স্বাস্থ্য-সমাচার

বঙ্গভাষায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একমাত্র
মাসিক পত্র।

সম্পাদক
ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু, এম্, বি।

অষ্টম বর্ষ
১৩২৬

কার্য্যালয়
৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ষ্টাণ্ডার্ড ড্রগ প্রেস,
৪৫ নং আহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

স্বাস্থ্য-সমাচার, অষ্টম বর্ষ, ১৩২৬

(বর্ণানুক্রমিক সূচি।)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অনশন	ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী	
আই-এম-এস		
আধুনিক শল্য-চিকিৎসা	শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এস্ সি	
আমেরিকার মদ্য বর্জ্জন		
আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা		
আলোচনা		৩, ২৫, ৪৯, ৭৩, ৯৭, ১২১, ১৪৫, ১৬৯, ১৯৩, ২১৭
আহারে মানসিক বিকৃতির ফল	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী	
ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়া		
ইনফ্লুয়েঞ্জার তৃতীয় আক্রমণ		
,, প্রতিষেধক ব্যবস্থা		
উচ্ছিষ্ট ভোজন	শ্রীনগেন্দ্রনাথ সিংহ শর্ম্মা	
৪৯শ বেঙ্গলীজ		
এপিডেমিক ড্রপ্সি		
কঁচি ছেলের খাবার	ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস	
কণ্টকারী	শ্রীগোপালচন্দ্র রায়	
কদলীর উপকারিতা	ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ	
কর্ণ, নাসিকা ও গলনালীর পীড়া		
কলিকাতায় কুষ্ঠব্যাধি		
কলিকাতায় বসন্ত		
কলিকাতার আবর্জ্জনা		
কলিকাতার চপ্ কাটলেটের দোকান		
কলিকাতার স্বাস্থ্য		
কলেরা নিবারণ		
কলেরা বা বিসূচিকা		
কাউণ্টেস অব ডফারিন ফাণ্ড		
কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ		
গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি		
গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান		
গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ড		
গ্রাম্য স্বাস্থ্য ও গবর্ণমেণ্ট		
চয়ন		
চিকিৎসক ভাইস চ্যান্সেলার		
চিকিৎসা বিদ্যায় ছাত্রীদের পুরস্কার		
ছেলেদের খেলা		
ছেলে মানুষ করা	ডাঃ শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় এল-এম-এস	
জননীর প্রতি		
জাপানের উন্নতির একটা কারণ		

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও পল্লীর স্বাস্থ্য	শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক	১৯৫
ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসার		১২২
ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল		৯৭
ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজ		৩
তেঁতুল	ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী	৪৪
দলাদলির সুলক্ষণ		২১৭
দারিদ্র্যই রোগের কারণ	শ্রীবিমলেন্দু মিত্র	২০৭
দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যের অপচয় নিবারণ		৭৯
দৃষ্টান্ত দ্বারা কিরূপে রোগ চিকিৎসা করা যায় ?		২৮০
ধনুষ্টঙ্কারে শিশু-মৃত্যু		৩
নববর্ষের নিবেদন		১
নাগরিক জীবন		১১৩
পচন নিবারক চিকিৎসা	ডাঃ শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়	১৭৯
পর্দ্দা কি যক্ষ্মার কারণ ?		২১৪
পল্লীর স্বাস্থ্য		১১৯
পল্লী-স্বাস্থ্য		২৩১, ২৫২, ২৭৭
পল্লী-স্বাস্থ্যোন্নতি	শ্রীযামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৯
পান	ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র রায়	২৫০
পাবলিক হেল্থ সার্ব্বিস		১২২
পৃষ্ঠ বেদনা		১০
পোষাক-পরিচ্ছদ	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ	১৬৭
প্রকৃত খাদ্য		১০৫
ভারতে জননেন্দ্রিয়ের পীড়া		২৫৭
ভারতের বাতুলাগার		১৯৬
ভারতে শিশুর জন্ম ও মৃত্যু		১৩৫
ভেজাল সরিষার তৈল		৯৮
মজুরদিগের স্বাস্থ্য		২৪১
মদ্যপানের অপকারিতা	শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী	১০০,
মদ্যপানের কুফল		১২১
মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্যবিভাগ		১৬৯
মনের তেজ		৫৬
মানবজাতির ভবিষ্যৎ খাদ্য		২৬৬
মানুষ গড়া		১৫৫
মান্দ্রাজে প্রসূতির মড়ক		১৫৮
মুষ্টিযোগ চিকিৎসা		৬৫, ১৬৮
মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরী		৯৮
মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-চিকিৎসালয়		৪৯
ম্যালেরিয়া	শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এসসি	৮৪
যশোহরে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয়		২৫
রক্ত দূষিত হয় কেন ?		১৫৪
লর্ড রোণাল্ডশের উক্তি		২৪২
বঙ্গ শিশু ও হুকওয়াম্	ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ	১৭২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্গে শিশু-মৃত্যুর কারণ	শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু	১৩৮
বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ	... ...	২৪২
বসন্তে আত্মরক্ষা	ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী	২৪৭
বস্ত্র	ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী	২৬৮
বাঙ্গালীর ছেলে	ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস	১২, ৩৬
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা	... ...	২৭১
বিলাতে আয়ুর্ব্বেদের আদর	... ...	৪৯
বিলাতে শিক্ষার ব্যবস্থা	... ...	৫১
বিল্ব	শ্রীগোপালচন্দ্র রায়	১৫০
বিবিধ সংগ্রহ	... ...	২৪, ৪৮
বিহারে পল্লীস্বাস্থ্য	.. ..	১৪৬
বোম্বায়ে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা	... ...	৫০
শত্রু নয়, মিত্র	... ...	২০১
শিশুদিগের ধূমপান নিবারণ	... ...	৫২
শিশুদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ	... ...	৫১
শিশুদের কর্ণশূল	... ...	১৮
শিশুদের পক্ষে গো-দুগ্ধ	... ...	৭
শিশু-মঙ্গল	... ...	২৬৫
শিশু-মড়ক	... ...	৫৩
শিশু-মৃত্যু ও তাহার কারণ	... ...	২৪৩
শিশু-মৃত্যুর প্রতিকার ব্যবস্থা	... ...	২১৪
শিশুর চিত্তবৃত্তি	... ...	৬৭, ৮১, ১০৮, ১২৬
শিশু শিক্ষা	... ...	১০১, ১৯০
শিশু স্বাস্থ্যের কথা	... ...	৩
শীতে স্বাস্থ্য রক্ষা	ডাঃ শ্রীবসন্ত কুমার চৌধুরী	২৩৫
সংক্রামক ব্যারাম ও এপিডেমিক	ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী	৫
সন্তান পালনে প্রসূতির অবস্থা	... ...	১৭৬
সমবায় দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন	... ...	২৬, ৪০
সমবায় সমিতির সাহায্যে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন এবং ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ নিব রণ	মাননীয় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র মিত্র সি-আই-ই	২১৯
সর্দ্দিগর্ম্মি	... ...	২০
সীমান্ত যুদ্ধে কলেরা	... ...	৯৭
সেকালের হাসপাতাল	... ...	১৪৭
স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ	... ...	১৯৯
স্কুলে স্বাস্থ্যরক্ষা	... ...	১৬৪, ১৮৪
স্বপ্নদোষ	... ...	৮৮
স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য	... ...	৩২
স্বাস্থ্য কমিশনারের বিজ্ঞাপন	... ...	২৬
স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ	... — ...	৯৯
স্বাস্থ্যতত্ত্বে উপেক্ষা	... ...	১৭৪
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ	১৪৩
হিন্দুস্থানী মতে বসন্ত চিকিৎসা	ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্য বিনোদ	২৩৭

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | বৈশাখ ১৩২৬ সাল | ১ম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

নিয়তি চক্রগতিতে "স্বাস্থ্য-সমাচার" সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করিয়া "অষ্টম বর্ষে" উপনীত হইল। পাঠক-বর্গের অনুগ্রহে ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশের মধ্যে একটী প্রয়োজনীয় পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যুদ্ধাদির জন্য ছাপিবার কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় আমরা সকলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মত কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেছি না। বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নিকৃষ্ট কাগজে পত্রিকা ছাপিতে হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে আমরা "স্বাস্থ্য-সমাচারের" অঙ্গসৌষ্ঠবের উন্নতিকল্পে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব স্থির করিয়াছি। স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা প্রচার করিয়া তদ্দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করা আমাদের কখনও উদ্দেশ্য নহে। সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তথ্য সকল প্রকাশ করাই আমাদের লক্ষ্য। ভরসা করি সহৃদয় গ্রাহকবর্গ আমাদিগের এই উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব অতি বিশাল এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন ইহা উন্নতি লাভ করিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার সহজবোধ্য পুস্তক, সাময়িক পত্রাদ্বি দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আমাদের দেশেও চরক, সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের বহুবিধ নিয়ম নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সমস্ত অমূল্য দ্রব্য কেবল পুস্তকেই আবদ্ধ উপদেশ আছে। অধুনা সভাসমিতি ও সহযোগী সংবাদ পত্রাদিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি ও আলোচনা প্রকাশিত হইতেছে ইহা আশার বিষয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বসন্ত ইত্যাদিতে দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের দেশ যেন এই সমস্ত উৎকট ব্যাধির কীটাণুসমূহের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর দেশের এই বিভীষিকাময় অবস্থা দর্শন করিয়া দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে এবং দেশকে এই সমস্ত ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হইলে কেবল বক্তৃতা ও সংবাদ পত্রিকাদি প্রকাশের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সাধারণের

ঔদাস্য দূর করিতে হইবে ; শৈশবাবস্থা হইতে শিশুদিগকে এই বিষয়ে অতি সরল ভাবে বুঝাইতে হইবে। ব্রতকথার ন্যায় স্বাস্থ্যবাণী সকলকে কণ্ঠস্থ করান উচিত। আমরা সকলেই জানি আরোগ্য করা অপেক্ষা রোগের আক্রমণ বন্ধ করাই সকলের কর্ত্তব্য। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রোগ আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয়। চিকিৎসকেরা গৃহস্থের আহার, বিহার ও অন্যান্য নিত্য করণীয় কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং যাহাতে রোগ না হয় তাহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় দরিদ্রদেশে সেরূপ সম্ভব নহে। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক সাধারণ নিয়মাদির সম্বন্ধে চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া দূরের কথা আমাদের দেশে এখনও এরূপ অসংখ্য পল্লী আছে যেখানে অনেক সময় চিকিৎসকের অভাব জন্য রোগী বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করে। আমাদের দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প। ২৪টী ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার স্কুল আমাদের দেশে নাই—সেইজন্য দেখা যায় প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ছাত্র চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়া কলেজ বা স্কুল সমূহে স্থানাভাব বশতঃ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়। সম্প্রতি বর্দ্ধমানে একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। ইহা অতি সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই প্রকার স্কুলের সংখ্যা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি না পাইলে আমাদিগকে এখনও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এই সমস্ত অসুবিধা, সাধারণের স্বাস্থ্য বিষয়ে অজ্ঞতা ও ঔদাস্য সকল বিষয়ে অন্তরায় রূপে বাধা দিতেছে।

সংসারে মানবের যতপ্রকার কর্ত্তব্য আছে তন্মধ্যে নিজ শরীর পালন ও রক্ষা এবং তাহার উন্নতি সাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, ইহা বলাই বাহুল্য। শরীর অসুস্থ হইলে তাহা আরোগ্য করিবার জন্য সকলেই সাধ্যমত যত্ন করিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রোগের আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে প্রায় অনেকেই বিশেষ কোন চেষ্টা বা যত্ন করেন না। মাদকদ্রব্য ব্যবহার, আহারাদি সম্বন্ধে অনিয়মাদি হইতে সকলকে সতর্ক হইতে হইবে। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির পথের বিঘ্ন গুলিকে নষ্ট করিতে হইবে। সংক্রামক রোগ সকল যাহাতে প্রতিরুদ্ধ হয় সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাস্থ্যই সকলের মূল ; এই মহামূল্য স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে সাধারণকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

নববর্ষের প্রারম্ভে এই নিবেদন লইয়া আমরা সাধারণের সমীপে উপস্থিত হইলাম।

আলোচনা

চিকিৎসক ভাইস চান্সেলার—সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার সার নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের আর কেহ ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন নাই। ডাক্তার সরকারের চিকিৎসা ব্যবসায় বিশেষ বিস্তৃত। বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্য্য গ্রহণ করায় তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ডাক্তার সরকারের এই পদ লাভে চিকিৎসক সম্প্রদায় বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। সকলেই আশা করেন যে ইহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইবে।

শিশু স্বাস্থ্যের কথা—সার নীলরতন সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন তদুত্তরে মিষ্টার ওমেলি বলিয়াছেন :—কলিকাতা কর্পোরেশন মাতৃনিবাস স্থাপন করিতেছেন। অন্য কোন মিউনিসিপালিটী অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে স্বাস্থ্য কমিশনার মিউনিসিপালিটী ও জিলাবোর্ড সমূহের সভাপতিদিগকে সার্কুলার পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, শিশুদের অতি-মৃত্যুর প্রতি লোকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহারা উহার প্রতিকারের জন্য উপায় করুন। ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে হাওড়ায় শিশু-প্রদর্শনী হইয়াছিল। স্বাস্থ্য কমিশনার জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ করিয়াছিলেন।

শিশু স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের প্রস্তাব সর্ব্বতো ভাবে কখনও আলোচিত হয় নাই। গভর্মেণ্ট কেবল শিশুদের অতি মৃত্যু নিবারণ জন্য উপায় বিধান করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওমেলি জানাইয়াছেন, যে, ১৯১৭-১৮ সালে এক বৎসরে বঙ্গদেশে মোট ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৫৩৭ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

ঢাকায় মেডিকেল কলেজ—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করেন যে ঢাকার মেডিকেল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করিয়া এককালীন ২ লক্ষ এবং বার্ষিক ৭৪৫৪০ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত করা হউক। গভর্মেণ্ট যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করিবার কথা হইয়াছে উহা হইতে এই অর্থ দেওয়া যাইতে পারিবে।

মাননীয় সার নীলরতন সরকার উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলেন, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা, চিকিৎসা বিদ্যার ফেকাল্টি না হইলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

সার হেন্‌রি হুইলার যথারীতি এই প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া জানাইয়াছেন যে, এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় এখনও আইসে নাই। আপনারা অপেক্ষা করুন, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রস্তাবাবলী প্রকাশিত হউক, সেইগুলির বিচার করিয়া পরে এই বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারিবে। সরকার হইতে এই যতটুকু বলিবার বলিলাম তদতিরিক্ত কোন প্রতিশ্রুতি এখন দিতে পারিব না।

অতঃপর প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইলে, পক্ষে ১৪ জন এবং বিপক্ষে ২৬ জন ভোট দেওয়াতে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ধনুষ্টঙ্কারে শিশু-মৃত্যু—"সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন কলিকাতা সহরে ১৯১৮ সালে ধনুষ্টঙ্কারে মোট ১০০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ৮৬৮ জনই

এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশু। এইত গেল সহরের মৃত্যুসংখ্যা। সমগ্র বঙ্গদেশে কত শিশু এই রোগে অকালে কালকবলে পতিত হয় তাহাও বিবেচ্য। আমাদের শিশুরা কিরূপ উপেক্ষিত হয় তাহা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই দেশের ভীষণ "আতুর ঘর"কে "যমের ঘর"ও বলা যায়। উহার মধ্যে আলো ও বায়ুর প্রবেশ নিষেধ। অশিক্ষিতা মাতা সেই ভীষণ ঘরে শিশু প্রসব করেন। এই ঘরে নবজাত সন্তানকে সর্ব্বপ্রথমে যে ধাত্রী ধারণ করিয়া থাকেন তিনি কিরূপ অজ্ঞ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। ধাত্রী বিদ্যাসম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানই নাই। সেই অশিক্ষিতা নারী তাহার অপরিচ্ছন্ন হস্তে যেমন তেমন ছুরি বা বাঁশের চটা দিয়া শিশুর নাড়ী ছেদন করে। এমন অবস্থায় যদি শিশু ধনুষ্টঙ্কারে না মরে ত কে মরিবে? সহরে যে ঘরে জননীরা সন্তান প্রসব করেন ঐ ঘর বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত, উহা অপরিচ্ছন্ন, বায়ুহীন, আলোকবর্জ্জিত। যে ঘরে আলোক ও বাতাস খুব বেশী পরিমাণ আবশ্যক সেই ঘরেই উহার অভাব? এমন রুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ুর মধ্যে যে শিশু জন্মিল তাহার ক্ষীণ জীবনশিখা অত্যল্প কাল মধ্যে নির্ব্বাপিত হইলে সেই মৃত্যু বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না।

আমরা নগর ও পল্লীর নর নারীর নিকট একান্ত দুঃখের সহিত শিশুদের এই অতি মৃত্যুর কারণ উপস্থিত করিতেছি। আশা করি, শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য সকলে সচেষ্ট হইবেন।

আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা—লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার সাদার ল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রণালীর নিন্দা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই চিকিৎসা প্রণালীর মূলে অন্ধ কুসংস্কার রহিয়াছে। সাদার ল্যাণ্ড এই চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি অসঙ্কোচে ইহার নিন্দা করিতে পারিতেছেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া ইহার নিন্দা ঘোষণায় তাঁহার কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ হয় নাই। তিনি তাহার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার বৈজ্ঞানিকতার অভিমান লইয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কবিরাজদের রোগ নির্ণয় পদ্ধতি তাঁহার আক্রমণের প্রধান বিষয়।

সারজন জেনারেল সার পারডি লিউকিস, মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ফিলাডেলফিয়ার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ক্লার্ক এবং অপর বহু সুপণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক চরকের চিকিৎসা প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন—

যদি চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক সমস্ত ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের নাম তুলিয়া দিয়া চরকের প্রণালী মতে চিকিৎসা করা হয় তাহা হইলে চিকিৎসকের কার্য্য কমিবে এবং পৃথিবীর পুরাতন ব্যাধিপীড়িতদের সংখ্যা অতি সামান্যই থাকিবে।

সার পারডি লিউকিসও বলিয়াছেন—"যত অধিক দিন আমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি, এই দেশের সহিত আমার পরিচয় যত বৃদ্ধি হইতেছে, এই দেশের বৈদ্য ও হাকিমদের চিকিৎসার মূল্য আমি তত অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

সংক্রামক ব্যারাম ও এপিডেমিক্

লেখক—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বক্সী

যে সকল ব্যারাম সাধারণত এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রমিত হয় তাহাদিগকে সংক্রামক ব্যারাম বলে।"

ইহা নানা প্রকারে সংক্রমিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রধানত ৫ পাঁচ প্রকার উল্লেখ যোগ্য।

১। প্রদাহযুক্ত স্থান, ক্ষত স্থান এবং ব্রণ হইতে যে সকল পূয অথবা অন্যান্য পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা ব্যারাম এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রমিত হইতে পারে। এই প্রকারে গণোরিয়া, সিফিলিস্ (উপদংশ) বসন্ত, গ্ল্যাণ্ডসি পিত্তরপারেল, পেরিটোনাইটিস প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

২। মল দ্বারা কোন কোন ব্যারাম সংক্রমিত হয়। যথা,—কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার প্রভৃতি।

৩। কতকগুলি ব্যারাম, ফুস্‌ফুস্, চর্ম্ম ও লালা হইতে সংক্রমিত হইয়া থাকে। স্কালেটিনা, হুপিংকাপ, হাইড্রো কোবিয়া (Hydrocholim) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪। কতকগুলি স্পর্শ দ্বারা সংক্রমিত হয় (By direct contact) যথা,—স্কেবিস্, গণোরিয়া, পুরুলেট অবথ্যালমিয়া প্রভৃতি।

৫। কোন ২ ব্যারাম স্পর্শ (Immediate Contact) ব্যতীত ও উৎপন্ন হইতে পারে। এই প্রকার ব্যারামের বীজ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া অপর সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই প্রকারের সংক্রমণকে (Infection) ইন্‌ফেক্‌সন কহে।

এই ত গেল সংক্রামক ব্যাধির সাধারণ নিয়ম। প্রায়ই ইহার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। সেইটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি সুস্থ ব্যক্তি সংক্রামক রোগের সংশ্রবে আসিয়াও ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হয় না। দেখা গিয়াছে ছোট ছেলে ভাতের মাড় মনে করিয়া তাহার কলেরাগ্রস্ত পিতার মল পান করিয়াছে তবুও সে ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হয় নাই। মাতা তাহার বসন্ত রোগগ্রস্ত পুত্রের পূয ও অন্যান্য স্রাব মধ্যে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিয়াও ঐ ব্যারাম হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

আবার দেখা যায় কোন বিশেষ কারণ টের পাওয়া যায় না, অথচ এক সঙ্গে বহু স্থানের বহুসংখ্যক লোক কোন একটী পীড়ায় এক সঙ্গে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। কোন প্রকার সাবধানতাই কার্য্যকরী হইতেছে না। এস্থলে সংক্রামকতার কথা কাহারও মনেই আসিবার সময় পায় না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় না কি, যে "সংক্রামকতা" একটি কথার কথা? যখন এক সঙ্গে নানাদেশে বহুসংখ্যক লোক একই ব্যারামে আক্রান্ত হয় তখন সংক্রামকতা কথাটি থাকে কোথায়? পরে অবশিষ্ট লোকদের হয়ত সংক্রামণ প্রণালী অনুসারে ঐ ব্যারাম হইতে পারে। প্রথমটি তবে কি? আর সেই অবশিষ্ট লোকদের মধ্যেও অনেকে এই আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায় তাহারই বা কারণ কি?

এই যে এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইল—ইহা সংক্রামক ভাবে কয়জনের হইল? দেশব্যাপী এই ইনফ্লুয়েঞ্জা একদিনে হঠাৎ বহুসংখ্যক লোককে আক্রমণ করিয়াছে—প্রথম এক জনের হইয়া তাহাই সংক্রমিত হইয়া অপর লোকের সর্ব্ব স্থলেই হয় নাই। এমন স্থানে হইয়াছে যেখানে এই সংক্রমণের কারণ একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি এমন গ্রামের কথা জানি যাহার চারিদিক বর্ষার জলে প্লাবিত গ্রামখানি একটি দ্বীপের ন্যায় সেই অগাধ জলরাশি মধ্যে ভাসিতেছে। গ্রামে কেবলমাত্র ২০।২২ ঘর লোকের বাস। এই

লোকদের মধ্যে প্রায় সকলেই একই দিনে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছে। কোন বাড়ীতে দুইটি, কোন বাড়ীতে একটী সুস্থ রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আবার কেহ ২ পরে আক্রান্ত হইয়াছে। কেহ মোটেই আক্রান্ত হয় নাই। প্রথম বারেও হয় নাই। দ্বিতীয় আক্রমণের সময়ও হয় নাই।

সাধারণত দেখা যায় কোন একটি এপিডেমিক বা জনপদ বিধ্বংসী ব্যারামের সময় এই সংক্রমণ নিয়মটি প্রায়ই খাটে না। সে সময় বায়ুমণ্ডল এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যাহার মধ্যে এপিডেমিকের প্রভাব খুব তীব্রভাবে অবস্থান করে। এই এপিডেমিক প্রভাব (Epedemic influence or Constitution) নানা কারণে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন নভোমণ্ডলের গ্রহ নক্ষত্র দিগের প্রভাবে এই প্রকার সংঘটিত হয়। কাহারও কাহারও মত আগ্নেয়গিরি হইতে অথবা ভূমিকম্পের পর এক প্রকার গ্যাস উৎপন্ন হওয়ায় ইহা ঘটে, কেহ বায়ুমণ্ডলের বৈদ্যুতিক অবস্থা (Electrical Condition) এবং ক্ষুদ্র ২ আণুবীক্ষণিক জীবাণুর বৃদ্ধি ইহার কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকলই কেবল অনুমান মাত্র। তবে ইহা ঠিক যে এই এপিডেমিকের সময় এমন একটী অবস্থা উপস্থিত হয় যখন মানবের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং কোন একটি বিশেষ প্রকারে বিষ (Specific Poison) অত্যন্ত তীব্র ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। এ অবস্থায় সংক্রমণের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হাম, স্কার্লেটিনা এবং বসন্ত প্রায়ই এপিডেমিক আকারে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কলেরা ও টাইফয়েড্ জ্বর এবং কখনও কখনও ডিপ্‌থিরিয়া কোন একটি বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে এপিডেমিক আকারে দেখা দেয় বটে; কিন্তু পূর্ব্বের কয়েক প্রকারের ন্যায় এত দেশ ব্যাপী হইয়া পড়িতে প্রায়ই দেখা যায় না।

এখন দেখা যাইতেছে সংক্রমণই হউক আর বায়ুমণ্ডলের তীব্র বিষের বৃদ্ধিই হউক, ব্যারাম উৎপন্ন করিবার পক্ষে ইহারাই যথেষ্ট নহে। আরও একটী জিনিষ দরকার, তাহা, মানবের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতার অভাব। এই জিনিষটিই মূল, যাহার জন্য মানব দেহে ব্যারাম উৎপন্ন হইবার সুযোগ পায়। যাহার এই রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বেশী পরিমাণে আছে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাই হউক, আর বসন্তই হউক কেহ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

কাহারও কাহারও দেহ এমন রোগ প্রবণ যে কোন একটী ব্যারাম, এপিডেমিক আকারেই হউক বা এন্‌ডেমিক আকারেই হউক, আরম্ভ হইতে না হইতেই তাহারা সর্ব্বাগ্রে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকার দেহ লইয়া সংসারে বাস করিতে প্রয়াস পাওয়া একটি বিড়ম্বনা বিশেষ। তাহার বাঁচা মরা তুল্য।

কাহারও কাহারও মত আমাদের দেশের দরিদ্রতা, খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে আমাদের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে। কথাটি অনেকাংশে ঠিক তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া আরও কারণ আছে যাহার জন্য ধনবান ব্যক্তি, প্রচুর সারবান খাদ্য ভোজী ব্যক্তি প্রভৃতিরাও সমভাবে ঐ সকল ব্যারাম দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে মানবের সাত্ত্বিক ভাবের ব্যতিক্রমই এই রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা হারাইবার মূল কারণ। যুক্ত আহার, বিহার, কর্ম্ম সকলে নিয়মিতরূপ চেষ্টা, নিয়মিতরূপ নিদ্রা ও জাগরণ এক কথায় সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিকভাবে অবস্থান রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যাহারা উৎশৃঙ্খল, আহার বিহারে যাহাদের নিয়মমাত্র নাই, যাহা ইচ্ছা তাই যাহারা খান, সে খাদ্য বাসি হউক, অখাদ্য হউক, পূতিগন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত হউক, বাজারেও নিকৃষ্ট রূপে পক্ক হউক যাহারা এসকলে কোনই নিয়ম পালন করে না তাহারাই সাধারণত রোগপ্রবণ দেহবিশিষ্ট হইয়া পড়ে।

এপিডেমিক আরম্ভ হইলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি

খুব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। বাজারে পচা জিনিষ বিক্রয় বন্ধ হইয়া যায়, দোকানে খাবার প্রভৃতিতে যাহাতে মাছি বসিতে না পায়, ধূলি না জন্মিতে পারে, বাসি ও দুর্গন্ধ জিনিষ না বিক্রয় করা হয়, এ সকল বিষয়ে খুব দৃষ্টি দিতে দেখা যায়। কিন্তু অসময়ে এই দৃষ্টি না দিয়া যদি সময়মত সমস্ত বৎসর ভরিয়া এই সকল সাবধানতা অবলম্বন করা হয় তবে লক্ষ লক্ষ প্রাণী অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এপিডেমিক আরম্ভ হইলে একদিনেই হয় না—ইহার জন্য তাহাকে অনেক দিন হইতেই বল ও ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হয়—পরে একদিন হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবার সুযোগ পায়। যাহাতে এইরূপ সংগ্রহে বাধা পড়ে তাহার চেষ্টা বহুপূর্ব্ব হইতেই করা দরকার। তাহা না করিলে ইহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই কঠিন।

ডাক্তারী বহিতে সংক্রামক ব্যারাম ও এপিডেমিকের নানা প্রকার প্রতিষেধক ঔষধের ব্যবস্থা দেখা যায়। আমার বিবেচনায় নিজ শরীরকে এই সকল রোগ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা অর্জ্জন করা। এই সকল রোগ এত গুপ্তভাবে, দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মানবদেহে প্রবেশ করে যে, মানব ইহা হইতে সাধারণ উপায় দ্বারাই রক্ষা পাইতে পারে না। একমাত্র নিজের শরীরকে একটী দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা ছাড়া অন্যগতি নাই।

শিশুদের পক্ষে গো দুগ্ধ

শিশুদিগের আহারের জন্য আজ কাল বহুবিধ পেটেণ্ট বা কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু এই প্রকার খাদ্য ব্যবহার করিতে হইলে তাহার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হইলে উপকার না হইয়া বরং অপকারই সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে অধুনা শিশু দিগের পক্ষে উপযোগিতা অনুযায়ী এই সমস্ত খাদ্যের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে সকলেই সতর্ক হইতেছেন। আজকাল শারীরিক ক্রিয়া ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাদির সম্বন্ধে সাধারণ ক্রমশঃ অভিজ্ঞ হইতেছেন, এখন লোকে আহার্য্যের উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কিরূপ খাদ্য শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় সেই দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন এবং তাহা দেখিয়াই আহার্য্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকেন। সাধারণের পক্ষে খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করা উপস্থিত আমাদের বক্তব্য নহে। শিশুদের খাদ্যের জন্য গো দুগ্ধের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলাই এখানে উদ্দেশ্য।

সকলেই অবগত আছেন যে শিশুদিগের পক্ষে মাতৃদুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে সুস্থ মাতার দুগ্ধই শিশুর পক্ষে উপকারী, কিন্তু তথাপি নানাবিধ কারণে গো-দুগ্ধের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী এবং আমাদের দেশে সকল শিশুই স্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে গো-দুগ্ধ পান করে। এই গো দুগ্ধ কি প্রণালীতে ব্যবহার করিলে নিরাপদ হয় ও শিশুর শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এ বিষয়ে কিছু জানিয়া রাখা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। মাতৃ দুগ্ধই সর্ব্বতোভাবে শিশুর পক্ষে যথার্থ উপকারী এবং উপযোগী সুতরাং যে খাদ্যের উপাদান মাতৃ দুগ্ধের উপাদানের সহিত এক হইবে অন্ততঃ সম্ভবমত এক উপাদান বিশিষ্ট হইবে তাহাই যে শিশুর পক্ষে উপকারী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিশুদের পক্ষে শ্বেতসার পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য (Starchy food) অত্যন্ত অপকারী। মাতৃ দুগ্ধে

শ্বেতসার বিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই। রুটী, আলু, এবং অন্যান্য যে সমস্ত শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য মাতা আহার করেন শারীরিক প্রক্রিয়া ক্রমে যে সমস্ত শর্করায় পরিণত হইয়া শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। শিশুদের এই বয়সে শর্করা পরিপাক করিবার উপযুক্ত শক্তি তাহাদের থাকে না কিন্তু যে সমস্ত কৃত্রিম আহার্য্য শিশুদিগের জন্য চলিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে প্রায়ই শর্করা বিশিষ্ট দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। শিশুদিগের আহার্য্যের বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তাহাদের পরিপাক যন্ত্রাদি অতি কোমল এবং অতি সামান্য কারণেই তাহাদের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। যে খাদ্য শিশুদের শরীরের সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধন সমভাবে করিতে সমর্থ ও নিয়মিত রূপে এবং সহজে যাহা পরিপাক হইবে সেইরূপ দ্রব্যই শিশুদিগের আহারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

এক্ষণে দেখা যা'ক যে গো দুগ্ধে কি কি জিনিষ বর্ত্তমান। প্রায় সমস্ত দুগ্ধেতেই মোটামুটি একই উপাদান বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে মনুষ্যের দুগ্ধের ও গো দুগ্ধের উপাদানের তালিকা দেওয়া হইল।

জল—এলবুমেন্—ফ্যাট্—সুগার—মণ্ট—কেজিন্

মনুষ্য দুগ্ধ—৮৮·৯২—অল্প—২·৬৬—৪·৩৬—·১৪—৩·৯২

গো দুগ্ধ—৮৭—·৫০—৩·৫০—৪—·৭২—৪·২৮

গো দুগ্ধে ছানার ভাগ অত্যন্ত বেশী এবং চর্ব্বি ও শর্করার ভাগ কম সেই জন্য কয়েকটী প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেই উহা প্রায় মাতৃদুগ্ধের ন্যায় তুল্য গুণ বিশিষ্ট হয় এবং শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। কিন্তু অন্যান্য দুগ্ধ যথা গর্দ্দভ, ছাগ দুগ্ধ ইত্যাদিও অনেক অংশে মাতৃদুগ্ধের তুল্য গুণ বিশিষ্ট, কিন্তু গো দুগ্ধের ছানাময় অংশ শিশুদের পক্ষে অতীব গুরুপাক হয়। গো দুগ্ধে ছানার ভাগ বেশী ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং স্তন্য দুগ্ধে এলবুমেনের ভাগ গো দুগ্ধ অপেক্ষা বেশী। গো দুগ্ধে ছানার ভাগ বেশী থাকার জন্য ইহা পান করিলে শিশুদের পাকস্থলীতে গিয়া এই দুগ্ধ জমিয়া যায় ও পরিপাকের হানি করে। ইহা ব্যতীত স্তন্যদুগ্ধ অপেক্ষা গো দুগ্ধে শর্করার ভাগ অনেক কম। কিন্তু শর্করা শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

উল্লিখিত বিষয় গুলি ভিন্ন গো দুগ্ধের অপর একটী দোষ আছে। যে সমস্ত গাভীকে বাড়ীতে রাখিয়া খাওয়ান হয় তাহাদের দুগ্ধে কিঞ্চিৎ অম্ল উৎপাদন করে কিন্তু যে সমস্ত গাভী মাঠে চরিয়া খায় তাহাদের দুগ্ধ অনেকটা মাতৃদুগ্ধের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়।

গো দুগ্ধ ব্যবহারের বিবিধ প্রণালীর মধ্যে কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

Sterilized milk :—দুগ্ধ গরম করিয়া ব্যবহার করিলেই তাহাকে Sterilized milk বলে। এইরূপ দুগ্ধ গরম করিয়া ব্যবহার করা দেখিতে গেলে অনেক অংশে অতীব হিতকারী, কারণ গরম হইলে উহার সমস্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায়! দুগ্ধে নানাবিধ "bacilli" থাকে এবং দুগ্ধের সহিত তাহা উদরস্থ হইয়া বহুবিধ রোগ উৎপাদন করে। কিন্তু দুগ্ধ ফুটাইয়া লইলে যেমন একদিকে অনেক সুবিধা হয় সেইরূপ এরূপ প্রক্রিয়ায় অনেক অসুবিধাও আছে। প্রথমতঃ দুগ্ধের যাহা প্রকৃত আস্বাদন তাহা ইহাতে নষ্ট হইয়া যায়, গরম করিলে দুগ্ধের ফ্যাট্ (চর্ব্বি) অংশ কমিয়া যায় এবং দুগ্ধের ছানার অংশের পরিবর্ত্তন হইয়া শিশুদের হজমের পক্ষে অধিকতর অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়।

Boiled milk—আমাদের দেশ গ্রীষ্ম প্রধান। আমাদের দেশীয় জলবায়ু জন্য এ দেশে দুগ্ধ ফুটাইয়া না লইয়া কাঁচা অবস্থায় রাখিয়া দিলে অতিরিক্ত গরমের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য আমাদের দেশে দুগ্ধ ফুটাইয়া ব্যবহার করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহাতে দুগ্ধ শীঘ্র অব্যবহার্য্য হয় না বটে কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে কাঁচা দুগ্ধের মধ্যে যেরূপ পুষ্টিকারক দ্রব্য পাওয়া যায় দুগ্ধ ফুটাইয়া লইলে তাহাতে সে পরিমাণ পুষ্টিকর দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের জলবায়ু অনুসারে আমাদিগের বাধ্য হইয়া ঐরূপ ভাবে

দুগ্ধ ব্যবহার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। শিশুদিগের ব্যবহারের জন্য যে দুগ্ধ সিদ্ধ করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে দুগ্ধ বেশীক্ষণ ফুটাইয়া ব্যবহার করা অতীব ভুল, কারণ এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত দুগ্ধ বিশেষ অনিষ্টকারী হইয়া থাকে। দুগ্ধে অধিকক্ষণ স্থায়ী ভাবে জাল না দিয়া একবার ফুটিয়া উঠিবামাত্র তাহা রাখিয়া দিয়া সেই দুগ্ধ ব্যবহার করিলেই সর্ব্বতোভাবে শরীরের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকারক ও উপযোগী হয়। ছাগ দুগ্ধ অনেকটা মাতৃ দুগ্ধের সমগুণ বিশিষ্ট তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটী বিশেষ অসুবিধা থাকায় ইহা শিশুদের জন্য খুব কমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ছাগ দুগ্ধের আস্বাদন তত সুবিধা নহে তাহা ছাড়া ইহার একটু দুর্গন্ধ আছে। ছাগ দুগ্ধের অপর একটী বিশেষ অসুবিধা যে সাধারণতঃ ইহারা অখাদ্য আহার করিয়া থাকে সেই জন্য ইহাদের দুগ্ধের উপাদান অনেক সময় বিভিন্ন প্রকারে হইয়া যায় ও শরীরের পক্ষে কখন কখনও অনিষ্টকারক হয়। এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে ছাগদুগ্ধ শিশুদিগের পক্ষে প্রশস্ত এবং প্রকৃষ্ট উপযোগী আহার্য্য হইতে পারে না।

অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধের মধ্যে গো দুগ্ধ শিশুদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও পুষ্টিকারক এবং ইহা মাতৃ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে শিশুদিগের জন্য নির্ব্বিবাদে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু এইখানে একটা কথা হইতেছে, গো দুগ্ধ শিশুর প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে হইলে ইহাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। কারণ মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা গো দুগ্ধে অধিক পরিমাণে সার পদার্থ আছে (solid matters) সেই সমস্ত পদার্থ শিশুদের পক্ষে পরিপাক কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া গো দুগ্ধের ছানাময় অংশ শিশুদের পক্ষে অনিষ্টকারী। এই ছানাময় অংশ উত্তমরূপে পরিপাক হইয়া শিশুর শরীর পোষণের কার্য্যে নিয়োজিত হয় না কাজেই শিশু শরীরের পুষ্টি সাধনের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু গো দুগ্ধের এই সমস্ত অসুবিধা থাকিলেও চেষ্টা দ্বারা ও কয়েকটী রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহাকে মাতৃ দুগ্ধের তুল্য গুণবিশিষ্ট করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমরা জানি যে গো দুগ্ধে মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা প্রোটিনের (Protein) ভাগ অধিক এবং চর্ব্বি ও শর্করার ভাগ কম। সেই জন্য ইহার প্রোটিনের ভাগ কমাইয়া তাহাতে প্রয়োজন মত চর্ব্বি ও শর্করার ভাগ বৃদ্ধি করিলেই তাহা প্রায় মাতৃ দুগ্ধের ন্যায় সমগুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়।

গো দুগ্ধে জল মিশাইলেই তাহা শিশুদের উপযোগী হয় এইরূপ সাধারণের ধারণা। দুগ্ধে জল মিশাইলে তাহার (Protein) প্রোটিনের ভাগ কমিয়া যায় সত্য কিন্তু শিশুদের অপকারী দুগ্ধের ছানাময় অংশের তাহাতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। গো দুগ্ধকে মাতৃ দুগ্ধের সমগুণ বিশিষ্ট করিতে হইলে দুগ্ধের এই অনিষ্টকারী অংশকে অন্য কোন উপায়ে নষ্ট করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গো দুগ্ধে মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা শর্করার ভাগ অনেক কম তাহার উপর জল মিশ্রিত করিলে তাহার ভাগ আরও কমিয়া যায়। দুগ্ধের শর্করার ভাগের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অনেক সময় দুগ্ধে চিনি মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয় কিন্তু ইহাতে দুগ্ধের প্রকৃত অভাব দূর হয় না। এই সমস্ত কারণে দুগ্ধে কেবল জল মিশ্রিত করিলেই গো দুগ্ধ প্রকৃতভাবে মাতৃ দুগ্ধের সহিত সমগুণ বিশিষ্ট হইয়া শিশুদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হয় না। উল্লিখিত কারণ গুলি ভিন্ন গো দুগ্ধের ছানাময় অংশ শিশুদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হানিকর। জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলেও গো দুগ্ধের এই দোষ একবারে নষ্ট হয় না। গো দুগ্ধের এই দোষ নষ্ট না করিয়া শিশুদিগকে খাওয়াইলেই ইহার ছানাময় অংশ শিশুদিগের পাকস্থলীর ভিতর শক্ত হইয়া জমিয়া যায় এবং তাহা কিছুতেই হজম হয় না কিন্তু মাতৃ দুগ্ধে এ আশঙ্কা খুব কম।

অন্যান্য প্রাণীর দুগ্ধ অপেক্ষা মাতৃ দুগ্ধের অভাবে নানা কারণে গো দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও উপযোগী। কিন্তু এই গো দুগ্ধের ও কয়েকটী বিশেষ দোষ থাকিলেও কয়েকটী প্রণালীতে ব্যবহার করিলে ইহা অনেকটা মাতৃ দুগ্ধের তুল্য গুণবিশিষ্ট হইয়া শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। এক্ষণে দেখা যাক্ যে কি কি প্রণালী অবলম্বন করিলে বা গো দুগ্ধকে কি ভাবে অবস্থান্তর করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইলে উহা মাতৃ দুগ্ধের সমগুণ বিশিষ্ট হয়। গো দুগ্ধকে মাতৃদুগ্ধের তুল্য গুণবিশিষ্ট করিতে হইলে এবং শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ প্রণালীতে ব্যবহার করিলেই তাহা হইতে পারে। প্রথমতঃ গো দুগ্ধের ছানাময় অংশকে এরূপ অবস্থান্তরে আনিতে হইবে যে উহা শিশুরা সহজে পরিপাক করিতে পারে এবং প্রক্রিয়া দ্বারা উহার পরিমাণ দুগ্ধ হইতে কমাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উহাতে শর্করা ও চর্ব্বির ভাগ কম থাকে তাহা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মাতৃ দুগ্ধের তুল্য করিতে হইবে। এবং তৃতীয়তঃ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ দুগ্ধকে ক্ষার গুণ সম্পন্ন (Alkaline) করিতে হইবে। গো দুগ্ধের উল্লিখিত রূপে পরিবর্ত্তন করিয়া মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে উহা অনেকটা নির্ব্বিঘ্নতার সহিত শিশুদিগের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে এবং মাতৃ দুগ্ধের অভাবে ঐরূপে প্রস্তুত গো দুগ্ধ যে শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও পুষ্টিকারক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পৃষ্ঠ বেদনা

পৃষ্ঠবেদনা বিবিধ প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের যে কোন স্থানে এই বেদনা হইতে পারে। যে প্রকারেরই হউক সকল অবস্থাতেই ইহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, ইহার অসহ্য যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। অধিকাংশ স্থলে এই রোগ বেশী তীব্র না হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সকলের পক্ষে এই বেদনা একই প্রকারের হয় না। কোন কোন ব্যক্তির বেদনা স্থানে হাত দিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় আবার এরূপও দেখা যায় যে বেদনাস্থানে টিপিলে রোগী আরাম বোধ করে।

এই রোগ অনেকানেক কারণে উপস্থিত হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে মোটামুটি এই রোগের বিশেষ কারণ দেখান হইতেছে। পরিপাক শক্তির হ্রাস বা গোলযোগ হইলে এই রোগ হয়। যাহাদের বহুদিনস্থায়ী অজীর্ণ রোগ আছে তাহাদের প্রায়ই কোমরের মধ্যে এইরূপ বেদনা হইয়া থাকে। কখনও কখনও রোগীর এইরূপ অবস্থায় সামান্য বেদনা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের বিশেষ লক্ষণ দেখা দেখা যায় না কিন্তু এইরূপ বেদনাতেই রোগীর পাকস্থলীর কার্য্য অনেক রকমে খারাপ হয়। যকৃতের কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিলেও এইরূপ বেদনা উপস্থিত হইতে দেখা যায় এবং অধিকদিন স্থায়ী হইলে ক্রমে ক্রমে বেদনা পৃষ্ঠদেশ হইতে স্কন্ধ সন্ধির মধ্যভাগে কিম্বা বক্ষিণ স্কন্ধাস্থিতে আসিয়া পৌছায়।

কোষ্ঠবদ্ধতাও ইহার অন্যতম কারণ। কিন্তু কোষ্ঠ বদ্ধতার জন্য যে বেদনা হয় তাহা সাধারণতঃ কটিদেশে থাকে। কিন্তু এই কারণে পৃষ্ঠবেদনা হইলে তাহা বেশী কষ্টজনক বা স্থায়ী হয় না কারণ কোনরূপ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে কিম্বা অবস্থা বিশেষে অন্য কোন প্রকারে উত্তমরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেই বেদনার উপশম হয়। এখানে হয়ত বলিতে পারেন যে অনেকস্থানে দেখা যায় প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে মলত্যাগে এইরূপ বেদনা

হইয়া থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, যাহাদিগকে ঐরূপ অবস্থাতেও এই বেদনায় কষ্ট পাওয়া যায় তাহাদের নিশ্চয়ই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না এবং সেই জন্যই তাহার পৃষ্ঠবেদনায় কষ্ট পায়।

আমরা শরীর রক্ষার জন্য যাহা আহার করি সেই আহার্য্য বস্তুর সার অংশ শারীরিক প্রক্রিয়া দ্বারা রক্তে পরিণত হইয়া শরীরের বল উৎপাদন করে এবং অসার অংশ শরীরের অপকারী বলিয়া মূত্র, মলের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা আছে তাহাদের মল নিয়মিত ভাবে নির্গত হইয়া যায় না বলিয়া সেই সমস্ত শরীরের অপকারী বিষাক্ত দ্রব্য শরীরের মধ্যে জমিয়া থাকে এবং এই বিষাক্ত দ্রব্য ক্রমে ক্রমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে ও তাহা হইতেই পৃষ্ঠবেদনা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। আমরা সাধারণতঃ কোন বেদনায় কষ্ট পাইলে তখন তাহা নিবারণের জন্য যে সমস্ত পেটেণ্ট (Patent) ঔষধ বাজারে বিক্রয় হয় তাহা ব্যবহার করি। সেই ঔষধ ব্যবহারে অনেক সময়ে আশু ফল পাইয়াও থাকি। কিন্তু ঐ সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে উপস্থিত বেদনার হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেও প্রকৃত যে কারণে রোগ হইয়াছে তাহার উপর কোন ক্রিয়া হয় না এবং তাহা নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যকারী অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। সেইজন্য এই বেদনা উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ তাহার কারণ নির্ণয় করা বিধেয়। রোগের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার চিকিৎসা করিলেই রোগ নিরাময় হইয়া যায় অন্যথা নির্ব্বোধের ন্যায় পেটেণ্ট ঔষধাদি ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকার স্থায়ী কোন উপকার হয় না।

পাশ্চাত্য অনুকরণে আজকাল আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ কর্‌সেট্ প্রভৃতি পোষক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত জামা ব্যবহারে কোমরের উপর অধিক চাপ পড়ে এবং তজ্জন্য তলপেটের যন্ত্রসমূহ স্থানান্তরিত হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ এবং স্থায়ী ভাবে এই সমস্ত জামা ব্যবহারে দেহের যন্ত্রাদির ব্যতিক্রম ঘটিয়া পরিনামে পৃষ্ঠবেদনা উৎপন্ন হয়।

পৃষ্ঠবেদনার বিবিধ কারণের মধ্যে বাত এবং স্নায়ুশূল সর্ব্বপ্রধান। স্নায়ুশূল জনিত বেদনা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও তীব্র হয়। এই কারণে যে বেদনা উপস্থিত হয় তাহার তীব্রতা বা হ্রাস অনেক সময় প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে সেঁতা কিম্বা ঠাণ্ডা বাতাসে থাকিলে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পৃষ্ঠবেদনায় দেখা যায় যে রোগীকে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ঠেস্ দিয়া রাখিয়া দিলে অনেকটা আরাম পায়। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালে বেদনার তীব্রতা অধিকতর বৃদ্ধি পায় এবং তজ্জন্য রোগী মোটেই নিদ্রা যাইতে পারে না। বহু স্থলে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বেদনা স্থানে গরম সেঁক দিলে কিম্বা বোতলে গরম জল পুরিয়া বেদনা স্থানে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করিলে বেদনার উপশম হয় ও রোগী অনেকটা সুস্থ হয়।

পৃষ্ঠবেদনার অপর একটী বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু এই কারণটীর প্রতি সাধারণতঃ আমরা লক্ষ্য করি না। অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ান বা বসিয়া থাকায় পৃষ্ঠবেদনা হইয়া থাকে। অস্বাভাবিক অবস্থায় শুইয়া বা বসিয়া থাকিলে আমাদের পেশীসমূহের অধিক পরিমানে প্রসারণ ও আকুঞ্চন হইয়া স্বভাবতঃই পৃষ্ঠবেদনা উপস্থিত হয় এবং আমরা যতক্ষণ না স্বাভাবিক অবস্থায় শুইয়া পড়ি ততক্ষণ সুস্থ হইতে পারি না। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে বালকগণ ঘাড় নোয়াইয়া বসিয়া পড়িতে অভ্যস্থ তাহাদের পৃষ্ঠবেদনা হইয়া থাকে।

অনেক সময় আকস্মিক বিপদ হইতেও ঐ রোগের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। যদি কোন ব্যক্তি কোন রকমে ঘোড়া বা গাড়ী হইতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে পড়িয়া গিয়া মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহা হইতে ফলে পৃষ্ঠবেদনা হইয়া থাকে। এইরূপ আকস্মিক বিপদের সঙ্গে সঙ্গেই সে ব্যক্তি অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা হয়। তারপর

শরীরের অন্যান্য অঙ্গের বেদনা পড়িয়া যায় বটে কিন্তু পৃষ্ঠবেদনা শীঘ্র আরোগ্য হয় না ও অনেকদিন স্থায়ীভাবে থাকে। এই সমস্ত রোগীদের রীতিমতভাবে চিকিৎসা করান দরকার।

পৃষ্ঠবেদনা মারাত্মক না হইলেও ইহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক তাহা নিঃসন্দেহ। সময়ে সময়ে ইহার যন্ত্রণা এত অধিক হইয়া থাকে যে রোগী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এমন কি শয্যা হইতে রোগীর উঠিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না। সেইজন্য এখানে আমরা পৃষ্ঠবেদনার কয়েকটী কারণ দেখাইয়া সাধারণকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ করিয়া দিলাম। এই রোগ যে সমস্ত কারণে হইতে পারে তাহা পাঠক এক্ষণে অবগত হইয়াছেন। তবে শেষ কথা এই যে যাহারা অনেকদিন হইতে স্থায়ী-ভাবে ভুগিতেছেন এবং নিরাময়ের সাধারণ উপায়গুলি অবলম্বন করিয়াও উপকার পান নাই তাঁহাদের কোন চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময় না করিয়া চাপিয়া রাখিলে পরিনামে ইহা অত্যন্ত কষ্টকর হওয়ার সম্ভব। চিকিৎসকের নিকট রোগীর জীবনযাত্রা নিয়মাদি, আহার, কার্য্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সংবাদ স্পষ্টভাবে বলা উচিত। কারণ সমস্ত কথা না বলিলে প্রকৃত কারণ ঠিক করা কঠিন। সমস্ত সংবাদ বলিয়া চিকিৎসকের উপদেশ ও ব্যবস্থা অনুযায়ী চলাই কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালীর ছেলে

('ভারতবর্ষ' হইতে উদ্ধৃত)

লেখক—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্ এম্-এস্

পিয়ার্স কোম্পানীর সাবান, কিম্বা মেলিন্স ফুড প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে যে বিলাতী শিশুর প্রতিকৃতি দেওয়া হয়, সেগুলি দেখিলেই স্বতঃ মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, এবং এখনো, বহু লোকের গৃহে, ঐ সকল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমা সযত্নে দেওয়ালে রক্ষিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়! কিন্তু "ওরিএণ্টাল আর্টের" ক্যাংলা ছবির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গালাদেশের শিশুর ছবি যে কেমন রোগ-জরা-মাখান, কেমন যে অকাল-বার্দ্ধক্যে ভরা করিয়া অঙ্কিত হয়, তাহা দেখিলে আনন্দের সঙ্গে যুগপৎ বিষাদের ছায়া দেখা দেয়। এমনটি কেন হয়? আমাদের "সোনার চাঁদ, সৃষ্টিধর, নন্দের দুলালেরা" এরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া জন্মায় কেন? যে দেশে বংশধরের জন্মের জন্য আনন্দ-উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে, যে দেশে বংশরক্ষা করা ধর্ম্মকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, সে দেশে শিশুর এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল?

আপাততঃ-অসাধ্য কারণ-নিচয়

যদিও পৃথিবীর সকল সুসভ্যদেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইয়াছে, তথাপি কুম্ভকর্ণের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া যথা-তথা এবং এইখানেই উহার যমজভ্রাতা কালাজ্বরেরও নিত্য প্রসার ঘটিতেছে। কলেরা বা বিসূচিকা-ব্যাধি পৃথিবীর অপর কুত্রাপি এইরূপ সহস্রশীর্ষ হইয়া রাজত্ব করিতে সাহসী হয় না। বসন্ত-ব্যাধি ভারতবর্ষেই "মাতার-অনুগ্রহ" অধিক পরিমাণে বর্ষণ করিয়া থাকে। বিভীষণের ন্যায়, যক্ষ্মা ও উপদংশ-ব্যাধি শনৈঃ-শনৈঃ এদেশে অমরত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত, যক্ষ্মা ও উপদংশ—এই সকল ব্যাধি অনায়াসে নিবার্য্য হইলেও, আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ উহাদিগকে নিবারণ করা অসম্ভব—অন্ততঃ এইটুকু

ধারণা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া করিতেই হইতেছে। আজ ইতালীতে ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়া নির্ব্বোধের কায বলিয়া বিবেচিত; যেমন পেন্‌সিল কাটিতে-কাটিতে নিজ অঙ্গুলি কাটিয়া যাওয়া দুর্ঘটনা হইলেও অসাবধানতাসূচক, তেমনি ইতালীতে যে কোম্পানীর অধীন শ্রমজীবীরা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়, আইনানুসারে সেই অসাবধান কোম্পানীকে অসাবধানতার দণ্ড স্বরূপ নিজ পয়সা ব্যয় করিয়া পীড়িত শ্রমজীবিদিগের চিকিৎসা ও খেসারতের জন্য বাধ্য করা হয়। এই ইতালীর ক্যাম্প্যানা নামক ভূখণ্ড অনেকাংশে বাঙ্গালাদেশের ন্যায়। সে দেশে ম্যালেরিয়া হওয়া লজ্জার কথা, আর আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া হওয়া একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। জার্ম্মাণরাজ্যে গো-বীজের টীকা লওয়া বাধ্যতামূলক বলিয়া, পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মাণ রাজ্যই বসন্ত ব্যাধি-বিমুক্ত। সমগ্র য়ুরোপময় যক্ষ্মা নিবারণের জন্য কি উদ্যমে কাজ চলিতেছে! এবং তাহার ফলে আজ যক্ষ্মা য়ুরোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত না হইলেও অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। ভোগভূমি য়ুরোপে উপদংশের বহুবিস্তৃতি সত্ত্বেও উহাকে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য কত উপায়ই উদ্ভাবিত হইতেছে। আর, আজ উপন্যাস পাঠ শ্রবণের ন্যায়, আমরা, বঙ্গদেশের চিকিৎসককুল, তাহা শুনিয়া যাইতেছি মাত্র!!!

অসাধ্য-সাধন

আমরাও চিকিৎসক, অপর দেশের লোকেরাও চিকিৎসক, আমরাও মানুষ তাহারাও মানুষ;—তবে কেন সুধু আমরাই রোগ ও জরা ভোগ করি? তাহার কারণ অনেকগুলি। সেগুলি প্রণিধান করিবার উপযুক্ত। (১) এ দেশের প্রাচীন ব্যবস্থা এই ছিল যে, চিকিৎসকগণ দাতব্য ভাবেই রোগীর চিকিৎসা করিতেন—ধনীরা এবং দেশের রাজাই চিকিৎসকের প্রতিপালনে অর্থব্যয় করিতেন। টোলের অধ্যাপকগণও অবৈতনিক-ভাবে শিক্ষাদান করিয়া যাইতেন;—এ কারণে, সমাজ নানারূপে অধ্যাপকগণকে বৃত্তি বা সম্মান দান করিয়া অর্থ যোগাইতেন। ফল কথা, অর্থকারী ব্যবসা চিকিৎসা-ব্যবসায় ছিল না, এবং চিকিৎসককুল আপামরসাধারণের উপকারে নিযুক্ত থাকিলেও, তাহাদিগের নিত্য-আলাপের বিষয় ছিলেন না। আমাদের বর্ত্তমান কালে, চিকিৎসা একটা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে—আদান-প্রদানের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—কাযেই সাধারণের চক্ষে উহার মর্য্যাদার হানিত হইয়াছেই, পরন্তু চিকিৎসককুলের শ্রীবৃদ্ধি আর এখন সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না। কাযেই, কতকটা ব্যবসায় বলিয়া, কতকটা চিকিৎসার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বশতঃও বটে,—সাধারণে উহার "ভালয়-মন্দে" সম্পদে-বিপদে সম্পৃক্ত হইতে চাহে না। সাধারণে উহার বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হইয়া, উহার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট না হইয়া, বরং ঐ দুই কারণেই চিকিৎসা-ব্যবসায়কে দূরে পরিহার করে এবং চিকিৎসকগণকে জীবনের নিত্য ঘটনার গণ্ডীর মধ্যে আনিতে চাহে না। চিকিৎসকের পক্ষেও ব্যবসা হিসাবে ব্যারাম "আরোগ্য" করাটাই লাভজনক বলিয়া, তাঁহারা ব্যারাম "নিবারণের" জন্য আদৌ ব্যস্ত হ'ন না। (২) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যেমন কোম্পানীর নিশান তুলিয়া দিয়া যে-কোনও য়ুরোপীয় বিনা-শুল্কে লবণের বাণিজ্য করিতেন এবং তজ্জন্য এদেশবাসী ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন, বর্ত্তমান কালে, বেসরকারী-চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরাও ঠিক অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। মোটা বেতন দিয়া সিভিলসার্জ্জন, ও তদ্ন্যূন বেতনে আসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন ও হস্পিটাল-অ্যাসিষ্টাণ্ট রাখিয়া এবং তাহাদিগকে অবাধ প্র্যাকটিশ করিবার সুযোগ দেওয়ায় বেসরকারী চিকিৎসকবৃন্দ প্রতিযোগিতায় অনেক স্থলে সফল হইতে পারেন না। কাযেই, যাহারা সরকারী কায করে, তাহাদের সময় ও সহানুভূতির অভাব বশতঃ, এবং, যাহারা বেসরকারী চিকিৎসক, তাহাদিগের নিত্য অর্থের অভাব বশতঃ, সাধারণের-উপকার হয়, এমন কার্য্যে উভয়ের কেহই মন দিতে পারেন না। কাযেই, বাধ্য

হইয়া, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (হেল্‌থ্‌ অফিসার ও স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর) নিযুক্ত করিয়া, অর্থব্যয়ে ও অনেক সময়ে অমানুষিক উপায়ে, স্বাস্থ্যানুকূলবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। যদি দেশের মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় চালান সম্ভবপর হইত, যদি হাঁসপাতালগুলিতে স্থানীয় চিকিৎসকবৃন্দ মিলিয়া-মিশিয়া কায করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে, পল্লীগ্রামে চিকিৎসক-গণের বাহুল্য ও তাঁহাদের বিদ্যার ও বহুদর্শিতার বৃদ্ধি ঘটিত এবং সেই সঙ্গে সহৃদয়তার ফলে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিত এবং বেতনভুক্ স্বাস্থ্যপরিদর্শকের নিয়োগের প্রয়োজন থাকিলেও, তাঁহার কার্য্যের উপরে তাবৎ দেশবাসীরই খরদৃষ্টি থাকিতে পাইত।

(৩) পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যবশতঃ, সাধারণে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কথা কহিতে চাহেন না। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপাঠ ধরান, সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি পঠন ও ছাঁয়া-চিত্রালোকের সাহায্যে প্রচারকরণ, বালিকা বিদ্যালয়ে রীতিমত-ভাবে স্বাস্থ্যপাঠ ধরান, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় মোটামুটি জ্ঞানের জন্য উপাধি সৃষ্টিকরণ—প্রভৃতি নানা উপায়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাধারণের মধ্যে অন্যায় "জুজুর" ভয় ভাঙাইতেই হইবে—নতুবা আমাদিগের ভদ্রস্থতা নাই। বিদ্যালয় বলিতে ইংরাজী বিদ্যালয়ের (হাইস্কুলের) নিম্নশ্রেণী হইতে কলেজের উচ্চতমশ্রেণী পর্য্যন্ত আমার লক্ষ্য এবং বালিকা বিদ্যালয়ে এম-এ, বি-এ, প্রভৃতি উপাধির বিড়ম্বনা না রাখিয়া ধাত্রী-বিদ্যা, শুশ্রূষাকারিণী-বিদ্যা, স্বাস্থ্য বিদ্যা, রন্ধনবিদ্যা, গৃহস্থালী প্রভৃতি বিদ্যার সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৪ নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের ঔদাসীন্য অমার্জ্জনীয়। আমি চাহি না যে, ঘরে-ঘরে রমণীরা বীজগণিতের কূট অঙ্ক সমাধান করুন; আমি চাহি যে, ঘরে-ঘরে পুরুষেরা রমণীগণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিন। মাটিতে লবণ বা ফল রাখিয়া খাওয়া, ঋতুবন্ধ না হইতেই চতুর্থ দিবসে স্নান করা, আঁতুড় ঘরে যত ময়লা ও পরিত্যক্ত জিনিস ব্যবহার করা, একই পুষ্করিণীতে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করা ও তাঁহার জল পানার্থ ব্যবহার করা, জঘন্য ময়লা কাপড় দশবার ত্যাগ করিয়া শুচিতা রক্ষা করা, পাতের এঁটো খাওয়া, মাথা মুড়ি দিয়া শয়ন করা, শয়নাগারের সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ করা, ময়লা "ন্যাতা" দ্বারা ভোজনপাত্রগুলির মার্জ্জনা করা, প্রভৃতি কত রকমের যে অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি আমাদের রমণীকুলের মজ্জাগত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অভ্যাসগুলির দোষ একে একে বুঝাইয়া ইহা-দিগকে পুরুষেরা নিরাকৃত না করিবেন ত কে করিবেন?

(৫) বার রাজপুতের তের হাঁড়ি-এই প্রবাদ-বচনটি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের জাতীয় একতার অভাব আছে। এই জাতীয় একতার অভাব একটী প্রধান অভাব। আমি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপ-যোগিতা বা অনুপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু জাতিবিভাগের ত্রুটী সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। তবে এটা বেশ মনে হয় যে, যদি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পশ্চাতে ক্ষাত্রধর্ম্ম সমানে সজীব ও প্রবল থাকে, তবেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে—নতুবা দলভ্রষ্ট সেনা, ভাব-হীন ভাষার মত জাতিবিচারের "কচ্‌কচি" লইয়াই দলাদলি করা সার হয়। জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, এখন সকলে মিলিয়া একত্রে কায করিতে হইবে। হীন স্বার্থ বা তুচ্ছ আত্মাভিমান লইয়া দলাদলি করিবার আর সময় নহে—সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখানে-ওখানে করধৃত-সূত্র-পরিচালিত বাজীকরের পুত্তলিকার ন্যায় নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া, পলিটিক্যাল থিয়েটার বা (রাজনীতির বৃথা অভিনয়) করিয়া আত্মাভিমান পুষ্ট বা স্বার্থ সংগ্রহ করিবার সময় আর নাই। জগতের সর্ব্বত্রই প্রজার জাগরণ হইয়াছে। আমাদিগকেও জাগিতে হইবে। কুম্ভকর্ণের কথা ভুলিতে হইবে। বিভীষণ যে অমর সে কথাও ভুলিতে হইবে। দেশের লোক লইয়া লোকমত প্রবল করিতে হইবে। লোকমত প্রবল হইলে, রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইবে না। লোকমত প্রবল হইলে, দেশমধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ও স্বাস্থ্যোন্নতির অভাব হইবে না। লোকমত প্রবল হইলে দেশের লোকে অহর্নিশ দেশের প্রাণের অস্থিমজ্জার সাড়া

পাইবে। তখন ছেলেদের কি রকমে মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, তাহার পরিচয় হাতেকলমে পাইব।

যদি দেশের সকলেই বুঝিতে পারে যে, আমাদের প্রধান অভাব দুইটী—শিক্ষার বিস্তৃতি ও স্বাস্থ্যলাভ,—তবে উঠিয়া পড়িয়া সকলেই সেই অভাব দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হয়। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের দেশের অবস্থা ঠিক উল্টা—অর্থাৎ আমাদিগের দেশের লোকে আদৌ জানে না যে, তাহাদিগের অভাব কি। আর তাহার উপরে এত বেশী করিয়া এবং এত জোরের সহিত তাহাদিগকে অনবরত শুনান হইয়াছে যে, তাহারা অকর্ম্মণ্য ও তাহাদিগের দেশে মানুষ নাই এবং তাহাদের দেশে দেখিবার বা শুনিবার উপযুক্তও কিছু নাই, যে তাহারা এখন সেই ভুলই ধারণা করিয়া রাখিয়াছে! অবস্থা ও ধারণা বিপরীত হওয়ার সঙ্গে, ব্যবস্থাও বিপরীত রকমের হইতেছে। অর্থাৎ, কোথায় দেশের লোকের সাহচর্য্যে, দেশের লোকের দ্বারা, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা হইবে, তাহা না হইয়া—সুদূর সিমলা বা দার্জ্জিলিং শৈলে বসিয়া, স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তার ইচ্ছামত, এখানে-ওখানে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে—আর দেশের লোকরা কতকটা অদৃষ্টের প্রহারের মত, কতকটা "বোঝার উপরে শাকের আঁটির" মত তাহা গায়ে মাখিয়া লইতেছে। এক পক্ষের ধার করা পিতৃত্বের কর্ত্তব্য-প্রয়োগ, অপর পক্ষে সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় ব্যবহার; ইহার ফলে অর্থ-নষ্ট মনঃকষ্ট হয় বটে, কিন্তু ফল অতি সামান্যই।

সত্য বটে, ইংরাজ আমাদিগের মা-বাপ হইয়া বসিয়াছেন, সত্য বটে তাঁহারা মমতাধিক্যবশতঃ আমা-দিগকে চিরকালই দুগ্ধপোষ্য শিশু করিয়া রাখিতে চাহেন; কিন্তু আমাদিগের নিজেরও ত কর্ত্তব্য আছে—আমরা কি কৈশোর উত্তীর্ণ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করি নাই? অগ্রসর হইয়া, পিতামাতার কার্য্যের লঘুতা সম্পাদন করা আমাদিগের উচিত।

রাষ্ট্রশক্তি যাহাতে প্রজার হস্তে সম্পূর্ণই না হউক, অন্ততঃ কতক পরিমাণে ন্যস্ত হয়, দেশময় সেই আন্দোলন চলিতেছে বটে; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশময় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিস্তারকল্পে সভা-সমিতি কই? যাহার যতটুকু সামর্থ্য, যতটুকু অবকাশ—সে সমস্তই দেশের হিতকল্পে নিযুক্ত করিতে হইবে। আগে দেশের লোককে খাইতে ও বাঁচিতে দিতে হইবে, তবে ত রাষ্ট্রশক্তির উপ-ভোগ করিবার সুযোগ হইবে? যে চেষ্টায় কংগ্রেস হইতেছে, সেই চেষ্টাকে সমস্ত বর্ষব্যাপী ও ক্রমানুযায়িক করিতে পারিলে এবং তাহাতে প্রাণের সংযোগ থাকিলে, কত কায করা যাইতে পারে। দেশের লোককে জানাইতে হইবে, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধিগুলি কি কি কারণে হয়; সেই সঙ্গে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার উপায়গুলিও জানাইয়া দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে দেশের লোকের কর্ণে ও মর্ম্মে বেশ করিয়া এই কথাগুলি প্রবেশ করিয়া দিতে হইবে যে, পৃথিবীতে অপর কোথাও এই সকল ব্যাধির তাদৃশ উৎপাত নাই, অতএব আমাদিগের দেশেও উহারা থাকিতে পাইবে না। ইহার জন্য যদি সমস্ত দেশ-বাসীকে একবেলা না খাইয়াও থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া ম্যালেরিয়াকে সবংশে নিধন করিতেই হইবে। সভা করিয়া, সমিতি করিয়া, দলগঠন করিয়া, গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বে হউক, গভর্ণমেণ্টের সাহচর্য্যে হউক, অথবা স্ব-স্ব চেষ্টায় হউক, যেমন করিয়া হউক, ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। যেমন এক দারিদ্র্যদোষ গুণরাশি নষ্ট করে, তেমনি একা ম্যালেরিয়াই সমস্ত বাঙ্গালার সকল সুখ, সকল স্বাস্থ্য, সকল উন্নতির অন্তরায়। গবর্ণমেণ্ট কবে দয়া করিয়া আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিয়া রাষ্ট্রীয় সুবিধা দান করিবেন, কত যুগ পরে আমাদের শিক্ষা জাতীয়-শিক্ষায় পরিণত হইবে, কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে দেশেরই লোকে দেশের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ণধার হইবেন—এই সকল আকাশকুসুমের আশায় বসিয়া না থাকিয়া আজই, এই দণ্ডেই, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, যাহার যেমন সামর্থ্য ও যাহার যেমন অবসর ও সুযোগ—সে সেই ভাবেই দেশের লোককে দেশের কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করুক।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুগ্রহে আজ দরিদ্রনারায়ণের সেবার মর্য্যাদা অনেক; কবে এই জরাব্যাধির ক্রীড়া-ভূমি আমাদের দেশে পীড়িত, নিরক্ষর ও সামাজিক "নিম্নশ্রেণী" ভুক্ত নারায়ণের সেবা ঘরে-ঘরে অনুষ্ঠিত হইবে? এই আপাততঃ অসাধ্যসাধন না করিতে পারিলে, শিশু-স্বাস্থ্য লইয়া বিচার করিয়া কি করিব।

যদি ম্যালেরিয়ার কথা ছাড়িয়া দিতে পারি, তবে শিশুস্বাস্থ্যের অনুন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু যে দিক দিয়াই দেখি, ম্যালেরিয়াই ওতঃপ্রোত ভাবে শিশু-স্বাস্থ্যহানির কারণ বলিয়া প্রকটিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন ম্যালেরিয়াকে এখন "ধামাচাপা" দিয়া রাখিতেই হইবে, তখন ম্যালেরিয়ার কথা ছাড়িয়া, অপর কারণগুলি নির্দ্দেশ করিব।

পিতামাতার অজ্ঞতা

পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব দায়িত্বপূর্ণ অবস্থা—ছেলেখেলা নহে। ইংরাজের অনুকরণে আমরা পত্নীকে আর সহ-ধর্ম্মিণী ভাবি না, বিলাস-ভোগ-সাধনের সামগ্রী মনে করি। কি নিজ-নিজ জীবনে, কি সন্তান-প্রতিপালনে, সংযমশিক্ষার দিকও মাড়াই না—নিজেও নিত্য অভাব সৃজন করিয়া, নিত্য সুখ-আশায় ঘুরিয়া মরি, ছেলেকেও বিলাসিতা, ভোগৈশ্বর্য্যের পথে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া করিয়া দিই। ইহা অপেক্ষা আর মূঢ়তা কি বেশী হইতে পারে? আমরা বাল্যবিবাহের দোষ দিই,—আমরা অমন অনেক বিলাতী ধূয়া ধরিয়া, কর্ণবাহী কল্পিত বায়সের পশ্চাতে ধাবিত হই; কিন্তু বাল্যবিবাহ বলিলেই কাম-পরিতৃপ্তির কথা মনে কর কেন? ছেলেকে সংযম শিক্ষা দাও নাই কেন? আমাদিগের প্রথম অজ্ঞতা এইখানেই। আমরা বিলাতী কাচ লইয়া অঞ্চলে গিরা দিবার জন্য অতীব উদ্‌গ্রীব। আমরা সহধর্ম্মিণীকে রমণী মনে করি, প্রমোদা জ্ঞান করি, আমরা বিবাহকে "বিশিষ্টরূপে পত্নীর ভার বহন করা" মনে না করিয়া ভোগোৎসব মনে করি। আমরা নিজ-নিজ সন্তানদিগকে-সমাজের ভাবী নিয়ন্তা ও স্ববংশের কীর্ত্তিস্থল বংশধর মনে না করিয়া, কামনার লীলাক্ষেত্র, ও অর্থবাহী বলদরূপে কল্পনা করি; এবং পুত্র সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান চরম আদর্শ,—"বাবা, তুমি দারোগা হও"। এইখানেই আমাদিগের প্রথম অজ্ঞতা—সংযমের অভাব।

আমাদিগের দ্বিতীয় অজ্ঞতা—স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞানহীনতা রমণীরা গৃহিণী হইতে স্পর্দ্ধা রাখেন, সুপাচিকা হইতেও স্পর্দ্ধাও করিতে পারেন, কিন্তু সুমাতা হইবার স্পর্দ্ধা কোথায়? যে গৃহিণী রন্ধনপটু, তিনি রন্ধনের প্রত্যেক উপকরণের দোষ-গুণ বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া, তবে রন্ধনকার্য্যে দক্ষতা লাভ করেন। কিন্তু, কি খাইলে শিশু ভাল থাকে, কি পরিলে শিশু ভাল থাকে, এ সম্বন্ধে অতীব স্থূলজ্ঞান মাত্র তাঁহারা কেহ কেহ নিজ অভিজ্ঞতার ফলে সংগ্রহ করিতে পারেন। মোটামুটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব কি পুরুষ, কি রমণী,—এ দেশে কেহই জানেন না, জানিবার স্পৃহাও প্রকাশ করেন না। প্রত্যেক বিদ্যালয়েও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে পাঠ্য পড়ান হয় না। যে অভিভাবকের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠ্য পুস্তক পড়ে, সে অভি-ভাবকেরা ভ্রমক্রমেও সেই সামান্য স্বাস্থ্যশিক্ষাটুকুও কষ্ট করিয়া পাঠ করেন না। পরন্তু, এ দেশে স্বাস্থ্যশিক্ষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-মত দম্ভের সহিত প্রকাশ করাই পৌরুষ-জ্ঞাপক। আমাদের দেশে কাহারো কোন ব্যারাম হইলে, বন্ধু-বান্ধবের মুখ হইতে—এমন কি সুচিকিৎসকেরই সম্মুখে—কত রকমের যে ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ভুক্ত-ভোগীরই জানা আছে। বোধ হয় আমাদের দেশে যত লোক আছে ততজনই "হাকিম"—অথচ, আমা-দিগের দেশের ন্যায় রোগের আকর অপর কোনও দেশ নহে। শ্রদ্ধাবান্ না হইলে, কখনও জ্ঞান লাভ হয় না। অশ্রদ্ধাবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে স্থূল স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখিতেই হইবে,—নতুবা নিজ নিজ শিশুদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব ব্যাপার হইবে।

আমাদিগের তৃতীয় অজ্ঞতার ফল—দেশকালপাত্র

সম্বন্ধে অবিবেকিতা। আমরা ভুলিয়া যাই যে, শিশু যখন গর্ভে বাস করে, তখন উষ্ণজলে নিমজ্জিত থাকে। জন্মের পরে সেই শিশুর যে কত দুর্গতি আমরা করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনো ফ্লানেলে বা পশমে আপাদমস্তক মুড়িয়া তাহার চর্ম্মের উগ্রতা সাধন করি, আবার কখনো তাহার দেহের উপরার্দ্ধে পরিচ্ছদাধিক্য করিয়া, শরীরের নিম্নার্দ্ধ নগ্ন রাখি। কখনো আমরা সাবান ব্যবহার করিয়া তাহার কোমল ত্বককে কর্কশ করি, আবার কখনো স্নান বন্ধ রাখিয়া তাহার স্নায়ুগুলির উত্তেজনা বৃদ্ধি করি। ফল কথা, এটি আমরা কেহই স্মরণ রাখি না যে, আকৃতির তুলনায় শিশুর চর্ম্মবিস্তৃতি বেশী বিধায়ে, অতি সামান্য কারণেই শিশুর ঠাণ্ডা লাগে এবং যথাসম্ভব একই উত্তাপে তাহাকে রক্ষা করাই সর্ব্বথা উচিত। তোমার অর্থাধিক্য ও মমতাধিক্য বশতঃ, অকারণে শিশুকে শতভূষায় ভারাক্রান্ত করিও না। শিশুদিগকে যে কাপড় চোপড় পরান হয়, তাহাতে অধিকাংশ সময়েই তাহারা বিব্রত হইয়া পড়ে,—আবার অনেক সময়ে এমন জামাজোড়া পরান হয় যে, ছেলেকে যতবার কোলে তোলা হয়, ততবারই তাহার বুকপিঠ আড়ুড় হইয়া পড়ে। কাপড়-চোপড় পরান সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক অবিবেচনার কায করা হইয়া থাকে। খুব অল্প সংখ্যক রমণীই জ্ঞাত আছেন যে, শিশুর ছয় মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিজ মাতৃস্তন্যই তাহার যথার্থ ও যথেষ্ট আহার্য্য। এ কথা জানা থাকিলেও, সকল জননীর স্তনে এত দুগ্ধ আসে না যাহা তদীয় শিশুর পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। আবার, যে জননীর স্তন্য যথেষ্ট থাকে, তিনিও মমতাধিক্য বশতঃ হয় ত দেড়, দুই, এমন কি তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্তও স্তন্য দিতে কুণ্ঠিত হন না। আজকাল ছেলে জন্মিলেই তাহাকে "বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ" (condensed milk) অথবা একটা না একটা "ফুড" (malted milk food)—অন্ততঃ সাগু বার্লিও খাওয়াইতে হইবে। এইরূপ খাওয়ানর হেতু, প্রথমতঃ, ঐ খাদ্য তদীয় জননীর বা অপর আত্মীয়ার অভিপ্রেত। দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসককুলের নির্ব্বোধিতা বা অবিবেকিতা। তৃতীয়তঃ, সাহেবদিগের বা সাহেবীয়ানাগ্রস্ত বাঙ্গালী বাবুদিগের অনুচিকীর্ষা। এই "ফুড" খাওয়ানপ্রথা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। নিতান্ত ব্যারাম-সময়ে, অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করা ভিন্ন অন্য কোনও অবস্থায় ইহাদিগকে ব্যবহার করা উচিত নহে; তাহার কারণ, ঐ বিলাতী খাদ্যগুলি বাসি; উহাতে ভাইটামীন না থাকায়, উহা খাইয়া দেহের বাহ্যিক পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু শিশুরা রোগপ্রবণ ও অন্তঃসারহীন হইয়া পড়ে; এবং উহার ব্যবহারে দেশের ধন অনর্থক বিদেশের কবলিত হয়। খাদ্যসম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়া আর একটী প্রধান দোষের উল্লেখ করিব। সেটিও অত্যন্ত অবিবেচনামূলক। খুব অল্প স্ত্রীলোকেই জানেন কতক্ষণ অন্তর শিশুকে খাওয়াইতে হয়। তাহার ফলে নিতান্ত এলোমেলো রকমে শিশুরা খাদ্য পাইয়া থাকে এবং সেই হেতু বশতঃ ব্যারামেও বিস্তর ভোগে। তাহা ছাড়া, অনেক গৃহস্থের এমন অভ্যাস আছে যে কচি ছেলে ভোজনের সময়ে নিকটে আসিলেই তাঁহারা তাহাকে কিছু কিছু ভোজ্য দিয়া থাকেন। এই ভাবেও শিশুর দেহের পক্ষে অনুপযুক্ত বহু খাদ্য অনুপযুক্ত সময়ে তাহার পাকস্থলীতে যাইয়া পীড়ার হেতু হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, ধনীর গৃহে শিশুরা অতি অল্প বয়স হইতেই গুরুপাক খাদ্য ভোজনে অভ্যস্ত হয় এবং দরিদ্রের সংসারে অনেক দুষ্পাচ্য, জঘন্য দোকানে খাবার খাইতে বাধ্য হয়।

(ক্রমশঃ)

শিশুদের কর্ণশূল

কর্ণই শব্দানুভূতির ইন্দ্রিয়। শৈশবাবস্থায় অনেক শিশুকে কানের মধ্যে বেদনা হইয়া কষ্ট পাইতে দেখা যায়। শিশুদিগের ইহা একটী অত্যন্ত অনিষ্টকারী ও কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই ব্যাধি উত্তমরূপে চিকিৎসা ও যত্ন দ্বারা আরোগ্য না করিয়া উপেক্ষা করিলে পরিণামে অভুত অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে এমন কি অনেক সময় শিশু বধির হইয়া পড়ে।

কর্ণের রোগ সম্বন্ধে বলিতে হইলে প্রথমতঃ কর্ণের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা হইল। আমাদের যে কয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে তন্মধ্যে কর্ণের গঠন প্রণালী অতি জটিল। করোটীর দুই ধারে পার্শ্ব-কপালাস্থিতে (Temporal bone) শ্রবণেন্দ্রিয় স্থাপিত। কর্ণের বাহিরের আকৃতি কিরূপ তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। সেই জন্য তাহার অভ্যন্তরীণ গঠনাদি সম্বন্ধে বলা হইতেছে। আমাদের কর্ণকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায় যথাঃ— (ক) বহিঃস্থ কর্ণ (the outer ear) (খ) মধ্যবর্ত্তী কর্ণগহ্বর (the middle ear) এবং (গ) আভ্যন্তর কর্ণ কুহর (the inner ear)।

বহিঃস্থ কর্ণ আমরা যাহা চক্ষে দেখিতে পাই কেবল তাহাই নহে তাহা ছাড়া উহার ভিতরের যে ছিদ্র পথটী মাথার ভিতরে ঢুকিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কতকটা শামুকের খোলার আকৃতি বিশিষ্ট উপাস্থিময় চওড়া একটী পাত, এবং উহা হইতে শ্রুতি বিবর (Auditory Canal) নামক প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা যে একটী নল মস্তকে প্রবিষ্ট হইয়াছে এই উভয়ে মিলিয়া বহিঃস্থকর্ণ গঠিত হইয়াছে। কর্ণ রন্ধ্রের ভিতরাংশের প্রান্তভাগ একটী ঝিল্লি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত আছে, এই ঝিল্লি ঢাকের চামড়ার ন্যায় টান করিয়া পাতা। ইহাকে পটাহ ঝিল্লি (Tympanic membrane) কবে। ইহা অতিশয় পাতলা স্থিতিস্থাপক এবং সামান্য আঘাতেই সহজে ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। এই পটাহ একবার ছিন্ন হইলে আর জোড়া লাগে না এবং উহার পরিণাম বধিরতা।

মধ্যবর্ত্তী কর্ণ পটাহ ঝিল্লী এবং আভ্যন্তর কর্ণের মধ্যস্থলস্থিত একটী ক্ষুদ্র গহ্বর বিশেষ। এই গহ্বরকেই কর্ণ পটাহ (drum of the ear, বলা হয়। কর্ণপটাহ এবং শ্রুতিবিবর এই উভয়ে মিলিয়া মধ্যবর্ত্তী কর্ণ গহ্বরটী (middle ear) গঠিত হইয়াছে। পটাহ গহ্বরে বিচিত্র আকারের তিনটী ক্ষুদ্র অস্থি আছে। ইহাদের প্রথমটীর আকার হাতুড়ীর ন্যায় উহাকে মুদ্গরাস্থি (malleus) দ্বিতীয়টীকে নেহাই অস্থি (incus এবং তৃতীয়টীকে রেকাবাস্থি (stapes) বলে।

আভ্যন্তর কর্ণ বা কর্ণকুহর (osseous labyrinth) দেহের যন্ত্রাবলীর মধ্যে অতি কোমল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই অংশই ধ্বনিতরঙ্গ গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়। ইহার অস্থিময় তিনটী অংশ। শ্রবণেন্দ্রিয়ের যন্ত্র কৌশল-প্রণালী মোটামুটী উল্লেখ করা হইল। বক্তব্য বিষয় এক্ষণে দেখা যাউক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পটাহ ঝিল্লী অতি পাতলা এবং ইহা অতি অল্প আঘাতেই ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। আমরা অনেক সময়ে এবং আমাদের দেখাদেখি শিশুরাও কান পরিষ্কারের নিমিত্ত কানের ভিতরে নানারূপ দ্রব, প্রবেশ করাইয়া থাকি। ইহাতে অনেক সময় এই পাতলা ঝিল্লী আঘাত প্রাপ্ত হইতে পারে সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। মধ্যবর্ত্তী কর্ণ অতি সহজেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পটাহ গহ্বরের তল ভাগে একটী ছিদ্রপথ আছে তাহাকে কর্ণরন্ধ্র (Eustachian tube) বলে। প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা এই নালীটি গলবক্ষে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেই জন্য নাসিকা ও মুখ গহ্বরের মধ্যে যদি দূষিত

ও পচন সাধক (Septic) পদার্থ সৃষ্টি হয় তাহা এই নালীর ভিতর দিয়া ক্রমে মধ্যবর্ত্তী কর্ণে আসিয়া পৌছায়। শিশুদের এই নলটী বয়স্ক ব্যক্তিগণের অপেক্ষা লম্বায় ছোট, চওড়া ও অত্যন্ত সোজা অবস্থায় অবস্থিত এই কারণেই বয়স্ক লোক অপেক্ষা শিশুদিগের কর্ণের পীড়া অধিক হয়।

শিশুদিগের কর্ণরন্ধ্রের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রন্থি সমূহ স্ফীত হইতে দেখা যায়। এই অবস্থা হইতেই উহাদের কর্ণপীড়ার ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হইতে থাকে। মুখগহ্বরে কিম্বা নাসারন্ধ্রের মধ্যে কোনরূপ দূষিত বা পচন সাধক দ্রব্যের সৃষ্টি হইলেই উহা কর্ণরন্ধ্রের পথ দিয়া মধ্যস্থিত কর্ণে উপস্থিত এবং তন্নিবন্ধন গ্রন্থি সমূহ স্ফীত হইলে তাহা হইতে একপ্রকার রস নির্গত হইয়া মধ্যবর্ত্তী কর্ণগহ্বরে জমিতে থাকে। এই অবস্থা হইলেই কর্ণের মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ শিশুদের কর্ণশূল বলিয়া থাকি। দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালে এই বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপে কিছুদিন কষ্ট পাইবার পর কর্ণ পটাহের ভিতরে ছিদ্র হইয়া পথ প্রস্তুত হয় এবং উক্ত পথ দিয়া সেই সমস্ত রস নির্গত হইতে থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে কর্ণের বেদনা কম পড়ে। যে রস নির্গত হয় তাহা ঘন এবং সামান্য পীতবর্ণের রং বিশিষ্ট হয় এবং তাহা অবিরত পড়িতে থাকে ও অতিশয় দুর্গন্ধময় হয়। এই অবস্থায় উত্তমরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উহা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে ও পরিণামে উহার ফল অত্যন্ত বিষময় হইয়া পড়ে।

এই রোগের কারণ নির্দ্দেশ কালে আমরা দেখিয়াছি যে এই রোগ কর্ণের কোন অবস্থা অপেক্ষা শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য ইহার চিকিৎসা করিতে হইলে একদিকে যেমন ব্যথিত স্থানের চিকিৎসার দরকার সেইরূপ রোগীকে সাধারণ ভাবে চিকিৎসা করা তাহা অপেক্ষা প্রয়োজন ও ফলদায়ক। সাধারণ ভাবে চিকিৎসা করা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে রোগীর মোটামুটী স্বাস্থ্যের চিকিৎসা করিতে হইবে। শৈশবাবস্থায় শিশুদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পিতামাতাকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। অপরিমিত আহারে, অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় প্রতিপালিত হইলে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান করিলে তাহাদের শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়।

গ্রন্থীস্ফিতি হইতে ক্রমে কর্ণের বেদনা উপস্থিত হয়। এইরূপ কর্ণশূলে শরীরের জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। শিশুদিগকে সহজ পাচ্য, সাধারণ, সুসিদ্ধ, ও শরীরের পক্ষে সর্ব্বরকমে উপযোগী এরূপ আহার্য্য দিতে হইবে, কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য তাহাদিগকে আহার করিতে দেওয়া অতীব অনিষ্টকারক। উল্লিখিত রূপ উপযোগী আহার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে আহার করাইলে তাহাদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাদের বাসস্থান, জীবন নির্ব্বাহ প্রণালী গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে চালিত করিলেই শিশুগণ কেবল কর্ণশূল কেন এইরূপ বহুবিধ রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারিবে। যখনই শিশু কিম্বা বালক বালিকা দিগের গ্রন্থিস্ফীতি রোগ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা সুচিকিৎসা দ্বারা সমূলে নষ্ট করা উচিত কারণ ইহা কর্ণশূলের একটী বিশেষ কারণ।

শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার যে কয়েকটী সাধারণ নিয়ম দেখান হইল তদ্ভিন্ন চিকিৎসার জন্য কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। লাইসল্ (Lysol) কর্ণ বেদনার একটী উত্তম ঔষধ। যে কর্ণে বেদনা হইবে সেই কর্ণ প্রত্যহ উত্তমরূপে ডুস্ (Douche) দ্বারা দৈনিক অন্ততঃ পক্ষে ৪ বার করিয়া ধৌত করা কর্ত্তব্য। ধৌত করিয়া কর্ণ তুলা দ্বারা কিম্বা অন্য কোন শুষ্ক পরিষ্কৃত বস্ত্রের দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। বেদনাস্থান ডুস্ দ্বারা ধৌত করিবার জন্য কিছু গরম

জলের সহিত এক চামচ লাইসল (Lysol) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত রস নির্গত হওয়া একবারে বন্ধ হইয়া না যায় ততদিন পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে বেদনাস্থান এই ভাবে পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থিস্ফীতির নিয়মিত চিকিৎসা করাইতে হইবে এবং স্ফীতি উত্তমরূপে সারিয়া যাইবার পরও কিছুদিন কর্ণ ধোয়াইতে হইবে। এই ভাবে চলিলে ক্রমে বেদনা নরম পড়িয়া যাইবে এবং ক্রমে ঘা আরোগ্য হইয়া মধ্যবর্ত্তী বর্ণের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে।

সর্দ্দি গর্ম্মি

গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে যাহাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় তাহাদের নিকট সর্দ্দিগর্ম্মি বা রৌদ্র লাগা বোধ হয় মোটেই অপরিচিত নহে। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে বহুলোক এই রোগগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট পাইয়া থাকে। সর্দ্দিগর্ম্মির ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবার উপায় নাই, অর্থ চিন্তাতেই হউক কিম্বা যে কোন কারণেই হউক ঘরের বাহির হওয়া আমাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। এই সর্দ্দি গর্ম্মিতে মানুষকে অত্যন্ত কাতর এমন কি মরনাপন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু ইহাতে এত ভোগ সত্ত্বেও ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমর বড়ই অমনোযোগী। ইহা সত্যই দুঃখের বিষয়। সেই জন্য ইহার কারণ, প্রকার, প্রতিরোধক এবং আরোগ্যের উপায় সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা হইল।

সর্দ্দি গর্ম্মি হইতে অনেক সময় লোকের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রথমাবস্থাতেই একটু সতর্ক ও যত্ন লইলেই ইহার এতটা গুরুত্ব আর থাকে না। সাধারণতঃ আমরা তিন প্রকারের সর্দ্দি গর্ম্মি দেখিতে পাই। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে নিম্নে বলা হইতেছে।

১। প্রথম প্রকার—অতিরিক্ত গরম হাওয়ায় এবং প্রখর রৌদ্রে থাকার জন্য অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে রোগীর মাথা ঘুরিয়া উঠে এবং রোগী টলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যায়। রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে হয়, নাড়ী ক্ষুদ্র, কোমল, অনিয়মিত এবং দ্রুতগামী হয়, শ্বাস অগভীর হয়, চক্ষুর তারকা বিস্তৃত হয়, গাত্র চর্ম্ম শীতল হয়, গাত্রের উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায় এবং রোগী আংশিক ভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অচৈতন্য হয়।

এইরূপ ঘটিলে যে স্থানে উত্তমরূপে বায়ু চলাচল ঘটে, এরূপ ঠাণ্ডা এবং ছায়াযুক্ত স্থনে রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখা উচিত। রোগীর শরীরের কাপড় উত্তমরূপে আল্‌গা করিয়া দেওয়া ভাল এবং মুখে ও বুকে জলের ছিটা দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগীর এই অবস্থায় স্মেলিং সল্ট (Smelling salt) নাকের নিকট ধরার ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার—অতিরিক্ত গরম হাওয়ায় (Temperature) থাকার জন্য অন্য এক প্রকারের সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া থাকে। এই প্রকারের সর্দ্দি গর্ম্মিতে কখন কখন দুই এক ঘণ্টা বা দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতে কার্য্যে অনিচ্ছা, হাতে পায়ে বেদনা, তন্দ্রাভাব, মাথা ধরা, চিত্ত চাঞ্চল্য, পিপাসা, আলো সহ্য করিতে না পারা, অগ্নিমান্দ্য, বমি বা বমনেচ্ছা, প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে, গাত্র চর্ম্ম উষ্ণ হয় এবং নাড়ী দ্রুতগামী হয়। এই অবস্থায় সাবধান হইলে রোগ জন্মিতে পারে না। রোগ ভালরূপে প্রকাশ পাইলে রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে, কখনও কখনও দৈবাৎ ভুল বকিতে দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ে, কখনও বা কষ্টের সহিত গভীর নিঃশ্বাস পড়ে এবং কখন বা গলা ঘড় ঘড় করে। মুখ প্রায়ই লাল হয়, কখন বা ফ্যাকাশে ও নীলাভ হয়। চক্ষুর তারা কখনও সঙ্কুচিত, কখনও বিস্তৃত, কখন বা স্বাভাবিক হয়। গাত্র চর্ম্ম অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং প্রায়ই শুষ্ক হয়। যখন গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক থাকে না, তখন প্রচুর ঘামে ভিজিয়া যায়। গাত্রের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। নাড়ীর অবস্থা প্রথমে অত্যন্ত দ্রুতগামী হয় এবং ক্ষুদ্র ও অল্পবেগবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পরে অনিয়মিত হয় এবং থামিয়া থামিয়া স্পন্দন হইতে থাকে। রোগী প্রায়ই অস্থির হয়, কখন বা অঙ্গ বিশেষের বা সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ হয়। প্রবল রোগে জলবৎ ভেদ হয়।

রোগ প্রকাশ পাইবা মাত্র রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিতে হইবে এবং খাট বা তক্তপোষের যে দিকে রোগীর মাথা থাকে সেই দিকট একটু উচু করিয়া রাখা উচিৎ। রোগীর শরীরের বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিয়া একখানি চাদর দিয়া শরীর ঢাকিয়া দিবে এবং সর্ব্বাঙ্গে ছোট ছোট বরফের টুকরা এবং মাথায় বড় বরফের টুকরা দিবে। বরফের অভাবে ঠাণ্ডা জল দিতে হয়। বরফজল বা ঠাণ্ডা জল ৩।৪ হাত উচ্চ হইতে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ছিটাইতে হইবে এবং একটু উচ্চ হইতে রোগীর মস্তকের সম্মুখ ভাগে বরফ জল বা ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাকিবে। ইহাতে রোগী শীঘ্র চৈতন্যলাভ করিবে। কিন্তু ২।১ মিনিটের বেশী ঐরূপ জল ঢালা উচিত নহে। রোগীর গাত্রের উত্তাপ কিছু কমিয়া গেলে গা মুছাইয়া গরম কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিয়া দিতে হইবে এবং হাতে, পায়ে ও পাঁজরায় গরম জলের বোতল দ্বারা সেক দিবে। ইহাতে রোগীর ঘাম হইবে। ঘাম হওয়া এই রোগের একটী সুলক্ষণ।

তৃতীয় প্রকার—অধিকক্ষণ প্রচণ্ড রৌদ্রে থাকার জন্য এক প্রকার সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়া থাকে। এই রোগে সময়ে সময়ে হটাৎ রোগী পড়িয়া যায় এবং কিছু ক্ষণের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কখন বা খুব জ্বর হয়, অত্যন্ত মাথার যন্ত্রণা হয়, নাড়ী মোটা ও দ্রুতগামী হয়, গাত্রঘর্ম্ম শুষ্ক ও খস্‌খসে হয়, রোগী আলো বা শব্দ সহ্য করিতে পারে না এবং কখন বা বমি করে ও ভুল বকে।

এই রোগে রোগীকে বায়ু চলাচল বিশিষ্ট, শীতল ও অন্ধকার গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। মাথা কামাইয়া মাথায় বরফ অভাবে ঠাণ্ডা জল দিবে। রোগী যদি খাইতে পারে তবে গরম দুগ্ধ অল্প অল্প দেওয়া যাইতে পারে।

উল্লিখিত কারণগুলি ভিন্ন আরও কয়েকটী কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে অধিকক্ষণ গরম বাতাসে কিম্বা প্রখর রৌদ্রে বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরে থাকিলে সর্দ্দিগর্ম্মি হয়। ইহা ব্যতীত অধিক মাত্রায় সুরা পান করা অতিরিক্ত মাংসাহার ও এইরূপ উত্তেজক দ্রব্য আহার কিম্বা শরীরের অপকারী খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করা প্রভৃতিও এই রোগের অন্যতম কারণ। মোট কথা যে কোনরূপ খাদ্যে কিম্বা আমাদের যে কোনরূপ ব্যবহারে দেহের নিয়মিত রক্ত চলাচলের ব্যতিক্রম ঘটায় ও জীবনী শক্তির হ্রাস করে তাহা হইতেই এই রোগ উৎপত্তি হয়।

সর্দ্দি গর্ম্মিতে মদ্যপান অত্যন্ত অনিষ্টকারী, ইহা ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গাত্র চর্ম্মের সজীবতা সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে অর্থাৎ শরীরের চর্ম্মের এইরূপ অবস্থা সর্ব্বদা রাখিতে হইবে যে উহা অতি সহজে কোনরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিচলিত না হয়। সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে স্নানাদি করিয়া চর্ম্ম পরিষ্কার রাখিলেই চর্ম্মের অবস্থা ভাল থাকিবে। নিয়মিত ঘর্ম্ম নিঃস্বরণ যাহাতে সুচারুরূপে হয় তাহা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুচারুরূপে ঘর্ম্ম নিঃস্বরণ হইলে

এই রোগ সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। এই রোগে মাংস কিম্বা কোনরূপ উত্তেজক খাদ্য বা পানীয় যত অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হইবে ততই ভাল, ইহাতে ফল এবং শাকসব্জী আহার করা প্রশস্ত। আহারে অনিয়ম, অধিক ভোজন করা, অনিদ্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য।

উপরে তিন প্রকারের সর্দ্দিগর্ম্মি লক্ষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটী মোটামুটি কথা বলিয়া উপস্থিত বক্তব্য শেষ করিব।

সর্দ্দি গর্ম্মির রোগীকে সর্ব্বদা ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার স্থানে রাখিতে হইবে কিন্তু সে স্থানে উত্তমরূপে বায়ু চলাচল হওয়া প্রয়োজন। রোগীকে অবস্থানুসারে শোওয়াইয়া কিম্বা হেলান অবস্থায় বসাইয়া রাখিতে হইবে, রোগীর অঙ্গের বস্ত্রাদি ঢিলা করিয়া দেওয়া উচিত, মস্তকে এবং শরীরে ঠাণ্ডা জলের ছিটা কিম্বা বরফ দেওয়া ভাল; এইরূপ জলের ছিটা রোগীর মুখে এবং মেরুদণ্ডে দেওয়া ভাল। রোগীর তৃষ্ণা পাইলে ঠাণ্ডা জল কিম্বা অবস্থানুসারে গরম দুগ্ধ দিতে পারা যায় কিন্তু ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই অবস্থায় রোগীকে কোনরূপ উত্তেজক দ্রব্য আহার করিতে বা উত্তেজক পানীয় পান করিতে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় ও বিশেষ হানিকর। রোগীর যাহাতে উত্তমরূপে ঘর্ম্ম নিঃস্বরণ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অতিশয় উপকার হয় কারণ এই রোগে ঘর্ম্ম নিঃস্বরণ ভালরূপে হইলে রোগ প্রায় আরোগ্য হইয়া যায়। সমস্ত রোগেরই অবস্থানুসারে বিবিধ ব্যবস্থা হইয়া থাকে এখানে আমরা এই রোগের কতকগুলি মোটামুটি কারণ, লক্ষণ ও তাহার প্রতিরোধক উপায় ও সাধারণ চিকিৎসা প্রণালী দেখাইলাম মাত্র। আশা করি ইহা সাধারণের অন্ততঃ কিছু উপকারেও আসিবে।

কলিকাতার স্বাস্থ্য

বঙ্গের বহু অস্বাস্থ্য পল্লীর তুলনায় কলিকাতাকে অসঙ্কোচে স্বাস্থ্যকর স্থান বলা যায়। কিন্তু ১৯১১ হইতে ১৫ এই পাঁচ বৎসরে হিসাবের গড় অনুসারে জন্ম ১৮,২৬৯ এবং মৃত্যু ২৫,৩৬০। অর্থাৎ হাজার করা জন্ম ২০·৪, মৃত্যু ২৮·৩। কলিকাতার তুল্য নগরেও জন্ম হইতে মৃত্যু অধিক। প্রধান প্রধান রোগে গড় পরতা বাৎসরিক মৃত্যুর হিসাব এই :—

জ্বরে	২৯০০
আমাশয় ও উদরাময়ে	২২০০
কলেরায়	১৯০০
যক্ষ্মায়	২০০০
শ্বাসযন্ত্রের পীড়া	৫০০০

শিশু মৃত্যু বার্ষিক ৫ সহস্র অর্থাৎ হাজারে ২৭০ জন।

মৃত্যু সংখ্যা কখন বাড়ে ?

অক্টোবর হইতে এপ্রিল এই কয় মাস কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। এপ্রিল মাসেই সাধারণতঃ মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। নবেম্বর হইতে জানুয়ারী এই কয়মাসে কলিকাতায় ব্রঙ্কাইটিস, ম্যালেরিয়া, আমাশয় ও উদরাময় রোগ প্রবল হয়। মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে কলেরা প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর আধিপত্য কাল। বর্ষা ঋতুতেই কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

কোন্ অঞ্চলে বেশী মরে ?

কলিকাতার নগরাভ্যন্তর অপেক্ষা উপকণ্ঠেই মৃত্যু সংখ্যা বেশী। স্বাস্থ্যের হিসাবে খিদিরপুর, বালিগঞ্জ, বাণিয়াপুকুর ও ইটালি নিতান্ত অপকৃষ্ট। ঐ সকল

অঞ্চলে ম্যালেরিয়া, শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধি, আমাশয় ও উদরাময়ে বহুলোকের প্রাণ হানি হয়।

কলিকাতায় ম্যালেরিয়া।

অক্টোবর হইতে জানুয়ারী কলিকাতায় ম্যালেরিয়া দৃষ্ট হয়। ২০, ২১ এবং ২৪ নং ওয়ার্ডে অধিক সংখ্যক লোক মরে। ঐ সময়ে কালীঘাট ও উহার সমীপবর্ত্তী গঙ্গা তীরস্থ জলসিক্ত ভূমিতে বদ্ধ জলে এনোফেলি মশক দৃষ্ট হয়।

যক্ষ্মা।

কলিকাতায় যক্ষ্মায় যত লোক মরে জ্বর ব্যতীত আর কোন রোগে এত অধিক লোক মরে না। কলিকাতায় প্রত্যেক ১২ জন মৃতের ১ জন এই রোগে মরে। যক্ষ্মাও বসন্ত প্রভৃতির ন্যায় ছোঁয়াচে ব্যাধি, তালতলা, বাণিয়াপুকুর, ইটালী ও খিদিরপুরে এই রোগে অধিক লোক মরে। কলিকাতায় পুরুষ হইতে দ্বিগুণ সংখ্যক স্ত্রীলোক এই রোগে মরিতেছে। বায়ু প্রবাহ হীন সিক্ত জলপূর্ণ গৃহে বাস করিয়া লোকে এই রোগে মরিতেছে।

কলিকাতার শিশু মৃত্যু।

কলিকাতায় বৎসরে গড়ে ৫ সহস্র শিশু মরে। উহাদের মধ্যে ৪৩০০এর মৃত্যুর কারণ অকাল জন্ম, ব্রঙ্কাইটিস, ধনুষ্টঙ্কার, যকৃতের পীড়া ও অজীর্ণ। এই মৃত্যুর অধিকাংশই নিবারিত হইতে পারে। ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগ হয়। সূতিকা গৃহের সুব্যবস্থা করিলে ও উত্তম বস্ত্রে শিশুদের আবৃত রাখিলে এই রোগদ্বয় হইতে পারে না। দুধ খেতে দেওয়া হয় বলিয়া তাহাদের উদরের পীড়া হয় প্রথম ৬ মাস শিশুকে মাতৃস্তন ব্যতীত আর কিছু খাইতে দেওয়া উচিত নয়। যদি গো-দুগ্ধ পান করান দরকার হয়ত উহা পরিস্কৃত পাত্রে ফুটাইয়া লইতে হইবে। অন্য কোন পানীয় বা কঠিন খাদ্য শিশুকে খাওয়াইতে নাই যে দুধে মাছি বসিবে উহা শিশুকে খাইতে দিবে না। আমরা বহুবার লিখিয়াছি যে, ধাত্রীর দোষে শিশুরা ধনুষ্টঙ্কার রোগে মরিয়া থাকে।

বর্ত্তমান স্বাস্থ্য।

কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে উহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বর্ত্তমান বৎসর ১লা, ৮ই ১৫, ২২এ এবং ২৯এ মার্চ্চ যে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সপ্তাহ গুলির সহিত গত বৎসরের অনুরূপ সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যার তুলনা করা যাউক।

	১৯১৮ সাল	১৯১৯ সাল
১লা মার্চ্চ	৪৬০	৭১৩
৮ই মার্চ্চ	৪৭৪	৭২৬
১৫ই মার্চ্চ	৪৮৫	৭৯৭
২২এ মার্চ্চ	৫১৯	৭৮৬
২৯এ মার্চ্চ	৫১০	৯৫৮

অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসর ঐ ৫ সপ্তাহে গত বৎসরের অনুরূপ সপ্তাহ হইতে ২৫৩, ৩১২, ২৬৭ ও ৪৪৮ জন অধিক মরিয়াছে। এই ৫ সপ্তাহে গত বৎসর হইতে মোট ১৫৩২ জন অধিক মরিয়াছে।

বিবিধ সংগ্রহ

ইনফ্লুয়েঞ্জার টীক।—লণ্ডন নগর হইতে প্রকাশিত ডেলি গ্রাফিক নামক কাগজে লিখিত হইয়াছে যে, লণ্ডনে ৬ শত লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিবারক টীকা দিয়াছিল, উহাদের মধ্যে কেবল একজন লোকের এই ব্যাধি হইয়াছিল।

বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের নামান্তর গ্রহণ।—গত ৭ই এপ্রিল বঙ্গীয় চিকিৎসা শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে ইহা স্থির হইয়াছে যে, বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজের নাম কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হইবে।

গত ৮ই এপ্রিল হইতে এই মেডিকেল কলেজ নূতন নামে অভিহিত হইতেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় উপদেশ।—বাঙ্গালার সেনেটারী কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী এই উপদেশ দিয়াছেন যে, যখনই যে কোন স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জা আরম্ভ হইবে, তখনই প্রতিদিন তিনবার দারুচিনির তৈল দুই ফোঁটা গরম জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রোগীর থুথু, কফ, এমন কি নিশ্বাস হইতে ঐ রোগ হইতে পারে। রোগীকে পৃথক রাখা উচিত। শুশ্রূষাকারীরা নাক ও মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রোগীর সেবা করিলে রোগাক্রান্ত না হইতে পারে।

ভারতে ভৈষজ্য।—ইউরোপে যে সকল ভেষজ জন্মে, ভারতে তাহা উৎপাদন করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। যুদ্ধের সময় ইউরোপ হইতে ঔষধ আমদানি করা অসম্ভব হওয়াতে ভারতবর্ষে নানা প্রকার ভেষজ উৎপাদন করার চেষ্টা হয়। সে চেষ্টাতে সিমলা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত হিমালয়ে বেলাডোনা, ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশে ইপেকাকোয়ালা, নানা স্থানে পডোফিলাস, ভারতের দক্ষিণে ও সিংহলে নক্সভমিকা জন্মান হইতেছে। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার টিংচার ও এক্সট্রাক্ট প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

সমব্যয় দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারণ—সমব্যয় দ্বারা কিরূপে ম্যালেরিয়া দমনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে উহা আলোচনার জন্য গত ২৫ শে চৈত্র অপরাহ্ণে রামমোহন লাইব্রেরী হলে এক সভা হয়। ডাক্তার বেণ্টলি সভাপতি ছিলেন। ডাক্তার গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ এণ্টি-ম্যালেরিয়া সমিতি স্থাপিত হয়। রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনিলাল বসু এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন

ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রস্তাব করেন, এই সমিতির সাহায্যার্থ লোকের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা হউক। যিনি বৎসরে ৬ টাকা চাঁদা দিবেন তিনি এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ বলেন ঐ জন্য আমরা গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া ন্যূনকল্পে ১ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব।

সভাপতি ডাক্তার বেণ্টলি বলেন, ম্যালেরিয়া দমনের জন্য আপনারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, গভর্মেণ্টের জন্য অপেক্ষা করিবেন না। বঙ্গদেশে রেজিষ্ট্রীভুক্ত ২ সহস্র চিকিৎসক আছেন, ইহাদিগকে আপনারা আহ্বান করুন; ইহারা আপনাদিগকে নিশ্চয় সাহায্য করিবেন। সভাপতি ঘোষণা করেন যে, সভাস্থলে সার কৈলাসচন্দ্র বসু ১ সহস্র, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এক কালীন ২৫০ এবং বার্ষিক চাঁদা ১০০; সার নীলরতন সরকার ২৫০, ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১ সহস্র (প্রথম কিস্তি) ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু ১০০৲ এবং সভাপতি ২৫০৲ এবং বার্ষিক চাঁদা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সাল | ২য় সংখ্যা

আলোচনা

যশোহরে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয়—যশোহর জেলাবোর্ডের সভ্যগণ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, "জেলাবোর্ড হইতে যশোহর সহরে একটি আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হউক। চেয়ারম্যান মহোদয় গভর্মেণ্ট হইতে ইহার অনুমোদন গ্রহণ করুন।"

জেলাবোর্ড আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করায় আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষীমাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা আশাকরি গভর্মেণ্ট এই মঙ্গলকর প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। যশোহরের আদর্শে বঙ্গের অন্যান্য জেলাবোর্ড সমূহেরও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অজ্ঞ অনেকেই এ চিকিৎসাপ্রণালীর উপর আস্থা রাখেন না এবং কেবলমাত্র পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীই রোগ নিবারণে সমর্থ এইরূপ ধারণা পোষণ করেন। গভর্মেণ্টও এযাবৎ এই চিকিৎসার প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। এই সকল নানা কারণে বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রণালীর বিশেষ সংকির্ণতা ঘটিয়াছে। নানাস্থানে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে এবং উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞের হস্তে তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার থাকিলে ক্রমে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার ঘটিবে। লোকে এই চিকিৎসা প্রণালীর উপর অধিকতর আকৃষ্ট হইবে।

চিকিৎসা বিদ্যায় ছাত্রীদের পুরস্কার—কলিকাতা ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্রী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া থাকেন উহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এতকাল তাঁহারা হেন্‌রি ফসেট পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন।

সংপ্রতি মিসেস ও মিস ফসেটের সহিত আলোচনা ক্রমে লেডি ডফরিন ফণ্ডের সেণ্ট্রাল কমিটি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, এখন হইতে প্রত্যেক বৎসর মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য ২৪০ টাকা মূল্যের একটি মাত্র পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধে সন্তান প্রসব, শিশু মৃত্যু এবং ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য আলোচিত হইবে। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে এইরূপ পুরস্কার প্রথমে দেওয়া হইবে। ১৯১৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মধ্যে দিল্লীর লেডি ডফরিন ফাণ্ডের জয়েণ্ট সেক্রেটরীদের নামে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধে উপযুক্ত বিষয় সমূহেরই আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য কমিশনারের বিজ্ঞাপন—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রতীকারমূলক উপদেশপূর্ণ একখানি বিজ্ঞাপন ভারতীয় স্বাস্থ্য কমিশনার রচনা করিয়াছেন। উহা ভারত গভর্মেণ্ট হইতে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট সমূহের সমীপে প্রেরিত হইয়াছে। উহা প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করিয়া লোক সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য ভারত গভর্মেণ্ট অনুরোধ করিয়াছেন।

উক্ত পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, ১৯১৯ সালে কেবল ভারতবর্ষেই ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে ৫০ লক্ষের অধিক লোক মরিয়াছে। রোগাক্রান্ত হইয়াও যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে। এতদ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যেরও বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছিল বটে কিন্তু তখন এই রোগে এমন ভীষণ মৃত্যু ঘটে নাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জা অতিশয় ছোঁয়াচে রোগ। ৬ হইতে ৪৩ ঘণ্টা মধ্যে এই ব্যাধি পরিণতি লাভ করিয়া ভীষণ হয়। থুথু ও কফের সহিত রোগ-বীজ পরিব্যাপ্ত হয় ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। বদ্ধগৃহে কাসি ও হাঁচির দ্বারা এই রোগবীজাণু পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এই রোগ যখন দেখা দেয় তখন যাহাতে এক স্থলে বহুলোকের সমাগম না হয় তাহা করিতে হয়। স্কুল, কলেজ, সভাসমিতি, থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিবে তখন কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে কয়েকটি পরামর্শ আছে।

(১) ঐরূপ সময়ে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের কতজন চিকিৎসক, কতজন শুশ্রূষাকারিণী, কয়টী অতিরিক্ত ঔষধালয় ইত্যাদি দরকার হইবে উহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। স্বেচ্ছা-সেবকদলের নাম লিখিত থাকিবে।

(খ) প্রত্যেক স্থলের লোকবল ও যাবতীয় উপকরণ এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অধীন করিতে হইবে।

গ) পরিদর্শকদল গঠিত হইবে। তাহারা রোগের ব্যাপ্তি এবং কাহার চিকিৎসা কিরূপভাবে করা উচিত গৃহে গৃহে পরিদর্শন করিয়া তাহা জানাইবেন।

(ঘ) ইহা বলাই বাহুল্য যে, টিকা, প্লেগ প্রভৃতি অন্য সকলের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময়ে তাহারা এই রোগ প্রশমনার্থ কার্য্য করিবেন।

সমবায় দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ কন্‌ফারেন্সে গত দশম অধিবেশনে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র মিত্র এক তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সরকারের সাহায্য ব্যতীতও লোক সাধারণ সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া নগর ও পল্লীর স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন এবং ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহু নিবার্য্য ব্যাধির প্রকোপ দমনে রত কার্য্য হইতে পারেন। তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা পরে তাহা প্রকাশ করিলাম।

ছেলেদের খেলা

বাঙ্গালীর বাড়ীতে ছোট ছেলেদের জন্য একটা কোন বিশেষ ঘর নাই। শুইবার ঘর, বৈঠকখানা, খাইবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঠাকুর ঘর ইত্যাদি বাড়ীর সকল ঘরের একটা নাম আছে, কিন্তু ছোট ছেলেদের থাকিবার বা খেলিবার ঘর বলিয়া কোন ঘর নাই। সাহেবদের যেমন ড্রয়িং রুম্ (বসিবার ঘর), ডিনার রুম্ (খাইবার ঘর) ইত্যাদি নানা ঘর আছে সেইরূপ, বাড়ীতে নারসারী (Nursery) বা ছোট ছেলেদের একটি বিশেষ ঘর আছে। বাড়ীর ছোট ছেলেরা সেই ঘরটির রাজা, সেই ঘরটিতে তাহারা শোওয়া, বসা, পড়া, খেলা, লাফালাফি, চেঁচামেঁচি অবাধে করিতে পারে। ছোট শিশু যখন পরিবারে জন্মগ্রহন করে তখন সে এক বিশেষ ঘরের দাবী লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাহার অভ্যর্থনার জন্য শুধু ত' মঙ্গলশঙ্খ বাজাইলে হইবে না তাহার জন্য বাড়ীর যে ঘরটি সব-চেয়ে ভালো তাহা রাখিতে হইবে, সেই ঘরই যথার্থ ঠাকুর ঘর। সাহেবদের ছেলেমেয়েরা জন্মগ্রহনের পর হইতে নারসারীতে প্রবেশ করে, সেই ঘরে তাহারা মায়ের প্রেমে, ধাত্রীর যত্নে, পরিচারিকাদের সেবায় ধীরে ধীরে কুঁড়ি হইতে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে; এই নারসারীর মধুময় অপরূপ স্মৃতি তাহাদের সারাজীবন জড়িত থাকে।

গরীব বাঙ্গালীর একান্নবর্ত্তী পরিবারে ঘরের খুবই অকুলান। খুব কম বাঙ্গালীরই বৃহৎ প্রাসাদ আছে। তবু, যতদূর সম্ভব, ছেলেদের এক বিশেষ ঘর বা বিশেষ স্থান প্রতি পরিবারে থাকা দরকার। বাঙ্গালীর বাড়ীতে এক ঘরেই নানা ঘরের কাজ সারিতে হয়; মায়ের শোবার ঘরেই শিশুরা ঘুমায়, ছেলে যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততদিন মায়ের ঘরই তাহার শুইবার ঘর। এ প্রথা ভালই। কিন্তু ছোট ছেলেদের খেলিবার জন্য একটি বিশেষ ঘর বা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা দরকার। এরূপ না থাকিলে যে মুস্কিল হয় তাহা বাঙ্গালীর পরিবারে প্রায়ই দেখা যায়, ছোটছেলে পিতার কাজের ঘরে গিয়া গোলমাল করে, বই ছেঁড়ে, টেবিল চেয়ার নাড়ে, মাতার রান্নাঘরে গিয়া কান্না জোড়ে, তরকারী মসলা লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়, আর ফলে তার ভাগ্যে বকুনি বা প্রহার জোটে। পিতা তাহাকে পীড়ন করেন, মাতা তাহাকে শাসন করেন, শিশু-প্রাণের খেলার আনন্দ কেহই বোঝেন না।

বাঙ্গালীর মায়েরা চান শান্ত ধীর ছেলে, যে ছেলে চেঁচায় না, লাফায় না, দৌড়াদৌড়ি গোলমাল করে না সেই ছেলেই সবচেয়ে ভালো; বাঙ্গালী পিতারা চান পণ্ডিত ছেলে, যে ছেলে বইয়ে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে, খেলায় বা বাহিরের আমোদে বিশেষ মন নাই সেই হচ্ছে তাঁহাদের আদর্শ পুত্র। কিন্তু সাহেব পিতা-মাতারা চান অশান্ত দুরন্ত প্রাণবান পুত্র। কেননা তাঁহাদের শিশুরা বড় হইলে দেশে ও বিদেশে সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে, জলে স্থলে শূন্যে আধিপত্য করিবে তাহারা সাগর ডিঙাইবে, শূন্যে উঠিবে, নব নব নগর গড়িবে, মানবসভ্যতার অগ্রণী হইবে; চাই বলবান শক্তিমান পুত্র। তাই সাহেব ছেলেমেয়েদের খেলাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। লর্ড ওয়েলিংটন বলিয়াছিলেন, "আমি ওয়াটারলু যুদ্ধ ইটনের ক্রীড়াক্ষেত্রেই জয় করিয়া-ছিলাম।" শুধু বই পড়ায় নয় কিন্তু নানারূপ খেলার মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব গড়িয়া উঠে। আজকাল ইয়োরোপের নানাস্থানে খেলার মধ্যদিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার পদ্ধতি (Kindergarten System) গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ছোট ছেলেদের পক্ষে লেখাপড়া শুধু যে একটা ভার বিষম বোঝা তা নয়, তাহাতে ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহাদের দেহের ও মনের পূর্ণ বিকাশ হয় না।

ছোট ছেলেদের জীবনে খেলার একটি বিশেষ স্থান

আছে। খেলার উপকারিতা খুবই বেশী। শিশু-স্বাস্থ্যবিৎ পণ্ডিত F. Frobeld বলেন,

"Play is the highest phase of child-development. The plays of childhood are the germinal leaves of all later life ; for the whole man is developed and shown in these. Come, let us live with our children."

গতি, চাঞ্চল্য হচ্ছে প্রাণের লক্ষণ ; যাহা অনড় অসাড় স্থির, তাহাত মৃত। শিশুজীবনের পক্ষে চাঞ্চল্য অস্থিরতা দরকার। নানাপ্রকার খেলার মধ্য দিয়াই ছেলেরা আপনার প্রাণশক্তিকে বিকশিত করে ; খেলার উৎস দিয়াই তাহাদের আনন্দরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। বয়স্কব্যক্তিরা নানাপ্রকারে দৈহিক ও মানসিক শ্রমদ্বারা আপনার প্রাণশক্তিকে প্রকাশিত করেন ; শিশুরা নানা খেলার মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় দেয়। ছেলেরা লাফাইবে, দৌড়াইবে, নাচিবে, হাঁসিবে, চেঁচাইবে, ছুটোছুটি করিবে—এইত শিশুজীবনের লীলা। যে মাতাপিতা ছেলেকে কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে স্থির, ধীর করিতে চান, তাঁরা জীবন উৎসকে পাথর চাপা দিয়া বন্ধ করেন।

ছেলেদের বয়স অনুসারে তাহাদের খেলার প্রকৃতিও আলাদা হয়। জন্মগ্রহণের পর হইতে শিশু যেমন বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া ওঠে, সেইরূপ তাহার খেলায় রূপও বদলাইয়া যাওয়া দরকার।

শিশু জন্মিয়াই কাঁদিয়া উঠে, সেই ক্রন্দনই সদ্যজাত জীবনের প্রথম ধ্বনি। জীবনের প্রথম বৎসর সে আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়াই খেলে ; শুইয়া শুইয়া হাত পা ছোঁড়া, চোখ খোলা, চোখ বোজা, জিনিষ ধরিতে হাত বাড়ান,—এইরূপ আপনার হাত পা নাড়ার আনন্দেই সে বিভোর থাকে। জীবনের দ্বিতীয় বৎসরে নূতন জগৎকে জানিবার উৎসুক তাহার অন্তর ভরিয়া থাকে ; সে চারিদিক বিস্মিত নেত্রে দেখে, রঙীন জিনিষ দেখিলে ধরিবার জন্য হাত বাড়ায় ; হামাগুড়ি দেয়, চলিতে চেষ্টা করে, জগতের নানা শব্দের তরঙ্গ তাহার কানে আসিয়া পৌছায়, সে আধ আধ স্বরে সেই শব্দ আপনার মুখে ফুটাইতে চেষ্টা করে। যাহা পায় তাহাই ধরে, তাহাই নাড়ে ; রঙীন জিনিষ দেখিলে ছুটিয়া ধরিতে যায়, হাতে পাইলে খুব খুসি হয় ; নূতন জগৎকে সে জানিতে বুঝিতে ধরিতে খুঁজিতে চায় ; ঘরময় হামাগুড়ি দেয়, অস্ফুট ভাষায় কত ধ্বনিরই অনুকরণ করে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু কিরূপে খেলিতে পারে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

(প্রথম ছয় মাস)

জিনিষ ধরা	শব্দ শোনা
জিনিষ মুখে পোরা	হাত পা ছোঁড়া
তাকাইয়া দেখা	চেঁচান
রঙীন জিনিষ উৎসুক হইয়া দেখা	হাঁসা

খেলার উপকরণ—ছোট ছোট খেল্‌না, রঙীন পুঁতুল

(ছয় মাস হইতে এক বৎসর)

জিনিষ টানা	গান বা শব্দ শোনা
জিনিষ নাড়া	হামাগুড়ি দেওয়া
শব্দ করা	হাত ধরিয়া দাঁড়ান বা চলা

এই বয়সে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে, শিশুরা জিনিষ কামড়াইতে চায় ; তাহাদের মুখে চুষিকাটি দেওয়া ভালো, তাহাতে দাঁত শীঘ্র শীঘ্র উঠে।

খেলার উপকরণ— চেয়ার, রেলিং, ঝুন্‌ঝুনি, চুষিকাটি।

(এক হইতে দুই বৎসর)

ধরিবার, দেখিবার, শক্তি বাড়িয়া যায়,
ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ায়,
দরজা খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারে,
দরজার আড়ালে লুকাইতে পারে,
জিনিষ লইয়া শব্দ করিতে, কাগজ ছিঁড়িতে পারে,
গোলা গড়াইয়া দিতে বা ধরিতে পারে,
ছোট পুঁতুল বা ছোট কাঠের ছোট জন্তু, পাখী,
গাড়ী ইত্যাদি লইয়া খেলিতে পারে,

খেলার উপকরণ :— দোলনা, ছোট সিঁড়ি, তাহা ধরিয়া উঠিতে পারে ;

(দুই হইতে চার বৎসর)

জিনিষ বুঝিবার, অনুকরণ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়।
ছোট ঘর ছাড়িয়া বাড়ীর চারিদিক ঘুরিতে চায়।
বাড়ীর কোন ঘরে কি আছে জানিতে চায়।
মাটি কাদা, বালি লইয়া খেলিতে পারে ;
ছোট পাহাড় গড়া, পাহাড়ের মাথায় পুকুর, পাহাড়ের গায়ে নদী, তাহার উপর সেতু, ইত্যাদি নানা খেলা।
বল্ ধরা, বল্ ছোঁড়া, বল্ লইয়া ছোটা।
পাথর কুড়ানো, নতুন বা আশ্চর্য্যকর জিনিষ সংগ্রহ করা
উঁচু জায়গায় চড়া, দড়ি ধরিয়া লাফান বা দোলা।
মাতাপিতার কাজের অনুকরণ করা, যেমন পুতুল খেলা, কলম লইয়া হিজিবিজি কাটা, ইত্যাদি।
নানা প্রকার খেল্‌না লইয়া খেলা,—নানাপ্রকার জীব, জন্তু, পাখী ; রঙীন কাগজের খেল্‌না।

খেলার উপকরণ :

দড়ি, ঘরে বা মাঠে ঝুলাইয়া দিলে, তাহা লইয়া ছেলেরা দুলিতে পারিবে।
খড়, বালি, ইত্যাদি, তাহা লইয়া পাহাড় করিতে গহ্বর করিতে পারিবে।
জলের খেলার জন্য লোহার নল, টব, ইত্যাদি চাই।

(চার হইতে ছয় বৎসর)

ছোট ছেলেরা এক কল্পলোকে বাস করে। ছেলেদের কল্পনার শক্তি অতি অদ্ভুত, অতি বিচিত্র, অতি আশ্চর্য্যকর। কল্পনার রঙীন আলো দিয়া তাহারা সাধারণ জনকে অপরূপ করিয়া তোলে। চেয়ার বা বেঞ্চ তাহাদের রেলগাড়ী হয়, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহারা এক ষ্টেসন হইতে আর এক ষ্টেসনে পৌছায়। ঘরের নীচু স্থান জল ও উঁচু স্থান স্থল, এরূপ বিভাগ করিয়া লইতে তাহাদের কিছু দেরী হয় না। ঘরের এক কোণকে তাহারা কলিকাতা আর এক কোণকে কাশী করিতে পারে। 'আমি রাজা', 'তুমি মন্ত্রী', 'ও আসামী' আর 'এই টুল্‌টা সিংহাসন' এরূপ ভাবিয়া লইতে তাহাদের কিছুই কষ্ট হয় না। এই কল্পনাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ শক্তিও খুব বাড়িয়া উঠে। 'রেল-গাড়ী' খেলা, 'পুতুলের বিয়ে দেওয়া' ইত্যাদি নানা খেলায় তাহারা মাতিয়া থাকে।

ভাল করিয়া লাফাইতে, দোড়াইতে, পারে ; দল বাঁধিয়া যাইতে, সাঁতার কাটিতে, নাচিতে সুরু করে।

ছবি আঁকিতে, ছবিতে রঙ্ দিতে, কাট কাটিতে, শিক্ষা পাইলে ছুতারের কাজ সামান্যরূপে করিতে পারে।

জিনিষ মাপিতে, জিনিষ ওজন করিতে পারে। বাগানে জল দিতে, গাছ পুঁতিতে, ছোট কুকুর বা বেড়াল লইয়া খেলা করিতে পারে, তাহাকে যত্ন করিতে পারে।

তাহার চোখে যাহা আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত লাগে, যেমন ছোট রং-ওয়ালা পাথর, গাছের নানারকম পাতা, ছোট কীট, ছবি, নিশান, রঙীন কাগজ, ফুল্, ইত্যাদি জমাইতে পারে। জিনিষ দেখিয়া তাহা কিরূপে হইল, কেন হইল, 'এটা কি', 'ওটা কি', ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে, তাহার সম্বন্ধে ভাবে, ও নিজের মন গড়া সিদ্ধান্ত করে। গান গাহিতে, বাজাইতে সুরু করে। বাড়ীর ভিতর ও চারিদিকের পথে কোথায় কিরূপ তাহা দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই বয়সে ছেলেরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে খেলা করিতে বাহির হয় ; বাড়ীর উঠানে বা বাগানে তাহাদের খেলার জায়গা ঠিক করিয়া দেওয়া দরকার। তাহাদের কাপড় জামার দিকেও এই সময় দৃষ্টি রাখা দরকার। খুব আঁট জামা হইলে খেলিতে অসুবিধা হয়। সাধাসিধে পোষাকই ভাল। অনেক মাতা বিকেলে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের খুব ভাল পোষাকে সাজাইয়া ঝি চাকরের সঙ্গে বেড়াইতে পাঠান ; ছেলে মেয়েরা জামা-কাপড়ের দোকানে সাজানো পুতুলের মত স্থির ধীর হইয়া বেড়াইতে যায় ; তাহারা নড়িতে দৌড়াইতে ভয় পায় ; পাছে কাপড় ছেঁড়ে, জামা ময়লা হয়। ছেলেমেয়েদের দেহটা যে কাপড় জামার দোকান নয়, এটা মাতারা

ভুলিয়া যান। বেশভূষা স্বাস্থ্যের জন্য; ছেলেমেয়েদের সুন্দররূপে সাজাইয়া মাতার সৌন্দর্য্যবোধের তৃপ্তি হইতে পারে কিন্তু ছেলেমেয়েদের মনে কোন শান্তি থাকে না, জামা ময়লা হইলে যে মার খাইতে হইবে তাহা তাহাদের মনে সর্ব্বসময়েই থাকে। যাহাতে ছোট ছেলেরা দৌড়াইতে লাফাইতে ছুটোছুটি করিতে পারে এরূপ কাপড় জামা পরানো দরকার। তাহারা ধীরে ধীরে আপনার কাপড় জামার যত্নও শিখিবে, কাপড় জামা না ছিঁড়িয়াই খেলিতে শিখিবে।

এই সময়টায় ছেলেদের মন খুবই চঞ্চল থাকে, একটা খেলা হইতে না হইতেই আর একটা নতুন খেলা আরম্ভ করিয়া দেয়; কখন যে কি করিবে তাহার ঠিক পায় না—মন ছটফট করিয়া বেড়ায়, একবার এটা করে, আবার ওটা করে—কিছুতেই মন দিতে পারে না—কোন বিশেষ খেলা করিয়াই মনে তৃপ্তি লাভ করে না, এই সময় খেলার একজন বয়স্ক সঙ্গী থাকিলে খুবই ভালো তিনি সব খেলায় যোগ দিয়া তাহার মন স্থির করিতে পারিবেন. কোন খেলার পর কোন খেলা করা যাইতে পারে, তাহা ঠিক করিয়া দিতে পারেন।

এই বয়সে কোন ছেলে বা মেয়েকে একা রাখা উচিত নয়; একা থাকিলে সে কুনো, গম্ভীর, স্বার্থপর হইয়া উঠে। পাঁচ ছয়জন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে খেলিলে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিতে শেখে, পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে; আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের ভাল করিতে, আপনার স্বার্থ দূরে রাখিয়া যাহাতে সকলের মঙ্গল হয় এরূপ করিতে পারে—এইরূপেই বিশ্বপ্রেম বিশ্বমৈত্রীর জন্ম হয়। দেশহিতৈষী সমাজ-সেবী হইতে হইলে যে সকল গুণের দরকার তাহা একা একা থাকিলে ফোটেনা; দশজন মিলিয়া খেলার মাঝেই তাহা ফুটিয়া ওঠে।

ছয় হইতে দশ বৎসর

এই বয়সে ছেলেরা কোন নিয়ম মানিয়া খেলিতে পারে। 'লুকোচুরি' মতন্ খেলার নিয়ম সহজ, কিন্তু ফুটবল্ খেলার নিয়ম জটিল; ৮।১০ বছর না হইলে এরূপ জটিল খেলা ছেলেরা বোঝে না।

যে সব খেলায় দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় সেই সব খেলাই বেশী করি খেলা দরকার। হাডুডুডু বা কপাটি খেলা, বল খেলা মন্দ নয়। তবে খুব বেশী দৌড়াদৌড়ি করা উচিত নয়, অতিরিক্ত শ্রম স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারই করে। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা, দোলা, ডিগ্‌বাজী খাওয়া; লাফান ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলায় দেহের ব্যায়াম হয়।

ছয় বছর হইতে ছেলেরা প্রায়ই লেখাপড়া আরম্ভ করে; নানা প্রকার খেলার মধ্য দিয়াই তাহাদের শিক্ষা যাহাতে সুগম ও সহজ হইয়া উঠে তাহার চেষ্টা করা দরকার। কিণ্ডারগার্টেন্ শিক্ষাপদ্ধতি যত অবলম্বন করা যায় ততই ভাল।

কলের ছোট রেলগাড়ী, ষ্টিমার চালান, তাহাদের কলকারখানা বোঝা, ছোট রেলগাড়ী, নৌকা, বাড়ী, তৈয়ারী করা—এইরূপ খেলায় ছেলেরা খুব আমোদ পায়, তাহাদের মনে কলকারখানার কাজ শিখিবার ইচ্ছা জন্মে।

ছেলেরা ছুতারের কাজও সামান্য রূপে করিতে পারে, ছোট ছোট কুড়াল বাটালী, দিয়া কাট চেরা, প্লেন করা, নিজেদের খেলবার জন্য টুল, বেঞ্চি তৈরী করা, এ বেশ আনন্দের খেলা।

দোকানদার-খেলাও বেশ আমোদজনক; কয়েকজন মিলিয়া ঘুড়ি, লাট্টু, মার্ব্বেল বা পেন্সিলের দোকান খুলিবে, কেউ হিসাব রাখিবে, কেউ বিক্রেতা হইবে; অপর ছেলেরা ক্রেতা হইবে ইহাতে পাঁচজন মিলিয়া কাজ করিবার সহজ ক্ষমতা জন্মে।

ছবি আঁকা, ঘর সাজানো, গান গাওয়া গল্প শুনিয়া বা পড়িয়া তাহা অপর সঙ্গীদের বলা; মজার মজার জিনিষ সংগ্রহ করা, যেমন ভালো ছবি, নানাদেশের টিকিট (ষ্টাম্প) নানারকম পাথর, কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি—নানাপ্রকার খেলা আছে। একদল ছেলে মিলিয়া মাঝে মাঝে গীতনাট্য বা হাস্যকর সহজ নাট্য অভিনয় করিতে

পারে। একবাড়ীর ছেলেরা পাশের বাড়ীর বা কোন আত্মীয়ের বাড়ীর ছেলেদের নিমন্ত্রন করিয়াই মাঝে মাঝে খাওয়াইতে পারে। তাহাদের উপর জিনিষপত্র আনিবার ভালরূপে অভ্যর্থনা করিবার, পরিবেষণ করিবার ভার দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এসব খেলা ছেলেরা একা করিতে পারে না, মাতাপিতার বা বয়স্ক ভাই ভগ্নীদের বা শিক্ষক, বন্ধুদের সাহায্য খুবই দরকার। বয়স্ক ব্যক্তিরা ছেলেদের এই সব খেলায় যোগ দিয়া যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিবেন এমন আর কোথায় পাইবেন।

ছেলেদের মাঝে মাঝে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া দরকার; শুধু পশুশালা বা মিউজিয়মে লইয়া গেলেই হইল না, তাহাদিগকে পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীর ধারে খোলা মাঠের মাঝে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া দরকার। মাঠে বা বনে তাহাদিগের উপর চোখ রাখিয়া তাহাদিগকে অবাধে ঘুরিতে দেওয়া দরকার। তাহাদের চোখে যাহা ভাল লাগিবে. সেই সব জিনিষ তাহারা জমাইবে। এইরূপে প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও প্রকৃতিকে ভালবাসিবার শক্তি জন্মে।

ছেলেরা ৮।১০ বছর হইলে তাহাদের জন্য বিশেষ খেলিবার ঘরের আবশ্যক হয় না, কারণ তাহাদের খেলার স্থান বাড়ীর উঠান, বা মাঠ, খোলা জায়গা। কিন্তু তাহাদের জন্য এক বিশেষ ঘর চাই; সেই ঘরে তাহারা ছোট মিউজিয়াম করিতে পারে, বা খেলার দোকান করিতে পারে; সেই ঘরে তাহাদের ছুতোর-খেলা, ইঞ্জিনিয়ার খেলা, বা ছবি আঁকা, গান শেখা ইত্যাদি নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে। এই খেলার মধ্য দিয়া কোন্ ছেলের কি প্রকৃতি তাহা সহজে ধরা যায়; কার শক্তি কোন মুখে, কে কোন কাজে পারদর্শী হইবে তাহা বোঝা যায়; এইরূপে ছেলেদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বুঝিতে পারিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা ঠিক করা যায়।

নানাপ্রকার খেলার মধ্যদিয়া দেহ ও মনের কি কি শক্তি ফুটিয়া ওঠে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

মানসিক শক্তিঃ—	নৈতিক গুণঃ—
পর্য্যবেক্ষণ	অধ্যবসায়
মনোযোগ	শিষ্টাচার
কর্ম্মতৎপরতা	সাহস
অনুকরণশক্তি	ধৈর্য্য
বোধশক্তি	স্বাধীনতা
কল্পনাশক্তি	ন্যায়প্রিয়তা
বিচারশক্তি	ঔদার্য্য
উদ্ভাবন শক্তি	সাহচর্য্য
নেতৃত্ব	
ব্যক্তিত্ব	
কৌতুকপ্রিয়তা	

নানা প্রকার খেলার মধ্য দিয়াই ছেলেরা এই রূপ-রসগন্ধ শব্দময় বিচিত্র আনন্দকর জগৎকে ভাল করিয়া দেখিতে বুঝিতে, ধরিতে, খুঁজিতে পারে। তাহাদের সৌন্দর্য্যবোধ জন্মে। আপন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যেরূপ ইচ্ছা ঘুরাইতে, মাংসপেশীগুলি যেরূপ দরকার নাড়িতে, চালাইতে পারে; তাহারা কর্ম্মতৎপর, সজীব, সজাগ, স্বাস্থ্যবান হয়।

ছোটছেলেদের মনোজগৎ যে বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মনোজগৎ নয়, তাহা মাতাপিতা, শিক্ষকগণ ভুলিয়া যান; শিশুদের একটি বিশেষ জগৎ আছে, ছোট ছেলেরা এক কল্পলোকে অপরূপ রাজ্যে বাস করে; তাহাদের দেহ ও মন উন্মুখ কুঁড়ি মাত্র, প্রস্ফুটিত ফুল নয়। মাতাপিতারা মনে করেন, ছেলে মেয়েদের যাহা বলিতেছি তাহাই তাহারা বুঝিতেছে, যাহা বারণ করিয়া দিয়াছিলাম তাহাই তাহারা মনে করিয়া রাখিয়া দিয়াছে; এইরূপ ছোট ছেলেমেয়েদের বোধশক্তি, কল্পনাশক্তি, স্মরণশক্তি, বিচারশক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা ভুল ধারণা আছে। ছেলেরা নবীন, সতেজ, সচল; তাহারা কিছু বোঝেনা, কিছু জানে না, তাহারা শুধু খেলিতে চায়। মাতা-পিতাকে এই স্বার্থপর বুদ্ধিমানের জগৎ হইতে ছেলেদের

আনন্দময় নবীন জগৎএ আসিয়া তাহাদের খেলায় যোগ দিতে হইবে। ছোট ছেলেমেয়েদের অন্তরেও সুখদুঃখ হাসি কান্না আশা নিরাশার খেলা চলিতেছে। তাহাদের মনেও ক্ষুধা, বাসনা, তৃষ্ণা রহিয়াছে। তাহাদের জীবন শরৎ আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মত ক্ষণিক কান্না ও হাসিতে ভরা। কান্নাই ছেলেদের ব্যথার ভাষা। যখন দেহে ও মনে কোথাও ব্যথা অনুভব করিতেছে, কিছু চায় অথচ পাইতেছে না, যাহা ভালবাসে তাহা হারাইতেছে, তখন শিশু কাঁদে। কান্নাই তাহার সকল চাওয়া, সকল ব্যথা, সকল ক্ষুধার, তাহার ক্রোধ, অভিমান লজ্জার কথা বলে। ছেলেরা যখন কাঁদে মাতারা তাহাকে ধমক দেন; তাঁহারা দেখেন না কেন সে কাঁদিতেছে তাহাকে খাইতে দিয়া ভোলান বা মেজাজ গরম থাকিলে গালে চড় বসাইয়া দেন। শিশুরা সব সময় খাইবার জন্যই কাঁদে না, হয়ত পেটে ব্যথা হইতেছে, বা জামা পরিয়া গরম হইতেছে, বা রঙীন খেলনা দেখিয়া পাইতে লোভ হইয়াছে—এইরূপ নানা কারণ আছে। যে মাতা আপন বুদ্ধির জগৎ ছাড়িয়া ছেলেদের জগতে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া প্রবেশ করিবেন, তিনিই সেই কান্নার কারণ জানিতে পারিবেন।

"Suffer the little children to play."

ছেলেদের খেলিতে দাও। মাতাপিতারা যদি সে খেলায় যোগ দিতে পারেন, ভালই, যদি না পারেন, তবে ছেলেদের শান্তশিষ্ট প্রাণহীন করিবার দুঃসাধ্য ব্রত যেন গ্রহণ না করেন। প্রাণ চঞ্চল, গতিবান, লীলাময় হইবেই; খেলাই ছেলেদের ধর্ম্ম। প্রাণের লক্ষণই আপনাকে বিকাশ করা, প্রকাশ করা, নানারূপে উৎসারিত করিয়া দেওয়া।

স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য

যাঁহারা স্বাস্থ্যতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা জন সাধারণের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং স্বদেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন যাঁহাদিগের জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহারা বাঙ্গালীর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কার্য্যে যত্ন প্রকাশ না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সদুপদেশ গ্রহণে অনেকেই বিমুখ। কারণ সুখে থাকিবার জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা সকলে যত বুঝেন স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা তত বুঝেন না। সভ্য বাবুদিগের কথা দূরে থাকুক, মধ্যবিত্তসমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে উদাসীন। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" এই বাক্যকে আমরা এমন নির্ব্বিকার চিত্তে মানিয়া লইয়াছি যে অস্বাস্থ্যকে আমরা সভ্য সমাজের একটা অঙ্গস্বরূপ বলিয়া মনে করি।

ব্যাপারটা এতদূর গড়াইয়াছে যে নব্য সভ্যতার ভক্ত নরনারীদিগের মধ্যে রোগ অনেকটা 'ফ্যাসন' হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আকারে ইঙ্গিতে প্রতিদিন যেন বলিতেছেন, মুখের পাণ্ডুর রাগ, ক্লান্তদৃষ্টি,—গভীর জ্ঞান উচ্চচিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক। টাকপড়া মাথা, মেদবহুল দেহ ও অকালপ্রৌঢ়তাকেও অনেকে গাম্ভীর্য্যের নিদর্শন ভাবিয়া সন্তোষ লাভ করেন। ইঁহারা সাধারণতঃ শ্রমবিমুখ, সুতরাং কোনপ্রকার ব্যায়ামকে 'আমল' দিতে চাহেন না। অবস্থাটা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কেহ কেহ রোগ লইয়া আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

বাঙ্গালার যে সকল কৃতী সন্তান আপনাদিগের সাধনাগুণে স্বনামধন্য বলিয়া সমাজে সমাদৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সাহিত্যকীর্ত্তি; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল

ও ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রচার দেশের পক্ষে যতই হিতকর হউক না কেন তাঁহারা স্বাস্থ্যের প্রতি যে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের গুণমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিষময় ফল ফলিতেছিল। কিন্তু ইদানীং নগরের যুবক সমাজে কিঞ্চিৎ ভাব-পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, কলেজের ও বড় বড় স্কুলের ছাত্রগণ কতকটা ইংরাজদিগের সদ্দৃষ্টান্তে, কতকটা বা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় পৌরুষ-চর্চ্চায় উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

কিন্তু পল্লী অঞ্চলের অনেক স্থলে জন-সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনে সম্পূর্ণ উদাসীন সুতরাং পল্লীর সংস্কার ও স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনার্থ ঐ সকল স্থানে তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের ও তথ্য প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন। পল্লীপঞ্চায়েতের বিলোপ, পৌরুষ-চর্চ্চায় অনাস্থা, পল্লীর অধিবাসি-সাধারণের দুর্দ্দশার কারণ। অনেকে হয়ত এই দুর্দ্দশার জন্য বাঙ্গালার "সেকেলে" ভাবকে দায়ী করিবেন। কিন্তু বাঙ্গালার 'সেকেলে' পল্লীসমূহে বাহুবলের চর্চ্চা বা ব্যায়াম ছিল, কিন্তু ঠগীদিগের উপদ্রব দমনকালে সরকার যে নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহাতেই পল্লী অঞ্চলে কুস্তি ও লাঠিখেলা প্রভৃতি উঠিয়া যায়। পুরাতন ব্যায়ামের মধ্যে কোন কোনটি ইদানীং কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। তথাপি তাঁহাদিগের অনুমোদিত উপায়ে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

যাঁহারা এই সকল কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করিলে প্রকৃত সদনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে, তাঁহারা অনেক সময়ে পল্লীর অস্বাস্থ্যকরতার দোহাই দিয়া নগরের সুখ ভোগ করেন, আর যাঁহারা গ্রামে বারমাস থাকেন তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমকে "ছোটলোকের কাজ" মনে করিয়া বৈঠকখানার চৌহদ্দী অতিক্রম করিতে চাহেন না। বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবনতি কেন ঘটিয়াছে, পাঠক এই সকল ব্যাপার হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় পল্লী পঞ্চায়েৎ গঠনে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশী ও বিদেশী প্রথায় স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলে বঙ্গের একটি প্রধান অভাবের পূরণ হইতে পারে। জন সমাজে আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রচারে আমরা যত্ন প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। রোগের নিদানভূত জীবাণুতত্ত্ব, রোগ সংক্রমণ ও তাহার প্রতিষেধ বিষয়ে যে সকল আলোচনা করিয়াছি পল্লীর ভদ্র ও শিক্ষিত জনগণের চেষ্টায় নিরক্ষর পল্লীবাসীদিগের মধ্যে তাহার প্রচার হইলে সুফল ফলিতে পারে। স্বাস্থ্যসুখ যে কত মধুর অনাময় বিধাতার কি মহনীয় দান, তাহা সকলে বুঝিতেও পারে, সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলদেহ ও রোগজীর্ণ শরীর কেমন অভিশাপ তাহাও জানিতে কাহারও বাকি থাকে না।

রোগ হয় কেন? ইউরোপের বর্ত্তমান চিকিৎসা শাস্ত্রে ও ভারতের পুরাতন আয়ুর্ব্বেদেও রোগের নিদান নির্ণীত হইয়াছে। যাঁহারা তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, মানব-শরীরে রোগের প্রকাশ, বিনামেঘে বজ্রাঘাত নহে,—প্রতিদিন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে মানুষের দেহে বিষক্রিয়া হয় ও শরীরের যন্ত্রগুলির ক্রিয়া-বিভ্রাট ঘটে ইহাতেই রোগের উৎপত্তি হয়। রোগ আকস্মিক ঘটনা নহে—মূর্খেই রোগকে ঐরূপ বিবেচনা করে।

আহার, বেশ-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এদেশে অনেকে শারীরিক পাপ-গ্রস্ত হইয়া পীড়িত হন। বিশেষতঃ আহারাদি বিষয়ে যাঁহারা অমিতাচারী —মশলাবহুল দুষ্পাচ্য খাদ্য ভোজনেই যাহাদিগের আনন্দ,—থিয়েটার, হোটেল প্রভৃতির ন্যায় বহুজনপূর্ণ স্থানে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া যাঁহারা বহুজনের শ্বাস-প্রশ্বাসে দূষিত বায়ুর বিষ গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের শীঘ্র স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আবার যাহারা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নিয়ম পালনে উদাসীন তাঁহাদিগকেও রোগ ভোগ করিতে হয়। যাহারা সময়ে স্নানাহার করে না,—নিদ্রাসম্বন্ধেও যাহারা কোন নিয়মের ধার ধারে না, হাসি তামাসা ও গল্পগুজবে সময় কাটাইতে পারিলে যাহারা স্বর্গ হাতে পায়, সেই সব অলসপ্রকৃতি লোককে রোগে পড়িতে হয়,—কেননা

প্রকৃতির প্রতিশোধ আছে। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যে সুখী হইতে চাহে, তাহাকে সুদে আসলে প্রকৃতির ঋণ শোধ করিতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে আমারা যে শরীর পাইয়াছি তাহাকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং কর্ম্মঠ করাই আমাদের একটি প্রধান কর্ম্ম, আমরা সে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে প্রকৃতি আমাদিগকে ক্ষমা করেন না। অনেকে দিনের মধ্যে একবার বাহির হইয়া "হাওয়া খাওয়া"কে,—সান্ধ্য বা প্রাত-র্ভ্রমণকে স্বাস্থ্যনীতিপালন ও শারীরিক পরিশ্রম বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, শরীর যাহাতে ঘর্ম্মাক্ত হয়, রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া কিয়ৎকালের জন্যও দ্রুততর হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য-ব্যায়াম করাই সঙ্গত। এইরূপ পরিশ্রমে শরীর সুস্থ থাকে এবং দেহে রোগের বীজাণু সংক্রমণ নিবারিত হয়।

কলিকাতার দেশী ও বিদেশী সওদাগর এবং মহাজন-দিগের মধ্যে, বড়বাজার, কলুটোলা, দরমাহাটা প্রভৃতি অঞ্চলে যাঁহাদিগের আড়ৎ, গুদাম ও দোকান আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে স্বাস্থ্যনীতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল প্রয়োজন সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আড়ৎ, গুদাম ও দোকানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ব্যবস্থায় গুদাম, আড়ৎ ও দোকানের কর্ম্ম-চারীদিগকে অনেক সময় সঙ্কীর্ণস্থানে থাকায় বদ্ধ ও বিষাক্ত বায়ুর শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে একদিকে যেমন কর্ম্মচারীদিগকে মধ্যে মধ্যে রোগ ভোগ করিতে হয় অন্যদিকে সেইরূপ তাঁহা-দিগের কার্য্য বিশৃঙ্খলা ঘটে। এইরূপ ব্যবস্থায় চাকরও মনিব উভয় পক্ষের বিশেষ অপকার হয়। মহাজন ও সওদাগরদিগের ক্ষতিটা অনেক সময় তাঁহাদিগের টাকার উপর দিয়া যায়. কিন্তু কর্ম্মচারীদিগের স্বাস্থ্যের ও অর্থের যে ক্ষতি হয় তাহার আর পূরণ হয় না। কর্ম্মচারীরা পেটের দায়ে—ভগ্নদেহে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের নিরুপায় ও অভিভাবকশূন্য পরিজনবর্গের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে তাহা ভাবিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর গুদামে রৌদ্র ও বায়ুর প্রবেশ একপ্রকার নিষিদ্ধ সুতরাং সহজেই স্থানগুলি অস্বাস্থ্যকর, তাহার উপর গুদামগুলির পার্শ্বস্থ পয়ঃ-প্রণালী হইতে প্রত্যহ যে বিষবাষ্প উঠিয়া গুদাম-গুলির বায়ু দূষিত করে তজ্জন্য ঐ সকল অঞ্চলে সাধারণতঃ টাইফয়েড, প্লেগ, টিউবারকুইসিস বা ক্ষয় প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু উৎপন্ন হয় এবং নগরে নানাপ্রকার সাংঘাতিক রোগের বিস্তার ঘটে। তবে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কর্ত্তৃ-পক্ষ নগরের সংস্কার ও শোভাবৃদ্ধি করিবার জন্য সমস্ত সহরটাকে যে ভাবে ভাঙ্গিয়া গড়িতেছেন তাহাতে কলি-কাতার কোন কোন অংশে নগরের উন্নতি নাগরিক-দিগের পক্ষে আপাততঃ পীড়াকর হইলেও এই ব্যবস্থায় বড়বাজার, কলুটোলা ও দরমাহাটা যে স্বাস্থ্যবিষয়ে উপকৃত হইয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, যাঁহারা সুখে থাকিতে চাহেন, তাঁহারা গৃহের পরিজনবর্গের এবং প্রতিবেশীদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি যেন একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। কে কিভাবে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিপদকে ডাকিয়া আনিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। প্রথমাবধি তাহার প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি হঠাৎ প্রকাশ পাইলে তাহার প্রতিকার বহুব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য হইয়া উঠে। কলিকাতার উপকণ্ঠে অনেক স্থানে এবং খাস রাজধানীর কোন কোন অংশে গাড়োয়ান, মুটিয়া ও অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমজীবীদিগের বাস। ঐ সকল স্থানের দৃশ্য যেরূপ ধিক্কার জনক, স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অধিবাসীদিগের মূর্খতাও তদনুরূপ। ইহারা অনেক সময়ে গৃহের আবর্জ্জনা, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য রাস্তায় ফেলিয়া রাখে, কূপ প্রভৃতির জলে এরূপভাবে 'কাঁথা-কাপড়' প্রভৃতি ধৌত করে যে স্থান গুলি দুর্গন্ধময় ও মক্ষিকাসঙ্কুল হইয়া থাকে। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ ঐ সকল অঞ্চলের পথ দিয়া গমনাগমন করিতে চাহে না। দরিদ্র ও ইতর শ্রেণীর লোকের বাস-পল্লী বলিয়া স্থানগুলি সত্বর আবর্জ্জনা মুক্ত করিবার

ব্যবস্থা নাই। সহরে ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সর্ব্বাগ্রে ঐ সকল স্থানেই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। সহরে কয়েকটা বড় বড় হাস পাতাল এবং দাতব্য ঔষধালয় আছে বলিয়া এই সকল শ্রমজীবীরা সাধারণ : রোগের সময় চিকিৎসা করাইবার সুযোগ পায় নচেৎ এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে নগরে ও নগরোপকণ্ঠে বাস সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত।

অনেকে পল্লীর পুষ্ট ও প্রফুল্লকান্তি যুবক ও প্রৌঢ় পুরুষদিগের স্বাস্থ্যশ্রী দেখিয়া মনে করেন, ইঁহারা কখনও রোগের কবলে পড়িবেন না, সংক্রামক ব্যাধির বিষ ইঁহাদিগের শরীরে বিষময় করিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহারা বেশী দিন স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকিলে, দিনকতক স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিবেন ও "উঁচুদিকে বাড়িয়া উঠিবেন" বটে, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা কি দুর্লভ নিধি হারাইবেন তাহা হিসাবের কালে ভিন্ন বুঝিতে পারিবেন না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের সন্তানেরাও তেমন বলিষ্ঠ হয় না।

সুতরাং আমাদিগের নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকিবার সময় আর নাই। আমরা যে নিজদোষে,—মাতাপিতার দোষে মরিতে বসিয়াছি—দিন দিন হীনবল হইয়া পড়ি-তেছি,—একথা সমাজে বিশেষভাবে প্রচার করা আবশ্যক। যাঁহারা দেশহিতৈষী, লোকশিক্ষক বলিয়া যাঁহারা আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি মাঝে মাঝে পল্লীগ্রাম এবং নগরের দরিদ্র পল্লী সমূহে পদার্পণ করেন, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত মূল তথ্য গুলি লোককে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে লোকে রোগের পীড়ন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে,—বালকবালিকারাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্যহীনতা ও দুর্ব্বলতার জন্য মাতাপিতাকে দায়ী করিবার অবসর পায় না, তদ্ভিন্ন এইরূপ শিক্ষা পাইয়া তাহারা উপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা শ্বাসযন্ত্র, যকৃৎ, পাকস্থলী প্রভৃতির দোষ সংশোধন পূর্ব্বক স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে পারে। আমাদের কি করা উচিত? স্বাস্থ্য-পুষ্টির জন্য আমাদের কি করা উচিত, তাহা আমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। কিন্তু আবার বলিতেছি, নিরাময় থাকিবার জন্য, শরীরের যথোচিত তুষ্টিপুষ্টির জন্য, বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল বড় আবশ্যক। রৌদ্রও শরীরের পক্ষে কম আবশ্যক নহে,—রৌদ্রে স্নানে (Sun-bath) অনেক রোগের প্রতীকার হয়। সুনিদ্রার পক্ষেও রৌদ্র-স্নান বা সূর্য্যালোকে বিচরণ বিশেষ আবশ্যক। গতি বা ক্রিয়াশীলতা জীব-জীবনের অবলম্বন,—নিশ্চলতা (stagnation) মৃত্যুর লক্ষণ।—প্রকৃতির লীলা-ক্ষেত্রের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেই দিকেই এই নিয়মের অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে। সে যাহা হউক,—সুস্থ ও সবল দেহে স্বচ্ছন্দ মনে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা দেহের পেশীপুঞ্জের পরিচালনা করা ও শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রতন্ত্রের ক্রিয়াবৃদ্ধি করা আবশ্যক, নচেৎ অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

স্বাস্থ্যনীতির অনুসরণে রীতিমত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা শরীর চালনা করিলে কিরূপ অমৃত ফল ফলে তাহা অনেকে জানেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এদেশের জন সাধারণের কথা দূরে থাকুক, সুশিক্ষিত ও মনীষী ব্যক্তিরাও এই তথ্যটি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহাদিগের অবস্থাসুলভ আলস্যই ইহার কারণ। ঘরে বসিয়া, ফুলদানীতে সজ্জিত কুসুম-স্তবকের মৃদু সৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে, মার্জ্জিত কর পল্লবের অঙ্গুলিগুলির লীলা দেখাইতে দেখাইতে গোটাকয়েক পিল, এক মোড়ক পাউডার সেবন করা, অথবা সোডা ওয়াটার প্রভৃতি স্নিগ্ধ ও উত্তেজক পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করা দৈহিক পরিশ্রম অপেক্ষা হৃদ্য ব্যাপার তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইরূপ উপভোগ, এক ঘণ্টাব্যাপী শারীরিক পরিশ্রমের তুলনায়—খুব Æsthetic সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্যোপলব্ধির ও মার্জ্জিতরুচির পরিচায়ক,—স্থল-বিশেষে বনিয়াদি 'চাল' বলিয়াও সমাদৃত। এই শ্রেণীর শ্রমকাতর ভদ্রলোকেরা ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমকে মূঢ়তার উৎপাদক—'গুণ্ডামি'র প্রশ্রয়দানমূলক ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

কার্য্যকারণতত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও

স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদিগের নিজ দোষেই রোগের উৎপত্তি ঘটে, অথচ আমরা বুঝিয়া চলিলে বেশ সুস্থ ও সবল হইতে পারি। মানুষ মাত্রেরই সুখসৌভাগ্য তাহার আচরণের উপর নির্ভর করে। স্বাস্থ্য সুখসৌভাগ্যের মূল,—বড় বড় উপাধি, পৈতৃক ধন অথবা স্বোপার্জ্জিত কাঞ্চনরাশির সহিত তাহার সম্বন্ধ খুব অল্প। একজন বড় মহাজন বা মস্ত সওদাগর, ইহজীবনে তাঁহাকে লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি হইতে হইবে, সুতরাং তিনি সমস্ত জীবন অক্লান্তভাবে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিলেন স্বাস্থ্যের দিকে তেমন দৃষ্টিপাত করিলেন না। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইল যে, অনেক বিত্তশালী মুরুব্বি তাঁহার দূরদর্শন ও কর্ম্মপটুতার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু যখন প্রবীণবয়স আসিল, আয় ব্যয়ের হিসাব করিয়া সঞ্চিত অর্থের পরিমাণটা ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইল, তখন বেশ বুঝা গেল, দিন ফুরাইয়াছে,—হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ঠিক বিশ্রাম লাভের সময়, পরপারে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর প্রবীণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের শরীর অনেকটা ভাল থাকে তাঁহারা শেষ জীবনটা বড় বড় ডাক্তারের কাঞ্চনপুষ্ট পরামর্শ লইয়া—দেশের স্বাস্থ্যকর স্থানে মাঝে মাঝে বাস করিয়া কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বদলে স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদের পরামর্শ লইলে ফল সমান হইয়া থাকে, তবে ততটা ঔষধ খাইতে হয় না।

বাঙ্গালীর ছেলে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

('ভারতবর্ষ' হইতে উদ্ধৃত)

লেখক—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্ এস্

স্বভাববিরুদ্ধ কায

পূর্ব্বে যে যে কথাগুলি বলিয়াছি, তাহার অধিকাংশই স্বভাববিরুদ্ধ কাযের বিরুদ্ধে; কিন্তু স্বভাবের প্রেরণায় ছেলেরা এমন কতকগুলি কায করিতে চাহে, যাহা করিতে না পারিলে তাহারা অসুখী হয়। সেরূপ কায ছয়টি'। প্রথমতঃ মিষ্ট খাইতে ভালবাসে ও টক রস পাইলে সুখী হয়। অথচ, সাধারণের মনে ঐ দুইটি জিনিসের বিরুদ্ধে নানা রকমের কুসংস্কার আছে। মিষ্ট খাইলে ক্রিমি বাড়ে, দাঁতে পোকা জন্মে, এবং টক খাইলে সর্দ্দি হয়,—এই ভয় সর্ব্বদাই গৃহীর মনে জাগরূক আছে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই শিশুদিগের ঐ দুটি জিনিস প্রিয়। তাহার কারণ, প্রথমতঃ, মিষ্টির মত আশু-শ্রমহারী-খাদ্য খুব অল্পই আছে; এবং দ্বিতীয়তঃ, মিষ্ট ভোজনে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও উত্তাপ রক্ষণ অতি সুন্দর রূপেই হইয়া থাকে। তাই প্রকৃতির প্রেরণায় শিশুমাত্রেই মিষ্টের অনুরাগী। টক খাইলে সর্দ্দি হয়, এ কথা চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অথচ টক খাইলে প্রস্রাব ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, বোধ হয় এই প্রাকৃতিক প্রেরণায় কাঁচা ও টক ফল ভালবাসে। আমার মনে হয়, শিশুদিগকে এই দুইটি রস হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়—তাহার ফলে শিশুদিগের অনিষ্ট হয়। তবে একথা সর্ব্বথা সত্য যে—"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।" দ্বিতীয়তঃ, শিশুরা নগ্ন থাকিতে ভালবাসে। আমাদের দেশে অন্ততঃ আট-মাসকাল গ্রীষ্ম, চারিমাস মাত্র শীত! অথচ, অনেক স্থলে দেখা যায় যে, সবল ঋতুতেই পিতামাতার খেয়াল ও অহঙ্কার পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, নানা রকমের জামা কাপড় শিশুগণকে পরাইয়া দেওয়া হয়। আজ-কাল এমন কি দুই-তিন মাসের শিশুকেও লজ্জানিবারক কৌপীন বা পা-জামা ব্যতীত সহরে দেখা যায় না। আমার মনে হয় যে, এই কাযটি অন্যায়। শীতে, বর্ষায় বা যে কোনও দিন ঠাণ্ডা থাকিলে অতি অবশ্য শিশুকে জামা-জোড়া দিয়া আবৃত করা উচিত। তদ্ব্যতীত বারোমাসে প্রত্যহই শিশুকে রীতিমত ভাবে তৈলমর্দ্দন করা উচিত;—তৈলাক্ত চর্ম্ম মসৃণ থাকে এবং শীতাতপ হইতে শিশুকে রক্ষা করে। কিন্তু অযথা শিশুকে জামা-জোড়া পরাইয়া রাখা অনুচিত—বিশেষতঃ যে সকল পরিধেয়ে বন্ধন, ফিতা, সেফ্‌টি পিন্ লাগানর প্রয়োজন হয়, তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তৃতীয়তঃ শিশুরা স্বতঃই জল ঘাঁটিতে ভালবাসে এবং নগ্ন পদে জলে-জলে বেড়াইতে পাইলে সুখী হয়। এই অভ্যাসটির অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি নাই এবং ছেলেরা অনবরত জল ঘাঁটে বা জলে বেড়ায়, ইহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। পরন্তু যে সকল অবিবেকী জনক-জননী শিশুগণকে "শক্ত' করিবার আশায় ঐ দিকে শিশুগণকে প্রশ্রয় দেন, তাঁহারা জানেন না যে, "শক্ত" করিবার চেষ্টার ফলে, কত শিশু অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিয়া বসে! আমার মনে হয় যে, যে সকল শিশু প্রত্যহ রীতিমত স্নান করিতে পায়, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান্ হয়। চতুর্থতঃ, শিশুরা চীৎকার করিতে ভালবাসে। অনেক বাটীর লোকেরা ইহাতে বিরক্ত হন এবং শিশুরা সামান্য চীৎকার করিলেই, তাহাদিগকে শাসন করেন। চীৎকার করিলে বুকের জোর বাড়ে, এই জন্যই শিশুরা চীৎকার করে; তাহাদিগকে নিষেধ করিলে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ অত্যধিক শাসন ও ভদ্রলোক তৈয়ারি করিবার অত্যধিক চেষ্টার ফলে, আমাদের ছেলেরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, এবং তাহারা পেচক-নীতি অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে। পঞ্চমতঃ, ছেলেরা স্বভাবতঃই দৌড়াদৌড়ি ও হুটোপাটি করিতে ভালবাসে। কিন্তু অল্পপরিসর স্থানে বাস করা ও চতুর্দ্দিকে বিলাতী মাটি দিয়া বাঁধান হওয়ার ফলে এবং কতকটা মমতাধিক্য

বশতঃ, আমরা শিশুগণকে স্থির হইয়া বসিতে থাকিতে বাধ্য করি—স্বাভাবিক উপায়ে তাহাদিগকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিতে দিই না। এক দিকে তাহাদিগকে জামাজোড়ার বাঁধনে বাঁধি, অপরদিকে তাহাদিগকে সরাসরি ভদ্র বানাইয়া ফেলি; কাযেই ছেলেরা স্ফূর্ত্তিহীন, দুর্ব্বল-পেশী, জড়ভরত হইয়া থাকে। ছোট পুষ্করিণীতে তাড়া না খাইয়া যে মাছেরা বাস করে, তাহারা ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে; বড় পুষ্করিণীতে সর্ব্বদাই তাড়া খাইয়া যে মাছেরা বাড়ে, তাহারা বৃহদায়তন হইয়া থাকে। মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ ঠিকই বলিয়াছেন—"You can not have an *A1* empire with *C3* population" অর্থাৎ মন্দস্বাস্থ্য লোক লইয়া উৎকৃষ্ট সম্রাজ্য স্থাপন করা যায় না। ষষ্ঠতঃ, ছেলেরা অনুকরণ করিতে ভালবাসে এবং চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া মনোবৃত্তিকে ফুটাইতে চেষ্টা করে। আমরা সেই নিয়ত-চঞ্চল ও নিত্য-অনুকরণশীল শিশুকে পাঁচ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই, পাঠ কণ্ঠস্থ করাইতে আরম্ভ করি, জোর করিয়া তাহার অসংযত অঙ্গুলিগুলিকে নানা ছাঁদের অক্ষর লিখিতে অভ্যস্ত করাই এবং সামান্য ভুল হইলেই ভীতি প্রদর্শন করাই! পাঠক মহাশয়, কখনো কি স্থির দৃষ্টিতে শিশুকে হস্তাক্ষর লিখিতে দেখিয়াছেন? কখনো মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন কি, যে, শিশু কত জোরে কলমটিকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং প্রত্যেক অক্ষর-পাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোমল ললাটে কত কঠিন রেখাগুলি ফুটিয়া উঠে? আপনার আমার পক্ষে দুই ছত্র লেখা কিছুই নহে, যেহেতু এতদিন উহা অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে;—কিন্তু একটা সামান্য অক্ষর লিখিতে হইলে শিশুকে কি প্রচণ্ড মানসিক শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সেই শক্তি সেই সুকুমার দেহের অনুপাতে কতটা, তাহা কি কখনো প্রণিধান করিয়াছেন? ভাষাশিক্ষা কর্ণের সাহায্যে যত সহজে হয়, চক্ষুর সাহায্যে তত শীঘ্র ও স্থায়ী ভাবে হয় না। শিশুরা নিত্যই নূতন জিনিস দেখিয়া কত কুতূহলী হয়, কতই তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলির উন্মেষ ঘটিয়া থাকে—কিন্তু আমরা জবর-

দন্তি দুই সন্ধ্যা জোর করিয়া তাহাদিগকে আকণ্ঠবদ্ধ করিয়া, বিদ্যার রাশি তাহার কণ্ঠের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিই। এরূপ করার ফলে, তাহার মন সঙ্কুচিত হয় এবং মনের সঙ্গে তাহার তাবৎ দেহই জব্দ হইয়া পড়ে। আমরা কি কখনো এ সকল কথা ভাবিয়া দেখি?

অপরাপর কারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই জনক জননী হইয়া বসি। এ কথায় কেহ যেন মনে করিবেন না যে, আমি "বাল্য"-বিবাহের প্রতিকূলে মত দিতেছি। "বাল্য" বিবাহ ভাল কি মন্দ, সে বিচার এখানে করিব না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা নিজ-নিজ কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ না পাইয়াই, পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকি। বয়সের ন্যূনতাবশতঃ যে সেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হই, তাহা নহে—"শিক্ষার" কল্যাণেই তাহা জানিতে পাই না, বিজাতীয়-ভাষা-শিক্ষার জাঁতা-কলে পেষিত হইয়া সে ভাষাও ভাল করিয়া শিখি না, নিজের চিত্তবৃত্তির উন্মেষও হয় না। অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলনে মস্তিষ্কটাকে উষ্ণ করিয়া আমরা মানসিক সংযম শিক্ষা করিবার আশা রাখি; কিন্তু দুর্ব্বল-দেহে জীবনের প্রতিদেহে অসংযমের পরিচয় দিয়া থাকি। আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস-চর্চ্চা করি, কিন্তু জীবনে একদিনও নিজেদের প্রকৃত সমাজের ও দেশের সংবাদ পাই না। শিক্ষার নামে এরূপ বিরাট ভণ্ডামির মধ্যে ভারবাহী "গাধা" হইয়া, মনুষ্য সমাজে ধারকরা লম্ব-কর্ণের বাহারই দিতে শিখি। মানুষের মনুষ্যত্বের সন্ধান পাই না, সমাজের মজ্জার সন্ধান পাই না, দেশের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি না—নিজের ঠাকুর না হইয়া পরের কুকুর হইয়া সমাজে বিচরণ করি। দেহতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, এ সকল শিক্ষা না করার ফলে আমরা, সংসারে সকল সুখই আমরা আয়ত্ব করিয়া বসি, যা কষ্ট রহে শুধু অন্ন-বস্ত্রের। তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা কর্ত্তব্য কিছুই জানিতে-না-জানিতে, পিতৃত্বে উন্নীত হই এবং অজ্ঞানতার মাসুল স্বরূপ অকালে কতকগুলি শিশু হারাইয়া, পত্নীকে চিররুগ্না করিয়া ও স্বয়ং মূর্ত্তিমান অস্বাস্থ্য হইয়া সংসারে জীবন্মৃত হইয়া বেড়াই। পূর্ব্বে "অষ্টোত্তরী" ও "বিংশোত্তরী" মতে আয়ুর্গণনা করা হইত বলিয়া মনে হয় সুদূর অতীতে, ভারতবর্ষে সাধারণের অয়ুষ্কাল ১০০ বা ১২০ বৎসর ছিল। তখন দেশের আবহাওয়াও বোধ হয় ভাল ছিল এবং লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। এখন দেশের আবহাওয়া অতি মন্দ, খাদ্যে পর্ব্বত-প্রমাণ ভেজাল, ম্যালেরিয়া সর্ব্বত্র, দৈন্য ও অভাব প্রচণ্ড, কাযেই লোকের আয়ুঃ স্বল্প। অথচ আমরা কেহই এই আয়ুস্তত্ত্ব আলোচনা করি না, এবং আমাদের দেশে রমণীরা এই দুর্লভ মানব জীবনটাকে যত্ন করিবার সামগ্রী মনে করেন না—আমরাও অন্দরমহলের তত্ত্ব লওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ করি না। কাযেই আমাদিগের দেহ হইতে জাত সন্তান-সন্ততি যে রোগের আকর হইবে, তাহার বিচিত্রতা কোথায়? মাসিক পত্রে যে উপন্যাসের চর্চ্চা যে অনবরত চলিয়াছে, তাহার একদশমাংশও যদি স্বাস্থ্য-চর্চ্চায় নিয়োজিত হয়, তাহা হইলেও অনেক কায হয় এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীরবিধানতত্ত্ব (physiology) ও মোটামুটি দেহতত্ত্ব (anatomy) শিক্ষার প্রচলন হওয়া চাই।

দৈন্য আমাদের দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহার সংসারে নিত্যই অভাব, তাহারই সংসারে মা-ষষ্ঠীর কৃপা বেশী হয়। কাযেই সকল ছেলের প্রতি সমান যত্ন করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অপরাপর দেশে দৈন্য ও পুত্রবাহুল্য থাকিয়াও অসুবিধা নাই। তাহার কারণ, প্রথমতঃ আমরা অলস, শ্রমবিমুখ ও কষ্ট-অসহিষ্ণু বলিয়া, সকল রকম কাযে হাত দিতে পারি না। আমরা অত্যন্ত সন্তানবৎসল বিধায়, গৃহ ছাড়িয়া বেশী দূরে যাইতে চাহি না। আমরা অদৃষ্টবাদী ও স্বল্পদোষ বলিয়া, সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়া যেনতেন প্রকারেণ অল্প বেতনেই সংসার চালাইয়া দিই। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মালিক আমরা নহি বলিয়া, আমাদের যোগ্যতার পুরস্কার কখনো পাই না এবং যে সকল কায আমাদের হাতে থাকা

উচিত ছিল, এমন সকল কায আমাদের করায়ত্ত নহে; কাযেই দৈন্যের বিকট মূর্ত্তি সর্ব্বদাই প্রকট। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের (১৩২৫, মাঘের শেষ) প্রাক্কালে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার উদ্বোধন কালে সম্রাট জর্জ্জ যে আশ্বাসবাণী তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে শুনাইয়াছেন, সে আশ্বাসবাণী কবে আমরা শুনিতে পাইব? সে দেশে, শ্রমজীবিদিগের বেতনের ন্যূন নিরিখ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে, ভগ্নস্বাস্থ্যদিগকে নিরাময় করা হইবে। আমরা কবে সেই সকল আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইব?

ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা একান্ত স্বার্থপর হইয়া, একান্নবর্ত্তিতা ও সৌভ্রাত্র ভুলিয়া গিয়াছি; অথচ ঐ দুইটির উপরে ভরসা করিয়া আমরা অনেক কায করিতে পারিতাম। এখন মাত্র গৃহিণী সম্বল হইয়া, তাহার উপরে বিলাসিতার কঠিন শৃঙ্খল পরিয়া, আমরা ক্রমশঃই দেহে ও মনে অর্থে ও সামর্থ্যে, দীনতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। আজ তাই যতদিন খাটিতে পারি, ততদিন পরিবার খাইতে পায়, এবং এখন এমন কাহাকেও আত্মীয় রাখি নাই, যাঁহার ভরসায় দুদিন সংসার ছাড়িয়া স্থানান্তরে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে যাইতে পারি।

উপসংহার

বাঙ্গালাদেশের আবহাওয়ার অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হইতেছে। বাঙ্গালীরা নিতান্তই দীন হইতে দীনতর হইতেছে;—কাযেই অর্থ ও শারীরিক সামর্থ্য উভয়ই কমিয়া যাইতেছে। সামাজিক বিপ্লবের ফলে, বাঙ্গালীর জীবনের মেরুদণ্ড—একান্নবর্ত্তিতা ও সৌভ্রাত্র—শিথিল হওয়ায়, বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার সহিত বিলাসিতার বলক্ষয়কারী শক্তির যোগ হইয়াছে; এবং উভয়ের ফলে, শক্তি সঞ্চয় করা দূরে থাকুক বাঙ্গালী শক্তি রক্ষাও করিতে পারিতেছে না। বিলাতী ভাষা ও অনাবশ্যক কতকগুলা বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয়গুলি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী চিরতিমিরে বাস করিতেছে। বাঙ্গালী রমণীরা যতই পাশ করুন না কেন, যতই বিদ্যা-শিক্ষা করুন না কেন, কবিতা ও নভেলেই মুগ্ধা আছেন—গৃহস্থালীর কিসে উন্নতি হয় বা শারীরতত্ত্ব কি, জানেন না। কাযেই বাঙ্গালীর ছেলেরা নিত্যই দুর্ব্বল, নিত্যই রুগ্ন, নিত্যই স্বল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে।

এই দোষ অপনোদনের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য অনেক। সেগুলির শুধু উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। (১) প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে হইবে যে, ধাপে-ধাপে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছে। (২) আমাদিগকে অহর্নিশই মনে রাখিতে হইবে, আমরা কতটা অজ্ঞান এবং আমাদিগের শিখিবার ও জানিবার কত আছে। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বারম্বার ও রীতিমত ভাবে দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীর-বিধানতত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষা জাতীয়-শিক্ষায় পরিণত হওয়া উচিত। (৩) দেশ হইতে ম্যালেরিয়াকে সমূলে উৎপাটিত করিতেই হইবে। (৪) দেহ ও মন পেষণকারী বর্ত্তমানকালের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে। (৫) সম্ভবমত পল্লীজীবনকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। (৬) রীতিমত খেলা ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত না রাখিলে কোনও বিদ্যালয় থাকিতে দেওয়া হইবে না, এরূপ সর্ত্তে বিদ্যালয়গুলিকে বাধ্য করিতে হইবে। (৭) ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে সমাজকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। "বাদাম তৈলে ভাজা খাবার", "জলমিশান দুগ্ধ" প্রভৃতির সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। খাদ্যের বিশুদ্ধতা সর্ব্বথা রক্ষণীয়, বিকৃত খাদ্য একেবারে বর্জ্জনীয়। উভয়ের মধ্যে রফা করা চলিবে না। উভয়ের মধ্যে গো-চারণের মাঠ রাখিয়া, গোজাতির উন্নতি সাধন করিয়া, দেশে ঘৃত ও গো-দুগ্ধ সুলভ করিতেই হইবে। (৯) গ্রামে-গ্রামে বিদ্যালয় ও বেসরকারী আতুরাশ্রম থাকিবে, ব্যায়াম-চর্চ্চার স্থান, কৃষি বা শিল্পশিক্ষার স্থান থাকিবে। (১০) জনসাধারণে যাহাতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হন, সেই উদ্দেশ্যে ও যাহাতে চিকিৎসকগণ অবাধে সমাজে নানারূপ স্বাস্থ্যহিতকর কার্য্যে সর্ব্বত্রই

নিযুক্ত থাকেন, এরূপ করিতে হইবে। (১১) সমবায় (Co-Operative) প্রথানুসারে নানারকমের শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যের যৌথ সমিতি স্থাপিত করিয়া, গ্রামে-গ্রামে নিরন্নকে, দুঃস্থকে ও দরিদ্রকে সাহায্য করিতে হইবে। এতগুলি করিলে তবে বাঙ্গালীর ছেলেরা পুনরায় স্বাস্থ্যবান্ হইবে। কায অনেক বলিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। সকল কাজই আমাদিগের একার চেষ্টায় হইবে না, এরূপ কল্পনা করিলেও চলিবে না। আমরা আগে যেমন সাদাসিধা চালে থাকিয়া মহৎ অনুষ্ঠান নীরবে করিয়া যাইতাম, এখন তেমনিই আড়ম্বর-বাগীশ হইয়া উঠিয়াছি। গরীবের দেশে সে চাল ভাল নহে, পুরা সাদাসিধা মানুষ হইয়া, আড়ম্বর ভুলিয়া গিয়া প্রত্যেকেই নিজ-নিজ সময়, অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া, কায করিয়া যাইতে হইবে—তবেই সুবর্ণ সুযোগ আসিবে, নতুবা নহে। "উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

সমবায় দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন

(মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতার মর্ম্ম)

১৯১৭ সালে বঙ্গদেশে হাজার করা ২৬.২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১২-১৭ এই পাঞ্চ বার্ষিক মৃত্যুহার ৩০.২। ১৯১৭ সালের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও ঐরূপ মৃত্যুহার অতি শোকাবহ। পল্লীর অবস্থা শোচনীয় তথায় মৃত্যু সংখ্যা সহর হইতে অধিক। ১৯১৭ সালে পল্লী সমূহে এক মাত্র জ্বরে হাজার করা ২০৩ জন মরিয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা যখন এইরূপ তখন ম্যালেরিয়া জ্বরে কত লোক আক্রান্ত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কত লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছে আমরা উহার সংখ্যা জ্ঞাত নহি, তবে যত লোক হয় উহার অষ্টম বা দশমাংশের মৃত্যু হয় ইহা মনে করা যায়। সাধারণতঃ অক্টোবর হইতে জানুয়ারী এই কয় মাসে ম্যালেরিয়া জ্বরে বেশী সংখ্যক লোক মরে। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অঞ্চলে অর্দ্ধেক বা তিন ভাগের একভাগ লোক রোগাক্রান্ত হয়। এই ব্যাধির আক্রমণে অনেকেরস্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, তাহাদের হঠাৎ মৃত্যু না হইলেও উহারা পেট ভরা প্লীহা লইয়া কতিপয় বর্ষ পৃথিবীতে অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইহার ফলে যেমন ব্যক্তির তেমন সমাজের জীবনে গভীর অবসাদ আসিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া ব্যাধির জন্য বাঙ্গালীর কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইতেছে কেহ যদি সেই হিসাব করেনত দেখিতে পাইবেন যে ঐ আর্থিক ক্ষতি অসীম। আমি এক সময়ে বঙ্গীয় কৃষকদের আয় গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলাম উক্ত আয় ৫০ কোটি হইতে পারে। কিন্তু ইহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারিলে এই আয় ২০ কোটি হওয়া সম্ভব। ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে বাঙ্গালীর গড় পরতা আয় ২৫ বৎসরে কম হইয়াছে। গড় আয়ুর সংখ্যা দ্বারা হয়ত বক্তব্য স্পষ্ট প্রকাশিত হইল না। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে যথার্থ অবস্থা বুঝা যাইবে:—

বঙ্গদেশে ১ লক্ষ পুরুষ মধ্যে ৭১ হাজার লোক ৩০ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মরিয়া থাকে। প্রায় ৮৫ সহস্র ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে প্রায় ৯৩০০০০৫ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে মরে।

যাহারা ম্যালেরিয়া এবং ঐরূপ নিবার্য্য ব্যাধিতে মরিতেছে তাহাদের পক্ষে কি সামাজিক, রাজনৈতিক বা শিক্ষাবিষয়ক কোন মহৎ কার্য্য সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে?

দুর্গতি মোচনের উপায় কি?

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উক্ত অকল্যাণ নিবারণের উপায় কি? কেহ বলেন সহৃদয় বদান্য ব্যক্তিদের দানের দ্বারা ইহার প্রতীকার করা যায়। কেহ কেহ বলেন, এত বড় বৃহৎ সমস্যা গভর্মেণ্ট ভিন্ন আর কেহ সমাধান করিতে পারিবেন না। আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, গভর্মেণ্ট বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই অমঙ্গল কিছুতেই সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইতে পারিবে না। কার্য্যের বিপুলতার সম্মুখে গভর্মেণ্টের সাহায্য এবং দয়ালুদের দান অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে। বঙ্গদেশের পল্লীসমূহে ৬৮ বর্গ মাইল স্থলে ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক বাস করিতেছে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

সর্ব্ব প্রথমে আলোচনা করা যাউক যে, সমৃদ্ধদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দানের দ্বারা বঙ্গের সকল স্থলে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে পারে কিনা। তিন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে দান আশা করা যায়। (১) সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী (২) সমৃদ্ধ বণিক (৩) সমৃদ্ধ অপর ব্যবসায়ী। ভূম্যধিকারীদের কথা আলোচনা করা যাউক। এখন বঙ্গদেশে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫ জন গভর্মেণ্ট রাজস্ব প্রদান করেন। বঙ্গীয় রাইয়তেরা মোট ১২॥ কোটি টাকা খাজনা দিয়া থাকেন। গভর্মেণ্ট উহার মধ্যে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব পান। সুতরাং ভূম্যধিকারীদের মোট আয় ৯ কোটির কিছু বেশী। মোট ষ্টেট ও জোত সংখ্যা প্রায় ২৯ লক্ষ। সুতরাং ভূম্যধিকারীর আয় গড় পরতা বার্ষিক ৩০ টাকা। ইহা শুনিতে যতই বিস্ময়কর হউক, অবস্থা এইরূপই। ইহার মধ্য হইতে যদি আবার রাজা মহারাজাদিগকে বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে আয় আরও কম হইবে। বলিতে পারেন যে, এই গড় আয়ের সহিত আমাদের কিছু সংশ্রব নাই, আমরা ধনী ভূস্বামীদের নিকট হইতেই সাহায্য পাইব। হাঁ, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দানের অধিকার বঙ্গদেশের ৩.৪ শত ভূম্যধিকারীর ন্যূন কল্পে যাঁহার ৮ কি ৯ হাজার টাকা বার্ষিক আয় তিনিই ভোট দিবার অধিকারী। সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে বিস্তর দান পাইবার আশা কল্পনা মাত্র।

বঙ্গদেশে ১২ শত বণিক ও অপর ব্যবসায়ী বার্ষিক ১০ সহস্র ও তদূর্দ্ধ টাকা আয়ের উপর আয়কর দিয়া থাকেন। ইহারা নানা কার্য্যে অর্থ দিতেছেন। ইহাদের আয় হইতে এই কার্য্যে যাঁহা পাওয়া যাইবে উহা কোন ক্রমে যথেষ্ট হইবে না। গত আদম সুমারী হিসাব মতে বঙ্গদেশে ৯৭৫০ জন আইন ব্যবসায়ী আছেন। ইহাদের মধ্যে কাজী, মোক্তার, এজেণ্ট প্রভৃতিও ধরা হইয়াছে। সুতরাং যথার্থ আইন ব্যবসায়ী ৬॥ হাজার হইবে। উহাদের মধ্যে শতকরা ১০ জনে বৎসর ৬৷৭ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে বিস্তর দান পাওয়া যাইবে মনে হয় না। ১৯১৪ সালের চিকিৎসা আইন মতে বঙ্গদেশে প্রায় ৩ সহস্র চিকিৎসক তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সুতরাং ইহাঁদের তেমন আয় হয় না। অধিক আয় করেন এমন চিকিৎসক অতি অল্প। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এক মাত্র দাতব্যের আয় দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

সরকারী সাহায্য।

১৯১৬-১৭ সালে গভর্মেণ্ট "স্বাস্থ্যরক্ষার" জন্য ৪ লক্ষ এবং "চিকিৎসা"র জন্য ২৩॥ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গত বৎসর গভর্মেণ্ট এই ব্যয় বাড়াইয়াছেন। এই বৎসর হয়ত আরও বাড়াইবেন। কিন্তু এই কয় লক্ষ টাকায় এত বড় বৃহৎ সমস্যার সমাধান হইবে? বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের আয় ব্যয় যাহারা জানেন তাহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন যে, সাধু ইচ্ছা থাকিলেও গভর্মেণ্ট সুবিস্তৃত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বহনে অসমর্থ!

জনমণ্ডলী।

ধনীর দানে বা গভর্মেণ্টের সাহায্যে যে কার্য্য হইবে না, কে সেই মহৎ কার্য্যের ভার লইবে? জনমণ্ডলী যদি প্রকৃষ্ট পথে কার্য্য করে তাহা হইলে তাহারাই এই

দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে। এই মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য সকলকে হাত ধরাধরি করিয়া মিলিত হইতে হইবে; কল্যাণ কামনায় প্রসন্ন চিত্তে এই কার্য্যে প্রত্যেকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ও শক্তি দান করিবে। এই সমবায়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার আছে; কিন্তু সেই সামান্য ত্যাগ স্বীকারের সুফল পাইবার জন্য যদি লোক সাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে পারে, তাহা হইলে কালক্রমে উহার অসামান্য উপকার প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারাই বিস্মিত হইবে।

কার্য্য পদ্ধতি।

বঙ্গদেশে ১৭৫৮টা গ্রামে ২ হইতে ৫ সহস্র লোক বাস করে। ১৭৫৮টা গ্রামের মোট অধিবাসী সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ২০৯। এতদ্‌ভিন্ন ১৬২টা নগর গ্রামে ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪২২ জনের বাস। উক্ত ১৬২ নগর ও পল্লী মধ্যে অনেক গুলিতে মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে সকল গ্রামে ২ হইতে ১০ হাজার লোক বাস করে সেই সকল স্থলে সমবায় প্রণালীতে স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান করা যাইতে পারে। যে সকল গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা ৫ শত হইতে ১ সহস্র বা উহার কম সে সকল স্থলে কোনরূপ ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। যে সকল পল্লী লোকবহুল সেই সকল গ্রামে প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করা সহজ। সেই সকল স্থলে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া প্রশমনের আয়োজন করা হউক। যে গ্রামে ৫ সহস্র লোকের বসতি সেই স্থলে ১ কি দুই বৎসর সমবায়ের উপকারিতা প্রচার করিলে সমবায় সমিতিতে ২ শত সভ্য পাওয়া যাইতে পারিবে। সমবায় সমিতির প্রারম্ভ সময়ে অবশ্য সভ্য সংখ্যা অল্প হইবে। সমিতির প্রথম শ্রেণীর সভ্য মাসিক ১২ আনা হইতে ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য ৬ আনা হইতে ৮ আনা, তৃতীয় শ্রেণীর সভ্য ৩ আনা হইতে ৪ আনা চাঁদা দিবেন। এই চাঁদার হার স্থানীয় লোকের অবস্থার উপর নির্ভর করিবে।

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণ বিনা দর্শনীতে চিকিৎসক এবং কেনা দরে ঔষধ পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ চিকিৎসকের বাড়ী যাইয়া তাহাকে বিনা দর্শনীতে রোগী দেখাইতে পারিবেন, অসুস্থ মহিলাদের এবং কঠিন রোগীকে চিকিৎসক বাড়ীতে যাইয়া বিনা ব্যয়ে দেখিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ চিকিৎসককে অযথা বাড়ীতে না ডাকেন, এই জন্য প্রত্যেক বারে তাহারা ডাকিলেই ৩ কি ৪ আনা দর্শনী দিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইহারাও কেনাদামে ঔষধ পাইবেন। তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যগণ বৎসরে ২ কি ৩ মাস দ্বিতীয় শ্রেণীয় সভ্যদের সমান অধিকার পাইবেন। যাহারা কার্য্যগতিকে বিদেশে থাকেন, কেবল বৎসরে ২।৩ মাসের জন্য দেশে যান তাহারাই এই শ্রেণীর সভ্য হইবেন। ইহা ছাড়া সভ্যগণ প্রত্যেক দুই কিস্তিতে ৩ কি ৪ টাকা প্রবেশিকা চাঁদা দিবেন। সভ্যগণ যদি মাসিক চাঁদা প্রদান না করেন তবে তাহাদের প্রবেশিকা হইতে উহা কাটিয়া লওয়া হইবে। সভ্যগণের প্রাপ্য সমস্ত অধিকার হইতে ইহারা বঞ্চিত হইবে। ১ কি ২ বৎসর এইভাবে কার্য্য করিতে পারিলে সমিতির মাসিক আয় ১৫০ হইতে ২০০ হইবে। প্রথমে আয় অতি সামান্যই হইবে। ৫০ হইতে ৭৫ টাকা হয়ত উঠিবে। ইহার একভাগ চিকিৎসক ও তাহার সহকারীর বেতনে, একভাগ চিকিৎসালয়ের সংস্থানে, তৃতীয়াংশ ম্যালেরিয়া দমনে এবং কিঞ্চিৎ ঋণশোধ ও গৃহনির্ম্মাণার্থ রক্ষিত হইবে। যাহারা সমিতির সভ্য নহে, চিকিৎসক তাহাদের মধ্যে ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে এবং তাহাদের নিকট উপযুক্ত মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

ম্যালেরিয়া দমনের জন্য যে অর্থ থাকিবে উহার দ্বারা (১) জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেই স্থলে উপযুক্ত শস্য বপন (২) গ্রামের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা (৩) পচা পুষ্করিণী ও ডোবা ভরাট (৪) চিকিৎসক উপদেশ করিলে পানীয় জল বৈজ্ঞানিক প্রণালী ক্রমে সংশোধন করিয়া পানযোগ্য করিবার ব্যবস্থা (৫) পচা পুষ্করিণী ও ডোবা ভরাট করিবার অর্থ যতদিন না হইবে ততদিন ঐ সকলের জল

শোধনের ব্যবস্থা (৬) ফুটান জল ব্যবহার প্রচলন এবং চিকিৎসালয়ে বা চিকিৎসকের বাড়ীতে অল্প মূল্যের শোধন যন্ত্রে জল শোধন ব্যবস্থা এবং (৭) স্বাস্থ্যনীতির প্রচার করিতে হইবে!

উল্লিখিত কর্ম্ম পদ্ধতি মধ্যে কোন্ কার্য্যে কত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে আমি তাহা নির্দ্দেশ করি নাই, কারণ উহা স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। যে গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই সেই গ্রামে চিকিৎসক নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপ গ্রামে সমিতির আয়ের শতকরা ৪৫ চিকিৎসকের বেতন হইবে, চিকিৎসক সমবায় সমিতির সম্পাদকের কার্য্যও করিবেন। শতকরা ১০ চিকিৎসকের সহকারীর বেতন হইবে, তিনি সমবায় সমিতির মুহুরীর কার্য্যও করিবেন। শতকরা ৫ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয়িত হইবে। শতকরা ২৫ ম্যালেরিয়া দমন কার্য্যে ব্যয় হইবে। শতকরা ১৫ ঋণশোধ ও গৃহ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে। সমবায় সমিতি অন্য ব্যক্তিদের দান এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার হইতেও সাহায্য পাইবেন। প্রবেশিকা হইতে যে ৪ কি ৫ শত টাকা পাওয়া যাইবে উহা দ্বারা চিকিৎসালয় স্থাপন কার্য্য চলিবে। যদি কোন সমিতি প্রবেশিকা হইতে ঐ পরিমাণ অর্থ না পান তাহা হইলে ঐ সমিতি কি ৩ শত টাকা ধার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সভ্য সংখ্যা যেমন বাড়িবে ঋণ তেমন শোধ করা হইবে। সুদের টাকাটা ঋণশোধ বা গৃহ নির্ম্মাণ জন্য রক্ষিত অর্থ হইতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে সকল গ্রামে চিকিৎসক আছেন সেই সকল গ্রামে স্থানীয় লোককেই নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শতকরা ৩৫ বেতন দিলেই চলিবে, কেন না বাহিরে ব্যবসায় চালাইবার অধিকার তাঁহার থাকিবে। সমিতির সভ্য সংখ্যা যদি অধিক হয় এবং ব্যবসায় করার অসুবিধা ঘটে তাহা হইলে বেতন বাড়াইতে হইবে।

ক্ষুদ্র পল্লীর ব্যবস্থা।

বঙ্গের পল্লীবাসী ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক মধ্যে কেবল ৬০ লক্ষ লোক জনবহুল পল্লীতে বাস করে। বৃহৎ পল্লী সমূহে সমবায় সমিতি স্থাপিত হইলে ক্ষুদ্র পল্লী সমূহের অসুবিধা দূর হইতে পারিবে। কারণ পার্শ্ববর্ত্তী ছোট পল্লী বা পল্লী সমূহ বৃহৎ পল্লীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এইরূপ সমবায় সমিতি স্থাপনে যাঁহাদের যথার্থ আগ্রহ হইবে তাঁহারা উহার কার্য্য প্রণালী দেখিবার জন্য ২৪শ পরগণার সৈদপুর, সুকচর এবং পনিহাটী গমন করিলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসিতে পারেন। ঐ সকল সমিতি প্রধানতঃ রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে পরিচালিত হইতেছে।

চিকিৎসার সুবিধা।

ইহা স্বীকার্য্য যে, সাধারণ লোকের মনে এমন জনহিতৈষিণা নাই যে স্বাস্থ্যোন্নতির নামে তাহাদিগকে সমবায় সমিতির সভ্য করা যাইতে পারিবে। কিন্তু নাম মাত্র ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া বাস্তবিকই মহদুপকার উহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঐ সুযোগের জন্য যখন লোক সমবেত হইবে তখন তাহারা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবিধি অর্থ এই যে, উহা প্রবর্ত্তন দ্বারা নিবার্য্য ব্যাধি প্রশমন ও রোগ নিবারিত হইলে লোক স্বাস্থ্যবিধির সুফল স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

গরীবের চিকিৎসা।

আমি যে কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছি উহা কার্য্যে পরিণত হইলে পরোক্ষভাবে বহু সুফল ফলিবে। ইহার দ্বারা দরিদ্রতর মধ্যশ্রেণীর লোকের উদরান্ন সংস্থানের কিয়ৎপরিমাণ সুবিধা হইবে। যাহারা এখন কেরাণীখানা-গুলির ভিড় বাড়াইয়া অপ্রয়োজনীয় জীবন বহন করিতেছে তাহাদের কেহ কেহ পল্লীগ্রাম গমন করিয়া লোকের কাজে লাগিয়া যাইতে পারিবে। এখন বঙ্গদেশে ত সহস্র তালিকাভুক্ত চিকিৎসক আছেন, উহাদের মধ্যে দুই সহস্রই মিউনিসিপাল এলাকায় আছেন। সেই এলাকায় লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ সুতরাং অবশিষ্ট ৪ কোটি ২ লক্ষ পল্লীবাসীর জন্য কেবলমাত্র শিক্ষিত ১ সহস্র চিকিৎসক আছেন। একজন চিকিৎসকের অংশে গড়পরতা ৪২ সহস্র লোক পড়ে। ইউরোপে একজন চিকিৎসক ১২

শত হইতে ২ সহস্র লোক চিকিৎসা করেন। তারপর বঙ্গদেশ হইতে ইয়ুরোপের স্বাস্থ্য কত উত্তম। সুতরাং এই দেশে চিকিৎসকের ভীষণ অভাব আছে। একজন চিকিৎসকের উপর যদি ৩০০০ লোকের চিকিৎসাভার অর্পিত হয় তাহা হইলেও বঙ্গের পল্লী সমূহে ১৪ সহস্র চিকিৎসক চাই। এতন্মধ্যে ১ সহস্র আছে, ১৩ সহস্র চিকিৎসক আরও দরকার।

পল্লীগ্রামে শিক্ষিত লোকের একান্ত অভাব। এই প্রেসিডেন্সীতে ১৫ সহস্র উপাধিধারী এবং ৮০ হইতে ৯০ সহস্র মেট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ লোক আছেন। ইহাদের অধিকাংশই মিউনিসিপাল এলাকামধ্যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চেষ্টিত হন। এই জন্যই আফিস আদালতে ভিড় হয়। মধ্যশ্রেণীর দরিদ্রেরা কার্য্য পাইতেছে না। এই দিকে এমন ভিড়, অন্যদিকে পল্লীসমূহে শিক্ষিত লোক আদৌ নাই। পল্লীগ্রামে যদি শিক্ষিতেরা না থাকেন তাহা হইলে গ্রামের স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নতির ব্যবস্থা কিরূপে হবে? পল্লীগ্রামে চিকিৎসকদের জন্য কর্ম্ম সৃষ্টি করিতে যেমন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে, তেমনই গ্রামে কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষিত লোকের আমদানী হইবে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিকতত্ত্বালোচনা।

আমাদের যদি এমন সৌভাগ্য হয় যে, ৩ কি ৪ বৎসর মধ্যে বঙ্গদেশে এইরূপ ৩০০ কি ৪০০ সমিতি স্থাপিত হয় তাহা হইলে পল্লীর চিকিৎসকদের সাহায্যে নানা ব্যাধি ও প্লীহা রোগীর হিসাব প্রস্তুত হইতে পারে। ঐ সকল হিসাব স্বাস্থ্য বিভাগের গবেষণার সহায় হইবে।

সমবায়ে শিক্ষিতের সহানুভূতি।

এখন সমবায় সমিতি সমূহ কৃষকদিগকে ঋণদা করিতেছেন। ভদ্র শ্রেণীর লোকদিগের সহিত এ আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় নাই। অবশ্য ভদ্র শ্রেণীর লোকদিগের সহিত আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতা স্থাপি হয় নাই। অন্যান্য ভদ্রশ্রেণীর কর্ম্মচারী আছেন। আ যেরূপ সমিতি স্থাপনের কথা বলিলাম উহাতে কৃষক ভদ্র সকলের সহানুভূতি সমভাবে আকৃষ্ট হইবে এতদ্দ্বারা এই প্রদেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্বায়ত্ত শাসনের সুশিক্ষা।

এইরূপ আন্দোলন দ্বারা স্বায়ত্ত শাসনের সুশি কার্য্যতঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জনমণ্ডলী আপনা হিতকর কার্য্য আপনারা সাধন করিতে শিখি তাহারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ক করিলে কিরূপ সুফল পাওয়া যায় উহা প্রত্যক্ষ করি এই জ্ঞানকেই আমি স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি ব মনে করি।

আত্ম নির্ভর।

এতদ্দ্বারা আত্ম নির্ভরের শুভ ফল শিক্ষা কা উপকৃত হইবে। তাহারা দেখিবে ধনীরা যাহা পা না, গভমেণ্ট একাকী যাহা করিতে সমর্থ ন পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করিয়া সমবায় লোক সাধারণ সেইরূপ কঠিন কার্য্য সাধন ক পারিতেছে।

তেঁতুল

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্ত কুমার চৌধুরী

তেঁতুলের সংস্কৃত নাম তিন্তিড়িকা। আয়ুর্ব্বেদীয় নাম যথা :—

"অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপি চ।
অম্লাচ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়িকা চ তিন্তিড়ী॥"

পশ্চিম প্রদেশে ইহাকে আম্লি বলে। ইংরেজ ইহাকে ট্যামারিণ্ড Tamarind বলে।

বাঙ্গলা দেশের প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই দুই একটী গাছ আছে। এই গাছ দীর্ঘ দিন

থাকিয়া প্রচুর ফল প্রদান করে। পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ইহার তত আদর ছিলনা। যে গৃহস্থের যত গুলি দরকার সে তত গুলি গাছ হইতে পাড়িয়া রাখিয়া দিয়া যাহার বাড়ীতে গাছ নাই সে অন্য বাড়ীর গাছ হইতে বিনামূল্যে গ্রহণ করিত। কিন্তু কাল ক্রমে ইহা বিদেশে রপ্তানি হইতে আরম্ভ হওয়ায় ইহা একটী আয়কর ফলবান বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বিশুদ্ধ পাকা তেঁতুল হাটে বাজারে এক্ষণে দুই হইতে চারি পয়সা সের মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

তেঁতুল সাধারণতঃ দুই প্রকার দৃষ্ট হয় অপক্কাবস্থায় পক্ক হইবার কিছু পূর্ব্বে, এক প্রকারের অভ্যন্তর লোহিতবর্ণ এবং অপর প্রকার শ্বেত বর্ণ বা হরিদাভ দৃষ্ট হয়। লোহিতাভ তেঁতুল দ্বারা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলে উহার বর্ণ হইয়া থাকে। উভয় প্রকার তেঁতুলই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ইহাতে সাইট্রিক এসিড, টার্টারিক এসিড, ম্যালিক এসিড এবং ক্রিম অব টার্টার আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে শর্করা ও মিউসেলেজ আছে। এজন্য ইহার আস্বাদ অম্ল মধুর।

তেঁতুল মৃদু বিরেচক ও শৈত্যকারক। ইহার মৃদু বিরেচক শক্তি ক্রিম অব টার্টারের উপর নির্ভর করে। ইহাতে সাইট্রিক এসিড থাকায় শৈত্যকারক।

দরিদ্র বঙ্গবাসীর ভোজন পাত্রের এক পার্শ্বে লবণ এবং অন্য পার্শ্বে তেঁতুলই আহারের প্রধান উপকরণ সামগ্রী। নানা প্রকার তরকারী সহযোগে ও মৎস্য সহযোগে মিষ্ট দ্বারা ইহার সুস্বাদু অম্ল প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই প্রতি রোজ নানা প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই প্রখর গ্রীষ্মের সময় ইহা অত্যন্ত মুখ রোচক। যাহারা রৌদ্রে কাজ করে তাহাদের অতি উপাদেয়। অন্য কোন উপকরণ না থাকিলেও শুধু লবণ ও তেঁতুল দ্বারা তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ পুরিয়া অন্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে। মৎস্য ও মাংস, ঘৃত পক্ক অন্ন ভোজনের পর তেঁতুল বড়ই তৃপ্তিকর, উপকারীও বটে। হিন্দু শাস্ত্রে ভাদ্র মাসে কাঁচা তেঁতুল ও গ্রীষ্মের রাত্রে পোড়া তেঁতুল সেবনের ব্যবস্থা আছে।

ভাদ্র মাসে কাঁচা তেঁতুলের অম্বল সুস্বাদু মুখরোচক ও অরুচি নাশক। ভাদ্র মাসে কাঁচা তেঁতুলের অম্বল অথবা কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া তন্মধ্যস্থ নরম সার এদেশে প্রায় লোকেই আহার করিয়া থাকে। তেঁতুল পত্রের অম্বলও নানা প্রকারে উপকারী এবং বঙ্গ দেশে তাহার যথেষ্ট আদর। পরিপাক ও পুরাতন তেঁতুল সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

পরিপক্ক তেঁতুল, দীপক, অগ্নিবৃদ্ধি কর, উষ্ণ, কফঘ্ন, বাত নাশক এবং শুক্রাদি বৃদ্ধিকর।

"অম্লিকাম্লা গুরুর্ব্বাতহরী পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্কা তু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥"
[ভাবপ্রকাশ।

এতদ্ব্যতীত রাজ বল্লভ গ্রন্থে ইহার আরো কয়েকটী গুণের উল্লেখ আছে। তেঁতুলের একটি প্রধান গুণ ইহা মুখের অত্যন্ত রুচি জন্মায়। তেঁতুলের বিরেচন শক্তিও অসাধারণ। তেঁতুলের সরবৎ অনেকেই পান করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদোক্ত মতে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে আরো বেশী উপকার হয়।

অম্লিকায়াঃ ফলং পক্কং মর্দ্দিতং বারিণা দৃঢ়ম্।
শর্করা মরিচোন্মিশ্রং লবঙ্গৈস্তু সুবাসিতং॥

এবং এই সরবতের গুণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছেঃ—

"অম্লিকা ফল সম্ভূতং পানকং বাতনাশকম্।
পিত্ত শ্লেষ্ম করং কিঞ্চিৎ সুরুচ্যং বহ্নিবোধকম্॥"

অনেকে কোষ্ঠ বদ্ধ রোগের প্রতিকার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ নিয়ম মত তেঁতুলের সরবত ব্যবহার করিয়া থাকেন। তেঁতুলের সরবতে স্থান বিশেষে জ্বর বিকার পর্য্যন্ত ভাল হইতে দেখা যায়। নানাবিধ চিকিৎসায় কোনরূপ ফল প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে "হরি বোল" হইয়া কেবল তেঁতুল গোলা পান করিয়া অনেকে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ

করিয়াছি। কঠিন শিরঃপীড়ায় তেঁতুলের সরবতে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার নিবারণ হইতে আমরা দেখিয়াছি। অনেক ইংরেজ এদেশে আসিয়া তেঁতুলের সরবতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা জানি কোন কোন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী রাত্রে আহারান্তে শয়নের সময়, কেহ বা প্রাতে ইহা পান করেন। তাঁহারা তেঁতুলের সার বা Extract এক কিম্বা দুই তোলা এক গ্লাস শীতল জলে ভিজাইয়া তাহার মধ্যে খানিক সিরাপ (Syrup) এবং দুই তিন ফোটা লেবুর আরক (Essence of Lemon) ও অল্প পরিমাণ সেরি মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকেন। যাঁহাদের শরীরে মেদের অংশ অধিক তাঁহারা মধুর সহিত তেঁতুলের ক্বাথ ব্যবহার করিলে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যক্ষ্মা ও ব্রঙ্কাইটিস রোগে বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় যে এক প্রকার পুরাতন কাশী হয়, তাহাতে পুরাতন তেঁতুল গুড়ের সহিত সেবন করিলে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বহির্গত হইয়া উপকার দর্শায়।

জ্বরাদি রোগে ইহা শৈত্যকর ও মৃদু বিরেচনের কার্য্য করে। যে সকল জ্বরে শরীরে দাহ ও পিপাসাধিক্য থাকে তাহাতে এক আউন্স বীজ শূন্য তেঁতুল দশ আউন্স গরম জলে ভিজাইয়া তাহার সহিত মিছরি যোগে শীতল হইলে পান করিতে দিলে ঐ সকল উপসর্গ প্রায় ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হইয়া থাকে।

এক আউন্স তেঁতুল অর্দ্ধসের দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া মোহন ভোগের ন্যায় ঘন হইলে দুই চামচ পরিষ্কার চিনি সহ পাক করিয়া শীতল হইলে, উহা আহার করিলে এক দিকে যেমন রসনার তৃপ্তিকর হইবে, অন্য দিকে বিবেচন কার্য্যেরও যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইংরেজীতে ইহাকে Tamarind Whey বলে।

অনেকে এক প্রকার শূল রোগে কষ্ট পাইয়া থাকে তাহাতে প্রায়ই কোষ্ঠ অপরিষ্কার থাকে তাহাদের পক্ষে ঐ প্রকার "তেঁতুল-ভোগ" দীর্ঘ দিন ব্যবহার করিলে ব্যাধি সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে।

কতক দিনের পুরাতন তেঁতুল কোষ্ঠের কাঠিন্য উপস্থিত করিয়া থাকে। কদলি সহ এইরূপ পুরাতন তেঁতুল সেবনে মিউকাস-ডায়রিয়া ও পুরাতন আমাশয় আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

কোনরূপ ধাতু বিষ উদরস্থ হইলে, তেঁতুল গুলিয়া সেবন করাইলে বিষদোষ নষ্ট হইয়া যায়।

তেঁতুলের ফুল উষ্ণজলে ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে, প্লীহা ও যকৃতের উপকার হয়।

কোমল তেঁতুল পত্রের ক্বাথ আমাশয় রোগের উপকারী। আয়ুর্ব্বেদে তেঁতুলের পাতায় বেদনানাশক শক্তির উল্লেখ আছে। যথা—অস্যাঃ পত্রস্য গুণঃ—"শোথরক্তদোষব্যথা নাশিত্বম্।" জণ্ডিস (Jaundice) বা কাওল (ন্যাবা) রোগে তেঁতুল পত্রের ক্বাথ সেবনে উপকার দর্শে।

তেঁতুল গাছের ত্বকে অনেক পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে লিখিত আছে—"অস্যাঃ শুষ্কত্বক্ ক্ষারস্তগুণঃ শূলমন্দাগ্নি-নাশিত্বম্।" শুষ্ক তেঁতুলের বল্কল দগ্ধ করিলে যে ক্ষার প্রস্তুত হয় ঐ ক্ষার এক বা দুই ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে অম্লজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। পাকস্থলিতে অম্লাধিক্য হইয়া পাক কৃচ্ছ্র রোগ উপস্থিত হইলে ঐ ক্ষার সেবনে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

গলা বেদনায় তেঁতুলের কাঁচা ত্বক সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা কবল করিলে উপকার হয়।

ক্ষত রোগে তেঁতুল গাছের আঠার চূর্ণ মহৌষধের ন্যায় কার্য্য করে।

স্থানিক বেদনা নিবারণার্থ ও কোনস্থানে মচকাইয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে তেঁতুলের প্রলেপ আশ্চর্য্যরূপে বেদনা নিবারণ করিয়া থাকে।

স্ফোটক ও বাগি ফাটানুর জন্য তেঁতুলের প্রলেপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

পাকুই রোগে কাঁচা তেঁতুল দগ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে উহার যন্ত্রণা শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়।

তেঁতুলের বীজের শ্বেত অংশের চূর্ণ উষ্ণজলে মিশ্রিত করিয়া কাই প্রস্তুত করতঃ স্ফোটকে দিলে স্ফোটক পাকিয়া গলিয়া যায়।

দুর্ভিক্ষাদি সময়ে দরিদ্রলোককে তেঁতুলের বীজেরশাঁস আহার করিতে আমরা দেখিয়াছি। বীজের শাঁস ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিতে নিতান্ত মন্দ নহে।

ঔষধরূপে তেঁতুলের যত প্রকার ব্যবহার এবং উপকারিতার বিষয় যতরূপ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এ পর্য্যন্ত তাহাই উল্লেখ করা হইল এক্ষণে বাণিজ্য ব্যবসাদি কার্য্যে তেঁতুলের উপকারিতার বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

তেঁতুলের কাষ্ঠ শক্ত ও তৈলাক্ত সেজন্য জ্বালান কার্য্যে ইহা বিশেষ উপযোগী। অন্য কাষ্ঠ অপেক্ষা বাষ্প প্রস্তুত কার্য্যে ইহার আদর অধিক। বারুদ প্রস্তুত জন্য তেঁতুল কাষ্ঠের কয়লাই প্রশস্ত এবং ইটের পাজা পোড়াইতে অন্যান্য কাষ্ঠ অপেক্ষা তেঁতুল কাষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। জল পরিষ্কারের ফিলটার যন্ত্রে তেঁতুল কাষ্ঠের কয়লাই ভাল।

ইহার কাষ্ঠ অধিক শক্ত বলিয়া অনেক কলের চাকার দাঁতগুলি তেঁতুল কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তেঁতুল পাতার ক্বাথ মধ্যে রেশম বা পট্টবস্ত্র ডুবাইয়া রাখিলে, উহা সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করিলে, তাহা সহজে উঠিয়া যায় না। এজন্য যখন পাকা রং করা আবশ্যক হয়, তখন ইহা ব্যবহার করা হয়। রেশম বস্ত্র বা রেশমের সূতা প্রথমে নীলের মধ্যে ডুবাইয়া নীল রং হইলে, তেঁতুল পাতার উষ্ণ ক্বাথ মধ্যে ডুবাইলে অতি উৎকৃষ্ট সবুজবর্ণ প্রাপ্ত হয়। কাশ্মীর প্রদেশে পশমি কাপড় তেঁতুলের পাতার ক্বাথে রাখিয়া লালবর্ণে রঞ্জিত করা হয়।

তেঁতুল বীজ সিদ্ধ করিয়া তাহার কালবর্ণ আবরণ ফেলিয়া শ্বেত অংশটী শিরীষ সহ মিশ্রিত করিয়া একরূপ আঠা প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ একত্র সংযোগ করিয়া রাখিতে এরূপ উৎকৃষ্ট আঠা অতি অল্পই পাওয়া যায়।

দেশীয় চিত্রকরেরা প্রতিমা বা কাগজে বর্ণ ফলিত করিতে তেঁতুল বীজের ক্বাথ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বর্ণকারেরাও রূপা উজ্জ্বল করণার্থ লবণ এবং তেঁতুল একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

এদেশ হইতে প্রতিবৎসর বিস্তর তেঁতুল বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

এক বিঘা জমিতে তেঁতুলের কৃষি করিলে, ব্যয় বাদে বর্ত্তমান সময়ে একশত টাকা লাভ থাকিতে পারে। এই গাছের ছায়ায় আনারস বেশ জন্মে।

এদেশে প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই প্রতিবৎসর একটী মৃন্ময় পাত্রে তেঁতুল রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ যত্ন পূর্ব্বক রাখা হইয়া থাকে এবং সময় সময় তাহা রৌদ্রে দেওয়া হয় বলিয়া অনেক দিন ভাল থাকে। বেশী পুরাতন হইলে তাহার রং কাল ও অম্লাস্বাদ কম হয় কিন্তু উপকারী অধিক হয়।

পরিপক্ক তেঁতুল একটী পাত্রে রাখিয়া চিনির সেরা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে অনেক দিন ভাল অবস্থায় থাকে।

তেঁতুল গোলা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তৈলের ভিতর রাখিলে সুস্বাদু হয় ও ভাল থাকে।

তেঁতুল গোলা সর্ষপ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে।

তেঁতুল গোলা ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে।

যতপ্রকারে তেঁতুল রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। একটী পাত্রে প্রথমে এক অঙ্গুলি পরিমাণ চিনি রাখিয়া তাহার উপর একস্তর তেঁতুল পরে আর এক স্তর চিনি এইরূপ পরপর সাজাইয়া রাখিলে তেঁতুল সুস্বাদ থাকে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩২৬ সাল | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ সংগ্রহ।

কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা—পৃথিবীতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা মোট ১০ লক্ষ। ভারতের ১৷৷০ লক্ষ লোক এই রোগাক্রান্ত।

মহীশূরে ইনফ্লুয়েঞ্জা—মহীশূর রাজ্যের ১,৬৬,০০০ লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ রোগে জন সংখ্যার শতকরা ২·৯ জন হ্রাস হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের বিস্তার—বর্ত্তমান বৎসর ভারতবর্ষের বহুস্থলে দুর্ভিক্ষ হইবে তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এখনই ২০ লক্ষের অধিক লোক সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে।

হাঁসপাতালে দান—ময়মনসিংহ জিলার রামগোপালপুরের জমিদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ময়মনসিংহ নগরের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাস্পাতালে ২০ সহস্র মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

হুকওয়ার্ম ব্যাধির প্রতিকার চেষ্টা—রাজসাহী সার্কেলের স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার এম, সি, গুপ্ত সংপ্রতি বর্দ্ধমানে থাকিয়া হুকওয়ার্ম ব্যাধি প্রশমনের চেষ্টা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

পুরীতে সর লিওনার্ড রোজার্সের কার্য্য—উড়িষ্যাপ্রদেশের একাংশে লোকের খুব গোদ হয় এবং এক প্রকার জ্বরের ফলে লোকে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল সার লিওনার্ড রোজার্স পুরীনগরে যাত্রী হাস্পাতালে এই ব্যাধির তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কুমারদের উপর ট্যাক্স—ইংলণ্ডের গভর্মেণ্টের খুব টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তাই যাহারা অবিবাহিত তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

কলিকাতায় মদের প্রসার—কলিকাতায় ৬৩টা দেশী মদের এবং ৪১টা বিলাতী মদের দোকান আছে। ইহা ব্যতীত ৮টা হোটেল ও ২০টা ভোজনালয়ে বিলাতী মদ বিক্রয় হয়।

আলোচনা

মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-চিকিৎসালয়—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন যে চক্ষু-চিকিৎসালয় আছে, কলিকাতার ন্যায় প্রকাণ্ড সহরের লোক-সংখ্যার অনুপাতে, উক্ত চক্ষু-হাসপাতালের চিকিৎসার ব্যবস্থা সুপ্রচুর নহে। এই ত্রুটির উল্লেখ করিয়া British Journal of Ophthalmology কিছু অনুযোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, আজকাল স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে চশমার ব্যবহার যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, দৃষ্টি-ক্ষীণতা প্রভৃতি চক্ষু সংক্রান্ত পীড়াও যেন অন্যান্য ব্যাধির ন্যায় সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি, পথে বাহির হইলে, ৫।৭ কিম্বা ৮।১০ বৎসর বয়স্ক চশমাধারী বহু বালক দৃষ্টি-গোচর হয়। এরূপ অবস্থায়, মেডিক্যাল কলেজে চক্ষু-চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচুর বলিয়া মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। সুখের বিষয়। গবর্ণমেণ্ট চক্ষু-চিকিৎসালয়ের প্রসার বৃদ্ধির আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। এতদর্থে ভূমি গৃহীত হইয়াছে, এবং গৃহাদির নক্সাও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এখন কাজ আরম্ভ করিতেই যা বাকী। বস্তুতঃ যুদ্ধ উপলক্ষে মাল-মসলা সংগ্রহের অসুবিধা, উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের অসদ্ভাব প্রভৃতি কারণে, এবং কাজটি বহুব্যয়সাধ্য বলিয়াও বটে— গবর্ণমেণ্ট এখনও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এখন যখন যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, এবং সন্ধিও হইয়া গেল, তখন আশা করা যায়, শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বর্ত্তমানে চক্ষু-চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতেই বৎসরে ৩০০০ রোগীর চক্ষে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয় এবং ১০০০ রোগীর চক্ষুর ছানি কাটিতে হয়। আর অন্যান্য প্রকারের চক্ষু-রোগী, যাহারা বাহির হইতে আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়, তাহাদের সংখ্যাও বৎসরে ২০০০০এর কম নহে। ইহা ছাড়া, যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থার অভাবে অনেক রোগী এখানকার চিকিৎসার সুযোগ লইতে পারে না। চক্ষু-চিকিৎসালয়ের প্রসার-বৃদ্ধির আবশ্যকতা এই বিবরণ হইতেই সম্যকরূপে উপলব্ধ হইবে।

বিলাতে আয়ুর্ব্বেদের আদর—

"এম্পায়ার রিভিউ" নামক একখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, মিঃ এস, এম, মিত্র বিলাতে বোর্ণমাউথ নামক স্থানে আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত প্রণালীতে

চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইতেছেন; এবং অন্য ডাক্তারেরা যে সকল রোগ আরোগ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া জবাব দিতেছেন এমন অনেক জটিল রোগ তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় মতের চিকিৎসার দ্বারা আরাম করিতেছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসকগণের যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হইয়াছিল, তাহাতে হোমিওপ্যাথি মতাবলম্বী চিকিৎসকগণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু এই কংগ্রেসে মিঃ মিত্র ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। এম্পায়ার রিভিউয়ের লেখিকা মিস আইরেন ব্যাকহাউস সংক্ষেপে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, বৈদ্যগণ বিবেচনা করেন যে, রোগ আরাম করিবার প্রণালী দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথমতঃ, মানব-দেহের আভ্যন্তরিক শক্তি; দ্বিতীয়তঃ, বাহিরের শক্তি। অর্থাৎ, প্রথমটি মানসিক ক্রিয়া, এবং দ্বিতীয়টি সূর্য্য ও ঔষধের ক্রিয়া। যে সকল রোগ 'ক্রনিক' বা স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে,—মিঃ মিত্র সেইরূপ জটিল পীড়া আরোগ্য করিতেছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে অসাধারণ শক্তিশালী শেল গোলার বিদারণের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে প্রচণ্ড কম্পন উপস্থিত হয়, তাহারই আঘাতে বহু সৈন্য পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। মিঃ মিত্র সেই "শেল-সক্"-ঘটিত রোগের চিকিৎসা করিতেছেন। লেখিকার মতে, আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টির সময়ে হিন্দু-জগতে এখনকার ন্যায় প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবহার ছিল না। সেই জন্য "শেল-সকের" ন্যায় পীড়ার চিকিৎসা-প্রণালীও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে থাকিবার কথা নহে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থাদিতে শেল-সকের চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকিলেও, ঐ সকল গ্রন্থ হইতেই মিত্র মহাশয় ভূমিকম্প ও ঝটিকাবর্ত্ত জনিত সকের চিকিৎসা-প্রণালী হইতে শেল-সকেরও চিকিৎসা-প্রণালী স্থির করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহার সাহায্যে বর্ত্তমান যুদ্ধে শেল-সক-পীড়িত সেনাগণের চিকিৎসা করিয়া সাফল্য লাভ করিতেছেন। একজন রয়েল আর্ম্মি মেডিক্যাল অফিসার যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, এবং শেল-সক পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। মিঃ মিত্রের চিকিৎসায় ছয় সপ্তাহে আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে সমর্থ হ'ন। মিঃ মিত্র পারদাদিঘটিত বিষ-দোষও নির্দ্দোষ রূপে দূর করিয়া থাকেন। মিঃ মিত্রের চিকিৎসার সফলতা দর্শনে ইংলণ্ডের চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে।

বোম্বায়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা—

বোম্বাই নগর যখন পুনঃ পুনঃ ইনফ্লুয়েঞ্জার দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে, তখন নাগরিকগণের রক্ষার জন্য রোগ-প্রতিষেধের উপায় অবলম্বনার্থ বোম্বাই কর্পোরেশন একটী মেডিক্যাল রিলিফ কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগকে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধ ব্যাপারে সাহায্য করেন। তাঁহাদের সাহায্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, নগরের বেসরকারী ভদ্রলোকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তাঁহারাও আনন্দের সহিত সাহায্যে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে উক্ত মেডিক্যাল রিলিফ কমিটির একটী রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে বেসরকারী ভদ্রলোকদিগের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সাহায্যের অজস্র প্রশংসা করা হইয়াছে। কেবল সাধারণ ভদ্রলোকদিগের ব্যক্তিগত সাহায্য নহে, সোসিয়াল সার্ব্বিস লীগ, হিউম্যানিটেরিয়ান লীগ, হিন্দু মেডিক্যাল এসোসিয়েসন, সেণ্ট জন য়্যাম্বুল্যান্স ব্রিগেড প্রভৃতি সঙ্ঘ হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। এই সকল সঙ্ঘের সদস্যগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রোগিগণকে ঔষধ দান এবং তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মহৎ কার্য্যে কেবল যে পীড়িত ব্যক্তিরা উপকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে; জনসাধারণ তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সেবা-ব্রতে উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া থাকিত। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণকে রোগমুক্ত

করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। সাধারণ বেসরকারী ভদ্রলোক ও সঙ্ঘ এই ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ায় জন সাধারণ পরম আশ্বস্ত হয় এবং মিউনিসিপ্যালিটীর সদিচ্ছার উপর তাহাদের বিশ্বাস জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘসমূহের সাহায্যের এইরূপ সুফল দর্শনে, ভবিষ্যতে সহরে মহামারীর আক্রমণ হইলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য, বোম্বাই নগরে একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত হইতেছে। এতদর্থে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসারের সহিত পরামর্শ করিয়া কমিটি স্থির করিয়াছেন, সমগ্র নগরটিকে ৫০টি ইউনিটে বিভক্ত করা হইবে। প্রত্যেক ইউনিটে গড়ে ২০০০০ অধিবাসী থাকিবে। প্রত্যেক ইউনিটে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে। কমিটিগুলি এক একজন চেয়ারম্যান, দুইজন করিয়া সেক্রেটারী এবং দুইজন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। একজন ডাক্তার, দুই জন নার্স ও অন্ততঃ দশজন ভলাণ্টিয়ার কমিটিকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। মিউনিসিপ্যালিটি বৎসরে প্রত্যেককে ১০০ টাকা বৃত্তি দিয়া ৩০ জন ডাক্তারকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহাদের সহিত এই চুক্তি হইবে যে, যখন মহামারীর আক্রমণ হইবে, তখন এই সকল ডাক্তার অপর সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহামারী-নিবারণে নিযুক্ত থাকিবেন এবং দৈনিক ১৫৲ টাকা হিসাবে ফী পাইবেন। ইহা ছাড়া ২০০ রোগীর শয্যা সমন্বিত অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন করা হইবে, এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ভাণ্ডারে এই সকল হাসপাতালের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম সর্ব্বদা মজুত রাখা হইবে। মহামারীর আক্রমণ হইলে মিউনিসিপ্যালিটী ভাণ্ডার হইতে সাজ-সরঞ্জাম বাহির করিয়া দিয়া এই সকল অস্থায়ী হাসপাতাল সাজাইয়া দিবেন। তার পর উহাদের ভার সম্পূর্ণরূপে ভলাণ্টিয়ারদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পূর্ব্বোক্ত কমিটিগুলি, ডাক্তার, নার্স ও ভলাণ্টিয়াররা মিলিত হইয়া লোক-হিতে নিযুক্ত হইবেন। অবশ্য তাঁহাদের অন্য যে সাহায্যের দরকার হইবে, মিউনিসিপ্যালিটী তাহার যোগাড় করিয়া দিবেন।

শিশুদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ—

আমাদের দেশে যে শিক্ষা-প্রণালী অধুনা অনুসৃত হইতেছে, তাহাতে, ছোট ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার অবকাশ অতি অল্প। আমরা যখন ছাত্রবৃত্তি পড়িতাম, তখন নিম্ন শ্রেণীতে "শরীর পালন" এবং উচ্চ শ্রেণীতে "স্বাস্থ্যরক্ষা" পড়িয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, "স্বাস্থ্যরক্ষা" অপেক্ষা "শরীর পালন" বইখানি হইতে আমরা সেই ছেলে বয়সে বেশী উপকার পাইয়াছিলাম। তার পর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া যখন ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম, তখন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন পাঠ্য পুস্তক পাইলাম না,—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের ঐ খানেই ইতি হইল। বস্তুতঃ, যদি শরীরকে সুস্থ রাখিয়া দীর্ঘজীবী হইতে হয়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য-রক্ষার মোটামুটি নিয়মগুলি শিখিয়া লইয়া তাহা পালন করিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যায় এমন একটা প্রধান এবং গুরুতর বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আশানুরূপ নহে,—ইহা অতি দুঃখের কথা। কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন এবং বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে না; যাঁহারা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন, তাঁহারা অভিজ্ঞ এবং বহুদর্শী চিকিৎসক হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যদি সকল বিদ্যালয়ে এরূপ চিকিৎসক নিযুক্ত করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে, যে সকল ভদ্রসন্তানকে শিক্ষা ব্যাপারে ব্রতী করিবার জন্য ট্রেনিং কলেজে তালিম দেওয়া হইতেছে, তাঁহাদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

বিলাতে শিক্ষার ব্যবস্থা—

এ বিষয়ে বিলাতে কিরূপ উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দিয়া রাখি। সম্প্রতি বিলাতের বোর্ড অব এডুকেশন ট্রেনিং কলেজের ছাত্র-

গণের ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে নূতন একটী সিলাবাস প্রস্তুত করিয়াছেন। শিশু-জীবনের অভাব এবং স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সিলাবাস প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ইহা এত সরল ও সহজ বোধ্য যে, ট্রেনিং কলেজের ছাত্রেরা—কি ভাবে শিশুদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে, এবং কি প্রণালীতে সেই উপদেশ শিশু-হৃদয়ে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়া ফলপ্রদ হইবে,—যে শিক্ষা তাহার পরিণত ভবিষ্যৎ জীবনের উপরও কার্য্য করিতে পারিবে,—তাহা উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবেন। শিক্ষক মহাশয় উপযুক্ত হইলে, ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার মনে আন্তরিক সহানুভূতি থাকিলে, শিশুরা সেই শিক্ষকের অত্যন্ত ভক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে শিশুর জীবনের উপর শিক্ষকের প্রভাব খুব বেশী; এবং এইরূপ প্রভাব না থাকিলে কোন শিক্ষকই উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। এইরূপ শিশুদের প্রিয় শিক্ষক তাহাদিগকে যে উপদেশ দিবেন, শিশুরা তাহা বেদ-বাক্য মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে পালন করিয়া থাকে। শিক্ষক যদি শিশুদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মগুলি ভাল করিয়া নিজে আয়ত্ত করিয়া, ছাত্রদিগকে রীতিমত উপদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষায় ছেলেরা এমন উপকার পাইতে পারে, যাহা তাহাদের সমগ্র জীবনে কার্য্য করিতে পারিবে। এই বিষয়টি বড় গুরুতর। একটা সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের ভাল মন্দ এই প্রাথমিক শিক্ষার উপর অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ইহার ভিতর কোন ভুলচুক হইলে তাহাতে জাতির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইবার সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের—যাঁহারা ভবিষ্যতে শিক্ষা-দান রূপ মহৎ ব্রত গ্রহণ করিবেন—গোড়ায় শিক্ষা নির্ভুল এবং উত্তমরূপ হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য আমরা মনে করি, খুব বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ ও স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্যে আমাদের দেশের ট্রেনিং কলেজের ছাত্রগণের ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়ের সিলাবাস প্রস্তুত করা হউক। অনেকে হয় ত বিলাতী সিলাবাসই এদেশে চালাইবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা বলি,—না, তাহা চলিবে না। বিলাত এবং ভারতবর্ষ—অথবা আরও একটু সংযত ভাবে, বঙ্গদেশ—এক দেশ নহে। এই দুই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, অধিবাসীদিগের সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, জীবন-যাপন প্রণালী এবং খাদ্য ও পানীয় এ সকলই বিভিন্ন। এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এ দেশের শিশুদিগের উপযোগী করিয়া সিলাবাস প্রস্তুত করিতে হইবে। এ বিষয়ে কতদূর কি ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা আমরা জানিতে চাই।

শিশুদিগের ধূমপান নিবারণ—

জুভিনাইল স্মোকিং এ্যাক্ট বা অল্প বয়স্ক বালকদিগের ধূমপান নিষেধ বিধি কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সরকারী গেজেটে ঘোষণা প্রচার করিয়া কলিকাতার হাই ও মিডল স্কুল এবং মাদ্রাসা-সমূহের হেড মাষ্টার মহাশয়গণকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের আপন আপন স্কুলের ছাত্রগণকে রাজপথে বা কোন সাধারণ ও প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান করিতে দেখিলে, তাহাদের নিকট হইতে (অবশ্য ধরিতে পারিলে) সিগারেট, বার্ডসাই বা বিঁড়ি কাড়িয়া লইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিবেন। এইটুকু অধিকার হেড মাষ্টার মহাশয়গণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। কোনরূপ দণ্ডের অর্থাৎ কিছু দিনের জন্য অপরাধী ছাত্রগণকে স্কুল হইতে বিদায় দিবার (rusticate) ব্যবস্থা থাকিলে অনেকটা আশা হইত যে, এই দুর্নীতি শীঘ্র দূর হইতে পারিবে। যাহা হউক, আপাততঃ যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার কিরূপ ফল হয় দেখা যাউক। পরে আবার সংশোধন করিলেই হইবে।

শিশু-মড়ক

বঙ্গে শিশু-মৃত্যুর হার প্রতি বৎসর যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই সবিশেষ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। অনেক চেষ্টায়, বহু অর্থব্যয়ে কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন বঙ্গের অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। এই কলিকাতাতেই শিশু-মৃত্যুর হার কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কতকটা বুঝা যাইবে,—সমগ্র বৎসরে যত শিশু জন্মিয়াছে, তাহার প্রতি হাজারে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ৪৭৪, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৪৪২, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪৯১, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ২৯৩, এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২৪৯টি শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহা হইতে মফঃস্বলের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নহে। সাধারণতঃ কলিকাতার অবস্থা অনেকটা স্বাস্থ্যকর ত বটেই; তাহার উপর, এখানে সুচিকিৎসকের অভাব নাই; যাঁহাদের অর্থ আছে, শিশুর পীড়া হইলে তাঁহারা চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া থাকেন। এই কারণে কলিকাতায় অনেক শিশু বাঁচিয়া যায়। কিন্তু মফস্বলের সাধারণ স্বাস্থ্য যেমন খারাপ, সুচিকিৎসকেরও তেমনি অভাব। সুতরাং মফস্বলে শিশু-মৃত্যুর হার স্বভাবতঃই বেশী হইবার কথা। শিশু-মৃত্যুর হার বৃদ্ধির কথা ভাবিয়া এক দিকে দেশবাসী যেমন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন, পক্ষান্তরে তেমনি, গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। তাঁহারা প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই কমিটিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা শিশু-মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিবেন; এবং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কাজ করিবেন। আজকাল অনেকে বিবেচনা করিতেছেন যে, এতদ্দেশের অধিবাসীদিগের সামাজিক আচার-ব্যবহারই শিশু-মৃত্যুর প্রাবল্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ; বাল্য-বিবাহ, অবরোধ প্রথা, আঁতুড়-ঘরের ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যই শিশুদিগের অকালে মৃত্যু ঘটিতেছে। কিন্তু এই কথা কতদূর সত্য, তাহা বিবেচনার স্থল। কারণ, হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক আচার-ব্যবহার ত দুই দিনের জিনিস নয়! বঙ্গের প্রধান দুই সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমান আজ যে সামাজিক আচার ব্যবহারের অধীন, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি চলিয়া আসিতেছে। (আজ কাল বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, পাশ্চাত্য রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার তাঁহাদের সমাজে কিয়ৎ পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে।) সামাজিক আচার-ব্যবহার আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান কারণ হইলে, এত দিনে কোন কালে এই দুই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সামাজিক আচার-ব্যবহার কোন কোন স্থলে অল্প পরিমাণে শিশু-মৃত্যুর কারণ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্রই উহা শিশু-মৃত্যুর একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান কারণ নহে, এবং হইতে পারে না; বিশেষতঃ এমন একটা পুরাতন জাতির পক্ষে। ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগও শিশু-মৃত্যুর একটা কারণ হইতে পারে। ম্যালেরিয়া-জীর্ণ পিতা-মাতার সন্তান সহজেই দুর্ব্বল হইয়া থাকে, এবং জন্মগ্রহণের পর বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে কালগ্রাসে পতিত হয়। তা' ছাড়া অন্য কারণও আছে। কি শিশু, কি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি সকলকেই পৃথিবীর সকল স্থলেই অনেক প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া তবে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। যে জাতির বা যে দেশের লোকের power of resistance যত কম বা বেশী, সেই জাতি বা সেই দেশের লোক (শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তি) সেই পরিমাণে ক্ষীণজীবী বা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কেবল শিশুরাই বেশী পরিমাণে

মরিতেছে না,—অন্যান্য দেশের তুলনায় বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও মৃত্যু-সংখ্যা খুবই বেশী। সুতরাং ইহা হইতে নিরাপদে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, এ দেশে শিশু অথবা বয়স্ক ব্যক্তি সকলেরই সাধারণ ভাবে power of resistance কমিয়া যাইতেছে। এই সংগ্রাম করিবার শক্তি কমিবার কারণ বিবিধ। তন্মধ্যে দেশের সাধারণ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং economic reasons প্রধান। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া দেশটিকে অনেকটা পরিমাণে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব উপস্থিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া এক দিকে যেমন লোকে চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, অন্য দিকে তেমনি দুই বেলা পেট ভরিয়া বলকর খাদ্য খাইতে না পাইয়াও লোকে আরও বেশী পরিমাণে দুর্ব্বল হইতেছে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথম ৬ মাস মাতৃস্তন্য তাহার একমাত্র খাদ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য শিশু সে খাদ্যে প্রায় বঞ্চিত। জননী নিজেই পুষ্টিকর খাদ্য পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহার স্তনে দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে? কাজেই শুষ্ক স্তন চুষিয়া চুষিয়া শিশু ক্লান্ত ও ক্ষীণ হইতে থাকে। অগত্যা তাহাকে গোদুগ্ধ দিতে হয়। কিন্তু গোদুগ্ধেরও একান্ত অভাব। গোরু কোথায়, যে গোদুগ্ধ সুলভে সহজে পাওয়া যাইবে? আগে আগে কি ধনী কি দরিদ্র, মফস্বলের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে দুই একটী করিয়া গাভী থাকিত। এখন প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীর গোয়াল শূন্য। ভরসা পেশাদার গোয়ালা। এখন সর্ব্বত্রই গৃহস্থ মাত্রকেই গোয়ালার নিকট হইতে দুগ্ধ কিনিয়া খাইতে হয়। সে গোয়ালার দুগ্ধ কেমন, তাহার কতখানি দুগ্ধ, কত খানি জল এবং কতখানি অন্য পদার্থ, তাহা কে না জানেন? গো-মড়কে মফস্বল এমন গোশূন্য হইয়াছে যে, বাড়ীতে কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে গোয়ালার দুগ্ধে কুলায় না, ছুটিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। শুধু দুধ বলিয়া নয়,—পল্লী অঞ্চলের এখন এমন দুরবস্থা হইয়াছে যে, তথায় ক্রিয়া-কর্ম্মে সকল জিনিসই কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। আবার কেবল ক্রিয়া-কর্ম্ম বলিলেও ভুল হয়। অনেক গ্রামে গৃহস্থের নিত্য-ব্যবহার্য্য সকল বস্তুই দুর্লভ—কলিকাতা হইতে লইয়া না গেলে, অনেক গ্রামের লোকের দিন চলা ভার। এমন অবস্থায় শিশু এবং শিশুর জননী উভয়েরই উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। শিশু-মৃত্যুর ইহাই প্রধান কারণ। উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে শিশু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবে কিরূপে? রোগ হইতে আত্মরক্ষাই বা সে কিরূপে করিতে পারিবে? কাজেই তাহাকে খাদ্যাভাবে একটু একটু করিয়া শুকাইয়া মরিতে হয়; নচেৎ রোগের সূচনা হইবামাত্র প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। তাহার উপর খাদ্যে ভেজালের বিষম অত্যাচার আছে। শিশু-মৃত্যুর যথার্থ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবল সামাজিক আচার-ব্যবহারের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে না;—ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; খাদ্যে ভেজাল নিবারণ করিতে হইবে; সর্ব্ব-সাধারণে যাহাতে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সস্তা পুষ্টিকর মোটা ভাত মোটা কাপড় সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাধারণ ভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে হইবে; তবে শিশু-মৃত্যুর হার কমিতে পারিবে। আর সামাজিক আচার-ব্যবহারের ত্রুটি থাকিলে, তাহার প্রতিকার করা ত সহজ ব্যাপার নহে! হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটানো একদিকে যেমন কঠিন, তেমনি শত শত বৎসর কাল-সাপেক্ষ। এদিক দিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে গেলে ত দিনে দেশ উজাড় হইয়া যাইবে। কিন্তু শিশু-মৃত্যুর হার দিন দিন যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে তাহার আশু প্রতিকারের উপায় অবলম্বন না করিলে চলিতেছে না। সুতরাং মনে হয়, সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া দেশের লোককে অনর্থক ক্ষেপাইয়া না তুলিয়া, যাহাতে তাহাদের power of resistance বাড়ে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহার

পর, সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন করা যদিই আবশ্যক হয়, তবে কালই সে কার্য্য স্বতঃই সাধন করিবে;—কেবল শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে কিছু সাহায্য করিতে হইবে।

ভারতীয়া মহিলাগণের সন্তান-প্রসব-কালীন দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া এবং শিশু-মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক দেখিয়া আমাদের বড়লাট-মহিষী লেডী চেমসফোর্ড সাহেবার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। এই কারণে, তাঁহার আগ্রহে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে দিল্লী নগরে সন্তান-প্রসব এবং শিশুদিগের মঙ্গলজনক বিষয় ও দ্রব্যাদির একটী প্রদর্শনী বসাইবার কল্পনা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ প্রদর্শনী কিরূপে সফলতা লাভ করিতে পারে, তাহাই বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, ইউরোপ-আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এরূপ প্রদর্শনী বিরল না হইলেও, ভারতের অবস্থা ইউরোপ-আমেরিকা হইতে অনেকটা বিভিন্ন হওয়াতে ঠিক ইউরোপীয় ধরণের প্রদর্শনী বসাইলেই চলিবে না। ভারতীয়া মহিলাদিগের আচার-ব্যবহার এবং জীবন-যাপন-প্রণালীর কথা বিবেচনা করিয়া, কি ধরণে প্রদর্শনী বসাইলে তাহা এদেশের মহিলাদের উপযোগী এবং মঙ্গলকর হইতে পারে, এবং তাঁহারা এইরূপ প্রদর্শনীর উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন, কর্ত্তৃপক্ষ এখন তাহাই চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা আশা করিতেছেন, শুধু দিল্লীর নহে, সমগ্র ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণ এই ব্যাপারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। কেবল ভারতবাসীরা নহেন, অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোকেও ভারতীয় শিশুগণের অকাল-মৃত্যুর কথা ভাবিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা পরামর্শ দিয়া, প্রদর্শিতব্য পদার্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া, কিম্বা চাঁদা দিয়া এই প্রদর্শনীর সফলতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। এই বিষয়ে যাঁহারা কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সিমলা, ডফারিন্ ফাণ্ড আপিসে, ইনফ্যাণ্ট ওয়েলফেয়ার একজিবিসনের অনারারী সেক্রেটারীর নিকটে পত্র লিখিলেই সকল সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ যে ভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছেন, আমরাও তাহাই ভাবিতেছি,—এইরূপ প্রদর্শনীর সার্থকতা এদেশীয় মহিলারা, এমন কি পুরুষেরাও, উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। তথাপি আমরা একেবারে এরূপ প্রদর্শনীর বিরোধী নহি। যে দিক দিয়াই হউক, কার্য্য সিদ্ধ হইলেই হইল। শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা যখন এত বেশী, তখন তাহা নিবারণের জন্য যে উপায় সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে, তাহা অবলম্বন করিতেই হইবে—ফল যতদূর হউক। শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির যে যে কারণ আমাদের মনে হইয়াছে, এবং তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহা আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। তথাপি, প্রদর্শনী লোক-শিক্ষার অন্যতম উপায়; এবং এদেশের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী ভাবে শিশু-পালন করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই কারণেই আমরা প্রদর্শনীর পক্ষপাতী। তবে, ইহাতে কতদূর ফল ফলিবে, তাহা পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

মনের তেজ

ইংরেজী এক শ্রেণীর সাহিত্যে আজকাল Will Power, Will Force শব্দগুলি একটু বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই শব্দগুলি বাঙ্গলায় মোটামুটি "ইচ্ছাশক্তি" রূপে অনুবাদিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইংরেজীতে Will Power বলিলে যাহা বুঝায়, বাঙ্গলায় "ইচ্ছাশক্তি" বলিলে ঠিক তাহাই বুঝায় না; এমন কি, বাঙ্গলা শব্দটির অর্থ ইংরেজী শব্দের অর্থের ধার দিয়াও যায় না। ইংরেজী Will Powerকে বাঙ্গলায় বরং মনের তেজ বা মানসিক শক্তি বলিলে কতকটা অর্থ আদায় হইতে পারে।

এই Will Power সম্বন্ধে Physical Culture নামক সাময়িক পত্রে শ্রীযুক্ত টমাস এল, মাসন একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, Will Power শব্দে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ কোন জিনিস নাই। Will Power শব্দে এমন একটা শক্তির ভাব মনে আসে, যাহা সাধারণ মানুষের থাকে না, যাঁহারা এই শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, এই শক্তি লাভ করা সাধনা-সাপেক্ষ। সেই সাধনা অনেকটা যোগ প্রক্রিয়ার মত; কিম্বা এই শক্তি মেসমেরিজম, ক্লেয়ারভয়েন্স প্রভৃতির সমশ্রেণীর। মিঃ মাসন কিন্তু বলেন, ও সব বাজে কথা। যতই সাধনা করা হউক, একজন মানুষ কখনও অতিমানুষ মানসিক শক্তি লাভ করিতে পারে না। তবে, মিঃ মাসনের মতে, এই শক্তি লাভের জন্য যে সাধনা করিতে হয়, তাহা একেবারে ব্যর্থ হয় না; অন্য দিকে তাহা হইতে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এই শক্তি-সাধনার প্রথম স্তর আত্ম-সংযম। আত্ম-সংযম অভ্যাস করিবার উপলক্ষে অনেক বদভ্যাস দূর করিতে পারা যায়।

মিঃ মাসন বলিতেছেন, কাহারও অসাধারণ মানসিক শক্তি আছে বলিলে বুঝিতে হইবে, লোকটি সাধারণ লোকের অপেক্ষা একটু বেশী জেদী, একগুঁয়ে—যাহা একবার ধরিবে, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা না করিয়া ছাড়িবে না। তাহাও আবার সকল বিষয়ে নহে, মাত্র কোন কোন বিষয়ে। এবং তাহা সাধনা-সাপেক্ষও নয়,—এইরূপ অসাধারণ মানসিক শক্তি বংশানুক্রম, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং লোকটির নিজের মানসিক গতির উপর নির্ভর করে। এই শক্তির সম্বন্ধে এত লেখালেখি হইয়া গিয়াছে, ইহার এত বেশী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে যে, লোকে মনে করে, ইহা যেন সর্ব্বশরীরব্যাপী একটা প্রচণ্ড সুপ্ত শক্তি—সাধনার দ্বারা ইহাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই, আরব্যোপন্যাসের দৈত্য-দানবের ন্যায় ইহার দ্বারা সাধারণ মানবের অসাধ্য কার্য্য সাধন করানো যাইতে পারে। কিন্তু, বাস্তবিক, সে রকম কিছুই নাই। লোকের মন হইতে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিতে হইবে। তবে কতক লোকের মনে কোন কোন বিষয়ে এক একটা প্রবল ঝোঁক থাকিতে পারে। তাহার অনুশীলনের দ্বারা সেই সেই বিষয়ে তাহারা অপর মানবের অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইতে পারে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। আমেরিকার ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টার একজন খুব বড় বক্তা ছিলেন। কেমন করিয়া তিনি এত বড় বক্তা হইলেন? কেন না, ডিমস্থেনিসের মত তিনি তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির অনুশীলন করিয়াছিলেন। বড় বক্তা হইবার প্রবল ইচ্ছাই তাঁহাকে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সে রকম ইচ্ছা থাকিলে, অনুশীলন করিলে, যে-কেহ তাঁহার মত প্রবল বক্তৃতা-শক্তি লাভ করিতে পারেন। ডিমস্থেনিসই বা কেমন করিয়া বড় বক্তা হইতে পারিয়াছিলেন? গ্রীস দেশে সে সময় খুব বড় বড় বক্তা স্বভাবতঃই জন্মগ্রহণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ডিমস্থেনিসেরও শৈশব হইতেই বক্তৃতা করিতে সাধ যায়। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বক্তৃতা-শক্তি ত ছিলই না; অধিকন্তু,

তিনি অত্যন্ত তোতলা ছিলেন। তিনি যখন নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক, তখনই একদিন একটা সভায় তাঁহার বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা হয়। তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলেন; কিন্তু একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। প্রথম কথাটি উচ্চারণ করিতে গিয়াই, এমন তো—তো—তো—তো আরম্ভ করিলেন যে, সকলে হাসিয়া উঠিল, হাততালি দিতে লাগিল, টিটকারী করিতে লাগিল। ডিমস্থেনিস অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু এই ঘটনা তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত করিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়াই হউক, তিনি তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির অন্তরায় স্বরূপ ঐ ত্রুটি সংশোধন করিবেন। প্রবল ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া, তিনি প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা করিয়া নির্জ্জন সমুদ্রতীরে থাকিয়া একাকী বক্তৃতা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তোতলামি দূর করিবার জন্য তিনি বেলাভূমি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, তাহা মুখে পূরিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গলার স্বর যাহাতে সমুদ্র-গর্জ্জনকেও ছাপাইয়া শুনা যায়, এমন উচ্চৈঃস্বরে তিনি স্বর-সাধনা করিতে লাগিলেন। বক্তৃতাকালীন মুদ্রা-দোষ সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রতিদিন তাঁহার নিজগৃহে একটী নির্জ্জন কক্ষে একখানি বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুষ্ঠুভাবে অঙ্গচালনা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসরের চেষ্টার পর তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হইল। তাঁহার তোতলামি সারিয়া গেল, তাঁহার কণ্ঠস্বর এমন তীব্র হইল যে, অতি বড় জনতার সমস্ত লোকই তাঁহার সেই তীব্র স্বর শুনিতে পাইবে এরূপ অবস্থা হইল। এইরূপে যখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সাধনা শেষ হইয়াছে, তখন এক দিন তিনি একটা প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা করিলেন। নূতন একজন বক্তার প্রথম আসরে নামিবার সংবাদ শুনিয়া সভায় বহুলোকের সমাবেশ হইল। তাঁহার প্রথম দিনের ব্যর্থ চেষ্টার কথা জানিত, এমন অনেক লোকও সেই সভায় উপস্থিত ছিল। ডিমস্থেনিস বক্তৃতা করিতে উঠিতেই, সেই তোতলামির পুনরভিনয়ের কল্পনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে টিট্‌কারি দিয়া, বিদ্রূপ করিয়া বসিতে বলিল। কিন্তু তিনি কাহারও কথা কাণে না তুলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার স্বরগ্রাম উঠিতে লাগিল। সভায় ঠাট্টা-বিদ্রূপের কোলাহল অচিরে থামিয়া গেল। লোকে একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। অবশেষে বহুক্ষণ পরে যখন তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইল, তখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইল যে, গ্রীসবাসীরা এরূপ চমৎকার বক্তৃতা আর কখনও শুনে নাই, গ্রীস দেশে বক্তৃতা-শক্তিতে ডিমস্থেনিস অদ্বিতীয়।

প্রবন্ধ-লেখক বলিতেছেন, এইরূপে এক-একজন লোক এক-একটা বিষয়ে কিম্বা কোন কোন স্থলে একজন লোক দুই বা তিনটি বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে; কিন্তু একজন লোকের পক্ষে সকল বিষয়ে সমান ভাবে চৌকস হওয়া বা নিখুঁত হওয়া সম্ভবপর নহে। অর্থাৎ, যাহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, সে অনুশীলনের দ্বারা, ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই বিষয়ের সম্যক স্ফুরণ করিতে পারে। তদতিরিক্ত কিছু করিবার চেষ্টা করিলেই শক্তির অযথা অপব্যয় হয়। এইরূপে অনর্থক শক্তিক্ষয় বাঞ্ছনীয় নহে। এবং এই প্রতিষ্ঠা লাভের কারণ আর কিছুই নহে,—প্রবল ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনা। ইচ্ছাশক্তির অনুকূলবাদীরা যেরূপ বিশ্বাস করেন, তদনুসারে যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়েই ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত,—কোন কর্ম্মই তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত থাকিত না। কিন্তু এরূপ সর্ব্ববিষয়ে সমান দক্ষতা মানব সমাজে দেখা যায় না।

দুই ব্যক্তি একই সময়ে, একই ভাবে, এবং একই অবস্থায় একই কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেও, কার্য্যটির শেষ ফলের সম্বন্ধে তাহাদের সফলতা কখনই একই প্রকার হইবে না। আরব্ধ কার্য্যটিতে প্রাধান্য লাভের জন্য তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকিলেও স্বাভাবিক কারণে, অথবা সাধনা-লব্ধ ক্ষমতার বলে,

কার্য্যটির চূড়ান্ত মীমাংসার সময়ে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য ঘটিবেই, একে অপরের অপেক্ষা অধিকতর সফলতা লাভ করিবেই। ইচ্ছা-শক্তির কোনরূপ মাহাত্ম্য থাকিলে তাহাদের সফলতাও সমান হইতে পারিত। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বোক্ত ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টারের ঘটনায়, কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে শক্তির পরিচালনা করিয়া তিনি বক্তৃতা-মঞ্চে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, অপর যে কোন বিষয়েই সেই শক্তির প্রয়োগ করিলে, সেই বিষয়েও তিনি অনুরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। লেখক বলেন, তাহা অসম্ভব। ইহা নির্ব্বোধের মত কথা। বক্তৃতা-শক্তির অনুশীলন না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে ক্ষমতার পরিচালন করিতে গেলে, তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইত।

মিঃ মার্সন দৈব শক্তি মানেন। কিন্তু তাহার প্রকার-ভেদ আছে। আমাদের সংস্কৃত বচন অনুসারে

"উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও; ইউরোপীয়ানদের মধ্যেও অদৃষ্টবাদীর অভাব নাই। এইরূপে তথায় Micawber theoryর সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতের অনুসরণকারীরা ঘোর অদৃষ্টবাদী। সে অদৃষ্টবাদ কিরূপ, লেখক পরে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অদৃষ্টের নামেই তিনি পুরুষকারকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অর্থাৎ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে বসিয়া থাকিলেও, যখন প্রকৃত কার্য্যের সময় উপস্থিত হয়, তখন এই কর্ম্মের আহ্বানকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না; তখন সমস্ত জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়, দৈবকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষকারের আশ্রয় লইতে হয়; কাপুরুষতা বর্জ্জন করিয়া উদ্যোগী পুরুষসিংহ হইতে হয়; তবে লক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করেন।

যখন কর্ম্মের সময় আসে, তখন মানুষের মনে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা জন্মে, এবং সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সে দেখে, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে সাহায্য আসিতেছে, যে সাহায্য,—তাহার ইচ্ছা যখন সুপ্ত অবস্থায় ছিল,—তখন তাহার কল্পনারও অগোচর ছিল। এইরূপে, কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইলেই, মানুষ কাজ করিতে আরম্ভ করে,—তা' সে জীবনের যতটা সময়ই নিষ্ক্রিয় ভাবে কাটাইয়া দিক না কেন, এবং তাহার বয়স তখন যতই হউক না কেন,—এবং নানা দিক হইতে সাহায্য আসিয়া তাহার কর্ম্মটিকে সুসম্পন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্মে অক্ষম, যাহার কাজ করিবার ইচ্ছা সুপ্ত, সে তাহার জীবনের নিষ্ফলতার জন্য অদৃষ্টকে দোষী করে, প্রতিকূল অবস্থার দোহাই দেয়। সে জানে না যে, তাহার ইচ্ছাই তাহার সাফল্যের মূল। ইচ্ছার প্রবলতা বা দুর্ব্বলতা ভেদে, তাহার জীবনের সফলতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই ইচ্ছা কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি নহে,—ইহা সাধারণ ইচ্ছা—সকলের অন্তরেই অবস্থিত; কেবল সুপ্ত বা জাগ্রত অবস্থা ভেদে তাহার শক্তির ইতর বিশেষ ঘটে। দৈবই বল, ভাগ্যই বল, অদৃষ্টই বল আর লাক্‌ই (luck) বল, কিম্বা পুরুষকারই বল,—ইচ্ছাই সব। এই ইচ্ছা, যাহার মনে যত প্রবল, যাহার যেরূপ জাগ্রত, সে তত ভাগ্যবান। কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইলেই, প্রকৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্রও নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, এবং তাহাতে সফলতা লাভও অনিবার্য্য। কিন্তু অনিচ্ছার সহিত কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার পরিণাম নিষ্ফলতা। সে ক্ষেত্রেই কেবল অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ঘটে, অদৃষ্টকেই গালি খাইতে হয়।

এই কর্ম্ম করিবার সময়ের উপস্থিতি, এই ইচ্ছা শক্তির জাগরণ—ইহা অনুশীলনের দ্বারা লাভ করা যায়। কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা আবার সংক্রামকও বটে। একজনকে হাই তুলিতে দেখিলে, আর একজনের যেমন আলস্য বোধ হয়,—সেও হাই তুলিতে আরম্ভ করে,—সেইরূপ একজন প্রকৃত কর্ম্মীকে কর্ম্ম করিতে দেখিলে আর পাঁচ জনের মনে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে, সেই অপর পাঁচ জন তখন স্বতন্ত্র ভাবেই হউক কি

প্রথম ব্যক্তির সহায়করূপে তাহার সহিত মিলিত হইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আবার, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও কর্ম্মেচ্ছার উদ্বোধনে সহায়তা করে। যে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, তাহার সেইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। চোরদিগের সহবাসে চুরি করিবারই প্রবৃত্তি জন্মে; সেইরূপ সাধুসঙ্গে সৎকর্ম্মের দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। সেই জন্য দেখা যায়, দেশে এক এক সময়ে এক একরূপ হাওয়া বহে, এবং সেই সময়ে তদনুরূপ মানুষও জন্ম গ্রহণ করে। শুনা যায়, নেপোলিয়ন যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন কর্সিকা দ্বীপে রাষ্ট্র বিপ্লব, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল; নেপোলিয়নের পিতামাতাকেও এই বিপ্লবে যোগ দিতে হইয়াছিল, এবং গর্ভবতী অবস্থাতেই নেপোলিয়নের জননীকে অশ্বারোহণে স্বামীর সহিত সর্ব্বদা নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। এইরূপে জননীর যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত থাকার সময়ে নেপোলিয়নের জন্ম হয় বলিয়া যুদ্ধ বিগ্রহকেই নেপোলিয়ন নিজ জীবনের ব্রত স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে শেষ কথা এই দাঁড়াইতেছে যে, যাহার যে দিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সে সেই বিষয়ের অনুশীলন করিলেই সফলতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু কাহার কোন্ দিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহা প্রত্যেক মানবকেই নিজে নিজে ঠিক করিয়া লইতে হয়। এ বিষয়ে অপরের উপদেশে কোন ফল হয় না, এবং তাহা যতক্ষণ না স্থির হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কিছুই করিতে পারে না,—তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নির্ণয় কেহ স্বতঃ করিতে পারে, কেহ বা ঘটনা-চক্রে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার গতিকে জানিতে পারে। এই শেষের অবস্থাটিকে লোকে 'ভাগ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

মনের সহিত শরীরের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীরের বিকার ঘটিলে মন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না; আবার মন প্রফুল্ল না থাকিলে শরীরেরও সোয়াস্তি থাকে না। সুতরাং শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে শরীরের উপর মনের প্রভাব বড় অল্প নহে।

মন যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না, তখনকার মনের অবস্থাকে অসুস্থ বলা যাইতে পারে। মনে মনে কাম ক্রোধাদি রিপু-ঘটিত উত্তেজনায় সঞ্চার হইলেও স্বাভাবিক থাকে না, তখন তাহাকে অসুস্থ বলিতেই হইবে। অত্যধিক শোক হর্ষ প্রভৃতির প্রাবল্যেও মনের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়া মনের বিকার উপস্থিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে শরীরও অস্থায়ী ভাবে (Temporarily) তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রোধাদির আতিশয্য ঘটিলে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির এমন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় যে, সেগুলি তখন আর বশে থাকে না, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। তখন মানুষ ইচ্ছা না থাকিলেও খুন জখম করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে। হর্ষাতিশয্যে বা শোক বিহ্বল অবস্থায় অনেক লোককে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিতে দেখা যায়। আবার সময়ে সময়ে অত্যধিক আনন্দ বা অত্যন্ত শোকের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ স্থগিত হইয়া তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, এবং অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে।

মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইহা একরূপ অবস্থা। ইহা ছাড়া, অন্যরূপ অবস্থাও আছে। অনেক লোকের স্বভাব এমনি যে, তাহারা সর্ব্বদাই নিজেদের শরীর অসুস্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া এরূপ মনে করিতে থাকিলে তাহাদের সুস্থ শরীরও ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়ে। যখন কোন গ্রামে বা নগরে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ও মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও বহু লোকে, পাছে তাহাকে কলেরায় আক্রমণ করে এই ভয়ে সর্ব্বদা আতঙ্কিত থাকে বলিয়া, সত্য সত্যই উক্ত প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু যদি তাহারা মনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিতে পারিত, যদি কলেরার

ভয়ে ভীত হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে হয়ত তাহারা আদৌ রোগাক্রান্ত হইত না। সুতরাং বলিতে হয়, মনের তেজ বা ইচ্ছা শক্তি বলিয়া যদি কোন শক্তি থাকে, তবে তাহার রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা আছে।

একজনের প্রবল ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের দ্বারা অপরের রোগ আরাম করা, কিম্বা ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ ফলে অপরের রোগ নিজ শরীরে সঞ্চালন করিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাময় করার নানা অলৌকিক কাহিনী ও উপাখ্যান মানব-সমাজে ও সাহিত্যে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, বাদশাহজাদা হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়া পড়িলে, তাঁহার পিতা বাদশাহ বাবর সমস্ত রাত্রি একাগ্রমনে প্রার্থনা করিয়া এবং জীবনে আর কখনও মদ্য স্পর্শ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া পুত্রের রোগ নিজ শরীরে সংক্রামিত করিয়া পুত্রকে নিরাময় করিয়াছিলেন। লৌকিক ব্যবহারে যাহাই হউক, বিজ্ঞানের বিশেষতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক দিয়া বিচার করিলে এই সমুদায় অলৌকিক ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তি-সঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রবল ইচ্ছা শক্তির পরিচালনার দ্বারা নিজের শরীরকে অনেক সময়ে সুস্থ রাখিতে পারা যায়, সংক্রামক মহামারীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এরূপ ঘটনা চিকিৎসা-জগতে বিরল নহে। ইচ্ছা শক্তির রোগ-প্রতিষেধক এই ক্ষমতার কথা চিকিৎসকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে, স্বাভাবিক কারণে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কেবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া এইটুকু যে, আতঙ্কে বিহ্বল হইলে স্বতঃই যেখানে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সাহস অবলম্বন করিতে পারিলে ততটা আশঙ্কা থাকে না। এই কারণে কোথাও কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিলে, চিকিৎসকেরা যেমন সকলকে সাহস অবলম্বন করিয়া থাকিবার পরামর্শ দেন, তদ্রূপ, সাবধানে থাকিতেও উপদেশ দিয়া থাকেন।

কণ্টকারী

লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

পরিচয়

কণ্টকারী ভারতবর্ষীয় লতাবিশেষ। ইহা প্রায় দুই তিন হাত লম্বা হয়। লতা ও পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকের দ্বারা আবৃত, কাঁটাগুলি ¼ ইঞ্চির বেশী লম্বা হইবে না। পত্র দৈর্ঘ্যে ১০।১২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১।০ ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চির মধ্যে। পত্রগুলি খাঁজকাটা;—কতকটা খরমুজের পত্রের সহিত সাদৃশ্য আছে। পত্রগুলি প্রথম হইতেই সবুজবর্ণ। ইহার ফুল নীলবর্ণের ও বেগুনে-বর্ণের দেখা যায়; ফুলের ৫টী কিম্বা ৬টী পাপ্‌ড়ী থাকে; মধ্যে হরিদ্রাবর্ণের ৩টী কিম্বা ৪টী শীষ্ থাকে। শীষ্‌গুলি ¼ ইঞ্চি লম্বা হয়। ফলগুলি ঠিক্ বেগুনের মত; কিন্তু লম্বা ধরণের হয় না, গোল হয়। ফলের ডাঁটাতেও কাঁটা থাকে, এবং তাহা আকারে খুব ছোট হয়। সেই জন্য অনেক প্রদেশে কণ্টকারীকে "গরক বেগুন" ও কোন কোন প্রদেশে "রাম বেগুন" বলিয়া থাকে। ফলগুলি যখন প্রথমে হয়, তখন সবুজবর্ণ তাহার গা

পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। ফল কাটিয়া দেখিলে তাহার ভিতর সরিষার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। কণ্টকারীর কাঁটা পায়ে ফুটিলেই ভাঙ্গিয়া যায়; সেইজন্য বাহির করিতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হয়।

কোন্ সময়ে উৎপন্ন হয়

কণ্টকারীর গাছ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে মাঠের যে কোন স্থানে বাহির হয়, এবং দুই এক পসলা বৃষ্টি পাইলে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কোন কোন ধান্য ক্ষেত্রে এরূপ পরিমাণে জন্মায় যে কৃষকগণ জমি কর্ষণ করিবার আগেই কণ্টকারীর গাছগুলি কাটিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলে। কণ্টকারীর গাছ কেহ যত্ন করিয়া উৎপন্ন করে না, উহা আপনা আপনি হয়। যাঁহারা কণ্টকারীর গাছ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কতকগুলি বীজ যে কোন জায়গায় ছিটাইয়া দিবেন, দিলেই গাছ বাহির হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু দিবস হইতে কণ্টকারীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—

"কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রাব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা
কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা"

কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী এই কয়েকটী কণ্টকারীর পর্য্যায়; কিন্তু অন্য গ্রন্থে, নির্দিগ্ধা, স্পৃশী, প্রচোদনী, কুলী, রাষ্ট্রিকা দুষ্প্রধর্ষিণী, ক্ষুদ্র কণ্টিকা, বহুকণ্টা, ক্ষুদ্রকণ্টা, ক্ষুদ্রফলা, চিত্রফলা এই কয়েকটী পর্য্যায়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বেত কণ্টকারী নামে আর এক জাতীয় কণ্টকারী আছে। তাহার পুষ্প শ্বেতবর্ণের; ইহা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য এবং ঔষধরূপে প্রয়োগেও অনেক পার্থক্য। ইহার পর্য্যায়ঃ—

" শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষণা ক্ষেত্র দূতিকা
গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী "

শ্বেত, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষণা, ক্ষেত্র দূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পী ও প্রিয়ঙ্করী এই কয়েকটী শ্বেত-কণ্টকারীর পর্য্যায়। এতদ্ব্যতীত, রাস্না, চন্দ্রমা, নিস্নেহ-ফলা, রামা, সিতকণ্টা, মহৌষধি গর্দ্দভী, চন্দ্রিকা, নাকুলী ও দুর্লভা এই কয়েকটী শ্বেত কণ্টকারীর নাম গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়।

কণ্টকারী ও বৃহতীর মধ্যে প্রভেদ ঃ—বৃহতীর গাছ অনেকটা বেগুন্ গাছের মত। কণ্টকারী গাছ এক প্রকার লতা মাটির উপর লতাইয়া যায়; কিন্তু বৃহতী গাছ বেগুন গাছের মত খাড়া হইয়া থাকে। বৃহতীর পাতা অনেকটা বেগুনের পাতার মত। বৃহতীর গাছ দুই তিন হাত উর্দ্ধে লম্বা হয়।

দেশভেদে নামভেদ ঃ—হিন্দুস্থানে, কণ্টকারীকে কটেরী, কংটেলি, লঘুকটাই, রিংগিনী, ভট্ কটৈয়া; কর্ণাটে, নেলগুল্লু; তৈলঙ্গে শ্বটীমুলঙ্গা ব্রাকুড়ী টেটু; উৎকলে, কটমারিষ, ডাক্তারী নাম Solanum xanthocarpum Syn. S Jacquinii; হাকিমী কটারি।

গুণ ঃ—ইহা তিক্ত রস, কফ, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, অরুচি নাশ করে। ইহা সারক; কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তাহাতে উপকার করে। কটুরস, সেইজন্য কফ নাশ করে, স্থূলতা নাশ করে ও মল পরিষ্কার করে। এবং কফজ জ্বরে বিশেষ উপকার করে। ইহা দীপন অর্থাৎ পাচকাগ্নির উদ্দীপন করে; অথচ আমরসের পরিপাক করিয়া থাকে। লঘু বলিয়া শীঘ্রপচনকারী, কফ নাশক; রুক্ষ বলিয়া বায়ু বৃদ্ধি করে ও কফ হরণ করে এবং উষ্ণ-বীর্য্য বলিয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, বাত ও কফ নাশ করে। রস অনুসারে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার কফনাশ করিবার শক্তিই প্রধান।

আময়িক প্রয়োগ ঃ—ইহা জ্বর, কাস, শ্বাস, কফ, বায়ু, পীনস্ পার্শ্বপীড়া, ক্রিমি ও হৃদ্‌রোগে প্রয়োগ হয়।

কণ্টকারী বাতজ্বরে দশমূল পাচনে, নাগরাদি, ভূনিম্বাদিকষায়, বিশ্বাদি, কণাদি, কিরাতাদি পাচনে; কফ জ্বরে, মরিচাদি, ব্যাঘ্রাদি পাচনে; বাতপিত্তজ্বরে নবাঙ্গ, নিদিগ্ধিকাদি পাচনে বাতশ্লেষ্মজ্বরে, মুস্তকাদি, বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ, কিরাতাদি ক্বাথে ব্যবহৃত হয়

এবং সান্নিপাতিক জ্বরে, বৃহত্যাদিগণ, শট্যাদিগণ বৃহত্যাদি কাথ প্রভৃতি পাচনে ব্যবহৃত হয়।

জ্বরাতিসারে পঞ্চমূল্যাদি পাচনে ব্যবহৃত হয়। ইহা বায়ুনাশক বলিয়া মধ্যম নারায়ণ তৈলে এবং বাতব্যাধিতে বৃহৎ মাষাদি তৈলে এবং অশ্মরী রোগে পায়ণান্নঘৃতে ও উশীরাদ্য তৈলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সূতিকা রোগে অমৃতাদি ও সূতিকা দশমূল পাচনে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

যখন কোনও রোগীর কফজ্বরে শরীর শীতল হইয়া পড়ে এবং নাড়ী অঙ্গুষ্ঠার মূল হইতে চলিয়া যায় তখন দুই আনা পরিমাণ কণ্টকারীর মূল ও ২৫টী গোলমরিচ বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া মধু দিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিলে রোগীর গাত্র পুনরায় গরম হইবে এবং নাড়ী আসিবে। কণ্টকারীর মূল বসন্তরোগের প্রতিষেধক। যখন গ্রামে চারিদিকে লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইতেছে, এরূপ অবস্থায় কণ্টকারীর মূল ও মরিচ সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া কিম্বা চর্ব্বণ করিয়া খাইলে আর বসন্ত হইবে না। এই যোগটী তন্ত্রের।

যখন এক বৎসর কিম্বা দেড় বৎসরের শিশুগণ দুগ্ধ পান করিয়া বমন করিয়া ফেলে এবং তাহাদের অতিশয় পাতলা দাস্ত হয়, তখন নিম্নলিখিত যোগটী প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কতকগুলি কণ্টকারীর ফল লইয়া তাহার মুখগুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া ফলের মধ্য হইতে বীজগুলি বাহির করিয়া দিলে এক একটী ছোট ঠোলের মত হইবে। তাহাতে স্তন্য দুগ্ধ দিয়া সেই ঠোলগুলি রৌদ্রে এক প্রহর কাল দিয়া সেই দুগ্ধ শিশুকে খাওয়াইবে।

কঙ্কন প্রদেশের অধিবাসীগণ ২ তোলা কণ্টকারী গাছের রস এবং ২ তোলা অনন্তমূলের রস মিশ্রিত করিয়া পান করেন, তাহাতে অধিক পরিমাণে প্রস্রাব করায়।

চিরতা ১ তোলা কণ্টকারীর মূল ॥০ আধ তোলা আদা আধ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে চিনি কিম্বা মিছরি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বর নাশ করে।

কণ্টকারী ও বৃহতীর ফল কটুতিক্ত রস, কটুবিপাক ও লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, ক্রিমিজ্বর নাশক। শ্বেতকণ্টকারী গর্ভপ্রদ।

কণ্টকারী হৃদয়ে ও মূত্রাশয়ে কার্য্য করে। সেইজন্য কাসে ও কফজনিত পীড়ায় ও হৃদ্‌রোগে ব্যবহৃত হয় এবং রক্ত পরিষ্কারক ঔষধের সহিত প্রস্রাব করাইবার জন্য অনেকে ব্যবহার করেন।

আরব দেশীয় হাকিমগণ "জোশান্দা আতশক" নামক ঔষধে "কাটারি খোরদ" অর্থাৎ কণ্টকারীর শিকড় ও পাতা উভয়ই উপদংশ রোগে প্রস্রাব করাইবার জন্য ব্যবহার করান।

আয়ুর্ব্বেদেও পঞ্চতিক্ত ঘৃতে ও বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ ও অন্যান্য রক্ত পরিষ্কারক ঔষধে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

কণ্টকারীর শিকড় ও পাতা ½ তোলা, জিওল গাছের ছাল ½ তোলা মাকালের শিকড় ½ তোলা বাবলার ফল ½, তোলা পুরাতন গুড় ½ তোলা জল ৩ পোয়া সিদ্ধ করিয়া ½ অংশ থাকিতে নামাইয়া সেই শেষ অংশ ৭ মাত্রা করিয়া ব্যবহার করিলে রক্তদুষ্টি রোগে আরবদেশীয় হাকিমগণ দিয়া থাকেন। উপরি উক্ত প্রমাণগুলি দেখিলে ও হাকিমী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে কণ্টকারী রক্তপরিষ্কারক ও প্রস্রাব বৃদ্ধি করা গুণ আছে। মৃগী রোগে কণ্টকারীর আটা নাকে দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

চোক উঠিলে কণ্টকারীর পাতার রস চক্ষে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

যখন দাঁতের বেদনায় মানব অতিশয় কাতর হয় দাঁতের মাড়ি ফুলিয়া উঠে এবং যখন পোকা ধরিয়া দাঁত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন কণ্টকারীর ফল তামাকের মত কলিকাতে সাজিয়া উহার ধূম মুখে করিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কণ্টকারীর মূলচূর্ণ, লাল চিনি ও গো দুগ্ধ এই কয়েক দ্রব্য মিশাইয়া পান করিলে বীর্য্যস্তম্ভনের পক্ষে বিশেষ উপকার করে।

বামুনহাটীর পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে কণ্টকারীর ব্যবহার দেখা যায়। একটী শ্বেত কণ্টকারীর মূল ২॥০ আড়াইটা মরিচের সহিত প্রাতঃকালে ঋতুর কয়েক দিবস সেবন করিলে বাধক জন্য যাহাদের সন্তান হয় নাই তাহাদের গর্ভ হয়। এই ঔষধটী বিশেষ পরীক্ষিত। মাত্রা ৵০ আনা। যে জ্বরে অতিশয় কাশি থাকে এবং কফ অতিশয় প্রবল থাকে সেখানে কণ্টকারী, বাকস, গোলমরিচ, তেজপাত, ও মিছরি সমভাগে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে পাক বন্ধ করিয়া সেই শেষ আধ পোয়া প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাবেলা আবার সেই মত প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে তৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কণ্টকারীর আর একটী গুণ আছে। যে জমিতে অতিরিক্ত পরিমাণে কণ্টকারী জন্মে সেই জমি যদি বর্ষার প্রথমে চাষ দিয়া তাহাতে জল বাঁধিয়া রাখা হয় তাহা হইলে সেই কণ্টকারী পচিয়া জমির বিশেষ উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। যে জমিতে অতিরিক্ত সার দেওয়া হয় সে জমি অপেক্ষা যে জমিতে কণ্টকারী জন্মায় এবং উক্ত প্রকারে তাহার প্রতিকার করা হয় সে জমি বেশী উর্ব্বরা হয়।

যখন কোন গৃহে মূষিকের উৎপাত হয় এবং অনেক গর্ত্ত করিয়া উৎপাত আরম্ভ করে তখন কণ্টকারী গাছ আনিয়া সেই মূষিকের গর্ত্তের মধ্যে দিলে মূষিক পলায়ন করে এবং যাহাদের গোল আলুর ব্যবসা আছে কিম্বা চাষে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা মূষিকের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে গোল আলু বিছাইয়া রাখেন, সেইখানে সেই আলুর মধ্যে মধ্যে কণ্টকারী গাছ আনিয়া রাখিয়া দিলে আর ইন্দুরে উৎপাত করিতে পারে না। এই কৌশল অনেকে অবলম্বন করিয়া মূষিকের উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

অনশন

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী

বৈজ্ঞানিকগণ মানব দেহকে ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইঞ্জিন যেমন উপযুক্ত কয়লা ও জল না হইলে আপনার কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, উপযুক্ত খাদ্য বিনা মানব দেহও সেইরূপ অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

পৃথিবীর যাবতীয় মানব সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে প্রতিদিন কিছু না কিছু আহার করিয়া থাকে। শরীর ধারণের উপযুক্ত হউক আর অনুপযুক্তই হউক, স্বল্পই হউক, আর অধিকই হউক, সুখাদ্যই হউক আর কুখাদ্যই হউক সকল মানবই আহার করিয়া থাকে। খাদ্য দ্রব্যের নিতান্ত অভাব না হইলে মানুষ যেরূপই পারুক কিছু না কিছু আহার করে। ১১৭৬ সালে বঙ্গ দেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় (যাহাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে) তাহাতে বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। তাহা ব্যতীত ইতিহাসে আর সেরূপ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎপর দেশ ভেদে, স্থান ভেদে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশ-হিতৈষী বহুব্যক্তি নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টের জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ক্রমে খাদ্য দ্রব্যের অসম্ভব দুর্ম্মূল্যতায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রতি রোজ প্রতি মানবের মধ্যে ভীষণ

ভাবে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে কত লোককে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ইহলীলা শেষ করিতেছে কয়জন লোক তাহার হিসাব রাখিয়া থাকেন। রাজা প্রজা, দীন দুঃখী প্রায় সকলেই দুর্ভিক্ষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্য, বল, সাহস উদ্যম ও অধ্যবসায় হারাইয়া ক্রমে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছেন। সে সকল হিসাব নিকাশ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অনশনে থাকিলে মানব দেহ কত দিন জীবিত থাকিতে পারে ও তজ্জন্য দেহে কিরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় ও সেই পীড়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় চিকিৎসকগণ কিরূপ ভ্রমে পতিত হন তাহা প্রদর্শন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেক গ্রন্থকার, প্রবন্ধ লেখক, ও বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানব ৪০ দিন পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য আহার না করিয়া জীবিত থাকিতে পারে এবং অল্প আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ও শুধু জল পান করিয়া মানুষ তিন মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু অনশনজনিত দেহের নানারূপ পরিবর্ত্তন ও নানা প্রকার পীড়াক্রান্ত হইয়া সে জীবলীলা শেষ করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনশন জনিত দেহের অবস্থান্তরের বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা—

পর্ব্ব ভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎ নাশোঽরুচি তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্র নেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোহতীক্ষ্ণ মূর্দ্ধবাতস্তমোহৃদি।
দেহাগ্নিবলনাশশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥

(চরক সংহিতা—সূত্র স্থান)

পর্ব্বভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, কাস, মুখ শোষ, ক্ষুধানাশ অরুচি, তৃষ্ণা, শোত্র ও নেত্রের দুর্ব্বলতা, মনের ব্যাকুলতা, সর্ব্বদা উর্দ্ধবাত, হৃদয়ের মোহ এবং দেহ ও অঙ্গের বলক্ষয় ক্ষীণের ফল।

সিনক্লেয়ার সাহেব তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনশনে প্রত্যহ প্রায় অর্দ্ধসের করিয়া শরীরের ভার কম হয়। প্রথমতঃ শরীরস্থ চর্ব্বি ও পরে মাংস প্রভৃতি অন্যান্য শারীরিক উপাদান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

দীর্ঘ অনশনে প্রথম দুই তিন দিন প্রবল ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে হয়। তৎপরে একেবারেই ক্ষুধা থাকে না। শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে।

বয়স ও শরীরের অবস্থাভেদে অধিক বা অল্প দিন উপবাস সহ্য করিতে পারা যায়। বৃদ্ধ লোকের যুবা অপেক্ষা, যুবকগণ বালকগণ অপেক্ষা অধিক দিন উপবাস সহ্য করিতে পারে।

দীর্ঘ অনশনে রাগপড়া (এনিমিয়া) উপস্থিত হয়, শরীর কৃশ, চক্ষু উন্মিলিত ও আরক্তিম হয়; পেটে বেদনা হয়, সর্ব্বাঙ্গ না কাঁপিলে উপশম বোধ হয়। অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে। চর্ম্ম শুষ্ক এবং ধূসরবর্ণ হয়। জিহ্বা ও গলা শুষ্ক, পাকস্থলী ও অন্ত্র শূন্য ও সঙ্কুচিত হয়। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, প্রস্রাব অল্প ও লাল বর্ণ হয়। পেশী সকল কোমল, ক্ষীণ, রসহীন এবং শরীর দুর্গন্ধ যুক্ত হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও দুর্গন্ধ হইয়া থাকে, ত্বকের উপর এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ উৎপন্ন হয়। সেই সকল কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখিতে সাদা গাত্রের ময়লা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দাঁতের মাড়ি পরিপূর্ণ হয়। তাহা হইতে অল্পেই রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। চক্ষে ক্ষত হয় (কর্ণিয়াক্ষত)। সমস্ত শরীর কঙ্কালে পরিণত হয়। নাড়ী দুর্ব্বল ও মৃদুগতি হইয়া থাকে। নাড়ী মিনিটে ৪০ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে। দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত চলচ্ছক্তি লোপ পায়। গাত্রে বেদনা ক্ষুধার অভাব, পিপাসা, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির হ্রাস মনের চঞ্চলতা ও মোহ হইয়া থাকে।

অল্প বয়স্ক শিশু ও বৃদ্ধেরা অনশন জন্য অধিক দুর্ব্বল হয় ও তাহাদের জীবনীশক্তি শীঘ্র নষ্ট হয়।

খাদ্য দ্রব্যের অভাবে অখাদ্য আহার করিলেও অথবা স্বল্প, অনুপযুক্ত আহারীয় গ্রহণ করিলেও উপরোক্ত অনেক লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পেটে অসহ্য বেদনা ও অতিসারাদি নানারূপ উপসর্গ উপস্থিত হয়।

এই সকল লক্ষণাদি প্রকৃত পীড়া না হইলেও অনেক সময় পীড়া বলিয়া লোকে চিকিৎসাধীন হইয়া থাকে। অনশন জনিত এরূপ পীড়ার কথা সহজে কেহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না। সে স্থলে এরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে অযথা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনেক চিকিৎসকই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন।

প্রবন্ধ লেখক পেটে অসহ্য বেদনাক্রান্ত এক রোগী চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন পরে জানিতে পারেন যে সেই রোগী ৩।৪ দিন অনশনে থাকিয়া পরে শুধু পাকা "বিচিকলা" তিন দিন সেবন করিয়াছে এবং তজ্জন্যই এরূপ বেদনার উদ্ভব হইয়াছে।

অনেক পরিবারে অল্পাহার জন্য এই সকল লক্ষণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সহরে না হইলেও অনেক পল্লী চিকিৎসক একটু অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিলেই এই সকল ভ্রম অনুধাবন করিতে পারেন। গাত্র কণ্ডু, চক্ষের পীড়া, দন্ত মাড়ির বেদনা ও শিথিলতা, রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি অনশনজনিত পীড়া অনেক চিকিৎসকেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন কিন্তু এই সকল পীড়া যে অনশনজনিত তাহা অনেকেই অনুধাবন করিতে চেষ্টা করেন না। এই সকল অনশন জনিত পীড়ার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে ঔষধে কোনই উপকারের সম্ভাবনা নাই। উপযুক্ত খাদ্য প্রদানই এই রোগের প্রকৃত ঔষধ। কিন্তু দীর্ঘ উপবাসের পর তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় যে অনেক সময় পাকাশয়ে কেন্সার ও ইন্‌ফ্লামেসন হইয়া থাকে এবং খাদ্যাদি গ্রহণ করিলেও অনেক সময়ে ২।৩ দিনের অধিক বাঁচিয়া থাকে না। প্রবল দুর্ভিক্ষের সময় এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

বর্ত্তমান বৎসরের অনশন সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। এ ভীষণ অনশন ক্রমে শরীর ক্ষীণ করিয়া লোককে মৃত্যু দ্বারে উপস্থিত করিতেছে।

"মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা"

লেখক—কবিরাজ শ্রীমুনীন্দ্র চন্দ্র লাহা।

১। ভাইট ও আনারস পাতা ছেচি লবে রস এক কাচ্চা।
বিট্ লবণ মিশিয়ে খে'লে মরে ক্রিমির ডাগর বাচ্চা॥

২। হলুদ পল্‌তার ছটাক রস পিপুল চূর্ণ রতি ছয়।
সপ্তাহ কাল সেবনেই কাম্‌লা নির্ম্মূল হয়॥

৩। তুলসীর রস দশ কুড়ি ফোঁটা মধু সহ খাওয়াইলে।
নব জ্বরে, সর্দ্দি কাসে, ভুগিবে না ছেলে পিলে॥

৪। ইক্ষু চিনি এক তোলা সোরা চূর্ণ রতি ছয়।
শীতল জল মিশিয়ে খেলে প্রস্রাব জ্বালা বারণ হয়॥

৫। শতমূলীর রস ও চিনি ত্রিফলার জল।
উন্মাদ রোগে নিত্য খেলে দেয় সদ্য ফল॥

৬। ধনে ভিজান জল এক ছটাক্ ইক্ষু চিনি অর্দ্ধ তোলা।
পান করিলে হরে তৃষ্ণা পিত্ত জনিত জ্বালা॥

৭। "গরম জল বোতলে ভরি বুলাইলে তল পেটে।
তলপেট ব্যথা বারণ হয় পনর মিনিটে॥

৮। তিল বা নারিকেল তৈলে মিশাইয়া চুণের জল।
ফেনাইয়া লাগাইলে পোড়ার জ্বালায় সদ্য ফল॥

৯। পাট পাতা, ধনে আর কোয়াসিয়ার জল।
সুদারুণ পিত্ত শূলে দেয় সদ্য ফল॥

১০। আতপ চাউল দূর্ব্বা বাটা সমভাগে খেলে।
ঋতু বন্ধ নাশ করে, স্রাব হয় সকালে॥

১১। ঘৃত সহ বেটে খেলে গিলা চারি আনা।
কমে রক্ত স্রাবাদি ও বাধক বেদনা।

১২। কুরচি বা অশোক ছালের ক্বাথাদি খাইলে।
রক্ত প্রদরাদি রোগ সারে অবহেলে॥

১৩। ভূমি কুষ্মাণ্ডের চূর্ণ দুগ্ধ সহ খেলে।
স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় স্তন্য শুকাইলে॥

১৪। মাখন, মিশ্রী, অশ্বগন্ধা, মধু, দুধের সর।
খেলে পুষ্টি, মনঃস্তুষ্টি কান্তি উজ্জ্বলকর॥

১৫। "অশ্বগন্ধা চূর্ণ খেলে গরম দুগ্ধ সনে।
মোটা ও বলিষ্ঠ হয় স্ফূর্ত্তি জন্মে মনে॥

১৬। কচি আম পাতার রস শশা বীজের শাস।
স্তন দুগ্ধে বেটে খেলে হিক্কা হয় নাশ॥

১৭। কাঁচা বেল পোড়া প্রাতে ইক্ষু গুড়ে খেলে।
দুঃসাধ্য গ্রহণী রোগ সারে অল্প কালে॥

১৮। পদ্ম গুড়চির ক্বাথ খেলে ইক্ষু চিনি সনে।
বাতরক্ত বা হাত পা দাহ সারে সাত দিনে॥

১৯। ধনে, মৌরী, হরিতকী, মিশ্রী, শুক্‌নো গোলাপ ফুল
ভিজিয়ে খেলে নাশে বায়ু, পিত্ত, কোষ্ঠবদ্ধ শূল॥

২০। যোয়ান, মৌরী, লং, বিট্‌লবণ সমভাগে বেটে।
লেবুর রস মিশিয়ে খেলে ভুগবে ক্ষুধার চোটে॥

২১। পাকিবার হলে পাকে বস্‌বার হলে বসে।
ফোড়া, বাগী পাকে, বসে তোক্‌মার পোল্‌টীসে।

২২। সিদ্ধ নিম পাতা বাটা ঘৃত সনে মিশাইয়া।
প্রয়োগেতে ফোড়া, বাগী যায় শুকাইয়া॥

শিশুর চিত্ত বৃত্তি

মায়ে-ঝিয়ে কথা হইতেছে।

মা—শ্রীমতী বিমলা বর্ষিয়সী মহিলা, সুশিক্ষিতা শৈশবে পিতৃগৃহে এবং বিবাহের পর উচ্চ শিক্ষিত স্বামীর যত্নে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্ল বালা আসন্ন-প্রসবা—সম্প্রতি শ্বশুরালয় হইতে পিতৃ গৃহে আসিয়াছে। দুপুর বেলা আহারাদির পর অবসর পাইয়া মায়ে-ঝিয়ে আলাপ করিতে বসিয়াছেন। প্রফুল্লও তাহার বয়সের উপযোগী সাধারণ শিক্ষা পাইয়াছে। মায়ের দৃষ্টান্তে লেখা পড়া শিখিতে তাহারও আগ্রহ কম নয়।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মা, খোকার মনের শিক্ষা কবে থেকে আরম্ভ হতে পারে?" বিমলা সময়ান্তরে প্রফুল্লকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, জননীই সন্তানের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী। ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক, তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে; এবং মা-ই সেই শিক্ষা দিবেন। যত শীঘ্র সম্ভব, ছেলে-মেয়েকে সভ্যতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা শিখাইতে হইবে। তার পর, উপযুক্ত বয়স হইলেই তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিতে হইবে। যে দিন প্রফুল্ল বুঝিতে পারিল যে, সে সন্তানের জননী হইতে চলিয়াছে, সেই দিন হইতেই সে মায়ের উপদেশ স্মরণ করিয়া, ভাবী সন্তানকে কিরূপে সুশিক্ষা দিয়া জননীর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। আজও সেই কথা মনে করিয়াই মাকে ঐ প্রশ্ন করিল।

মা বলিলেন, "যে দিন খোকা ভূমিষ্ঠ হবে, সেই দিন থেকেই তার মনের পরিণতি সাধনের জন্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করতে হবে।"

"এক দিনের ঐ অতটুকু ছেলে! দিন কতক তাকে দোলায় চাপিয়ে দোল খাওয়াতে হবে না? তাকে কাছে নিয়ে শুয়ে আদর-সোহাগ করতে হবে না! প্রথম দিন থেকেই এতটা শক্ত হতে গেলে, ছেলে হাঁপিয়ে উঠবে যে! না মা, সে আমি পারব না। আঁতুড়ের কচি ছেলেকে মা আদর করবে না? আমি তার কড়া মেজাজের মাষ্টার হতে চাই না মা! আমি তার সত্যিকারের মা হতে চাই।"

"তা' হতে তোমাকে আমি বারণ করি না বাছা। সে কথা আমি বলিও নি। আমার কথাটা তুমি ঠিক বুঝতে পার নি। কিম্বা, আমিই তোমাকে কথাটা ঠিক করে বলি নি, উল্টা করে বলেছি। আমার বলবার মানে, যে দিন তোমার ছেলে পেট থেকে পড়বে, সেই দিন থেকে তোমার নিজের শিক্ষা আরম্ভ হবে। তুমি সাবধানে, সংযত ভাবে থাকলে তোমার ছেলের সুখের সীমা থাকবে না; কিন্তু তোমার নিজের একটু কষ্ট হতে পারে। সে কষ্ট তোমাকে সহ্য করতেই হবে। তুমিত এত দিন শ্বশুরবাড়ী ছিলে,—তোমার শাশুড়ী কি তোমাকে রাত দিন সাবধান করত না?"

"ও মা! সে কথা আবার বল্‌তে! তাঁর সাবধানের জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠে ছিল। এখানে এসে দু' দিন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। বাবাঃ! রান্নাঘরে যাবার হুকুম ছিল না,—ছাতে ওঠবার যো ছিল না! যেখানে যখন তখন শোবার যো ছিল না! খাবার সময়ের এক চুল এ দিক ও দিক করবার যো ছিল না! বাপ্ রে বাপ!"

"তবেই দেখ। এসবই কিন্তু তোমার পেটের ছেলের জন্য।"

"যত দিন শ্বশুর বাড়ীতে ছিলুম, তত দিন ত শাশুড়ী নিজেই চব্বিশ ঘণ্টা টিক্‌টিক্ করতেন। আবার, যে দিন এখানে আসি, সে দিনও কত সাবধান করে দিয়েছেন,—এ খেয়ো না, তা' খেয়ো না, এ কাজ করো না, সে কাজ করো না; এই করবে, তাই করবে সে কত! কই, তুমি ত এতটা কর না!"

"আমি করি নি, তোমার কোন অন্যায় দেখি নি বলে'। অন্যায় দেখলে আমাকেও করতে হবে বই কি। ছেলের পাছে কোন কষ্ট হয়, কি অসুখ বিসুখ হয়,—সে জন্যে পোয়াতিকে খুব সাবধানে থাকতে হয় বই কি। যাক্, কি কথা থেকে কি কথা এসে পড়ল। বলছিলুম কি,—ছেলেকে ঠিক সময়ে খাওয়াতে হবে, ঠিক সময়ে শোয়াতে হবে; একচুল এ দিক ও দিক করলে চলবে না। ছেলের খাবার সময় হলে, তোমার যতই অসুবিধা হোক্, যে কাজেই তুমি ব্যস্ত থাক না কেন, তোমাকে সব কাজ ফেলে এসে, ছেলেকে মাই দিতেই হবে। আবার, ছেলে কাঁদলেই যে তার মুখে মাই পুরে দিয়ে কান্না থামাতে হবে, এটীও অন্যায়। সে কাঁদলেও ঠিক সময়ের আগে তাকে খেতে দেবে না। ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে তাকে নাওয়াতে হবে; শোবার সময় হলে, ঠিক সময়টিতে শোয়াতে হবে! রোজ সকালে তাকে ঠিক সময়ে মাই দেবার পর দোলায় শুইয়ে দেবে। ছেলেকে ঠিক মত মানুষ করতে হলে, ছেলের মাকে নিজেকে আগে ভাল করে শিখতে হবে। এমন শিক্ষা বই পড়ে, কি অন্য কোন রকমে হয় না। মেয়ে মানুষের এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর নেই।"

"আচ্ছা মা, এসব ত খালি তার দেহের শিক্ষা; মনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কি? আমার খোকার কথাই ধর। তার মনে এখনও আঁচড়টি পর্য্যন্ত পড়ে নি। স্কুলে যেতেও এখনও তার পাঁচ বছর দেরী। এর মধ্যে তার মনকে শিক্ষা দেবার জন্যে তার মাকে কি করতে হবে?

"তোমার মনের কথা আমি বুঝেচি। কিন্তু তুমি যা' মনে করছ, ঠিক তা' নয়। যত কচি ছেলেই হউক, তার মনে যে একটীও রেখাপাত হয় নি, তা মনেও কোরো না। শিশুর মনটিকে তুমি বরং এক-খানা শাদা কাগজের সঙ্গে তুলনা করতে পার। তবে তাতে লেখা আছে,—কিন্তু তা' অদৃশ্য কালিতে। এখন সে লেখা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু একটু তাপ দিলেই সেই সাদা কাগজের উপর কালো লেখা ফুটে উঠবে। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার মনের যে অবস্থা থাকে, সেই অবস্থাটুকু লক্ষ বৎসর কি তারও বেশী দিন ধরে পরিণতি পেয়েছে। (মা বোধ হয় হিন্দু সংস্কারানুসারে পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করে' এই কথা স্মরণ করে' এই কথা গুলো বলেছিলেন।) তার মনের কল কব্জা এমন ঠিক ভাবে বসানো যে, কিছু কাল একটু তাপ-সেক, একটু হাওয়া, একটু খানি ঘুমের জোরে সেই কল কব্জা গুলো এমন নিখুঁত আর নিয়মিত ভাবে কাজ করতে থাকে, যে, একটু খানি লক্ষ্য রাখলে কোন সময়ে তার মনের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে তা তুমি ঠিক ঠিক বলে' দিতে পারবে। কোন্ মাসে সে 'মা' বলতে শিখবে, কোন্ মাসে 'কথা বলতে শিখবে, কোন মাসে খাবার চেয়ে খেতে শিখবে, কোন্ মাসে খেলনার দাবী করবে,—এ সবই ঠিক বলা যায়।"

"কিন্তু সে ত অনেক দিনের কথা। যে সময়ে সে 'মা' 'বাবা' বলতে শিখবে, সে সময়ে ত তার মনে অনেক খানি পরিণতি হয়েছে। কিন্তু তার আগে তার আগে কি শিশুর মন ভাবনা-চিন্তা-শূন্য,—নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না! এ অবস্থাটাকে নিষ্ক্রিয় বলতে হবে; কেন না, মনের কাজই হচ্চে নানা বিষয় স্মরণ করে রাখা, আর ভেবে চিন্তে একটা সিদ্ধান্ত করা। কিন্তু এই অবস্থায় তার মন ত এ সব কিছুই করতে পারে না?"

"তুমি যা' বল্‌ছ, তা' কতকটা ঠিক বটে। কি এর মধ্যে একটা কথা বুঝে দেখতে হবে। শিশু মুখে যত দিন না কথা ফোটে তত দিন সে কোন কথা মনে করে রাখতে কিম্বা কিছু সিদ্ধান্ত করতে পারে না বটে, কিন্তু তখনও তার মন একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়। তার ক্ষিধে পেলে সে কাঁদে। তার মনই তাকে কাঁদায়। কিন্তু জেনে শুনে নয়। তার পর তুমি তাকে পেট ভরে দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিলে তার কান্না থেমে গেল। উলটে সে আনন্দে হাত

নেড়ে খেলা করতে লাগল.; মিট মিট করে চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল; চাই কি একটু একটু হাসতেও লাগল। তুমি হয়ত তার সামনে খানিকটা লাল সালু ঝুলিয়ে দিয়ে গেলে, সে এক দৃষ্টে তাই দেখতে লাগল; হয় ত সেটা নেবার জন্যে হাত বাড়াতেও লাগল। এ সবই তার মনের ক্রিয়া। কিন্তু জেনে শুনে নয়। এই অবস্থাটাকে তার মনের পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থা বলা যায়; কিন্তু তবু তার মন তখন নিষ্ক্রিয় নয়। তার পর তার মুখে যখন কথা ফুটতে আরম্ভ হল,—সে মা, বাবা বলতে শিখলে তখন থেকে তার মনের সজ্ঞান অবস্থা আরম্ভ হল। সে যে মা বলছে তা' জেনে শুনেই বলছে। অর্থাৎ মা বললে কি বোঝায় তা সে জানে, মাকে চেনেও। তেমনি যখন বাবা বলতে পারে, তখন তা' জেনে শুনেই বলে, আর বাবাকে চিন্তেও পারে। এটী হল সজ্ঞান অবস্থা। তবে এই সজ্ঞান অবস্থার কম বেশী আছে। তার বয়স যত বাড়তে থাকে, জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে কিন্তু তার মনের অজ্ঞান অবস্থার ক্রিয়া তার জন্মের অনেক দিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়। তোমার পেটের ভেতর ছেলে নড়ে টের পাও না?"

মেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে পেটে হাত দিয়া বলিল, "হ্যাঁ নড়ে বই কি? এই যে দেখ না,—এই খানে. মাথাটা ঠেলে ঠেলে দিচ্চে! ঐ সরে গেল।"

"পেটের ভেতরের ঐ ছোট্ট ঘরটিতে তার যখন যে ভাবে থাকলে আয়েস বোধ হয়, তখন সেই ভাবে থাকে। এই যে নড়া চড়া,—এটা তার আয়েস-বুদ্ধির ফল—তার মনেরই ক্রিয়া। তবে এই ক্রিয়াটা অনেকটা স্বতঃই হয়।"

মেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া হাসিয়া বলিল, "বল কি মা! পেটের ভেতরেই ছেলের এত আয়েস-বুদ্ধি হয়েছে, যে, সে আয়েস মাফিক থাকবার জন্যে নড়ে, চড়ে?"

"তা' বই আর কি! তবে তুমি যে ভাবে কথাটা বলছ, ঠিক সে ভাবে নয়। আমরা আয়েস বলতে যা' বুঝি, সে রকম আয়েস নয়। তবে অনেকক্ষণ একভাবে থাকবার পর আমরা যে হাত পা নেড়ে একটু ভিন্ন ভাবে বসি বা দাঁড়াই—সেই রকম আর কি। অর্থাৎ, তোমার নড়া চড়া থেকে ছেলের মনে অজ্ঞাত সারেই এক একটা দাগ পড়ে যাচ্ছে। এই ধর, তুমি যখন চলে বেড়াচ্ছ তখন তোমার পেটের ভেতর ছেলে দোল খায়। এই দোল খেতে খেতে এই ভাবটা তার মনে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। জন্মাবার পর সেই জন্যে দোলায় শুয়ে দোল খেতে তার খুব আয়েস হবে। আর, তোমার পেটের ভেতরে থাকবার সময়ে সে দোল খেতো, একথা তার মনে পড়ে যাবে,—যদিও তার মনের কথা সে প্রকাশ করে বলতে পারবে না।"

আহারে মানসিক বিকৃতির ফল

লেখক ডাক্তার—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বক্সী

মানসিক বিকৃতি অবস্থায় কাহাকেও কোন প্রকার আহার্য্য প্রদান করিলে, সেই খাদ্য বস্তু ভোজনে ভোক্তার স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে দেখা যায়। এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার জন্য এ প্রবন্ধটির অবতারণা করা হইল।

এ বিষয়ের আলোচনা করিতে, আমরা দুইটি বিষয় সম্বন্ধে আপাতত বলিব। প্রথমতঃ প্রসূতীর এবং পালয়িত্রীর (Wet nurse) স্তন্য দ্বারা আপনাপন সন্তানকে পালন করা সম্বন্ধে। দ্বিতীয়তঃ কাহারও নিজে রন্ধন করিয়া বা পক্ক অন্নাদি অপরকে খাইতে দেওয়া

সম্বন্ধে। এই দুই ভাবের আহার্য্যেই মানসিক বিকৃতির ফল কিরূপ হইতে পারে তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

স্তন্য দানের সময় স্ত্রীলোকের মন যাহাতে প্রশান্ত আনন্দপূর্ণ ও বেশ সহজভাবাপন্ন থাকে সেই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় স্তন্যদায়িনী কাহারও সহিত ভয়ানক দোষপরবশ বিষম ঝগড়ায় ব্যাপৃত থাকার সময় সন্তানকে স্তন্য পান করাইতেছেন। না হয়, নিজে যখন অত্যন্ত শোকগ্রস্ত, কোন কারণে ভীত ও মন্ত্রস্থ অথবা কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার ভীষণ পরামর্শে লিপ্ত সেই সময়ে তাহার তাহার সন্তানকে স্তন্যপান করাইতেছেন। এ সকলে কি ভীষণ বিষময় ফল ফলিয়া থাকে তাহা হয় ত তাহাদের সন্তানের অসুখ করিয়াছে। মায়ের স্তন্যের ক্ষীর যে বিষে পরিণত হওয়ায় এ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা এদেশের কয়জন লোকে বুঝিয়া থাকে?

কয়েকটি উদাহরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

একটী স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া তাঁহার সন্তানকে স্তন্য পান করালে, দুগ্ধ পান করিবার কিছুকাল পরেই সন্তানের সমস্ত শরীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল (শৈশবাপেক্ষা)। যখন বিবিধ উপায় অবলম্বনেও শিশুটি আরোগ্য লাভ করিল না তখন ডাক্তার বুল সাহেবকে (Thomas Bull) দেখান হইল। তাঁহার পরামর্শে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করালে সন্তানটি শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিল।

ডাক্তার বুল সাহেব আরও একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। দুই বৎসর তিন মাস বয়স্ক একটী শিশু উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয় ও তাহার শরীরে ঘন ঘন আক্ষেপ হইতে থাকে। ডাক্তার বুলকে ইহার চিকিৎসার্থ ডাকা হইলে তিনি আসিয়া দেখেন যে শিশুটীর যন্ত্রণা-সূচক রোদন ধ্বনিতে গৃহস্থিত যাবতীয় লোক অত্যন্ত সন্ত্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তার অনুসন্ধানে জানিলেন এই শিশুটির পালয়িত্রীর পিতা মদ্য পান করিয়া আসিয়া তাহাকে (পালয়িত্রীকে) বহুবিধ তিরস্কার ও প্রহার করিয়াছিল। ইহাতে পালয়িত্রীর মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া তাহার স্তন্যদুগ্ধ বিকৃত করিয়াছে, এই স্থির করিয়া তিনি অপর প্রতিপালিকার হস্তে হস্তে শিশুটীর পালনের ভার প্রদান করিলেন। অবিলম্বে শিশুটী রোগমুক্ত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পূর্ব্বোক্ত প্রতিপালিকার স্তনে আর সেই অবধি দুগ্ধের সঞ্চার হইল না।

ডাক্তার ভলয়্যামন সাহেবের উদাহরণ পড়িলে আরও আশ্চয্যান্বিত হইতে হয়।

এক সূত্রধর কোন সৈনিক পুরুষের সহিত ঘোরতর অসি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে তাহার স্ত্রী অত্যন্ত ভীতা হইয়া উভয়ের মধ্যে গিয়া পড়ে, এবং সৈনিক পুরুষের হস্ত হইতে তরবারি খানি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করে। অবশ্য বিবাদ তখনই মিটিয়া যায়। ইহার কিঞ্চিৎ পরে সূত্রধর রমণী আপন সন্তানকে স্তন্য পান করাইবা মাত্র শিশুটি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

এ সকল ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নহে। আমার বিশ্বাস প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিনিয়ত ছেলেদের বিকৃত দুগ্ধ পান জনিত অসুখ হইতেছে। কিন্তু তাহা আমরা কয় জনে বুঝিতে পারি? ঐ প্রকারে হঠাৎ মরিয়া না গেলেও, অনেক শিশুই যে মাতার মানসিক বিকৃত জনিত বিকৃত-দুগ্ধ পান করিয়া কঠিন রোগগ্রস্ত হইতেছে তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

তবে একটি কথা। আমাদের দেশে স্তন্যদায়িনীদের মধ্যে এই মানসিক বিকৃতি জিনিসটা এতই বাহুল্য যে শিশুগণ ক্রমাগত বিষ পানে অভ্যস্ত হইয়া প্রায় "নীলকণ্ঠ" পড়িয়াছে। অভ্যস্ত হইয়া গেলেও এই প্রকারের ব্যারামের সংখ্যা খুব কম নহে।

অতএব প্রসূতী ও পালয়িত্রীগণ যখন ক্রোধান্বিতা থাকেন, ভয়ে অভিভূতা ও শোকে বিমর্শ হন, যখন মনে হিংসা দ্বেষ ও ঈর্ষা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি নিচয় জাগরূক থাকে, সে সময়ে তাহাদের আদরের দুলালদিগকে কদাচ স্তন্যপান করাইবেন না। এ সময়ে স্তন্য বিকৃত এবং

অত্যন্ত অল্প পরিমাণে নিস্থত হইয়া বালকের সাংঘাতিক রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া পড়ে।

কেবল প্রসূতী বলিয়া কেন, স্ত্রীলোকদিগের কোন মাতৃজাতি, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব সময়ে পরকে খাওয়াইতে ও সেবা করিতে হয়, তাঁহারা যদি মানসিক বিকারগ্রস্ত হন তবে জগৎ যে ধ্বংস হইয়া যাইরে! এই সকল ভাব মনে পোষণ করিয়া কাহাকেত খাইতে দিলে তাহার কি আর রক্ষা আছে!!

আমি জানি অবিশ্বাসী আমার এ কথা শুনিয়া হাসিবেন; মানসিক বিকারে স্তন্যদুগ্ধ বিকৃত হয় তাহা অতি কষ্টে বিশ্বাস করিতে পারিলেও, তাহারা একথা কখনই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে মানসিক বিকৃতি সম্পন্না নারীর হাতের মধ্য দিয়া এই সকল মানসিক মানসিক ভাব সমূহ অপরের শরীরে সঞ্চারিত হইতে পারে। ইহা তাহাদিগের নিকট হাস্যোদ্দীপক বলিয়াই মনে হইবে।

কিন্তু ইহাতে হাস্য করিবার কিছু নাই। মানসিক শক্তির ক্রিয়া কেমন প্রচণ্ড ভাবে কাজ করিতে পারে তাহা আজকাল পাশ্চাত্য মহাত্মগণও একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। আমি কেবল আমাদের দেশেরই দোহাই দিতেছি না।

আজকালকার কথা নহে, বহু শতাব্দি পূর্ব্বে ইংলণ্ডের জনসমূহের এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস কিরূপ ছিল তাহা মহামতি সেক্ষপিয়ারের কমেডি অব এরারস্ Comedy of Errors) নামক বই হইতে আমরা বেশবুঝিতে পারি। সেটি আমি সংক্ষেপে বলিব।

Comedy of Errorsএ সন্ন্যাসিনী (Abbess) আড্রিয়ানাকে (Adriana) তাহার (ভুল) স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার কারণ সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"Thou say'st his meat was sauc'd with thy upbraidings:
Unquiet meals make ill digestions;
Thereof the raging fire of fever bred:
And what's a fever but a fit of madness?"
[Act V. Scene I]

ইহার কথায় কথায় অনুবাদ (litteral translation) নিষ্প্রয়োজন। ইহার তাৎপর্য্য মোটামুটি এই।

সন্ন্যাসিনী আড্রিয়ানাকে বলিতেছেন তুমি যে তোমার মাংস মসলা সংযুক্ত করিবার কালে তোমার স্বামীকে তিরস্কার করিয়াছ, অর্থাৎ সে সময় তোমার মানসিক বৃত্তি তোমার স্বামীর প্রতি কতকগুলি খারাপ ভাব পোষণ করিতেছিল তাহাতেই তাহার খাদ্য উদ্বেগপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর করিয়াছে। তাহাতে তাহার খাদ্য পরিপাক হয় নাই, সেই জন্য তাহার শরীরে জ্বরভাব প্রকাশ পাইয়াছে, শেষে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়াছে।

আমাদের দেশেও এই রকম বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে।

শাস্ত্রে অধীরা অর্থাৎ পতি-পুত্র-হীনা রমণীর হাতে খাওয়া নিষেধ আছে। কিন্তু এই অধীরা খুব নিকট আত্মীয় হইলে এবং সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হইলে দোষ নাই। শাস্ত্রকারগণ বলেন এবম্বিধ রমণীগণের শরীরে এমন কিছু দোষ আছে যে জন্য তাহার পতি পুত্র মৃত হইয়াছে। এ প্রকার স্ত্রীলোক বিষকন্যা সঙ্খার মধ্যে তাঁহারা পরিগণিত করেন। যেমন সামরিক বিষ কন্যা রজস্বলা রমণীর হাতে খাওয়া নিষেধ; সেইরূপ এই প্রকারের স্ত্রীলোকদিগের হাতেও ঐ কারণে খাওয়া নিষিদ্ধ। তার পর যাহারা কুৎসিৎ স্বভাবাপন্না, হিংষা দ্বেষ ও ঈর্ষা পূর্ণা, এবং যাহারা ভোক্তার প্রতি সদ্ভাব পোষণ করেন না এরূপ স্ত্রীলোকের হাতেও খাওয়া নিষিদ্ধ।

পিতা মাতা সুহৃদ, বৈদ্য (চিকিৎসক) পুণ্যাত্মা প্রভৃতি যাঁহারা সর্ব্বদা হৃদয়ে সদ্ভাব ও সদিচ্ছা পোষণ করেন তাহাদের দৃষ্ট ও প্রদত্ত অল্প স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। পরন্তু দীন হীন, ক্ষুধার্ত্ত, পাষণ্ড, ক্লৈব, রোগী, প্রভৃতির দৃষ্ট ও প্রদত্ত অন্ন অতীব দূষনীয়। ভোজনের সময় ইহারা খাদ্য দ্রব্যে দৃষ্টিপাত করিলেও তাহা ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

এই সকলের ব্যাখা ও কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আমি এ স্থলে সময় ও শক্তির অপচয় করিতে চাই না।

বিশ্বাসী পাঠক ইহা হইতেই এ সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এ সম্বন্ধে মহাভারতে বড় একটী সুন্দর কথা আছে। তাহা আমি এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

যখন শ্রীকৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডবগণের মঙ্গলার্থ কৌরব সভায় সন্ধি করিবার সঙ্কল্পে গমন করিয়াছিলেন তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সকলেরই হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছেন—

"লোকে হয় প্রীতি পূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি-সহকারে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?"

অনেক বড় লোকের কৃপা ভিখারী দিগেরও এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সক্ করিয়া ও সৌভাগ্য মনে করিয়া যাহারা বড় লোকের বাড়ীর অনাদৃত ও হাত ঝাড়া অন্নে উদর পূর্ত্তি করে তাহারা প্রায়ই হীন স্বাস্থ্য ও নীচ প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাচ্ছিলতার সহিত যাহা দান করা হয় সেই দান প্রতিগ্রহ কারীর শারিরীক ও মানসিক অবনতি যে অবশ্যম্ভাবী এ কথাও কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে?

এ সম্বন্ধে একটী মাত্র উদাহরণ দিব তাহাতেই পাঠকগণ সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

কোন একটী বড় লোকের বাড়ীতে এক কড়াই পূর্ণ (প্রায় ৫।৬ সের হইবে) জাল দেওয়া দুগ্ধে একটী ইন্দুর পতিত হইয়া মরিয়া যায়। দয়াবতী গৃহিণী তাহা নিজ স্বামী পুত্র দিগকে খাইতে না দিয়া পাড়ার কতিপয় গরিব গৃহস্থ দিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। বড় লোকের বাড়ীর ভেট্ আসিয়াছে বলিয়া বুক ফুলাইয়া লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। হায়! হায়!! তাহাদের এই সাধের গর্ব্ব নিভিয়া গেল পরদিন, যখন দেখা গেল তাহাদের অনেকেই বিষম পেটের অসুখে ও ভয়ানক বমিতে আক্রান্ত হইল! সকলেই বাঁচিল বটে, হতভাগ্যেরা তবুও ভাবিতে পারিল না যে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি সেই বড় লোকেরই দান সম্ভূত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে। অতএব সকলেরই বড় লোকের বাড়ীর ভেট লইতে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

অশ্রদ্ধার সহিত, তাচ্ছিলের সহিত; হিংষা দ্বেষ ও অসম্মানের ভাবের সহিত শুধু যে মানসিক বিকার জনিত বিষ সঞ্চারিত হয় তাহা নহে, ইহাদের সহিত এই প্রকারের অখাদ্যও যে অনেক সময়ে প্রদত্ত হইয়া থাকে ইহাও সকলের জানিয়া রাখা দরকার। কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দত্ত যে অন্ন তাহা খুদ হইলেও ও ভারতবর্ষে তাহা আজও "বিদুরের খুদ" বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

অনেকে হয় ত অবগত আছেন যে জলপড়া (mesmerised water) দ্বারা অনেক সময় অনেকে ব্যারাম হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। এই জল পড়া কার্য্যকারকের (operator) প্রবল ইচ্ছা শক্তি বা (will force) প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মানসিক বিকৃতি গ্রস্তের প্রদত্ত আহার্য্যও দূষিত ও অনিষ্টকারী হইয়া থাকে। আবার এ কথাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে লোকের মঙ্গল করা অপেক্ষা লোকের অনিষ্ট করাটা অনেক সোজা।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

কলিকাতায় কুষ্ঠ ব্যাধি—

এই কলিকাতা সহরে পথে বাহির হইলেই নিত্য বহু সংখ্যক কুষ্ঠ রোগীকে রাজপথে অবাধে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এই দৃশ্য কেবল যে নয়নের পক্ষে ক্লেশদায়ক, তাহা নহে; ইহা সাধারণের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকরও বটে। হাটে বাজারে ইহারা যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে সুস্থকায় ব্যক্তিরা ইহাদের সংস্রবে আসিয়া পীড়িত হইতে পারে; এবং অনুসন্ধান করিলে হয় ত দেখা যাইবে, অনেক সুস্থ লোকে না জানিয়া শুনিয়া কুষ্ঠ রোগীর সংস্রবে আসিয়া, কিম্বা তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া নিজেরাও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। রবিবারে ইহারা দলে দলে ভিক্ষায় বাহির হয়। পাল পার্ব্বন উপলক্ষে গঙ্গাতীরে, কালীঘাটে কিম্বা অন্য কোন তীর্থক্ষেত্রে যেখানে অনেক লোকের সমাগম হয়, সেইখানে ইহাদিগকে ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। অন্য সময়েও যে সকল রাস্তা দিয়া সচরাচর বহু লোকে যাতায়াত করে, সেই সকল রাস্তার ধারে বসিয়া ইহারা ভিক্ষা করে। তার পর তাহারা স্থান ত্যাগ করিলে দেখা যায়, তাহাদের পরিত্যক্ত নিষ্ঠিবন, থুতু, সিকনী, গয়ের, শ্লেষ্মা, কিম্বা তাহার ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ-রক্তে সেই স্থানটি পূর্ণ হইয়া আছে। ক্রমে সেই সকল দ্রব্য শুকাইয়া গেলে তাহার উপর দিয়াই লোকে যাতায়াত করিয়া থাকে। এইরূপে কুষ্ঠ রোগের বীজ যে সুস্থ দেহে সঞ্চালিত হইতে পারে না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না; বরং সঞ্চালিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সেই জন্য অনেকে বিবেচনা করেন, কুষ্ঠ রোগী মাত্রকেই স্থানবিশেষে বাস করিতে বাধ্য করা উচিত। তাহা হইলে এই রোগ যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। নচেৎ কুষ্ঠ রোগীদের সর্ব্বত্র অবাধ-ভ্রমণের অধিকার থাকিলে, রোগ-বিস্তৃতির গুরু সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীদিগকে এক স্থানে কোন কুষ্ঠাশ্রমে বাস করিতে বাধ্য করিতে হইলে আইন চাই। কুষ্ঠ রোগীদের সম্বন্ধে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিরচিত ভারত গবর্ণমেণ্টের তৃতীয় আইন নামে যাহা আছে, তাহা এ পক্ষে যথেষ্ট নহে। সেই জন্য উক্ত আইনের সংশোধন, বা প্রয়োজন হইলে নূতন আইন রচনা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে; এবং আপাততঃ বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। সে দিন সার ফ্রাঙ্ক কার্টার মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কুষ্ঠ রোগ এবং কুষ্ঠ রোগী সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তদন্তের জন্য একটী কমিশন বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কলিকাতার হেলথ অফিসারও এইরূপ একটী কমিশন বসাইবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঢাকায় বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুরও একটী বক্তৃতায় কুষ্ঠ রোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা আনুমানিক দুই লক্ষ। এক মাত্র কলিকাতা সহরেই ১০০০ কুষ্ঠ রোগী বাস করে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সহরে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহা অবশ্যই আতঙ্কের কথা। সুখের বিষয়, কুষ্ঠ রোগীদের সম্বন্ধে একটা যাহা হয় ব্যবস্থা হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। যেরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহা আমরা যথা সময়ে পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিব।

ইনফ্লুয়েঞ্জার তৃতীয় আক্রমণ—

ভারতবর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জায় তৃতীয় আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বোম্বায়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, আমরা গত মাসেই পাঠক পাঠিকাগণকে তাহার আভাষ দিয়াছি। বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এই তিনটি প্রধান নগরের কর্ত্তৃপক্ষ ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়াছেন। এবারকার আক্রমণ যদিও এখনও তেমন প্রবল হয় নাই, তথাপি, সাবধানের মার নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী হেলথ অফিসার মহাশয়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, লোককে জনতা পরিহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বড় বড় সভা সমিতি, স্কুল-কলেজ, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের স্থান—এই সকল স্থলে খুব জনসমাগম হয়। সমবেত জনতার মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা-পীড়িত লোক থাকিলে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস হইতে নির্গত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বীজ সুস্থদেহ লোকের শরীরে প্রবেশ করিয়া পীড়া উৎপন্ন করিতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা নিবারণের জন্য সভা সমিতির অধিবেশন সহজেই স্থগিত রাখা যায়; কিন্তু থিয়েটারে লোক সমাগম বন্ধ করা একটু কঠিন। থিয়েটারের অভিনয় কিছু দিনের জন্য বন্ধ না রাখিলে, কেবল লোককে থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিলে, কোন ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য নহে, সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য থিয়েটারগুলির দিকে কর্ত্তৃপক্ষের একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ইংরেজী থিয়েটারগুলির সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই; কিন্তু বাঙ্গলা থিয়েটারগুলির সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাহাতে আমাদের মনে হয়, আমাদের থিয়েটারগুলির ব্যবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। তার মধ্যে প্রধানতম এই যে এখানে বায়ু সঞ্চালনের বন্দোবস্তের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। এখন থিয়েটারে যদিও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু থিয়েটারগুলিতে এত বেশী লোক জমে যে, পাখার হাওয়ায় বিশেষ কোন ফল ফলে না। কষ্ট হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মেয়েদের। তাঁহারা দ্বিতল ও তৃতলে থাকেন;—নীচের তলায় শত শত লোকের পরিত্যক্ত উত্তপ্ত প্রশ্বাস বায়ু উপরে উঠিয়া মহিলাগণের সমূহ কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। থিয়েটারের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। আমরা সময়ান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। তার পর হেলথ অফিসার মহাশয় স্কুলে জনসমাগম নিবারণে যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা কতদূর সম্ভব, তাহা বিবেচনার স্থল। গত বৎসর ইনফ্লুয়েঞ্জার দরুণ স্কুল কলেজ অনেক দিন বন্ধ থাকায় ছেলেদের পড়াশুনার সময় অনেকটা নষ্ট হইয়াছে। এবারও কি তাহাই হইবে? তদপেক্ষা, আমাদের বিবেচনায় আর একটী কাজ করিলে ভাল হয়। মিউনিসিপ্যালিটী নিজ ব্যয়ে একজন কি দুইজন সুযোগ্য ডাক্তার নিযুক্ত করুন, যিনি ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব কমা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যত দিন না মিউনিসিপ্যালিটী সহরটি

ইনফ্লুয়েঞ্জা-রোগমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত, প্রত্যহ প্রত্যেক স্কুল কলেজে গিয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন, এবং কাহাকেও ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত বলিয়া বুঝিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে Segregate করিবার অর্থাৎ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে ছেলেদের পড়াশুনার ততটা ক্ষতি হইবে না, অথচ, রোগের বিস্তৃতি নিবারণের পক্ষেও অনেকটা কাজ হইতে পারিবে।

কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ—

বেলগেছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক অধিবেশনে যে রিপোর্ট পঠিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়, কলেজ-বাটী তৈয়ার করিতে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ৯২০ জন ছাত্র এবং পূর্ব্ব বৎসর ৬২৮ জন ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইতে আসিয়াছিল; কিন্তু স্থানাভাবে ২৬৭ জনের অধিক ছাত্রকে গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই। এই ঘটনাটি হইতে স্বর্ব্বই প্রমাণিত হইতেছে যে, শিক্ষিত যুবকদের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপায় অবলম্বন করিবার জন্য আগ্রহ কত অধিক। ৯২০ জন ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইতে চায়; অথচ কলেজে আড়াই শতের অধিক ছাত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার স্থান নাই। সুতরাং দেশের অভাব মোচনের পক্ষে উচ্চ শ্রেণীর মেডিক্যাল কলেজ আরও কতগুলি দরকার, তাহাও এই ঘটনা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। এদিকে দেশে সুচিকিৎসকেরও অভাব যথেষ্টই রহিয়াছে। পল্লীগ্রামের অনেক স্থলেই ভাল ডাক্তার কবিরাজ নাই; সুতরাং সেই সকল স্থানের লোকেরা পীড়িত হইলে সুচিকিৎসকের সাহায্য পায় না। বস্তুতঃ কলেজ স্থাপিত হইলে, তাহাতে কখনও ছাত্রাভাব হইবে না; এবং ছাত্রগণ কৃতবিদ্য হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনেরও অসুবিধা হইবে না। কিন্তু কলেজ স্থাপনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়—অর্থাভাব। কিন্তু প্রতি বৎসর নানা রোগে, বিনা চিকিৎসায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশের তুলনায় এই অর্থাভাবের অসুবিধা অকিঞ্চিৎকর। কয়েকটি কলেজ স্থাপন করিতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে, তদপেক্ষা বিনা চিকিৎসায় কালের করাল কবলে পতিত লোকগুলির প্রাণের মূল্য কি নিশ্চয়ই বেশী নহে? অতএব আমরা মনে করি, প্রজার প্রাণ-রক্ষার্থ ধনী-নির্দ্ধন-নির্ব্বিশেষে দেশের লোকেরই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য, যে কোন উপায়েই হউক, যথোপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিয়া দেওয়া উচিত। আচ্ছা, শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতি যে উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদেশে ছাত্র প্রেরণ করিতেছেন, সেই উপায়ে, অর্থাৎ যত বেশী লোকের নিকট হইতে সম্ভবপর—বাৎসরিক দুই আনা বা চারি আনা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটির গঠন করিয়া মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা যায় না কি?

কলেরা বা বিসূচিকা।

কলেরা তীব্র ছোঁয়াচে ব্যাধি। কলেরার লক্ষণ,—প্রবল ভেদ, বমন এবং মোহ। 'কোচের কোমা ভিব্রিওজ' (Koch's comma vibrios) নামক বিশেষ এক শ্রেণীর জীবাণু হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

ইতিহাস ও প্রাদুর্ভাব।

কলেরা রোগের সর্ব্ব প্রথম প্রাদুর্ভাবের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, উহা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতেই সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে ইহা এতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং ইহাতে এত বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, যে, লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল, ইহা কোন নূতন পীড়া। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ, সংস্কৃত চিকিৎসা শাস্ত্রে এবং হিপোক্রেটের বিবরণীতে এমন রোগের প্রাদুর্ভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহার সহিত কলেরার লক্ষণগুলি হুবহু মিলিয়া যায়। তাহা ছাড়াও, যে সকল ইউরোপীয় চিকিৎসক সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই রোগের প্রাদুর্ভাবের বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষে প্রায়ই কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। বিশেষতঃ, গঙ্গা নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে, চীন দেশের দক্ষিণাংশে এবং সম্ভবতঃ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে কলেরার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। কয়েক বৎসর অন্তরে ইহা স্থানে স্থানে সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচ্য দেশ-সমূহেই প্রায় ইহার সংক্রামকতা দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে কলেরা ব্যাধি বহুবার সমস্ত সভ্যজগতে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছিল।

আমাদের দেশ প্রয়াগের বা হরিদ্বারের কুম্ভমেলা, পুরীর রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের সময়ে যখন বহু তীর্থ-যাত্রী এক স্থানে সমবেত হয়, সেই সময়ে তথায় কলেরা প্রায় সংক্রামক রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতায় যে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভা হইয়াছিল,—গঙ্গানদীর মোহানাস্থিত গঙ্গাসাগর তী হইতে প্রত্যাগত তীর্থযাত্রীদিগের দ্বারাই তাহা এখা আনীত হইয়াছিল। এই সকল উৎসব-স্থলে স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত নির্দ্দোষ না হওয়ায়, এবং বিশু পানীয় জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত না থাকায়, তী যাত্রীদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এই সকল তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেকে বহু দূরবর্ত্ত স্থান হইতে তীর্থ দর্শনে আসিয়া থাকে। তীর্থক্ষেত্রে বা পথিমধ্যে কলেরার বীজ তাহাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর, তাহারা নিজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাদের শরীরে কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপে নানা স্থান হইতে সমাগত যাত্রীরা তীর্থক্ষেত্র হইতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলে, একই সময়ে দেশের বিভিন্ন অংশে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কোন একটী বড় উৎসবের পর ভারতে প্রায়ই এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়।

কলেরা কিরূপে সংক্রামিত হয়।

(১) পানীয় জল বিষাক্ত হইয়া। জলই কলেরা প্রধান বাহন। অতীত কালে যে সকল স্থলে কলে সংক্রামক রূপে দেখা দিয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধা করিতে গিয়া জানা গিয়াছে, পানীয় জল দূষিত হইয়া ঐ সকল স্থলে কলেরা সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছিল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে হাম্বার্গ নগরে একবার সংক্রামক কলে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সে ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছি সহরের পানীয় জল কলেরার বীজাণুর দ্বারা বিষা হইয়া যাওয়াতেই নগরবাসীরা কলেরার দ্বারা আক্রা হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর অন্তর্গত হাম্বার্গ ও আলটো নগর পরস্পরের খুব নিকটেই অবস্থিত। এল্‌ব্‌ ন হইতে উভয় নগরেই পানীয় জল সংগৃহীত হ

আলটোনা নগরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। এল্‌ব্‌ নদী হইতেই জল সংগৃহীত হইত বটে, এবং এই নগর হাম্বার্গ অপেক্ষা নদীর মোহানার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় হাম্বার্গ নগরের পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা নদী পথে নিঃসৃত দূষিত জলের সাহায্যে আলটোনার পানীয় জল বিষাক্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু এই নগরের পানীয় জল বালুকাপূর্ণ ফিলটারের ভিতর দিয়া শোধন করিয়া লওয়া হইত বলিয়া, ইহা ততটা অনিষ্টকর হইতে পারে নাই। কিন্তু হাম্বার্গের জলসরবরাহকারক কোম্পানী এতটা সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। হাম্বার্গের পানীয় জলের দূষিত অবস্থা এবং আলটোনা নগরের পানীয় জলের বিশুদ্ধতা একটী আশ্চর্য্য উপায়ে বেশ স্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা গিয়াছিল। একটা রাস্তা ছিল, যাহার এক পার্শ্বের বাড়ীগুলিতে হাম্বার্গের কোম্পানী জল সরবরাহ করিতেন; আর, যে প্রধান নলের ভিতর দিয়া আলটোনায় জল সরবরাহ করা হইত, সেই নলের সহিত ঐ রাস্তার অপর পার্শ্বের বাড়ীগুলির জলের কলের সংযোগ ছিল। যাহারা আলটোনার জল পাইত, তাহাদের মধ্যে একজনও রোগাক্রান্ত হয় নাই; কিন্তু রাস্তার যে ধারের লোকেরা হাম্বার্গের জল পাইত তাহাদের মধ্যে বহু লোক কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হয়। নদীর জল কিরূপে দূষিত হইয়াছিল, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছিল। এক হাজার রুসিয়ান ভ্রমণকারী আমেরিকায় যাত্রা-কালে পথিমধ্যে এল্‌ব্‌ নদীর তীরে কলেরাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের দ্বারাই নদীর জল দূষিত হয়। ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া যায়, পানীয় জলের বিশুদ্ধিতা রক্ষা করা মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে কত বড় গুরুতর কার্য্য। বড় নগরেই হউক বা ছোট গ্রামেই হউক, মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে পানীয় জলের উপর লক্ষ্য রাখা অতীব আবশ্যক। কলিকাতা, এবং ভারতের অন্যান্য বড় নগরে পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পরেই ঐ সকল স্থলে কলেরার প্রকোপ বহু পরিমাণে কমিয়া যায়। দূষিত জল যে কলেরার প্রধান কারণ, ইহাও তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ছোট ছোট গ্রামে যখন কলেরা দেখা দেয়, তখন, যে পুষ্করিণী বা কূপ হইতে লোকে সাধারণতঃ পানীয় জল সংগ্রহ করে, সেই পুষ্করিণী বা কূপের জল শোধিত করিয়া লইলে, এবং কেহ যাহাতে পুনরায় ঐ পুষ্করিণী বা কূপের জল দূষিত করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তথায় চৌকিদার বসাইলে, যে অর্থব্যয় হয় তাহাও সার্থক হয়, এবং গ্রাম হইতে কলেরাও দূরীভূত হয়। কারণ, প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন গ্রামে একজন লোক কোনরূপে মারাত্মক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলে, তাহার দুই এক দিন পরেই ঐ গ্রামের আরও অনেক লোকে কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বহু বারই দেখা গিয়াছে।

২। দুগ্ধ দূষিত হইয়া।—দুগ্ধের দ্বারা কলেরা রোগের বীজাণু কেবল যে সংক্রামিত হয় তাহা নহে; দুগ্ধের মধ্যে অবস্থিতি কালে কলেরার বীজাণু পুষ্টি লাভ এবং বংশবৃদ্ধি করে। দূষিত দুগ্ধ পান করিয়া অনেক স্থলে বহুলোক একই সময়ে এক সঙ্গে কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। গোয়ালারা দুগ্ধে মিশাইবার জন্য যে জল ব্যবহার করে, সেই জল কলেরার বীজাণুদুষ্ট হইলে দুগ্ধও দূষিত হইয়া পড়ে। গোয়ালারা এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মূর্খ লোক যে, দুগ্ধে মিশাইবার জন্য তাহারা যে জল ব্যবহার করে সে জল বিশুদ্ধ কি না, সে বিষয় তাহারা গ্রাহ্যই করে না; যেমন তেমন জল পাইলেই হইল। তবে পান করিবার পূর্ব্বে দুগ্ধ উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া লইলে অগ্নিতাপে কলেরার বীজাণু মরিয়া গিয়া দুগ্ধ অনেকটা নিরাপদ হইতে পারে। এই বিষয়ে ইউরোপীয়ানদিগের অসুবিধা কিছু অধিক। কারণ, আমরা যেমন জ্বাল না দিয়া কখনও দুগ্ধ পান করি না, ইউরোপীয়ানদিগের মধ্যে সে প্রথা নাই,—তাঁহারা বিনা পাকেই দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন।

৩। দূষিত খাদ্য এবং মাছির সাহায্যে।—কলেরা রোগের বিস্তৃতি সাধনে কীট-পতঙ্গাদি বড় কম সহায়তা করে না। কলেরা-বীজাণু দুষ্ট পদার্থের সংস্পর্শে আসিবার পর তাহারা খাদ্যাদির উপর আসিয়া বসিয়া সেগুলিকে দূষিত করে। এ বিষয়ে সাধারণ মাছিই খুব বেশী অনিষ্ট করিয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কলেরার বীজাণু মক্ষিকার দেহে চৌদ্দ দিন জীবিত থাকিতে পারে। কেবল ইহাই নয়; মক্ষিকাদিগের একটা কুৎসিত স্বভাব এই যে, তাহারা প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার করিয়া মলত্যাগ করে, এবং তদপেক্ষাও ঘন ঘন বমন করিয়া থাকে। অনভিজ্ঞ জনসাধারণ মক্ষিকাদিগের রোগ-সম্প্রসারণ-শক্তির কথা অবগত না থাকায়, এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন না, বা কোনরূপ সতর্কতাও অবলম্বন করেন না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, মক্ষিকাদিগের দ্বারা আমাদের কি ঘোর অনিষ্টই না সাধিত হইয়া থাকে। একবার আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছিল, ছয় বর্গ-ইঞ্চি স্থানের মধ্যে মক্ষিকাদিগের বমির চিহ্ন ১১০০ এবং বিষ্ঠা ত্যাগের চিহ্ন ৯টি ছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে, বাজারের খাদ্য কি ঘোর অনিষ্টকর; কারণ, এই খাদ্যে সর্ব্বদাই মাছি বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি মিঠায়ের দোকানদারদিগকে তাহাদের প্রস্তুত মিঠাইগুলি কাচের বাক্স বা আলমারির মধ্যে রাখিতে বাধ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যে কেহ একটু লক্ষ্য করিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন, দোকানদারেরা মিউনিসিপ্যালিটির আদেশ কি ভাবে পালন করিয়া থাকে। আলমারি বা বাক্সের কাচগুলির দশা দেখিলে ইহা বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না যে, মিষ্টান্নাদি আলমারির ভিতর রাখিবার উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হয় না। আলমারির কাচ ভাঙ্গিয়া গেলে, তৎপরিবর্ত্তে নূতন কাচ বসাইয়া দেওয়া প্রায়ই হয় না। ভাঙ্গা কাচের যায়গাটা অনাবৃতই থাকিয়া যায়। তার পর, আলমারি বা বাক্সের কাঠের ঠাটটি বজায় থাকিলেই, কর্ত্তব্যপরায়ণ মিউনিসিপ্যালিটিও তাঁহাদের আদেশ পালি হইতেছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এদিকে, সেই অ কাশের ভিতর দিয়া মক্ষিকাকুল অবাধে বাক্সে প্রবে করিয়া যথারীতি খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিয়া তাহাদে চিরাভ্যস্ত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। অনে দোকানদার আবার মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-বিভাগ কর্ম্মচারীদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য আলমারিটিকে সা স্বরূপ রাখিয়া, মিষ্টান্নগুলিকে উত্তমরূপে সাজাই আলমারির বাহিরেই রাখিয়া দেয়। আবার কলেরা প্রকোপের সময়ে রেল ষ্টেসনের হকারদিগের নি হইতে খাদ্য ক্রয় করিয়া খাওয়া আরও বেশী বিপজ্জনক কারণ, গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের প্রসঙ্গেই ব হইয়াছে, কলেরা রোগাক্রান্ত তীর্থযাত্রীরা রেল ষ্টীমারপথে নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়া থাকে তাহাদের মলমূত্রাদি বা তাহাদের দেহ-নিঃসৃত অন্য পদার্থ হইতে কলেরা রোগের বীজাণুর মক্ষিকা-বাহ ষ্টেসনস্থিত হকারদিগের মিঠান্নে সঞ্চালিত হওয়া বি নহে।

৪। কলেরা ভিব্রিও।—পূর্ব্বোক্ত তিনটি উপা অর্থাৎ দূষিত দুগ্ধ, দূষিত জল ও দূষিত খাদ্যের ম বর্ত্তিতার comma vibrios মানবদেহে প্রবেশ কর আরনেষ্ট হার্ট একবার বলিয়াছিলেন, "তুমি কলে ভক্ষণ করিতে পার, তুমি কলেরা পান করিতে পা অথচ তুমি কলেরা দ্বারা আক্রান্ত না হইতে পার সুপরিচালিত কলেরা হাসপাতালে রোগীর পরিচ কারীরা কলেরা দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় লোকের খাদ্য ও পানীয় কলেরা বীজাণুর দ্বারা দূ না হইলে কেহ সহজে কলেরার দ্বারা আক্র হয় না। কিন্তু খাদ্য পানীয় কিরূপে দূষিত হই পারে? কলেরা রোগীর মলমূত্রাদি এবং বমিত প কলেরা রোগের বীজাণুতে পূর্ণ থাকে। এই স বীজাণু ধ্বংস করিতে না পারিলে,—ঐ সকল মূত্র বা বমিত পদার্থ পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলিলে, অথবা বিশোধক ঔষধের দ্বারা সে

নষ্ট করিয়া না ফেলিলে তাহাই ক্রমে মানুষের খাদ্য ও পানীয়ের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণের স্বাস্থ্য বিপন্ন ও ক্ষুণ্ণ করে। কলেরা রোগী আরোগ্য লাভ করিবার পর পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত তাহার পরিত্যক্ত মলের মধ্যে কলেরা ভিব্রিওর অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সময়টাই সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক; কারণ, এই সময়েই লোকে মনে করে, রোগী ত আরাম হইয়া গিয়াছে; অতএব আর তাহার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। এই সময়ে রোগীর মলের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনে অবহেলা করাতেই রোগীর মলের সংস্পর্শে আসিয়া পানীয় জল দূষিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে, এবং তাহার ফলেই কলেরা আবার বিস্তৃতি লাভের সুযোগ পায়।

দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যের অপচয় নিবারণ

ভারতবর্ষে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব হইয়াছে; গরীব লোকের কষ্টের একশেষ হইয়াছে; সকলে পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পাইতেছে না; অনেকের এক বেলাও অন্ন জুটিতেছে না। ইতোমধ্যেই দরিদ্রশ্রেণীর লোকের ঘরে অনশন-ব্রত,—উপবাস আরম্ভ হইয়াছে। সংবাদপত্রে দেশব্যাপী হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। সরকার বাহাদুরের আসন টলিয়াছে; খাদ্যশস্যের আমদানী-রপ্তানী নিয়মিত করিবার এবং মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার প্রস্তাব ও উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

দুর্ভিক্ষের কয়েকটী আনুষঙ্গিক বিষয় আছে। তন্মধ্যে একটী,—মহামারী। দেশে প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, খাইতে না পাইয়া, অথবা অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া অনেক লোকে রোগাক্রান্ত হয়। দুর্ভিক্ষের ফলে কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। ইতিহাসে এরূপ ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত আছে। দুর্ভিক্ষ-জনিত মহামারীর প্রকোপের সময় সরকার বাহাদুর, জনসাধারণ, এবং চিকিৎসক সম্প্রদায়ের এক একটী বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। এই বিষয়টি অতি গুরুতর, এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমরা পরে তাহার আলোচনার চেষ্টা করিব। আপাততঃ, দুর্ভিক্ষের সহিত পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অপর একটি বিষয়ের এখানে আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

দুর্ভিক্ষের অর্থ, খাদ্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য। এ সময়ে লোকে জীবন ধারণের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে না। এমনই দুর্দ্দিনে যে অল্প পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহার যাহাতে কোনরূপ অপচয় না ঘটে, সে দিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য; অপচয় ঘটিলে, তাহা নিশ্চয়ই নিন্দার বিষয় হয়। ভাত, ডাল, মাছ—ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। রুটি লুচি অবস্থাপন্ন লোকদিগের সৌখীন খাদ্য,—উহা সর্ব্বসাধারণের খাদ্য নহে। এই ডাল-ভাতের নিত্য কিরূপ অপচয় ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা দেখাইয়া দিতেছি। অন্ততঃ, দুর্ভিক্ষের খাতিরেও এই অপচয় নিবারণ করা সকলেরই উচিত কি না, তাহা পাঠক-পাঠিকারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা কেবল উদর পূর্ণ করা, ক্ষুধার শান্তি করা খাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য নহে; খাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য,—শরীরের পুষ্টিসাধন করা, শরীরকে সবল ও কর্ম্মক্ষম রাখা, দুর্ব্বল দেহে যাহাতে রোগ পীড়া প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা। সুতরাং যে খাদ্যে আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন হয়, তাহাই আমাদের প্রধান খাদ্য, এবং খাদ্য গ্রহণ করিবার পর, তাহার যতটুকু শরীরকে পোষণ করে,

প্রকৃত পক্ষে সেইটুকুই আমরা আহার করি। খাদ্যের যে অংশ শরীরে শোষিত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে না, যথাসময়ে দেহ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া নির্গত হইয়া যায়, তাহাকে খাদ্য বলিতে পারি না। আমরা নিত্য যে ডাল-ভাত খাই, তাহার কতখানি আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করে, প্রকৃতপক্ষে তাহার কতখানি অংশ আদায় হয়, এইবার তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

খাদ্য শরীরে শোষিত হইতে গেলে, পাক-যন্ত্রস্থিত পাচকরস-সহযোগে তাহার পরিপাক হওয়া আবশ্যক। এই পরিপাক হইতে গেলে তাহার পরিপাকের উপযোগী অবস্থায় পাকযন্ত্রে আসিয়া পৌছানো চাই। ভুক্ত দ্রব্যের যতটুকু অংশ দন্তদ্বারা উত্তমরূপে চর্ব্বিত হয়, পাকযন্ত্রের পাচক রস কেবল সেইটুকু মাত্র পরিপাক করিতে পারে, এবং তাহাই শরীরে শোষিত হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। কিন্তু আমাদের আহার্য্য গ্রহণ প্রণালীর দোষে আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনেকটা পরিমাণেই ব্যর্থ হইয়া যায়। যাঁহারা রুটী, লুচি, মাংস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন দ্রব্য আহার করেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ সকল খাদ্য কিয়ৎ পরিমাণে চর্ব্বণ করিতে হয়; নচেৎ ঐ সকল খাদ্য গলাধঃকৃত হয় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শ্রেণীর খাদ্য আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের খাদ্য নহে। আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের খাদ্য ডাল ভাত। সুতরাং তাহা কতটা আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করে, এখানে তাহাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

উপরে খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল,—আহার করিবার সময় এত কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা আহার করি না। ক্ষুধা নিবারণের জন্যই প্রধানতঃ আমরা আহার্য্য গ্রহণ করি। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই শীঘ্র শীঘ্র খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হওয়া প্রয়োজন। আবার যাঁহাদিগকে আহারাদি করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কোন কার্য্যে যোগ দিতে হয়,—যেমন আপিসের কেরাণী, স্কুল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোক—তাঁহাদিগকে আবার আরও তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া লইতে হয়। তা' ছাড়া, অভ্যাসবশতঃ কিম্বা আলস্যবশতঃ আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণেই, আহারের জন্য যতটা সময় ব্যয় করা প্রয়োজন, ততটা সময় ব্যয় করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকেও খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়াই গিলিয়া ফেলিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আহার করিবার সময়, আহার্য্য-দ্রব্য কিরূপ অবস্থায় আনিলে তাহা অক্লেশে গলাধঃকরণ করা যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সকলে আহার করেন; এবং খাদ্যদ্রব্যকে সেই অবস্থায় আনিবার জন্য—অর্থাৎ সহজে গলাধঃকরণ করিবার জন্য যতটুকু চর্ব্বণ করা প্রয়োজন, প্রায় সেইটুকু চর্ব্বণ করিয়া থাকেন; তাহার অধিক কিছুই করেন না।

ডাল এবং ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। এই দুইটী জিনিসই নরম। সুতরাং কেবল গলাধঃকরণ করিবার জন্য ইহাদিগকে প্রায়ই চর্ব্বণ করিতে হয় না। বিনা চর্ব্বণেই যে ডাল ভাত উদরস্থ হয়, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, যদি কোন লোক আহারের অব্যবহিত পরে কোন কারণে বমন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে প্রায় দেখা যায়, আস্ত আস্ত গোটা গোটা ভাত ডাল প্রভৃতি বমনকালে বাহির হইয়া আসে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং চিকিৎসক মাত্রেই এ বিষয়ে একমত যে, উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে পাক-যন্ত্রস্থিত পাচক রস খাদ্যকে জীর্ণ করিতে পারে না, তাহা শরীরে শোষিত হইয়া দেহের পুষ্টি-সাধন করিতে পারে না। ভগবান আমাদিগকে যে সুন্দর মুক্তাপংক্তির মত দুই পাটি দন্ত দিয়াছেন, তাহা কেবল মুখমণ্ডলের শোভা সম্পাদনের জন্য নহে কিম্বা কিঞ্চিৎ চর্ব্বণের দ্বারা খাদ্যদ্রব্যকে গিলিবার উপযোগী করিয়া দিবার জন্য নহে। উহার একটা মস্ত বড় ব্যবহার আছে। আহারকালে আমরা সেই প্রধান বিষয়টিই ভুলিয়া যাই, সেদিকে আদৌ মনোযোগ দি

না। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিলে তবে তাহা পাচকরসের দ্বারা জীর্ণ হইতে পারে। তাহার উপর চর্ব্বণকালে যে লালা নিঃসৃত হয়, তাহাও খাদ্যকে পরিপাক করিবার পক্ষে অনেকটা সহায়তা করে। অচর্ব্বিত বা অল্প-চর্ব্বিত খাদ্য উদরস্থ হইলে তাহা প্রায়ই জীর্ণ হয় না। কারণ, পরিপাকযন্ত্রের মধ্যে ত দন্ত নাই, যে, তাহা দন্তের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে! সাধারণ বাঙ্গালী যে প্রায় অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকেন, খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করাই তাহার কারণ।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া, আশা করি, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা যাহা নিত্য আহার করি, তাহার কতখানিই বা প্রকৃতপক্ষে কাজে লাগে, এবং কতটারই বা অপচয় হয়। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন খাদ্যদ্রব্যের এত অনাটন, তখন যে অল্প পরিমাণ খাদ্য আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার যাহাতে বেশী অপচয় না ঘটে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শিশুর চিত্ত-বৃত্তি

দিন দুই তিন পরে একদিন বিমলা দেবী আহারাদির পর উপরে আসিয়া একটু দিবা নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে কন্যা প্রফুল্লবালা আসিয়া বলিল, 'মা, আজ আর ঘুমিয়ে কাজ নেই। দুপুরবেলা ঘুমুলে গাটা বড় ম্যাজ ম্যাজ করে। সেই জন্যে আজ আর আমি শুই নি। সে দিন তুমি যে সব কথা বল্‌ছিলে, সেগুলি বড় ভাল কথা। সে সব কথা শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে, খুব উপকারও হয়। আজও তুমি আমাকে সেই রকম কিছু ভাল কথা বল না মা।"

"কি তুমি শুন্‌তে চাও বল। আমি যতটা জানি সব তোমাকে বল্‌ছি।"

"আমি আর কি বল্‌বো, তুমি নিজেই বল না।"

"কি, তবু একটু স্পষ্ট করেই বল। তুমি যখন শুন্‌তে চাচ্চ, তখন কি তোমার ভাল লাগে, তা অবিশ্যি তোমার মনে নিশ্চয়ই হয়েছে।"

"এই এখন আমাকে কি রকম ভাবে থাকতে হবে; ছেলে হলেই বা তাকে কি রকম করে মানুষ করতে হবে —এই এমনি সব কথা আর কি!"

"তোমার এ-সব কথা শোনবার জন্য আগ্রহ দেখে, আমার বড় আহ্লাদ হচ্চে। সে দিন যে সব কথা হয়েছিল, তা' তোমার মনে আছে?"

"হাঁ। সে কথা একটীও আমি ভুলি নি।"

"আমি কি একখানা বইতে পড়েছিলুম যে, আমরা মাঝে মাঝে এই রকম স্বপ্ন দেখি,—যেন আমরা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি;—মাটীতে পা ঠেক্‌ছে না; কিম্বা জলের উপর তেল, কি দুধের উপর সর যেমন ভেসে থাকে, মেঝেতে তেমনি ভাবে আছি—পায়ের ভর দিয়ে থাকতে হচ্চে না। যিনি এই বইখানি লিখেছেন, তিনি বলেন, মার পেটের ভিতরে থাকবার সময় ভ্রূণ ঠিক সেই রকম ভাবে ভেসে থাকে—" এইখানে মেয়ে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, ভ্রূণ কি?"

"ছেলে-মেয়ে যত দিন পেটের ভিতরে থাকে ততদিন অর্থাৎ প্রসব হবার আগে পর্য্যন্ত তাকে ভ্রূণ বলে। যাক্, কি বলছিলুম,—ভ্রূণ পেটের ভিতরে ভেসে ভেসে থাকে। বয়স হলেও, সেই স্মৃতিটী একেবারে মুছে যায় না। ঐ রকম স্বপ্ন দেখবার কারণ,—ঘুমন্ত

অবস্থায়, মানুষের সেই ভ্রূণ-অবস্থাটি মনে পড়ে—তাই সে ঐ রকম ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন দেখে। তা' হলেই বুঝতে পারছ, মায়ের পেটের ভিতরে থাকবার সময়েও ছেলের মন নিশ্চিন্ত থাকে না ;—তখন থেকে তার শিক্ষা রীতিমত চলতে থাকে।

তার পর, যে দিন সে প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কেঁদে উঠে। মার পেটে সে কেমন আয়েসে ছিল ;—এ কোথায় কঠিন মাটীতে এসে পড়ল! এ কান্নাটি ভয়ের নয়,—অস্বস্তির কান্না, এ কান্না কষ্টের ফল। এ থেকেও তুমি বুঝতে পারবে, ছেলে তখন থেকেই তার আয়েসটি বুঝে নিয়েছে। আয়েসের জায়গায় একটুখানি কষ্ট হলেই, সেটুকু তাঁর সহ্য হবে না,—তিনি কেঁদে সে কথা সব্বাইকে জানিয়ে দেবেন, —"ওঁ!" শুধু আয়েস নয়। মার পেটের ভেতর তিনি কেমন গরমে ছিলেন, কেমন নিয়মিত সময়ে নাড়ীর ভেতর দিয়ে খাবার এসে তাঁহার দেহখানিকে গঠন ও তার পুষ্টিসাধন করত, কেমন দোল খেত—এ সবই তিনি সেই সময় থেকেই রীতিমত বুঝে নিয়েছেন। বাইরে আসবার পর তাঁর গায়ে একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগল, দোল খাওয়া বন্ধ হল। এসব অসুবিধাই তিনি তখনই ধরে ফেললেন, আর আপত্তি জানিয়ে দিলেন। দাই তখনই তাঁকে হাতের চেটোয় তুলে নিয়ে একটু দোল খাওয়াবে ; কুসুম কুসুম গরম জল দিয়ে তাঁকে চান করিয়ে গা পুঁছিয়ে দিয়ে গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে দেবে। হয় ত বা দু'চার ফোঁটা দুধ কি দু'এক ফোঁটা মধু আঙ্গুলে করে তাঁর মুখে পুরে দেবে। এই সবগুলি হলে, তিনি বুঝতে পারবেন, তিনি তাঁর আয়েসের জায়গা থেকে নতুন জায়গায় এসেছেন বটে, কিন্তু এখানেও তাঁর যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। এইটি বুঝলে তবে তাঁর কান্না থামবে।"

"হ্যাঁ মা, ছেলে কি সত্যি সত্যি এ-সব কথা বুঝতে পারে ?" "পারে বই কি মা! তবে তুমি আমি যেমন করে বুঝি, সে রকম করে নয়। তার পর তাঁর নতুন অবস্থায় থাকতে তাঁকে অভ্যেস করতে হবে। পেটের ভেতর থাকবার সময় তিনি হাত পা গুটিয়ে মাথাটা বুকের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তাল পাকিয়ে ঐটুকু জায়গার মধ্যে বাস করছিলেন ; ভূমিষ্ঠ হবার পর একটু একটু করে হাত পা ছড়িয়ে তিনি বুঝতে পারেন,—তিনি আর সেই ছোট্ট ঘরটিতে নেই,—এখানে জায়গা যথেষ্ট। সেই দিন থেকেই তাঁর জায়গার পরিমাণের জ্ঞান আরম্ভ হবে। ভ্রূণ অবস্থায় তাঁকে আলাদা করে শ্বাস-প্রশ্বাস টানতে বা ত্যাগ করতে হত না ; মার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও সে কাজটা হয়ে যেত। এখন তিনি আর সে সুবিধাটি পাচ্ছেন না,—এখন থেকে তাঁকে নিজেকেই শ্বাস-প্রশ্বাস টানবার ও ত্যাগ করবার কাজ চালিয়ে নিতে হবে,—এক্ষেত্রে তিনি মার কাছ থেকে আর কোন সুবিধা পাবেন না। কাজেই, তখন থেকে তাঁকে নিজেকেই শ্বাস-প্রশ্বাস টানতে হবে। নিঃশ্বেস টানবার সময়,—পেটের ভিতর যখন তিনি ছিলেন, তখন বেশ গরমেই ছিলেন— বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁর নাকে ঢুকলেই, তাঁর হাঁচি পাবে,—তিনি হেঁচে উঠবেন। এর আগেই তাঁর একবার হাই তুলে, হাত পা ছড়িয়ে, কুঁচ্‌কে, বেঁকিয়ে আলিস্যি ভাঙ্গা হয়ে গেছে,—সে কথাটাও মনে রাখতে হবে। এর পর, একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবে, তাঁর স্বাদ, স্পর্শ, এ-সব জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্চে। চোখ দুটী মিটমিট করে তিনি দিনের সূর্য্যের আলোটাকে বা রাত্রের প্রদীপের আলোটাকে চিনে নিচ্চেন। ক্রমে তিনি খেতে, হজম করতে, ঘুমুতে শিখবেন। এই যে সকল ক্রিয়া—এ সমস্তই তাঁর মনের উপর কাজ করবে।"

মেয়ে অবাক্ হইয়া মায়ের এই সকল উপদেশ শুনিয়া যাইতে লাগিল। একটুখানি পরে বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন, "এর থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে তুমি তাকে যা শেখাবে, যে সকল অভ্যাস করাবে, সে তাই শিখবে, তাই তার অভ্যেস হয়ে যাবে। তাকে যদি তুমি ঘড়ি ধরে ঠিক সময়টিতে খাওয়াও, তা'হলে সেইটেই তার অভ্যেস হয়ে

যাবে, তখন খাবার সময় হলেই, সে কেঁদে তোমাকে সে কথা জানিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি যদি নিয়ম করে না খাওয়াও, তা' হলে তারও বদ অভ্যেস হয়ে যাবে ;—যখন তখন খাবার জন্যে কান্না ধরবে। এই রকম, তার সমস্ত অভ্যেসগুলি ঠিক নিয়মিত সময়ে নিয়মিত ভাবে হওয়া চাই। খাবার অভ্যেসটা এই রকম হলেই ভাল হয়,—ভোরে ছটার সময় আরম্ভ করে, সন্ধ্যা ছটা পর্য্যন্ত দু' ঘণ্টা অন্তর একবার করে খাওয়াবে ; রাত্রে ১০টার সময় একবার, ২টার সময় একবার হলেই যথেষ্ট হবে। দু'চার দিন একটু মনোযোগ দিয়ে এই অভ্যেসটি করিয়ে দিলেই খোকা যতই ঘুমুক না কেন, ঠিক সময়ে জেগে উঠবে,—আর সে সময়ে তুমি ঘুমোও, কি কাজে ব্যস্ত থাক, যাই কর না কেন, সে তোমাকে ডাকবে। এটা বড় সামান্য কথা মনে করো না। ঐ খাওয়ার অভ্যেসটি থেকে তার অন্য সমস্ত কাজে, এমন কি যথেষ্ট বয়স হবার পরও, সময় হিসেব করে চলবার অভ্যাস হয়ে যাবে। এ রকম অভ্যেস যাদের দাঁড়িয়ে যায়, তাদের আর কোন কাজে ঘড়ি দেখে সময় ঠিক করবার দরকার হয় না,—তারা নিজেই যেন এক একটা ঘড়ি হয়ে পড়ে,—ঘড়ি না দেখেও তারা দিনে রেতে সকল সময়েই ঘণ্টা মিনিট পর্য্যন্ত কাঁটায় কাঁটায় বলে দিতে পারে। সময়ের অভ্যেস হয়ে গেলে সকল কাজেই খুব সুবিধা হয়,—অনেক বড় বড় কাজও করা যায়।

এ রকম ঘড়ি ধরে কাজ করার সুবিধে অসুবিধে অনেক মা-ই জানে না। তারা তাদের কচি ছেলেকে যখন তখন ঘুম পাড়াচ্চে, যখন তখনই খেতে দিচ্চে। এতে ছেলের অভ্যেস এমন খারাপ হয়ে যায় যে, সেও তেমনি যখন তখন খেতে কি ঘুমুতে চাইবে। আর, ইচ্ছা হবামাত্র সেটি না করে দিলে আর রক্ষে থাকবে না,—কেঁদে বাড়ী মাথায় করবে। কচি আঁতুড়ে ছেলের রাগ দেখ নি ? ও বাবা! সে কি ভয়ানক রাগ! অনিয়মে আরও অনিষ্ট হতে পারে। পাকযন্ত্রগুলোকে বিশ্রামের অবসর না দেওয়ায় হজম ভাল হয় না। আমাদের কচি ছেলে মেয়েদের দুধতোলা অভ্যেসটি শুধু অনিময়ে খাওয়ানো শোওয়ানোর ফল। এই রকম বদ অভ্যেস যাদের দাঁড়িয়ে যায়, তাদের ঘুমও ভাল হয় না। অথচ নিয়মিত আর যথেষ্ট ঘুম শিশুর পক্ষে খুব দরকার। খাওয়াবার সময় যেমন ঠিক থাকা চাই, ঘুমোবার সময়টিও তেমনি ঠিক থাকা চাই। ঠিক সময়ে খাওয়ার অভ্যেসের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সময়ে ঘুমোবার অভ্যেসটিও করিয়ে দিলে ছেলের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকবে। সকল বিষয়েই এই রকম নিয়ম মেনে চলবার অভ্যেস করিয়ে দিলে ছেলের অনেক উপকার হতে পারে।

দু' চার মাস গেলে, ছেলে যখন সংসারের জিনিস-পত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে আরম্ভ করবে, তখন সে হাতের কাছে যে জিনিস দেখতে পাবে, তাই হাত বাড়িয়ে ধরতে যাবে। এতেও তাকে মানসিক শ্রম করতে হবে। ঐ যে জিনিসপত্র ধরবার চেষ্টা, ওটা খালি শারীরিক চেষ্টা নয়, মনেরও চেষ্টা। মন তাকে ঠেলা না দিলে তার হাত-পায়ে কোন চেষ্টার ভাব আসতেই পারে না। প্রথমে তাকে মনে মনে ভেবে নিতে হবে,—কোন দিক থেকে কেমন ভাবে হাতে বাড়ালে সে জিনিসটীকে ধরতে পারবে। প্রথম চেষ্টাতে না ধরতে পারলে আবার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় বারে না পারলে তৃতীয় বার। এমনি যতক্ষণ না সে জিনিসটিকে ধরতে পারে, ততক্ষণ চেষ্টা করতে ক্ষান্ত হবে না। কিন্তু দেখ্‌বে, প্রত্যেকবারই সে নূতন নূতন দিক থেকে চেষ্টা করচে। প্রথমবারের চেষ্টায় জিনিসটির নাগাল না পেলে, দ্বিতীয়বার হাতটা আর একটু বাড়িয়ে দেবে। তেমনি, প্রথমবার এক দিক দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে না পারলে দ্বিতীয়বার আর এক দিক দিয়ে হাত বাড়াবে। আবার নাগাল পেলেও, প্রথমবারই যে সে জিনিসটিকে মুটো করে ধরতে পারবে, তাও নয়। এদিকেও তাকে অনেকবার চেষ্টা করতে হবে। এ সমস্ত চেষ্টাই কিন্তু জেনো তার মানসিক ক্রিয়ার ফল। তার হাত পা মনের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এই রকম চেষ্টায় কখনও কখনও ঘণ্টার পর

ঘটা কেটে যায়, তবু তারা চেষ্টা ছাড়ে না, বিরক্ত হয়েও চেষ্টা ছেড়ে দেয় না। তিন-চার মাস বয়েস থেকে জিনিসপত্র ধরবার চেষ্টা আরম্ভ করে। আট-নয় মাস বয়সে তবে জিনিসটিকে ধরবার ক্ষমতা জন্মায়। এই বয়সে আর তাকে চেষ্টা বিশেষ করতে হয় না,—সে ইচ্ছে করলেই ঠিক জিনিসটির উপর হাত দিয়ে সেটি ধরতে পারে। এই ক্ষমতাটুকু লাভ করবার পর কিন্তু আর এ চেষ্টা তার ভাল লাগবে না। সে তখন অন্য বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ করবে। এ সবে তার কতখানি মানসিক পরিশ্রম হয় তা' বুঝতে পারছ কি? আট ন মাস বয়সে ছেলে উপুড় হতে চেষ্টা করবে। যখ চেষ্টা আরম্ভ হবে, তখনও তার উপুড় হবার ক্ষমত জন্মায় না। চেষ্টা করতে করতে তবে সে ক্ষমতা জন্মায়। এই পর্য্যন্ত বলিয়া, মা বলিলেন, "আজ আর নয় মা,—এখন একটুখানি গড়িয়ে না নিলে আমার আর কিছুতে চলছে না। বাকী কথা কাল হবে এখন।"

অগত্যা প্রফুল্ল মাকে তখন বিশ্রামের অবসর দি কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

ম্যালেরিয়া।

লেখক—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এসসি।

(ইহার প্রতিকার-কল্পে অন্য দেশ কি করিয়াছে এবং আমরা কি করিতে পারি।)

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাস্তুর (Pasteur) যখন পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, দেহাভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র কীটাণুই মানবের ব্যাধির কারণ, তখন তিনি এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বীজাণুজনিত ব্যাধি এই ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাড়াইবার ক্ষমতা মানবের আছে। মানবের এ ক্ষমতা পাস্তুর দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; কিন্তু এ ক্ষমতা আজ মানব কিয়ৎ পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছে,—এবং পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে দু' একটা ব্যাধি একেবারে নিষ্কাশিত হইতেছে।

ম্যালেরিয়া (Malaria) কথাটার আসল মানে খারাপ বাতাস। পূর্ব্বে সাধারণের ধারণা ছিল, খারাপ বাতাস হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি। পাস্তুরের এক শিষ্য দেখাইলেন যে, সে সব কিছু নয়,—জীব-দেহে রক্তের মধ্যে এক রকম জীবাণু দেখা দেয়, তাহারাই ম্যালেরিয়ার কারণ। আরও দেখা গেল, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে কুইনাইন (Quinine) খাওয়াইলে, ঐ জীবাণু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়, রোগী সুস্থ হয়। কিন্তু এই জীবাণু কোথা হইতে কিরূপে শরীরে প্রবে করে? দেখা গেল, জলে, স্থলে, আকাশে—কোথা এই জীবাণু বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অনে অনুসন্ধানের পর রণাল্ড রস (Ronald Ross) দেখিলে যে, এক জাতীয় মশা আছে, যাহার মধ্যে এই জীবা বাঁচিয়া থাকে; এবং শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, হু হু করি নিজেদের বংশ-বৃদ্ধি করে; এবং এই জাতীয় মশা ম্যালেরিয়াকে দেহ হইতে দেহান্তরে পরিচালিত করে ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়াইয়াছে এইরূপ ম ইটালী হইতে আনাইয়া, সেই মশা ম্যালেরিয়াশূন্য লণ্ড কোন সুস্থ ব্যক্তির নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ম তাহাকে কামড়াইল; কয়েক দিনের মধ্যে তাহা ম্যালেরিয়া দেখা দিল। ম্যালেরিয়া যে মশা দ্বা চালিত হয়, এই আবিষ্কারের জন্য এক বৎসরের নোবে প্রাইজ রস্‌কে দেওয়া হইল। কুইনাইন দিয়া ব্যাধি প্রতিকার করা অপেক্ষা এই মশা মারিয়া ব্যাধি আক্রমণ রোধ করাটা যে অধিকতর শ্রেয়ঃ তাহা

বলিলেও চলে; কিন্তু কামান না দাগিয়াও যে মানব এই মশা মারিতে পারে, তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল পানামা (Panama)। তথায় প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানব কিরূপে জয়ী হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে।

কলম্বস্ (Columbus) আমেরিকায় পৌঁছিয়া যখন বুঝিলেন সেটা ভারতবর্ষ নয়, তখন পশ্চিম দিয়াই ভারতবর্ষে পৌঁছিবার একটা সহজ পথ তিনি খুঁজিতে লাগিলেন। সে পথ মিলিল না। দেখা গেল, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে কেপ হর্ণ (Cape Horn) বা উত্তর আমেরিকার উত্তরে গ্রীনল্যাণ্ড (Greenland)এর নিকট দিয়া ব্যতীত আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে যাইবার জাহাজের কোন রাস্তা নাই। পানামার নিকট উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগ স্থানটা খুবই অপ্রশস্ত; সেখানে এধার হইতে ওধার অবধি একটা খাল কাটিয়া সহজে জলপথ তৈয়ারি করা যাইতে পারে, এ কল্পনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অনেকের মনে উঠিয়াছিল; কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। সুয়েজ খাল যখন শেষ হইল, তখন কথাটা আবার নূতন করিয়া উঠিল; এবং রীতিমত চেষ্টা আরম্ভ হইল। অনেক কোম্পানী ফেল হইবার পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের (United States) গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে হাত দিলেন, এবং বিস্তর লোকজন সহ ইঞ্জিনিয়ারগণকে পানামায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কাজ হইবে কি—যে যায়, আগে বিছানা লয়। ম্যালেরিয়া, ইওলো ফিভার, (Yellow fever), টাইফয়েড (Typhoid) প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সেখানে এত বেশী যে, পানামার মত অস্বাস্থ্যকর স্থান তখন আর পৃথিবীতে ছিল কি না সন্দেহ। এক বৎসর পরে আমেরিকান সেনেট (Senate) অবগত হইলেন যে, যদিও সতর হাজার লোক কাজে গিয়াছে, এক কোদালও মাটী উঠে নাই। সেনেট স্থির করিলেন, আগে ঐ স্থানকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে হইবে, পরে অন্য কথা। তখন ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ বন্ধ হইল এবং ডাক্তারেরা লাগিয়া গেলেন। বন জঙ্গল পরিষ্কার হইল, জল নিকাশের ব্যবস্থা হইল, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত হইল, মশা মারা হইল; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী ঘর তৈয়ারী হইল। কিছু দিনের মধ্যে স্থানটীকে এতই স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় করিয়া তোলা হইল যে, যে পানামার নামে লোকে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, সেখানে এখন লোকে দলে দলে সখ করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতে গেল। এইবার ইঞ্জিনিয়াররা কাজে হাত দিলেন। মানুষের বুদ্ধিতে ও টাকায় যাহা সম্ভব তাহা হইল। সে দিন সান্‌ফ্রানসিস্কো (San Fransisco) নগরে মহা ধুম-ধামের সহিত যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি মহামতি উইলসন্ (Wilson) একটী বোতাম টিপিলেন, আর ২০০০ মাইল দূরে ভূগোলের জলস্থলের বিভাগ উল্টাইয়া দিয়া, প্রকৃতির দুশ্ছেদ্য বন্ধন মোচন করিয়া একটী মহাসমুদ্র আর একটী মহাসমুদ্রের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিল। কিন্তু জগতে এই যে এক বিরাট অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইল, তাহাতে সফলতা আসিল তখন, যখন চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়ারিং-বিজ্ঞানের সহিত একত্র হইল—এবং উভয়ের সহিত মিলিত হইল একটী সমগ্র জাতির সমবেত চেষ্টা।

কিন্তু শুধু পানামায় কেন, বিজ্ঞান-সম্মত চেষ্টায় পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইতে চলিয়াছে। ইটালীতে যেখানে বৎসরে ষোল হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যাইত, সেখানে কয়েক বৎসরের মধ্যে বার্ষিক মৃত্যু-সংখ্যা চারি হাজারে নামিয়া আসিল। গ্রীসে ম্যারাথনে (Marathon)এ দুই বৎসরের মধ্যে বার্ষিক মৃত্যুহার শতকরা নব্বুই হইতে দুই-এ পৌঁছিল। পশ্চিম আফ্রিকার যে সব স্থান এক দিন 'সাদা মানুষের গোর' ছিল, এখন সে সকল স্থান স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে। কোলোন (Colon), রাইও ডি জেনিরা (Rio de Jeneira), হাভানা (Havana), কিউবা (Cuba), ফিলিপাইন (Philippine) দ্বীপ ম্যালেরিয়া-শূন্য হইতে চলিল। আর ভারতবর্ষ—এখানে প্রতি

বৎসর ৫০ লক্ষ লোক জ্বরে প্রাণত্যাগ করিতেছে; এবং অধিকাংশ স্থলে সে জ্বর ম্যালেরিয়া। সে বৎসর সার রণাল্ড রস্ ভারতবর্ষের এই ব্যাধি সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে পড়িয়াছে; এই বাঙ্গালা দেশের স্যানিটারি কমিশনার (Sanitary Commissioner) বেণ্টলি (Bentley) সাহেবের নব উদ্ভাবিত উপায়ে মশা মারিবার জন্য বর্দ্ধমানে ও জঙ্গীপুরে দুইটী গ্রাম ঠিক করা হইয়াছে এবং কাজও সেখানে চলিতেছে। কিন্তু যে ব্যাধি প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোককে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতেছে এবং কোটী কোটী লোককে স্ফূর্ত্তিহীন, নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, উৎসাহহীন, বিমর্ষ এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমে অক্ষম করিয়া তুলিতেছে, তাহার প্রতীকার-কল্পে দেশবাসীর মধ্যে যে চেষ্টা, যে আয়োজন, যে অর্থব্যয় আবশ্যক, তাহা কোথায়? বিজ্ঞান-বলে মানবের এ শত্রুকে যে বিনাশ করা যায়, নিঃসংশয়রূপে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। চাই এখন গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর সম্মিলিত চেষ্টা। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা বলেন, গ্রীসের পতন আরম্ভ হইল তখন, যখন সেখানে ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করিল। ঐতিহাসিক ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতে দেখা যায়। গ্রীসে এক সময় যাহা সত্য হইয়াছিল, ভারতবর্ষে তাহা সত্য হইয়া না দাঁড়ায়, তজ্জন্য দেশবাসীমাত্রকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ত চাই-ই, দেশবাসীরও এ বিষয়ে যথেষ্ট করিবার আছে। এ কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ম্যালেরিয়াকে যে কোন স্থান হইতে বিদায় করা যায়। পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে ইহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং যাহারা তাড়াইয়াছে, তাহারা আমাদেরই মত মানুষ। পানামায়, ইটালিতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার অনেক-গুলিই বাঙ্গলার গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া আপনাদের স্ত্রী-পুত্রাদির রক্ষার জন্য অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। এতৎসম্বন্ধে এই কয়টী সহজসাধ্য বিষয়ে প্রত্যেক গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, বাঙ্গালার পল্লীগ্রা ম্যালেরিয়াশূন্য করা সুদূরপরাহত হইবে না—

১। এনোফেলিস্ মশক তৃণ-গুল্ম-সমাকুল পুষ্করি খানা, ডোবা, বা যেখানে কোন স্থানে বা প আবদ্ধ জল দেখে, সেইখানেই ডিম্ব প্রসব ক সেই ডিম্ব হইতে এনোফেলিস্ মশক উৎপন্ন হ ম্যালেরিয়ার বিস্তারে সহায়তা করে।

পুষ্করিণী হইতে তৃণ গুল্ম ও আগাছা তুলিয়া ফেলি মশক আর তাহাতে ডিম্ব পাড়িবে না। পুষ্করিণী মাছ ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। মাছেরা মশক-শা গুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। খানা, ডোবায় ছাড়া যায় না বলিয়া, সেইগুলিকে বুজাইয়া কর্ত্তব্য। যদি বুজাইয়া ফেলা সম্ভবপর না হয়, হইলে সেইগুলিকে যথাসম্ভব আগাছাশূন্য করি হইবে। এবং সম্ভব হইলে তাহাতে কেরোসিন্ সপ্তাহে দুই একবার করিয়া ফেলিলে মশক জ না। বর্ষার সময় কোন পাত্র খোলা রাখিবে তাহাতে যদি জল জমিয়া থাকে, বৃষ্টির পর জল ঢালিয়া ফেলিবে ও পাত্রটীকে উপুড় ক রাখিয়া দিবে।

২। জঙ্গল, আবর্জ্জনা ও গাছপালার ভিতর ম গণ আশ্রয় লইয়া থাকে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে তা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ম গুলি দুই শত হাতের বেশী উড়িয়া আসিতে না। অতএব বাটী হইতে চতুর্দ্দিকে দুই শত, তিন হাতের ভিতর যত গাছপালার ঝোপ জঙ্গল দে তাহা সাফ করিয়া ফেলিবে।

৩। সন্ধ্যার সময় হইতে গাত্র আচ্ছাদিত ক রাখিলে মশক দংশন করিতে পারে না।

৪। মশকাধিক্য হইলে সন্ধ্যার পর হইতেই ম ভিতর বসিয়া কাজকর্ম্ম করা যুক্তিসঙ্গত।

৫। ধুনা ও গন্ধক পোড়াইলে মশক পলাইয়া ইহার দ্বারাও মশকের হাত হইতে কিঞ্চিৎ পাওয়া যাইতে পারে।

৬। ম্যালেরিয়ার সময় মশারির ভিতর ব্যতীত শয়ন করিবে না। মশারি ছেঁড়া থাকিলে তাহা মেরামত করিয়া লওয়া আবশ্যক। মশারির ধার বিছানার তলায় ভালরূপে গুঁজিয়া রাখা উচিত।

৭। হাত-পাখার সাহায্যেও সন্ধ্যাকালে মশক তাড়াইতে পারা যায়।

৮। যখন গ্রামে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইবে, তখন প্রতি সপ্তাহে একদিন ৮।১০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন নিয়মিত ভাবে খাওয়া উচিত।

৯। যদি উল্লিখিত নিয়মগুলি পালন করা সত্ত্বেও একদিন হঠাৎ শরীর খারাপ বোধ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় ৮।১০ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করিবে; তাহা হইলে যে সকল ম্যালেরিয়ার জীবাণু পূর্ব্বেই শরীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

১০। কুইনাইন সেবনে শরীরের কোনই ক্ষতি হয় না। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ। ম্যালেরিয়া-রোগীকে ১০।১২ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। কুইনাইন প্রয়োগ দ্বারা যত শীঘ্র সম্ভব ম্যালেরিয়া-রোগীকে আরোগ্য করিবে; নচেৎ মশক দ্বারা সেই রোগী হইতে অপর ব্যক্তি আক্রান্ত হইবে। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইলে রোগীরও ক্ষতি হইবে এবং অপর সকলেরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। *

কিন্তু একটা কথা এই যে, এ সবার মূলে যে টাকা সেই টাকা আসে কোথা হইতে? পূর্ব্বে কূপ খনন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য যে সকল ধনী জমিদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত, বাঙ্গালায় সেই ধনী জমিদারের সংখ্যা বিরল হইয়া আসিতেছে। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা একের বোঝা ছিল, এখন তাহা দশ-জনকে মাথায় করিয়া লইতে হইবে। কাঠবিড়ালীর দ্বারা যে সাগর-বন্ধনে সহায়তা হওয়া সম্ভব তজ্জন্য আমাদের কোন দেশান্তরের পুঁথি হাতড়াইতে হইবে না। প্রত্যেক তিল মিলিত হইয়া যে বিরাট তালে পরিণত হয়, তাহার দ্বারা অনেক মঙ্গল-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে একটা অন্তরায় আছে। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানব-প্রকৃতির একটা ধারা এই যে, কোন এক সুদূর ভবিষ্যতের এক অনির্দ্দিষ্ট মঙ্গলের জন্য মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এক ধারাবাহিক নিয়মাবদ্ধ চেষ্টায় মানবের মন সাড়া দেয় না—তা সে মন যতই প্রশস্ত হউক এবং সে চেষ্টা যতই ক্ষীণ হউক। যে কার্য্যে আশু ফল প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাতে মন কোন উদ্দীপনা খুঁজিয়া পায় না; এবং যাহার এক দিকে ভ্রমর-গুঞ্জন নয়—মশক-গুঞ্জন, এবং অপর দিকে মধু নয়, কুইনাইন—তাহাতে কবিত্ব-রসেরও সম্পূর্ণ অভাব। দেশের বা দশের উপকারের জন্য মনটাকে সজাগ করিয়া তুলিতে পারা যায় যদি এটা নিশ্চয় জানা যায় যে, দেশের ও দশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপকারটা তখনি তখনি এবং পূরামাত্রায় হইয়া যাইতেছে। কারণ, কি সামাজিক জীবনে, কি Biology শাস্ত্রে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' অপেক্ষা সারবান কথা খুব অল্পই আছে।

তাই সে দিন কলিকাতার কতকগুলি বড় বড় ডাক্তার এবং অ-ডাক্তার মিলিয়া এক Scheme খাড়া করিয়াছেন, যাহাতে ম্যালেরিয়া তাড়ানর আগে আত্মানং রক্ষেৎ ও সততং রক্ষেৎএর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সেটা মোটামুটি এই—

একটি, বা ছোট হইলে, দুটী-তিনটী গ্রাম লইয়া একটী মণ্ডল স্থাপিত হইল। মনে করা যাউক, এই মণ্ডলীর সভ্য সংখ্যা হইল ১০০; এবং প্রতি সভ্য মাসিক—এই ধরা যাউক—১৲ এক টাকা হিসারে চাঁদা দিতে লাগিলেন। মণ্ডলী একজন ডাক্তার—ধরা যাউক, একজন Sub-asst. Surgeon রাখিলেন মাসিক ৪০।৫০ টাকা মাহিনা দিয়া। এই ডাক্তারের কাজ হইবে খবর পাইলেই প্রতি মেম্বরের বাড়ী গিয়া বিনা দর্শনীতে রোগী দেখিয়া আসা, এবং বিনা লাভে কেবল মাত্র পড়নের খরচা লইয়া ঔষধ দেওয়া। সুতরাং মণ্ডলীর প্রতি সভ্য যদি বিনা ফি'তে

* হরিনাভি হিতসাধন মণ্ডলী—পত্রিকা সংখ্যা ১

প্রয়োজন হয় না। মল ত্যাগের সময় কোঁৎ দিলে ঐ বীর্য্য বাহির হইয়া আসে। পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন-দাতারা, কিন্তু, স্বপ্নদোষকে যেমন ভীষণ ভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন মল ত্যাগের সময় কোঁৎ দিলে যে বীর্য্য বাহির হইয়া আসে, সেই অবস্থাকে মেহরোগ বা তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া অধিকতর ভীষণ ভাবে তাহার বর্ণনা করেন। কিন্তু পাঠকেরা মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন, ইহা বাস্তবিক রোগ কি না, এবং ঔষধের দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া সম্ভবপর কি না। জিজ্ঞাসা করি, কোন্ পেটেণ্ট ঔষধ জীবের মনে কামোদ্রেক হওয়া নিবারণ করিতে পারে? অথবা, বীজাধারে একবার বীর্য্য আসিয়া সঞ্চিত হইলে, কোন্ পেটেণ্ট ঔষধ তাহাকে পুনরায় স্বস্থানে অর্থাৎ অণুর আকারে সর্ব্বদেহে ফিরাইয়া পাঠাইতে পারে? অথচ পেটেণ্ট ঔষধওয়ালারা ভাষার আড়ম্বরে, বিজ্ঞাপনের ছটায়, এই অবস্থাকেই দুইটী ভীষণ রোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়া, অপরিণত-বয়স্ক অল্প-বুদ্ধি যুবকগণের মনে ধাঁধা লাগাইয়া দিতেছেন, তাঁহাদিগকে অযথা আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের ঔষধে ইহার প্রতিকার হইবে কি,—এই সকল ঔষধের বিজ্ঞাপনগুলি যেরূপ ভাষায় রচিত, তাহাতেই লোকের মনে কামোদ্রেকে যথেষ্ট সহায়তা হইয়া থাকে। আবার, ঔষধ সকল এমন যে, তাহারাই—রোগ নিবারণ করা ত দূরের কথা—ইন্দ্রিয় সকলকে অনিচ্ছায় (অর্থাৎ মনে প্রকৃত পক্ষে কামোদ্রেক না হইলেও) উত্তেজিত, করিয়া বীজাধারে বীর্য্য সঞ্চয়ে সহায়তা করে।

এখন, স্বপ্নদোষ, অথবা, জাগ্রত অবস্থায় কোঁৎ দিবার সময় বীর্য্য-স্খলন যদি বাস্তবিক রোগই হয়, তাহা হইলেও, পেটেণ্ট ঔষধে, শুধু পেটেণ্ট ঔষধ কেন, কোন ঔষধেই তাহার প্রতিকার হইতে পারে না। এই দুই রোগের প্রতিকারের একমাত্র উপায়,—সংযম অভ্যাস করা। কেবল ইন্দ্রিয় সংযম নহে, মানসিক সংযমও বটে। কারণ, মনই এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের প্রধান নিয়ামক। কেবল ইন্দ্রিয় সংযমে কোন ফলই হইবে না। স্ত্রী-সঙ্গমের উপায় না থাকিলে, যাহাতে মনে কামোদ্রেক মাত্র হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; সর্ব্বদা এমন ভাবে নিজেকে কার্য্যে নিয়োজিত রাখিতে হইবে যে, মনে যেন কামোদ্রেক হইবার অবসর মাত্র না ঘটে। যাহাতে কামোদ্রেক হইতে পারে, এমন পুস্তকাদি বা সাহিত্য পাঠে, অথবা, তদনুরূপ বিষয়ের আলোচনায়, বিরত থাকিতে হইবে।

মনকে অসংযত হইতে দিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সংযমে কোন ফল ফলিবে না। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বা পুরাণাদিতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে চির সংযমী মুনি ঋষিরাও মুহূর্ত্ত কালের জন্য মানসিক সংযম হারাইয়া পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন।

যাউক সে কথা। এখন বোধ করি পাঠকেরা ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াছেন, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি তথাকথিত রোগ-গুলি বাস্তবিক রোগ নহে; উহা সাময়িক মানসিক অসংযমের লক্ষণ মাত্র। স্বপ্নদোষ ঘটিলেই আতঙ্কিত হইয়া যা'তা' পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিয়া নিজের স্বাস্থ্য এবং ইহ-পরকাল নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। শরীর ও মন উভয়তঃই ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করুন, দেখিবেন, এই সকল তথাকথিত রোগ কখনও আপনাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। আর যদিই কখনও অবস্থা বিশেষে মনে কামোদ্রেক হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে স্বপ্নদোষ বাস্তবিকই ঘটে, তাহা হইলেও আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। উহা দেহ মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃই ঘটিয়া থাকে। ফল কথা কায়মনোবাক্যে সংযম অভ্যাসই পবিত্রতা রক্ষার এক মাত্র সদুপায়,—কোন পেটেণ্ট ঔষধই আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে না।

গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

কতকগুলি রোগ আছে, যাহা গৃহস্থমাত্রকেই ভোগ করিতে হয়; কোন গৃহস্থই তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। হাম, পান-বসন্ত প্রভৃতি এই শ্রেণীর রোগ। যদি কেহ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই সকল রোগের কোনটির দ্বারা কখনও আক্রান্ত না হইয়া থাকে, তবে সে জোর করিয়া বলিতে পারে যে, সে বড় ভাগ্যবান লোক। সে সহজেই মনে করিতে পারে, প্রকৃতি দেবী তাহার দেহ এমন ভাবে গড়িয়া দিয়াছেন যে, গৃহস্থের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য রোগ সকল ও তাহার কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু ভাগ্যদেবী বা প্রকৃতিদেবীর দোহাই না দিয়া, সে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহ অপেক্ষা, সে নিজে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি, নিজের অজ্ঞাতসারেই, অভ্যাসবশতঃ বা শৈশবকালীন শিক্ষা-বশতঃ, কিম্বা তাহার পারিবারিক আচার-ব্যবহারের অনুসরণ পূর্ব্বক, পালন করিয়া চলাতেই, সে ঐ সকল রোগকে দূরে রাখিতে ও তাহাদের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কারণ, এইটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত।

এখন এইটী বিবেচনা করিতে হইবে, যাহা ব্যক্তির হিসাবে সত্য, তাহা জাতির হিসাবেও সত্য হইতে পারে। যদি কোন লোক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করিয়া চলাতে নিজেকে চিরসুস্থ রাখিতে পারে, তবে কোন জাতি সমষ্টি হিসাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া চলিতে পারিলে, অধিকাংশ রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না কেন? জাতির হিসাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি ঐ জাতির আচার-ব্যবহার বা রীতি-নীতিতে পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এখন, কোন জাতি, বা সমাজ, বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন গার্হস্থ্য রোগের অতিমাত্রায় প্রাদুর্ভাব দেখিলে, মানুষের মনে সহজেই এই প্রশ্নটির উদয় হইয়া থাকে যে, এইরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কারণ কি? এই জন্য দায়ী কে? এই দায়িত্ব কি চিকিৎসক-গণের উপর ন্যস্ত? না, সমাজপতিগণের উপর? এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপর জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারটা অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে, চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকেন,—রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত নহে। সে কার্য্যের জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা, যথা স্যানিটারী কমিশনার, স্যানিটারী ইনস্পেক্টর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। ইঁহারা গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া গ্রামের, নগরের বা দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তি বা জনমণ্ডলীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার লইয়া থাকেন। তা' ছাড়া, ব্যক্তি বা সমাজ হিসাবে, নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, সাধারণ লোকেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। আমরা অদ্য স্যানিটারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিব না,—কেবল ব্যক্তি বা সমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, জনসাধারণ ঔদাসীন্য, আলস্য এবং অজ্ঞতা-নিবন্ধন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়া থাকেন। কি গৃহস্থ-ঘরে, কি গ্রামে-নগরে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-গুলি প্রায়ই পালিত না হওয়ায় পারিবারিক অথবা গ্রাম্য বা নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত জনসাধারণের কর্ত্তব্যগুলি অসম্পন্নই থাকিয়া যায়। অথচ, সামান্য একটু চেষ্টা করিলে, একটু সতর্ক থাকিলে, অনেক রোগই সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না,—লোকের কষ্ট কমিয়া যায়,—অনেক মানব-জীবন রক্ষা পায়। এই বিষয়টির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের

জন্য, তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে অবহেলার প্রধান কারণ তাহাদের অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতার দরুণই তাহারা রোগ নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে পারে না। তাহাদের এই অজ্ঞতা সর্ব্বপ্রথমে দূর করিতে হইবে,—অতি শৈশব অবস্থা হইতেই তাহাদিগকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি শিক্ষা দিতে এবং সেই গুলি পালন করিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। বিদ্যালয়ে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুগণকে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাধারণ শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে, বালকবালিকাগণকে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

বাঙ্গালা দেশের বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিক্ষা দিবার কিরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা বলিতে পারি না; সম্ভবতঃ নাই। যদি থাকে, তবে তাহাও অতি সামান্য ভাবেই আছে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য-রক্ষার কোন নিয়ম পালন করিতে দেখিতে পাই না বলিয়াই আমাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। শিশুদিগের পাঠশালায় বা বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিক্ষা দিবার যদিই কোন ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলেও, তাহার কোন প্রত্যক্ষ ফল দেখা যাইতেছে না। সেই জন্য আমাদের মনে হইতেছে, শিশু-বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না থাকিলে, অচিরে রীতিমতভাবে তাহা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য; এবং থাকিলে, তাহা যাহাতে ফলপ্রদ হয়, এমন ভাবে তাহার সংশোধন করা আবশ্যক।

কিন্তু ছেলে-মেয়েদের যাঁহারা স্বাস্থ্য-তত্ত্ব শিখাইবেন, তাঁহাদের নিজেদের এ বিষয়ে আগে শিক্ষা লাভ করা দরকার। ট্রেনিং কলেজসমূহে যে সকল বি-টি; এম-টি প্রভৃতি উপাধিধারী শিক্ষক প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য তত্ত্ব শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? আমরা জানি, পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে এমন কি, সাধারণ পাহারাওয়ালাদিগকেও উত্তমরূপে First Aid বা দুর্ঘটনা স্থলে সর্ব্বপ্রথমে শুশ্রূষা-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। ট্রেনিং কলেজেও তদ্রূপ ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার উপযোগী করিয়া শিক্ষকগণকে প্রস্তুত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক, যিনি,—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনের সুফল, এবং নিয়ম লঙ্ঘনের কুফল উত্তমরূপে অবগত আছেন। আর বালকদিগের বিদ্যালয় অপেক্ষা বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কেন না, বালিকারাই পরিবারের ভাবী কর্ত্রী, গৃহলক্ষ্মী, সংসারের শ্রী। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার প্রধানতঃ তাঁহাদের উপর অর্পিত। বাড়ীর কেহ পীড়িত হইলে, চিকিৎসকের উপদেশ মত তাঁহারা প্রাণপণ যত্নে রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারেন। তাঁহাদের স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতার ফলে তাঁহারা এ বিষয়ে স্বতঃই অশিক্ষিত-পটুত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু, দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, রোগ নিবারণের (prevention) সম্বন্ধে তাঁহারা কোনরূপ শিক্ষা বা উপদেশ পান না বলিয়া এ বিষয়ের কোন ব্যবস্থাও করিতে পারেন না এবং অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে এই বিষয়ে অবহেলা করিতে দেখা যায়। এই কারণে, যেখানে সতর্কতা অবলম্বন করিলে রোগের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব হইত, সে সকল স্থলে অসতর্কতার ফলে বাড়ীর লোকদের রোগ ভোগ করিতে হয়। অধিকাংশ গৃহস্থ মহিলা সুগৃহিণী, সুপাচিকা, উত্তম শুশ্রূষাকারিণী; কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে,—নিবার্য্য রোগসমূহ দূরে রাখিবার উপায় অবলম্বনে অনবহিতা।

এ সকল বিষয়ে আমাদের কোন কথা কহিতে হইত না; কারণ, আমাদের অনেক আচার-ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল, এবং সেগুলি পালন করিয়া অনেক স্থলেই পারিবারিক স্বাস্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য

শিক্ষার কল্যাণে, আমাদের মা-লক্ষ্মীরাও অনেক স্থলে ঐ সকল আচার পালনে উদাসীনা হইয়া পড়িয়াছেন; অথচ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য-নীতি এদেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে না। কাজে কাজেই আমাদের পারিবারিক স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে। বিলাতেও বালক-বালিকা-দের বিদ্যালয়ে প্রথম প্রথম স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত ছিল না। এখন কিন্তু, ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হওয়ায় তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা উত্তমরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার ফলে, বালিকারা রন্ধনাদি গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্বও শিক্ষা করিতেছেন। ঘর দোর অপরিষ্কার রাখিলে, কাপড়-চোপড় ময়লা থাকিলে, বিছানা নোংরা হইলে, খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে রন্ধন করা না হইলে কিরূপ কুফল ফলিয়া থাকে, গৃহস্থালী কিরূপ অস্বাস্থ্যকর ও অশান্তির আগার হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারা বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শিখিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহাদের গৃহস্থালী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি-স্বাস্থ্যের আগার হইয়া উঠিতেছে, এবং তাঁহারাও আদর্শ গৃহিণীর পদ লাভ করিয়া জাতির ভাবী উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতেছেন।

আধুনিক শল্য-চিকিৎসা

লেখক—শ্রীচারু চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এস্‌সি

সে অনেক দিনের কথা, গুটী পোকার চাষ ও রেশম তৈয়ারি তখন ফ্রান্সের এক প্রধান ব্যবসা। হঠাৎ গুটী-পোকার মধ্যে মড়ক দেখা দিল, সমস্ত দেশময় মড়ক ছড়াইয়া পড়িল; এত বড় এক ব্যবসা, দেশের এত বড় এক সম্পদ লোপ পাইবার উপক্রম হইল, প্রতিকারের কোন উপায় ঠিক হয় না। তখন রসায়নবিৎ বলিয়া পাস্তরের (Pasteur) নাম হইয়াছে। লোকে পাস্তরের উপর এই মড়কের কারণ অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিল। অণুবীক্ষণের তলে একটী দুষ্ট গুটী পোকা রাখিয়া পাস্তর দেখিলেন, অতি সূক্ষ্ম অগণিত পোকা উহার মধ্যে কিল্‌বিল্ করিতেছে—ইহারা এত ছোট যে, শুধু চোখে ধরা পড়ে না। এই কীটাণুগুলিই যে গুটী-পোকার রোগের কারণ, পাস্তর এই অনুমান করিলেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল বীজাণু মারিবার ঔষধ আবিষ্কৃত হইল; গুটীপোকার মড়ক অচিরে থামিয়া গেল; ফ্রান্সের রেশম-ব্যবসা পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

গুটীপোকার রোগের মূলে যখন এই ক্ষুদ্র কীটাণু আছে, তখন এই জাতীয় কীটাণু যে মানবের ব্যাধির কারণ, পাস্তর এইরূপ অনুমান করিলেন এবং পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিয়া গেলেন। ঘোড়া গরুর এক রকম মারাত্মক ঘা হয় তাহাকে এন্‌থ্রাক্‌স্ (anthrax) বলে এবং কাঁচা চামড়ার ব্যবসা যাহারা করে তাহাদের মধ্যেও এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পাস্তর ঐ ব্যাধিগ্রস্ত কোন লোকের রক্ত অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলেন, উহাতে রাশি রাশি একপ্রকার জীবাণু পাওয়া গেল। ঐ রোগাক্রান্ত যে কোন লোক বা যে কোন পশুর রক্ত দেখা হইল, তাহাতেই ঐ একই রকমের জীবাণু মিলিল। সুতরাং এই জীবাণুই যে এন্‌থ্রাক্‌স্ রোগের কারণ তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু একটা কথা এখানে উঠিতে পারে যে, যেটাকে কারণ বলিয়া মনে করা হইতেছে সেটা হয় ত কারণ নয় কার্য্যের ফল। ক্ষুধা বোধ করিলে শিশু কাঁদিতে থাকে এবং সকল শিশু ইহা করে। তাহা বলিয়া কান্নাটা

তো শিশুর ক্ষুধার কারণ নয়; পাস্তর এ কথা বুঝিতেন; তাই পরীক্ষাটা এবার তিনি অন্য রকমে আরম্ভ করিলেন। ঐ এন্‌থ্রাক্‌স্ ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির জীবাণু মিশ্রিত এক ফোঁটা রক্ত কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশাইয়া দিয়া দেখিলেন, ঐ সুস্থ ব্যক্তিতে ঐ ব্যাধির সকল লক্ষণ দেখা দিল। পাছে এখানেও কথা উঠে যে, পোকাগুলি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—বিষ শুধু রক্তেতে আছে, এবং পোকার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষাক্ত রক্ত শরীর মধ্যে চালনা করিয়া দেওয়ার ফলে, ঐ ব্যাধির আবির্ভাব হয়; তাই পাস্তর জীবাণুগুলিকে রক্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া উহা শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পূর্ব্বমত ফল পাইলেন। দু-এক স্থানে যে ব্যতিক্রম ঘটে, তাহার কারণ এই, ফসলের জন্য ভাল বীজও যেমন প্রয়োজনীয়, উর্ব্বর ক্ষেত্রও ততোধিক আবশ্যক। এমন দেখা গিয়াছে, সুস্থ সবল বলিষ্ঠ দেহে জীবাণু বিজ্‌ বিজ্‌ করিতেছে—কিন্তু রোগের কোন চিহ্ন নাই; হঠাৎ আহার নিদ্রার অনিয়মে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর দুর্ব্বল হইল, অমনি ঐ বীজাণুগুলি নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। যে মাটী শক্ত বলিয়া এতদিন তাহারা দাঁত বসাইতে পারিতেছিল না, হঠাৎ সেই মাটী নরম হওয়ায়, তাহারা আপন আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল।

পাস্তর এইবার জীবাণু লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন, এন্‌থ্রাক্‌স্ জীবাণুকে বহুক্ষণ উত্তপ্ত করিয়া রাখিলে উহার কার্য্যকরী শক্তি অনেক কমিয়া যায়; এবং তখন কোন জন্তুর শরীরের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে, উহা মোটেই মারাত্মক হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা উত্তাপে রাখা হইয়াছে এইরূপ এন্‌থ্রাকস্ জীবাণু একটী ভেড়ার দেহে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে ব্যাধির সামান্য একটু আধটু লক্ষণ দেখা দিল মাত্র, আর কিছু হইল না। উহার পনর দিন পরে বার ঘণ্টা উত্তাপে রাখা হইয়াছে এইরূপ তীব্রতর জীবাণু আবার সেই ভেড়ার রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইল, বিশেষ কিছু দেখা গেল না। আবার পনর দিন পরে ঐ ভেড়ারই দেহে সাধারণ জীবাণু দেওয়া হইল, তাহাও ভেড়াটির বেশ সহিয়া গেল; কিন্তু ইহাই অন্য যে কোন সাধারণ ভেড়ার পক্ষে মারাত্মক।

সংসারক্ষেত্রেও আমরা দেখি, আফিংএর যে মাত্রা বিবাহযোগ্য বয়সোত্তীর্ণা কুমারীর পক্ষে যথেষ্ট—তাহাই একদিন না পাইলে পাকা আফিং-খোরের হাই উঠে।

পাস্তর—আরও দেখিলেন যে, কোন বিশিষ্ট জীবাণুকে কোন বিশিষ্ট জাতীয় জন্তুর দেহে যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া যায়, তো ইহার তীব্রতা ইচ্ছামত বাড়ান বা কমান যায় না! কোন জাতীয় তীব্র জীবাণু যদি শরীরের মধ্যে চালনা করিয়া দেওয়া যায় তো এই জীবাণুজনিত রোগ স্বল্প পরিমাণে শরীরে দেখা দেয় বটে; কিন্তু ঐ রোগের মারাত্মক আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা পাইয়া যায়। ভ্যাক্‌সিন্ (Vaccine) চিকিৎসায় এই তথ্যই নিহিত আছে; এবং বর্ত্তমান কালে ভ্যাকসিন চিকিৎসকের একটী প্রধান সহায়।

পাগলা কুকুর বা কোন জন্তু কামড়াইলে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু একরূপ অনিবার্য্য। কিন্তু মৃত্যু তৎক্ষণাৎ ঘটে না, চল্লিশ দিনের পূর্ব্বে শরীরে ঐ প্রাণঘাতী বিষের কার্য্য দেখা দেয় না। এই সময়ের মধ্যে যদি দিনের পর দিন খুব ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ জাতীয় খুব তীব্র বিষ শরীরের মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে চল্লিশ দিন পরে যখন ঐ জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিতে আসিবে, তখন সে দেখিবে, তাহাকে বাধা দিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া আছে, এবং তখন আর তাহার দাঁত ফোটাইবার সামর্থ্য থাকিবে না।

পাস্তরের পূর্ব্বে পাগলা কুকুরে কামড়াইলে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল; আর এখন পাস্তর ইন্‌ষ্টিটিউটে (Pasteur Instituteএ) চিকিৎসিত হইলে মৃত্যু একেবারেই অসম্ভব।

একটী রাখাল বালককে বাঘে কামড়ায়; তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত প্রণালীতে পাস্তর ঐ বালকের প্রাণদান

করেন। এই রাখাল বালকই পাস্তরের প্রথম রোগী। তাই ফ্রান্সের পাস্তর ইনষ্টিটিউটের সম্মুখে একটী প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত করা হইয়াছে,—একটী বালক বাঘের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

পাস্তর নিজে চিকিৎসক ছিলেন না। তাঁহার এক শিষ্য লর্ড লিষ্টার (Lord Lister) তাঁহার সিদ্ধান্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে লাগাইয়া আণ্টিসেপ্‌টিক (Antiseptic) ও আসেপ্‌টিক্ (Aseptic) অস্ত্র-চিকিৎসার সৃষ্টি করিলেন। রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা জীবাণু মারিয়া ফেলিয়া লিষ্টার ক্ষতস্থান শীঘ্র আরাম করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে শস্ত্রচিকিৎসা করিলেই যেমন ক্ষতস্থানে জীবাণুর প্রবেশ দ্বারা সমস্ত স্থানটা ফুলিয়া উঠিত, লাল হইত,—এই জীবাণুগুলিকে মারিতে আসিয়া শরীরের শ্বেত রক্ত-কণিকা নিজেদের প্রাণ দিয়া পুঁযে পরিণত হইত এবং অত্যধিক জ্বর আনিয়া প্রাণ সংশয় করিত—এখন নানা উপায়ে ঐ জীবাণুর আগমন বন্ধ হওয়ায় কাটাকুটি সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া গেল। তাই এখন বলা হয়, নেপোলিয়ান তাঁহার সমস্ত যুদ্ধে যত না লোক মারিয়াছিলেন, লিষ্টার প্রতি বৎসর তত লোকের প্রাণদান করিতেছেন।

কিন্তু মানব ইতিহাসের সকল দেশের সকল সময়ের সকল চিকিৎসকের উপর পাস্তরেরই নাম থাকিবে, যিনি নিজে চিকিৎসক না হইলেও ব্যাধিগ্রস্ত মানবের কল্যাণ সাধনে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন এবং যাঁহার আবিষ্কৃত উপায় বর্ত্তমান চিকিৎসা-প্রণালীর ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

চয়ন।

মাতাপিতাদের মনে রাখা দরকার যে পুত্রকন্যাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া তোলা, তাহারা যেন আত্মনির্ভরশীল হয়, পরের মুখ চাহিয়া না থাকে। গৃহের শাসনের ইতিহাস আমাদের রাষ্ট্রশাসনের ইতিহাসের মত হোক্; প্রথমে রাজতন্ত্র, মাতাপিতা গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহাদের আজ্ঞা বিনা বিচারে পালনীয়। তারপর ধীরে ধীরে পুত্রকন্যারা যত বয়স্ক হইবে, তাহাদের বুদ্ধি জাগিবে, স্বাধীন মত গড়িয়া উঠিবে; গৃহরাজ্যের নবীন প্রজারা মাতাদিগের শক্তি ও স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবে, গৃহচালনার ভার নিজেদের হাতে লইবে; মাতাপিতারা কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিবেন, তাহাদিগকে নিয়মিত করিবেন, উপদেশ দিয়া, প্রেম দিয়া গৃহশাসনে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। বৎসরের পর বৎসর পুত্রকন্যারা মাতাদিগের হস্ত হইতে গৃহরাজ্যের এক একটি শাসনভার কাড়িয়া লইবে; অবশেষে তাহারা পূর্ণবয়স্ক হইলে তাহাদের হস্তে গৃহের সকল কর্ত্তৃত্ব থাকিবে; মাতাপিতাগণ গৃহরাজ্যের রাজাসনে বসিয়া থাকিবেন কেবল পূজা লইবার জন্য, সেবা লইবার জন্য, প্রেম পাইবার জন্য, রাজ্যের নিয়ম গঠন বা রাজ্য চালনের জন্য নহে। ছেলেমেয়েদের এইরূপে গৃহচালনে শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বী ও স্বধীনতাপ্রিয় করিয়া গড়িয়া তোলা দরকার। (হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার)

অনেকে মনে করিতে পারেন জ্ঞানলাভের জন্য শারীরিক নিয়ম পালনের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর নিতান্ত অসুস্থ না হয় ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না।' কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবীর পক্ষে, শরীরের অবস্থা ভাল না থাকিলেও জ্ঞানার্জ্জনের অধিক বিঘ্ন হয় না এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্রাম যথানিয়মে চলিলেই শরীর ও মনের অবস্থা জ্ঞানার্জ্জনের উপযোগী হয়। সঙ্ক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও আহার নিদ্রায় সংযমই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম।

স্যার শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩২৬ সাল | ৫ম সংখ্যা

আলোচনা

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল—

গত ১৯শে আগষ্ট প্রাতঃকালে লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই সভায় স্কুলের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হয়। এই রিপোর্টে দেখা যায়, স্কুল-বাটীর উভয় পার্শ্বে নূতন দুইটি বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মূল বাটীরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। স্কুল-বাটীর এইরূপ বিস্তৃতি সত্ত্বেও এই স্কুলে প্রবেশার্থী অনেক ছাত্রকে স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। এই স্কুলে একটী হোষ্টেলেরও বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছে। সর্ব্বশেষে লর্ড বাহাদুর একটী সুদীর্ঘ মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। বঙ্গদেশে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার প্রসঙ্গ উঠিলেই, দেশে যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের অভাবটি খুব বড় হইয়া দেখা দেয়। বস্তুতঃ, বঙ্গদেশের বিস্তৃতি এবং লোক সংখ্যার তুলনায় এদেশে যতগুলি মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল রহিয়াছে, তাহা সংখ্যায় যথেষ্ট নহে। এখনও অনেক স্কুল স্থাপন করিলে তবে দেশের অভাব কিয়ৎপরিমাণে মিটিতে পারে। দেশবাসীকেও অচিরে এই বিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

সীমান্ত-যুদ্ধে কলেরা—

সম্প্রতি পশ্চিমোত্তর সীমান্তে আফিগানদিগের সহিত আমাদের যে যুদ্ধ হইয়া গেল, সেই যুদ্ধের সংস্রবে, চিকিৎসা বিভাগের কিছু অব্যবস্থার কথা প্রকাশ পাইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সৈন্যগণের অনুচরদিগের মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এমন কি, সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে সিবিলিয়ানদিগের মধ্যেও বিষম কলেরার আক্রমণ হইয়াছিল। আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, বন্দোবস্তের ত্রুটিতে পানীয় জল দূষিত হইয়াই না কি রোগ-বিস্তৃতির পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল। এই সকল ত্রুটি পরিদর্শন করিয়া সংশোধনের ব্যবস্থা করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মচারীরও অভাব ছিল। তাহার উপর, সৈন্যগণকে অত্যধিক গরমের মধ্য দিয়া কুচ করিতে হইয়াছিল। ইত্যাদি বিবিধ কারণে লোক জনের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া বিলাতী পার্লামেণ্টে আলোচনা চলিতেছে, এবং দেশময় একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ইহার পরিণাম কি হইবে তাহা বলা যায় না। আর, আমরা আদার ব্যাপারী,—আমাদের পক্ষে ইহা জাহাজের খবর মাত্র।

ভেজাল সরিষার তৈল—

সরিষার তৈলে আবার এক নূতন রকমের ভেজালের কথা শুনা যাইতেছে। সরিষার সহিত "পাকড়" নামক এক প্রকার বীজ মিশাইয়া তৈল নিষ্কাশন করা হইতেছে। এই ভেজাল জিনিসটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই ভেজাল তৈল ব্যবহারে, শুনা যাইতেছে, লোকে উদরাময় রোগে কষ্ট পাইতেছে। উদরাময়ের সঙ্গে গা-বমিবমি, বমন প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায়। সংবাদপত্রে এই তৈল ব্যবহারের বিরুদ্ধে লোককে সতর্ক করা হইতেছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সাধারণকে এই তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে সতর্ক করার ফল কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোন তৈলে যদি ভেজাল মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে তাহা কেবল রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়িতে পারে। কিন্তু সাধারণ ক্রেতা বাজারে সরিষার তৈল কিনিতে গিয়া, তাহাতে "পাকড়" মিশ্রিত আছে কি না, তাহা কিরূপে ধরিতে পারিবে? তাহা ছাড়া, ভেজাল সংক্রান্ত আইনের কল্যাণে দোকানদারেরা—তাহাদের পণ্যে ভেজাল আছে, এ কথা বলিয়া কহিয়াই ব্যবসায় চালাইতেছে। কই, সাধারণে ইহার প্রতিকারার্থ কি করিতে পারিতেছে? তৈল যখন লোককে ব্যবহার করিতেই হইবে, এবং কেহই যখন ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিসের কারবারই করিতেছে না, তখন ভেজাল তৈল ব্যবহার করা ছাড়া আর তাহাদের কিই বা উপায় আছে? বর্ত্তমান আইনটি বরং ভেজালওয়ালাদের রক্ষা-কবচের কাজ করিতেছে। নূতন ভেজাল-নিবারক আইন বিরচিত হইয়া দোকানদারদিগের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা না হইলে অন্য কোন উপায়ই দেখা যাইতেছে না।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার তৃতীয় আক্রমণ এখনও চলিতেছে—উহার ভোগের কাল এখনও শেষ হয় নাই। সিমলা হইতে প্রকাশিত সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, ভারতের অনেক স্থলে, বিশেষতঃ, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, রেঙ্গুণ, প্রভৃতি বড় বড় নগরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার এখনও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণকে এখনও আরও কিছুদিন বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রতিকারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা এখন চলিতেছে, তাহার কোনটাই এখন বন্ধ করা যাইতে পারে না।

মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরী—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালের রোগীদের ব্যবহারের জন্য যে একটী লাইব্রেরী আছে, সম্প্রতি ঐ লাইব্রেরী-কমিটির একটী অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল বি, এইচ, ডিয়ারী আই-এম-এস সভাপতি হইয়াছিলেন। এই অধিবেশনে লাইব্রেরী-কমিটির সেক্রেটারী যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে দেখা যায়, লাইব্রেরীটির দিন দিন উন্নতি হইতেছে। গত বার্ষিক অধিবেশন হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ লাইব্রেরীতে ৪০১ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইশতখানি ইংরেজী এবং অবশিষ্ট বাঙ্গালা পুস্তক। রোগীরা প্রত্যহ গড়ে একশত পুস্তক পাঠ করিবার জন্য 'ইস্যু' করিয়া থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে লাইব্রেরীর জন্য ২০৯৸৵ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ১৫৩৵ টাকা খরচ হইয়াছে। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে লাইব্রেরীর নামে ১৫২৸৵ জমা আছে। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতায় লাইব্রেরীর মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কলেজের অধ্যাপক কর্ম্মচারীবৃন্দের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করেন এবং স্বয়ং মাসিক ১০ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হ'ন। বাহিরের লোকের নিকট হইতেও চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব হয়। যে সকল রোগী পীড়িত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে,—আপনার জন হইতে দূরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে, তাহাদের পক্ষে সময়-কাটানো

নিশ্চয়ই নিতান্ত ক্লেশদায়ক। এরূপ অবস্থায় সদ্‌গ্রন্থ তাহাদের চিত্ত বিনোদন এবং সময় কাটাইবার অন্যতম উপায়। সুতরাং লাইব্রেরীটির উন্নতি সাধনকল্পে জনসাধারণ যে মুক্তহস্ত হইবেন, এরূপ আশা স্বচ্ছন্দে করা যাইতে পারে।

কলিকাতার আবর্জ্জনা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের একটী অধিবেশনে সম্প্রতি প্রস্তাব হয় যে, ইটিলিতে রাস্তা বাঁধাইবার খোয়া রাখিবার যে জায়গা আছে, ঐ স্থানে সহরের আবর্জ্জনা রেল গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য একটী নূতন প্ল্যাটফর্ম্ম প্রস্তুত করা হউক। মোটর গাড়ীর সাহায্যে সহরের আবর্জ্জনা রাস্তা হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া ঐ স্থানের প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। জমি ক্রয়, প্ল্যাটফর্ম্ম নির্ম্মাণ ইত্যাদি বাবদে ব্যয় পড়িবে ৫৮৪৭০০ টাকা। তার পর আরও একটা বড় মতলব আছে। এখন যে ঘোড়ার ও রেলের গাড়ীর সাহায্যে আবর্জ্জনা স্থানান্তরিত করা হয়, তাহা সুবিধাজনক নহে। প্রথমতঃ, ময়লার গাড়ীগুলি দেখিতে বড় নোংরা, তাহাদের সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। রাস্তা দিয়া যখন ময়লার গাড়ী আবর্জ্জনা লইয়া যায়, তখন এক একখানি গাড়ীতে এত বেশী আবর্জ্জনা তুলিয়া লওয়া হয় যে, গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে অর্দ্ধেক ময়লা রাস্তায় পড়িতে পড়িতে যায়। ইহা অবশ্য স্বাস্থ্যানুকূল ব্যবস্থা নহে। এই গাড়ীর দ্বারা কাজ শেষ করিতে অনেকটা সময়ও লাগে। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া, প্রস্তাব হইয়াছে যে, মোটর গাড়ীর সাহায্যে খুব শীঘ্র শীঘ্র ময়লা স্থানান্তরিত করিতে পারিলে ব্যবস্থাটা যেরূপ স্বাস্থ্যানুকূল হয়, কলিকাতার ন্যায় সহরের তদ্রূপ উপযোগীও হইতে পারে। যাহা হউক, এই বড় মতলবটা এখন বিবেচনাধীন আছে,—আপাততঃ কেবল মোটর গাড়ীর সাহায্যে কতকটা স্থানের ময়লা স্থানান্তরিত করিবার কল্পনা হইয়াছে। আর, যে রেলগাড়ীর দ্বারা ময়লা ধাপার মাঠে চালান দেওয়া হয়, তাহাও না কি তুলিয়া দিয়া মোটর দ্বারা সে কাজটাও সারা হইবে। মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম কমিশনার ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের সংশোধন কল্পে এই প্রস্তাব করেন যে, যেখানে প্ল্যাটফর্ম্ম নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে, তাহার খুব কাছেই ট্যাংরার কসাইখানা। সুতরাং এখানে প্ল্যাটফর্ম্ম নির্ম্মিত হইলে, আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধ এবং মাছি ও অন্যান্য কীটের দ্বারা মাংসের গুণের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে কি না তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। কথাটা সঙ্গত বুঝিয়া অপর কয়েকজন কমিশনার ডাক্তার সুরেশবাবুর প্রস্তাবের সমর্থন করেন। অবশেষে আলোচনার পর স্থির হয় যে, স্বাস্থ্যের অনুকূল হইবে বলিয়াই নূতন প্ল্যাটফর্ম্ম নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। বিশেষতঃ, মোটর সাহায্যে খুব দ্রুত কাজ হইবে, সুতরাং সুরেশবাবু যাহা আশঙ্কা করিতেছেন, তাহার কোন কারণ থাকিবে না। ফলে মূল প্রস্তাবটিই সভায় গৃহীত হইয়াছে।

স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ—

যত দিন যাইতেছে, কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা তত বাড়িয়া যাইতেছে; এবং সহরে বাসযোগ্য স্থান ততই সঙ্কীর্ণ হইতেছে। স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সরকারী অনেক নূতন বাড়ী তৈয়ার হইতেছে, —তাহার উপর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই সকল কারণে সহরে লোকের বাস করিবার স্থান কমিয়া যাইতেছে। ধনী লোকেরা প্রচুর অর্থব্যয়ে এই সহরে এখনও ভূমি ক্রয় করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন। কিন্তু, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের উপায় কি? তাহারা যায় কোথায়? সমাজে তাহাদেরও একটা স্থান আছে। সুতরাং সহরে তাহাদেরও বাস করিবার স্থান থাকা আবশ্যক। সুখের বিষয়, এতদিনে কলিকাতা কর্পোরেশনের এই দিকে শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। কর্পোরেশনের সেদিনকার অধিবেশনে কমিশনার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ

মল্লিক মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩৯৪ ধারায় বিধান আছে যে কলিকাতা কর্পোরেশন দরিদ্রদিগের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন, এবং উপযুক্ত স্থলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের জন্য হয় স্বাস্থ্য-সম্মত বাড়ী তৈয়ার করাইয়া দিবেন, না হয়, বাড়ী তৈয়ার করিবার উপযোগী ভূমি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। গত বিশ বৎসরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই। আর এ বিষয়ে অবহেলা করিয়া ইহা স্থগিত রাখা চলে না। অতএব, এই বিষয়টি বিবেচনা করিবার জন্য কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং দ্বাদশজন কমিশনার লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক; এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ লইয়া ও গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া কমিটি ছয় মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া কর্পোরেশনে দাখিল করুন। মোটের উপর, ঐ পূর্ব্বোক্ত ধারানুসারে যাহাতে কাজ হয় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করুন। প্রস্তাবটির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইবার পর উহা গৃহীত হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত কমিটিও গঠিত হইয়াছে। এখন, যাঁহারা স্থানাভাবে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা আর ছয়টী মাস অপেক্ষা করিয়া দেখুন, তাঁহাদের অদৃষ্টে কি হয়,—তাঁহারা সহরে বাস করিতে পাইবেন, কি তাঁহাদিগকে সহর-ছাড়া হইতে হইবে। তার পর যা করেন ভগবান।

মদ্য-পানের অপকারিতা

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় ভূখণ্ডেরই প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মাদক দ্রব্য কোন-না-কোন আকারে তখনকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের মত স্থানেও একদিন মদ্যের ব্যবহার খুব প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের সেই প্রাচীনকালের জ্ঞানগুরু ঋষিরাও তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর তাঁহারা যখন ধীরে ধীরে মদের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন মদ্যপানের প্রথা যাহাতে দেশ হইতে একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহার জন্য তাঁহারা বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালের স্মৃতি পুরাণ অনুসন্ধান করিলে সেই চেষ্টার তীব্রতা যে কত অধিক ছিল তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। অতি প্রাচীন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহারাও যদি সুরা পান করিতেন তবে তাহাও কাহারও নিকট দোষের বলিয়া মনে হইত না; কিন্তু পরে উহা দেশের মধ্যে এরূপ নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকে সুরাপানকে পাপ ব্রহ্মহত্যা ও গুরুপত্নীগমনের পাপের সহিত সমান বলিয়া মনে করিত। দেশের হিতৈষিগণ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ তীব্র চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষ একটী মহাপতনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহিরেও আমরা এই একই দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখি। রোমের মত সুবৃহৎ সামাজ্য যখন গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন সেখানকার ধনী ও দরিদ্র এই উভয় শ্রেণীরই অধিবাসীদিগের মধ্যে অহিফেন অত্যধিক মাত্রায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আফিমের নেশায় বিভোর হইয়া দিন দিন অজ্ঞাতভাবে ধ্বংসের পথে নামিয়া চলিতেছিল। সকলেই মোহাচ্ছন্ন, কে কাহাকে প্রবুদ্ধ করিবে? তাই ভারতবর্ষের মত

রোম আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। সেই আসন্ন দুর্দ্দিনের করাল ছায়ায় সমগ্র রোমক-সামাজ্য কবলিত হইলেও দেশের কোন হিতৈষীর অন্ধ চক্ষে তাহা প্রতিফলিত হইল না। রোম ডুবিল; অবনতির চরম সাগরতলে চিরতরে অদৃশ্য হইল।

অহিফেন প্রাচীনকালে কেবল যে রোমেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল তাহা নহে, বর্ত্তমান কালেও তাহা অনেকের সর্ব্বনাশ করিতেছে; রুষিয়া ও চীনে তাহার পূর্ণ প্রভাব। প্রবল প্রতাপশালী তুর্কিদিগকে সে আপনার দাস করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল অহিফেন নহে—মদ, গাঁজা, চরস প্রভৃতি যে-কোন প্রকারের মাদক দ্রব্য যখন যে দেশ দীর্ঘ কাল ধরিয়া ব্যবহার করিয়াছে, তখন সেই দেশই মনুষ্যত্বের বিনিময়ে পশুত্ব বা জড়ত্বকে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জগৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত হইলেও সেখানে মদের ব্যবহার অতিরিক্ত মাত্রায় প্রচলিত হইয়া পড়ায়, তাহাদের চরিত্র হইতে পশুভাবের প্রভাব কিছুতেই অপনোদিত হইতেছে না। কৃত্রিম বাহ্য সভ্যতার অন্তরালে তাহারা আপনাদের কুৎসিত পশুভাবকে প্রচ্ছন্নে পোষণ করিয়া আসিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া যে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রদীপ্ত আলোকে সেই কুৎসিত পশুভাবের নগ্ন মূর্ত্তি বিশ্ববাসীর নয়ন সমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই ভয়ঙ্কর 'ছিন্নমস্তা' মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া বিশ্ববাসীর সহিত তাহারাও অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিনকার সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনও তাহাদের মধ্যে মঙ্গল বহন করিয়া আনিল, তাহারা জাগরণ লাভ করিল। সেইদিন হইতে পাশ্চাত্য মনীষিগণের ইহাই একটি প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কেমন করিয়া এই ভীষণ পশুত্বের গ্রাস হইতে দেশবাসীর উদ্ধার সাধন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা দেশের মধ্যে যাহাতে মদ্যের প্রচলন কমিয়া যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন এবং অনেক পরিমাণে সফলকামও হইয়াছেন। এ বিষয়ে আমেরিকা জগদ্বাসীকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে! আজ সেখানে মদ্য একেবারে নিষিদ্ধ। ইহা যে এক দিনে বা একটিমাত্র চেষ্টায় সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে। কত দিনের কত প্রকারের কঠিন সাধনার ফলে আজ মার্কিণগণ এই অভিলষিত সিদ্ধিকে লাভ করিয়াছে। যাহারা আজীবন মদ্যপানে অভ্যস্ত তাহাদিগকে ইহার অপকারিতা বুঝান যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কারণ যে কোন অভ্যাস বা প্রথার মধ্যে আমরা আজন্ম আবদ্ধ থাকি, লালিত পালিত হই, তাহাকে বিচার করিয়া বুঝিবার শক্তি আমরা হারাইয়া ফেলি; তাই সেখানে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার সময় হইতেই মদ খাইলে কি কুফল আর না খাইলেই বা কি সুফল পাওয়া যায়, তাহা অতি ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়া আসা হইতেছিল। কেবল যে এক বিদ্যালয় হইতেই এই শিক্ষার বিস্তার হইতেছিল তাহা নহে; দেশীয় নানাবিধ নৈতিক সভাসমিতি এবং ধর্ম্মমন্দির হইতেও এই শিক্ষা দিন দিন বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইতেছিল। চারিদিক দিয়াই ইহার অপকারিতাসম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার তীব্র চেষ্টা চলিতেছিল। ইহার ফলও আশানুরূপ ফলিয়াছিল; দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই একটী ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, এই মদ্য-ব্যবসায়ের মূলে একটী দুষ্ট রাজনীতি রহিয়াছে। তাহারা দেখিতেছিল যে, দেশের মধ্যে যে সমস্ত বড় বড় পদ রহিয়াছে, সেগুলি যাহারা মদ্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদেরই অধিকৃত; নানাবিধ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে, মদ্যপান পরিত্যাগ করিলেই তাহাতে অধিক সিদ্ধি-লাভ করা যায়! শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাবে দেশের জনসাধারণের মনোভাব যখন এইরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বিঘোষিত হইল। দেশবাসীর চিত্তক্ষেত্রে যে মঙ্গলের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এখন অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। মদ্যের ব্যবসায় বেশীর ভাগ জার্ম্মাণদিগেরই

হাতে ছিল ; তাই এই যুদ্ধের সময় মদ্য অতি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। যে কর্ত্তব্যকে আমেরিকাবাসী অতি কঠোর বলিয়া মনে করিতেছিল, প্রয়োজনের তাড়নায় তাহা অতি সহজ হইয়া আসিল ; তাহারা মদ্য পরিত্যাগ করিল। যাহারা যথার্থ মানুষ, তাহারা যদি একটীবারও জানিতে পারে যে, কোথায় তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে, তবে সহস্র বাধাবিপত্তি তাহাদিগকে সে পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। আমেরিকাবাসী যে যথার্থ মানুষ, আমরা তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই তাহার নিদর্শন পাইয়া আসিতেছি ; ইহাও তাহাদের মনুষ্যত্বের একটী অন্যতম নিদর্শন।

সমগ্র জগদ্বাসী যখন জাগরিত হইয়া মদ্যপানের কুফল উপলব্ধি করিয়া তাহার হস্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট, তখন চিরনিদ্রিত ভারতবর্ষ একেবারে উদাসীন! পূর্ব্ব পিতামহগণের পরম শুভকর নিষেধ বাক্যকে অবহেলা করিয়া পাশ্চাত্য জাতির অন্ধ অনুকরণে তাহারা মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্য জাতির মধ্যেও মদ্যের প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলেও, ভারতবর্ষে উহার প্রসার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। গাঁজা ও অহিফেনের ব্যবহারও দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না ; বিশেষতঃ এ বিষয়ে বঙ্গদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়াছে ; বৎসরে বৎসরে আবগারীবিভাগের আয় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইতেছে। শুনিলে ঘৃণায় মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় না যে, সামান্য অর্থের লোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত যুবকগণও আত্মমর্য্যাদাকে পদদলিত করিয়া গাঁজা, মদ ও অহিফেন প্রভৃতির দোকান করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণও আজ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান ও তাহার ব্যবসায় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না। কোন সুসন্তান যদি কখন বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা করিতে বাধ্য হন, তখন যাঁহারা শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘিত হইল বলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে বদ্ধপরিকর হন, এখন তাঁহারা কোথায়? শাস্ত্র যে মদ্যকে "অদেয়ঞ্চাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; এমন কি যাহাকে "দ্বিজাতীনামনালোচ্যম্" দ্বিজাতিদিগের আলোচনার অযোগ্য বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, আজ দ্বিজাতিগণ—ব্রাহ্মণগণ তুচ্ছ অর্থের জন্য সেই মদ্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন ; অথচ এজন্য তাঁহাদের কোন সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইল না! সম্মানেরও কোন লাঘব ঘটিল না! ইহা অপেক্ষা দেশের আর কি দুর্দ্দশা হইতে পারে? আমরা কি এমনই পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি যে, উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও আমরা, আমাদের প্রকৃত হিত কিসে হয়; তৎসম্বন্ধে অন্ধ থাকিব? বিশ্বের মধ্যে যে উন্নতির ভেরী নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কি আমরা শ্রবণ করিব না? যে আমেরিকাবাসী পুরুষানুক্রমে মদ্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহারা যদি আজ মদ্যকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তবে যাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে মদ্যের ব্যবহার শত শত যুগ রহিত হইয়া গিয়াছে, যাহারা অল্প কয়েক দিন মাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণে পুনর্ব্বার মদ্যব্যবহারে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইতেছে—তাহারা মদ্যপান ত্যাগ করিতে পারিবে না? আমরা সকল বিষয়েই গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকি, গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ না করিলে আমরা ক্ষুব্ধ হই ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যত দিন পর্য্যন্ত লোকে নিজের অভাব নিজে বুঝিয়া তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত না হয়, তত দিন কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। আমরা যদি নিজেরাই নিজেদের হিত না বুঝিয়া ব্যবসায় করিয়া দিন দিন মদ্যের প্রসার বাড়াইয়া দিতে থাকি, আর মুখে কেবল গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন জানাই, তবে তাহা কোন দিনই সুফল প্রসব করিবে না ; কিন্তু আমরা যদি দেশবাসীকে এই মহাপাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আন্তরিক চেষ্টা করি তবে তাহাতে নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে ; আমরা সফলকাম হইব ; উন্নতি আমাদের করায়ত্ত হইবে।

গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-নীতি।

আজকাল "Nation-Building" বা "জাতি-গঠন" বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। এই জাতি গঠন করিবার সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম উপায়ের প্রস্তাব করিতেছেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এ কথাটা বড় একটা কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন না। জাতি গঠন করিতে হইলে যেমন সৎশিক্ষা লাভ করা দরকার, সদাচারসম্পন্ন হওয়া দরকার, তেমনি শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিতে শেখাও দরকার। কারণ, শরীর অসুস্থ থাকিলে কোন সৎশিক্ষা বা কোন সদাচারই তেমন কাজে লাগে না। সেই জন্য সংস্কৃতে একটী কথা আছে,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

এখন, শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে, তাহাও শিক্ষা করিতে হয়। আবার, শুধু শিখিলেই হইবে না,—অভ্যাসও করিতে হইবে। সে শিক্ষা ও অভ্যাস কখন আরম্ভ করিতে হইবে?—অতি শৈশবে, বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই। কাহার কাছে শিখিতে হইবে? বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকটে, এবং বাড়ীতে জননী, ভগিনী, অন্যান্য আত্মীয়া, এবং পিতা, ভ্রাতা, খুড়া, জ্যেঠা প্রভৃতির নিকট। কিন্তু যাঁহারা এই শিক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বেই এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকেও নিজ নিজ জীবনে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনের অভ্যাস করিতে হইবে। তবে তাঁহারা শিশুদিগের চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম না শিখিলে চরিত্র গঠনই সম্পূর্ণ হয় না। এইরূপে শৈশবকাল হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সুন্দর স্বাস্থ্যসম্পন্ন যুবক যুবতীরা যে জাতি গঠন করিবে তাহাই আদর্শ জাতি হইবে।

এ পক্ষে আমাদের দেশে কিরূপ চেষ্টা হইতেছে? বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা দিবার বিশেষ কোন বন্দোবস্তই ত দেখিতেছি না। গৃহেও ইহার একান্ত অভাব দেখা যায়। আমাদের দেশের কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে শিশু এবং বালকবালিকাগণের চেহারা দেখিলেই তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সহরের ছেলেমেয়েরা সভ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু অধিকাংশই স্বাস্থ্যসম্পন্ন নহে। অতিরিক্ত রকম সভ্য, শান্ত-শিষ্ট করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগকে এমন কঠোর শাসনে রাখা হয়, যে, তাহারা স্বেচ্ছানুসারে অবাধে এক পা নড়িতে পারে না। চঞ্চলস্বভাব বালকবালিকারা পিতামাতার কঠোর শাসনে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের গোপালের মত সুবোধ হইবার চেষ্টা করে। ইহাতে তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইবার অবকাশ পায় না। ফলে, সভ্য হইতে গিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য এমন দুর্ব্বল হইয়া যায়, যে, সামান্য একটু বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাদের সর্দ্দি, জ্বর হইয়া থাকে। সামান্য একটু আহারের অনিয়ম হইলেই পেটের অসুখ হইয়া থাকে। একটু বেশী মেহনত করিতে হইলে, কিম্বা গায়ে একটু রোদ লাগিলেই অমনি মাথা ধরে। অনেক আট দশ বৎসর বয়স্ক বালক (এবং বালিকাকেও) চশমা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এই সব ননীর পুতুল লইয়া কি নেশন-বিল্ড করিতে পারা যায়?

পল্লীগ্রামের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও আজকাল আশানুরূপ নহে। তাহারা সহরের ছেলেমেয়েদের মত এত সৌখিন, কিম্বা বিলাসী নহে বলিয়া ইহাদের মত সামান্য কারণে পীড়িত হয় না বটে, কিন্তু পল্লী-জীবনের নিত্যসহচর রোগসমূহের, বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়ার পীড়নে, তাহারা অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া পড়িতেছে। তবে তাহারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারায়, সহরের সঙ্কীর্ণ স্থানে বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস না করিয়া, উদার প্রান্তর মাঠ ঘাটে অবাধে ভ্রমণ, দৌড়াদৌড়ি, খেলা-ধূলা করিবার তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ থাকায়, তাহাদের স্বাস্থ্য সহরের বালকবালিকাদিগের অপেক্ষা অনেকটা ভাল।

এখন সহরে ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলের অভাব

নাই। স্কুলে তাহাদের নিত্য নিয়মিত পাঠের সঙ্গে তাহাদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেকটা কাজ হয়। শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না,—তাহারা উপদেশ অনুসারে কাজ করিতেছে কি না তাহাও দেখিতে হইবে। হাতে কলমে তাহাদিগকে স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা দিতে হইবে। কেহ পীড়িত হইয়া স্কুল কামাই করিতে থাকিলে, সে সুস্থ হইয়া স্কুলে আসিবার পর তাহাকে, এবং তদুপলক্ষে ক্ল্যাশের অপর সকল বালককেও তাহার পীড়িত হইবার কারণটি বা কারণগুলি বুঝাইয়া দিয়া সাবধানে থাকিতে শিখাইয়া দিতে হইবে।

পল্লীগ্রামে স্কুলের সুবিধা সর্ব্বত্র সমান নহে। অনেক স্থলে স্কুল থাকিলেও, স্থানীয় সকল বালকবালিকাই স্কুলে অধ্যয়ন করে না। সুতরাং পল্লীগ্রামে একটু বিশেষ রকম ব্যবস্থা করা দরকার। যেখানে স্কুল আছে অথবা যাহারা স্কুলে অধ্যয়ন করে, তাহাদিগকে স্কুলেই স্বাস্থ্য-নীতি শিখাইবার ব্যবস্থা করা যায়। আর, যাহারা স্কুলে পড়ে না, তাহাদিগকে অবশ্য বাড়ীতেই শিক্ষা দিতে হইবে। স্থলবিশেষে গ্রামের বিজ্ঞ প্রধান ব্যক্তিগণ নিয়মিতভাবে সপ্তাহে এক দিন কিম্বা দুই দিন অপরাহ্ন-কালে গ্রামের ছেলেমেয়েদের একত্র করিয়া তাহাদিগকে স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন।

পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাববশতঃ ছেলেবুড়ো সকলেরই সাধারণ স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ। এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ নিবারণ করা বিরাট ব্যাপার, এবং উহা প্রধানতঃ Stateএর কাজ। তবে জনসাধারণেরও এ বিষয়ে সাহায্য করা প্রয়োজন। Stateএর কর্ত্তব্য State পালন করিতে থাকুন এবং জনসাধারণও Stateকে যথাসাধ্য সাহায্য করুন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যাহা করা আবশ্যক তাহা প্রত্যেককে করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া আছে বটে, কিন্তু একটু সাবধান থাকিলে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে একেবারে আত্মরক্ষা যে করা যায় না, এমন নহে। ছেলেবেলা হইতে এই ব্যক্তিগত চেষ্টাটুকু করিতে শিখিতে হইবে।

স্কুলে স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা অবশ্য সকল কথা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিবে না। তবে ১০।১১ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে এবং ৮।৯ বৎসর বয়স্কর বালিকাদিগকে স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এই বয়স হইতেই তাহারা কিছু কিছু বুঝিতে পারিবে; সুতরাং এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নততর নীতি-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা যায়।

প্রথমে তাহাদিগকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, শরীর সুস্থ রাখা কেবল তাহাদের নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নহে,—তাহারা যে পরিবারের এবং যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই পরিবারের এবং সেই সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের খাতিরেও তাহাদের নিজ নিজ শরীর সুস্থ রাখা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, ভগবান যে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন,—পশু করিয়া সৃষ্টি করেন নাই,—তাহার উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে "মানুষ" হইতে হইবে। পশুর সহিত মানবের যে পার্থক্য তাহাদিগকে সেটি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া সেই উন্নত আদর্শের দিকে চলিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ইহাও শিখাইয়া দিতে হইবে যে, ঐ উন্নত আদর্শ লাভ করিতে হইলে,—প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদের দেহ সুস্থ রাখিতে শিক্ষা করা দরকার। এই দুইটী বিষয় যাহারা উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবে, তাহাদিগকে স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা দিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। ছেলেমেয়েরা ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে নিজের নিজের শরীরে যত্ন করিতে শিখিলে national health বা জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আপনা আপনি হইয়া যাইতে পারিবে।

মোট কথা, এই শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে উপযুক্ত শিক্ষক আবশ্যক। জাতির প্রতি মমত্ব-বোধ যাঁহার আছে, যিনি শিক্ষকতা করা কেবল অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলিয়া মনে করেন না, যিনি ছাত্রছাত্রীগণকে নিজ পুত্রকন্যার মত দেখিতে এবং তাহাদিগকে সেই

ভাবে স্নেহ করিতে পারেন, কেবল তিনিই এই মহান শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে এইরূপ উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সাধারণতঃ যতটা নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করা হয়,—ছেলেমানুষ বলিয়া তাহাদিগকে যতটা উপেক্ষা করা হয়, বাস্তবিক তাহারা ততটা নির্ব্বোধ নহে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ছেলেমেয়েরা তাহাদের পিতা, মাতা, অন্য অভিভাবক বা শিক্ষকের অনেক কথাই বুঝিতে পারে। 'ছেলে মানুষ', 'অবুঝ' বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলে, তাহাদিগকে শিক্ষাদানে বিরত থাকিলে, তাহাদের প্রতি, এবং দেশের ও জাতির প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। পেশাদার শিক্ষকের কথা ছাড়িয়া দিলে, যিনি প্রকৃত শিক্ষক—ছাত্রদের প্রতি যিনি অন্তরের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন, তিনি ছাত্রদের হৃদয়ের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন যে, ছেলেরা তাঁহার কথা বেদবাক্য স্বরূপ মান্য করিয়া থাকে। কোন কোন কথা তাহারা যদি নাও বুঝিতে পারে, তথাপি, তাঁহারা উপদেশ বলিয়া তাহারা তাহা পালন করিবার চেষ্টা করিবে।

ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন এবং স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক যখন ছাত্রদের স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিবেন, তখন তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের মত নীরস বা তিক্ত না হয়। উপদেশ দিবার গুণে উপদেশগুলি ছেলেদের কর্ণে মধু বর্ষণ করা চাই। তবে তাঁহার উপদেশে ফল ফলিবে। এই কাজটি যিনি সুশৃঙ্খলে করিতে পারিবেন, তিনিই সুশিক্ষক। এরূপ শিক্ষক অবশ্য যত্র তত্র অনেক সংখ্যায় পাওয়া যাইবে না; তবে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া এরূপ শিক্ষক গড়িয়া লইতে হইবে।

প্রকৃত খাদ্য।

আমরা প্রত্যহ যাহা আহার করি, ঠিক মত তাহার সকলগুলিকেই খাদ্য বলিতে পারি কি? না,—পারি না। কারণ, "খাদ্য" কেবল তাহাকেই বলিতে পারা যায়, যাহার দ্বারা আমাদের শরীরের 'পুষ্টিসাধন" হয়। যে সকল দ্রব্য আমাদের শরীর পোষণে সহায়তা করে না, তাহা আমরা উদরস্থ করিলেও, তাহা আমাদের মুখরোচক,—রসনার তৃপ্তিকর হইলেও,—তাহাকে খাদ্য বলিতে পারা যায় না; বলিলে, খাদ্যের অপমান করা হয়। বস্তুতঃ, তাহা প্রকৃত পক্ষে অখাদ্য। কারণ, শরীর পোষণ করাই খাদ্য গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য,—রসনার তৃপ্তিসাধন বা উদর পূরণই খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য নহে। যে দ্রব্য দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহাই আমাদের খাদ্য-পদবাচ্য; যাহার দ্বারা তাহা হয় না, তাহা নিশ্চয়ই অখাদ্য।

আবার এক জিনিষ একজনের পক্ষে পুষ্টিকর হইলেও, অপর লোকের পক্ষে পুষ্টিকর না হইতেও পারে। সুতরাং, প্রকৃত খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন হইতে পারে। কারণ, খাদ্য হজম করিয়া শরীর পোষণার্থ নিয়োগ করা ব্যক্তিগত শারীরিক অবস্থা ও হজম করিবার শক্তির উপর নির্ভর করে। সুস্থকায় এবং বলবান্ ব্যক্তি যে জিনিষ খাইয়া হজম করিতে পারে, ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত, শীর্ণকায়, দীর্ঘোদর ব্যক্তির তাহা হজম করিতে না পারিবারই কথা। কাজেই, পোলাও-কালিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তির খাদ্য হইতে পারে;

কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষে সাগু-বার্লি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্যই খাদ্য। পোলাও-কালিয়া তাহার খাদ্য নহে, অখাদ্য।

তবে কি প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে? সকল মানুষের—অন্ততঃ, এক এক জাতীয় মানুষের জন্য এক একটা সাধারণ খাদ্য নির্ব্বাচন করা যায় না কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ বহুকাল ধরিয়া বহু অনুসন্ধান, গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা সমগ্র মানব সমাজের শারীরিক গঠনের একটা সাধারণ অবস্থা নির্ণয় করিয়া খাদ্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মানব-শরীর যে যে উপাদানে গঠিত, খাদ্যেও সেই সকল উপাদান থাকা আবশ্যক। আবার, কেবল থাকিলেই চলিবে না, এমন অবস্থায় থাকা চাই যে, মানব-দেহের উপাদানগুলি খাদ্য হইতে নিজ নিজ সমধর্ম্মী ও সমশ্রেণীর উপাদানগুলিকে বাছিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া নিজেদের ক্ষয় পোষণপূর্ব্বক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই যে শরীর-পোষণ-ক্রিয়া,—ইহা দুইটী মৌলিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথম অবস্থাটি গৃহীত খাদ্যের গুণ, এবং দ্বিতীয় অবস্থাটি খাদ্যকে হজম করিবার পক্ষে শরীর-মধ্যস্থ পাকযন্ত্রের শক্তি পূর্ব্বে বলিয়াছি, খাদ্যের পুষ্টিকারিতা গুণ থাকিলেও, ব্যক্তিবিশেষের হজম করিবার শক্তির তারতম্য অনুসারে, ঐ ভুক্ত পদার্থ কমবেশী শরীর-পোষণ-কার্য্য সম্পন্ন করে। অর্থাৎ, খুব পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলেও হজম করিবার শক্তি না থাকিলে, সে খাদ্য কোন কাজেই আসে না। আবার, হজম করিবার শক্তি খুব বেশী থাকিলে, কম পুষ্টিকর খাদ্য হইতেও ততটা উপকার পাওয়া যায় না। ফল কথা, খাদ্যও পুষ্টিকর হইবে, হজম করিবার শক্তিও যথেষ্ট থাকিবে;—তবে আহার্য্য গ্রহণ সার্থক হইবে। ইহা ছাড়াও, আরও একটা কথা আছে। যে যেমন কাজ করে, তদনুসারেও খাদ্যের তারতম্য করা দরকার। একজন মজুর, যাহাকে সমস্ত দিন কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়,—তাহার জন্য যে খাদ্য আবশ্যক,—একজন কেরাণী যাহাকে সমস্ত দিন মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার সে খাদ্যে চলিবে না,—তাহার জন্য অন্য রকম খোরাক চাই।

এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইলে খাদ্য-শ্রেণীর পদার্থগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে কোন্ খাদ্যে কোন্ শ্রেণীর উপাদান কি পরিমাণে আছে, তাহা জানা যাইবে; এবং কোন্ কোন্ খাদ্য কোন্ শ্রেণী মানুষের পক্ষে কি পরিমাণে আবশ্যক তাহাও নির্ণয় করিতে পারা যাইবে।

বৈজ্ঞানিকেরা রাসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে পদার্থ সকল বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি মূল পদার্থ পাইয়াছেন। সেই সকল মূল পদার্থের মধ্যে অঙ্গার (Carbon), অম্লজান (Oxygen), যবক্ষারজান (Nitrogen), উদজান (Hydrogen) অন্যতম। এই মূল পদার্থগুলি জীব-শরীর গঠনের প্রধান উপাদান। সুতরাং জীব-শরীর পোষণ করিতে হইলে, যে সকল পদার্থে এই মূল পদার্থগুলি আছে, তাহাই জীবের খাদ্য হইতে পারে। এই মূল পদার্থগুলি অনেক যৌগিক পদার্থেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু জীব-শরীর যে ভাবে গঠিত, তাহার শক্তি যেরূপ সীমাবদ্ধ, জীবগণ যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, তদনুসারে, জীবমাত্রেই পদার্থমাত্র হইতেই এই উপাদানগুলি সংগ্রহ করিতে পারে না। পারে কেবল উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থ হইতে। সেই জন্য, এই দুইটী পদার্থ জীবের খাদ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত চারিটী মূল পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে এবং বিভিন্ন অবস্থায় মিলিত হইয়া প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয় করিতে হইলে এমন ভাবে বিশ্লেষণে কাজ হইবে না। অন্য দিক হইতে আরও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিলে খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণীত হইতে পারিবে। বৈজ্ঞানিকেরা অতঃপর খাদ্য দ্রব্যকে এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন। তাহাতে ফল পাওয়া গেল,—

১। Proteins (প্রোটীন্‌স) বা Albuminoids (য়্যালবুমিনয়েড্‌স);—গোধূমের অন্তর্গত Gluten (গ্লুটেন), ডিম্বের অন্তর্গত Albumen (য়্যালবুমেন) বা শ্বেতাংশ, দুগ্ধের অন্তর্গত Casein (কেসেইন্‌), Connective tissuer (কনেকটিভ টিস্যুর) অন্তর্গত Gelatin (জিলাটিন), পেশী বা মাংসের অন্তর্গত Fibrin (ফিব্রিন্‌); উদ্ভিজ্জ প্রোটিন্‌স্‌ (তন্মধ্যে Globulin প্রধান) (ইহা প্রায় সমুদায় উদ্ভিজ্জ পদার্থে বিদ্যমান)। এইগুলি হইতে Protein পাওয়া যাইতে পারে।

২। Carbohydrates (কার্ব্বোহাইড্রেটস্‌);—সমগ্র উদ্ভিজ্জ পদার্থে ইহা পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ Starch (ষ্টার্চ্চ—শ্বেতসার) বা Dextrin (ডেক্সট্রিন্‌—শুষ্ক উত্তাপে ষ্টার্চ্চই ডেক্সট্রিনে পরিণত হয়; টোষ্ট করা রুটিতে এই ডেক্সট্রিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইহা দ্রবণীয় এবং সুপাচ্য) ও চিনিতে পাওয়া যায়।

৩। তৈল;—ইহা সমস্ত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্যে আছে।

৪। ধাতব পদার্থ। কোন প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ দগ্ধ করিলে তলায় যে ছাই পড়িয়া থাকে, তাহাই ধাতব পদার্থ। ইহার বিলক্ষণ পুষ্টিকারিতা গুণ আছে। বালকবালিকার খাদ্যে ইহা থাকা চাই, নচেৎ তাহাদের দৈহিক পুষ্টিসাধন সম্ভবপর নহে। ছাইতে ধাতব পদার্থ লবণ নামে রাসায়নিক পদার্থের আকারে থাকে। ঐ লবণ মধ্যে Calcium Magnesium, Potassium Sodium ধাতুর ফসফেট, সলকেট ক্লোরাইড প্রভৃতি পদার্থও আছে। ক্যালসিয়ম ফসফেট হইতে আমাদের অস্থির ধাতব অংশ সংগৃহীত হয়।

৫। জল;—সকল প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থে জল বর্ত্তমান আছে। জল না থাকিলে শারীর-ক্রিয়া সম্ভবপর হইত না।

এই পাঁচটি পদার্থ প্রধানতঃ আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা দেহ-যন্ত্রের অনেক কাজ সাধিত হয়। আহারের পূর্ব্বে ইহারা যে খাদ্যে যেরূপ অবস্থায় থাকে, এবং রন্ধনাদির দ্বারা ইহাদিগকে যেরূপ অবস্থায় পরিণত করিয়া লওয়া হয়, তদনুসারে ইহারা শরীরের মধ্যে নানারূপ কাজ করিয়া থাকে। রন্ধনের তারতম্যানুসারে কোন খাদ্য কখনও লঘুপাক, কখনও গুরুপাক হইয়া যায়। কাঁচা অবস্থার অপেক্ষা রাঁধা অবস্থায় উদ্ভিজ্জ জাতীয় অনেক খাদ্যই অধিকতর সুপাচ্য হইয়া উঠে। কিন্তু প্রাণিজ খাদ্য অনেক সময় দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ কাঁচা ডিম সিদ্ধ ডিমের অপেক্ষা অধিকতর সুপাচ্য।

খাদ্যের ঐ যে পাঁচটি বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থার উল্লেখ করা হইল (প্রোটীন, কার্ব্বোহাইড্রেট, তৈল বা চর্ব্বি, ধাতব পদার্থ, ও জল) ইহারা জীবদেহের এক এক অংশের পুষ্টিসাধন করে। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রোটীনমূলক খাদ্য টিস্যু গঠন করে এবং দেহে তাপ ও তেজ উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কার্ব্বোহাইড্রেটমূলক, পদার্থ ও তৈল জাতীয় পদার্থ তাপ ও তেজ উৎপাদন করে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জল ও ধাতুমূলক পদার্থ টিস্যু গঠন করে।

প্রাচীনেরা বিবেচনা করিতেন, দেহ-পোষণার্থ প্রোটীন সংগ্রহ করিতে হইলে মাংস এবং তদ্বৎ পদার্থ আহার না করিলে চলিবে না। কিন্তু এখন স্থির হইয়াছে, প্রাচীনগণের ঐরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। কারণ, প্রোটীন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুই প্রকারের খাদ্যেই পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী যে শরীর পোষণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এদিকে আবার, কার্ব্বোহাইড্রেট শ্রেণীর পদার্থ মধ্যে কিছু প্রোটীন এবং প্রোটীন শ্রেণীর খাদ্য মধ্যে কিছু কার্ব্বোহাইড্রেট আছে। অতএব বলিতে হয়, এই শ্রেণী-বিভাগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই।

সংক্ষেপে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের পক্ষে মাংস অপরিহার্য্য খাদ্য নহে। যথা, প্রাচীনেরা মনে করিতেন, মাংস না খাইলে বেশী করিয়া শারীরিক পরিশ্রম করা

যায় না। পক্ষান্তরে আলু পূর্ব্বে পেট-ভরানো খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত,—তাহার দ্বারা যে শরীরের রীতিমত পুষ্টিসাধন হয়, এ কথা আগে কেহই বিবেচনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু এখন স্থির হইয়াছে প্রোটীন নামক পদার্থটী আলুতে খুব বেশী পরিমাণে আছে।

শিশুর চিত্তবৃত্তি।

বছর খানেক পরের কথা।

ইতিমধ্যে প্রফুল্লর একটী খোকা হইয়াছে। প্রসবের তিন মাস পরে সে শ্বশুড় বাড়ী গিয়াছিল। সম্প্রতি তাহার শরীর একটু অসুস্থ হওয়ায় সে আবার বাপের বাড়ী আসিয়াছে। প্রসব জনিত দৌর্ব্বল্য এখনও দূর না হওয়ায় তাহার শ্বাশুড়ী কিছুদিন তাহাকে তাহার মার কাছে রাখিতে সম্মত হইয়া, স্বেচ্ছায় তাহাকে তারার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

প্রফুল্ল আহার করিয়া উপরে আসিয়া তাহার খোকার সহিত খেলা করিতেছিল। খানিক পরে বিমলা দেবী আহার করিয়া উপরে আসিয়া স্নেহের অনুযোগ করিলেন, "হাঁ লা ফুলি, খোকাকে নিয়ে যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে পড়লি; ডালগুলো বেছে রাখতে বলেছিলুম, রেখেছিস?"

প্রফুল্ল মায়ের কথার ঠিক জবাব না দিয়া, এক গাল হাসিয়া কহিল, "দেখ না মা, খোকা কেমন হাঁট্‌তে শিখ্‌ছে। বলিয়া খোকাকে দাঁড় করাইয়া দিল। তার পর তাহার হাত দুটী ধরিয়া তাহাকে চলিতে শিখাইতে লাগিল, 'হাঁটি হাটি,—পা, পা"। এই বলিয়া দুই এক পা নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া হাত ছাড়িয়া দিতেই, খোকা ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিমলা দেবী তাড়াতাড়ি আসিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, চুম্বনে চুম্বনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিয়া আদর করিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মী দাদা আমার, কেঁদ না। মা বড় দুষ্টু, ওকে মারব এখন!"

কিন্তু খোকা দিদিমার এত আদর উপেক্ষা করিয়া দুষ্টু মায়ের কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইল, এবং আরো জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

"ধন্যি ছেলে যা হোক! নে বাপু, তোর ছেলে নে।"

খোকা প্রফুল্লর কোলে গিয়া শান্ত হইয়া চুপ করিল। মা তখন মেয়েকে কহিলেন, "তোর বাছা সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি। এখনই কি ওর হাঁটবার বয়েস হয়েছে? আরও দুই এক মাস যাক, তবে ত হাঁটতে শিখবে। তোর যেন আর তর সয় না!"

"কেন মা খোকা ত দাঁড়াতে বেশ পারে; হাঁটতে বা পারবে না কেন? তুমি দেখ না,—আমি দু'দিনে ওকে হাঁটতে শেখাচ্ছি।"

"ওরে, তা পারবি না। অতটুকু ছেলের হাঁটতে শেখা কি সোজা কথা? ওতে ওর কত মানসিক পরিশ্রম হয়, তা জানিস?"

মার কথা প্রফুল্লর বিশ্বাস হইল না। সে একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "হাঁটাতে আবার মানসিক পরিশ্রম কোথায় বরং শারীরিক পরিশ্রম একটু আধটু হয় বটে।"

মা বলিলেন, "শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে, কিন্তু শরীরের মেহনত যতটা হয়, মানসিক পরিশ্রম তার চেয়ে ঢের বেশী হয়।"

"কেমন করে মা?"

"ওমা, তা আবার হয় না? প্রথমতঃ ওকে পা ঠিক রাখতে হবে। ইংরেজীতে তাকে বলে ব্যালেন্স

পাল্লা ঠিক না রাখতে পারলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারবে না। এতে কি ওকে কম ভাবতে হয়? তার পর, চলতে হলে দূরত্বের একটা ধারণা মনের ভেতর এসে জন্মাবে। কতখানি পা বাড়াতে হবে,—বেশী দূরে পা বাড়ালে পড়ে যেতে হবে—এ জ্ঞান টুকুও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাওয়া চাই। তার পর, চলবার জন্য গতিবেগ প্রয়োগ করতে হবে। মনের ভেতর এসব ভাবনা না উঠিলে, মনে মনেই এদের সমাধান করে না নিলে অতটুকু ছেলেও চলতে শিখতে পারে না। তার পর, চলবে অথচ পড়বে না,—এ ভাবনাটাও বড় ছোট খাট ভাবনা নয়। চল্‌তে গেলেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ওকে টেনে মাটীতে ফেলে দিতে চাচ্ছে;—সে শক্তির বিরুদ্ধে ওকে চলতে হবে, তার সঙ্গে লড়াই করে, তাকে হারিয়ে দিলে তবে ও চলতে পারবে। কাজেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হাতে ওকে ফেলে দিতে না পারে, সে চেষ্টা ওকে করতেই হবে। এটা সম্পূর্ণ মানসিক চেষ্টা। এখনও মাস দু' তিন না গেলে খোকা হাঁটতে চেষ্টা করতেই পারবে না। তার পর; আরও মাস কতক না গেলে ওর হাঁটা শেখা সম্পূর্ণ হবে না।"

"তা' হলে আমি কি ওকে হাঁটতে শেখাবো না?"

"না। এত তাড়াতাড়ি কিসের? আপনিই হাঁটতে শিখবে। চেষ্টা করতে করতে, পড়তে পড়তে ঠিক শিখে নেবে। তাতে কিছু দিন সময় লাগবে অবিশ্যি। তা' লাগুক না। বরং ওকে হাত ধরে হাটতে শেখালে ওর নিজের চেষ্টায় বাধা পড়ে যাবে। একটা এমন বদ অভ্যাস দাঁড়িয়ে যাবে যে, ভয়ঙ্কর পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে,—পরের সাহায্য না পেলে নিজে কোন কাজ করতে পারবে না। তার চেয়ে নিজে হাঁটতে শিখুক। তাতে সময় লাগে লাগুক; পড়ে পড়ুক, ক্ষতি নাই।"

"আচ্ছা মা, আপনি হাঁটতে শিখতে গেলে ও ত ফি বারই পড়ে যাবে। তাতে ওর লাগবে না? মা হয়ে আমিই বা তা' কেমন করে দেখব?"

"একটু আধটু লাগবে বটে, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হবে না।"

"আচ্ছা, যদি পড়ে যেয়ে মাথা ফেটে যায়?"

"কি যে অলুক্ষুনে কথা বলিস! দুই একবার মাথায় লাগবে বটে, কিন্তু মাথা ফাটবে কেন? ওর মাথা এখন কত নরম একবার হাত দিয়ে টিপে দেখ না। আর সেই সঙ্গে তোর নিজেরও মাথা টিপে দেখ, কত শক্ত। হাঁটতে গেলে প্রথম প্রথম দুই একবার মাথায় লাগতে পারে, কিন্তু তার পর আর লাগবে না। কেন জানিস? বার দু তিন মাথায় লাগলেই ও এমনি সাবধান হয়ে যাবে যে, পড়লেও, মাথায় যাতে না লাগে সে চেষ্টা ও আগে করবে; পড়বার সময় মাথাটায় যাতে না লাগে, সে জন্যে মাথা সাবধান করে একটু উচু করে রাখবে,—মেঝেয় মাথা ঠেকতে দেবে না।"

প্রফুল্ল কোন কথা কহিল না। কিন্তু তাহার চাহিয়া থাকার ভঙ্গী দেখিয়া মা তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, "তুই অত ভয় করিসনি। ছেলেকে সর্ব্বদা নজরে নজরে রাখতেও হবে,—যাতে তার কোন বিপদ আপদ না ঘটে, আবার তাকে সব নিজে নিজে শিখতেও দিতে হবে। মানুষের সঙ্গে অন্য জীব জন্তুর একটা মস্ত প্রভেদ আছে সন্তান পালন করার বিষয়ে। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখতে পারি ইতর জীবের সন্তানেরা যত শীঘ্র লায়েক হয়ে ওঠে, মানব-শিশুর লায়েক হতে তার চেয়ে অনেক বেশী দেরি হয়। অন্য জীব জন্তুর সন্তান মার পেট থেকে পড়বার দুই এক দিনের মধ্যেই নিজের প্রায় সব কাজ করতে শেখে,—তাদের মা-বাপকে খুব কমই সাহায্য করতে হয়। এই ধর ভেড়া, ছাগল, গরু—এদের বাচ্ছা হলে, প্রথম দুই এক দিন তাদের মা তাদের খুব যত্ন করে। দেখ্‌লি নি, সে বছর যখন আমাদের গাইটা বিউলো,—বাচ্ছাটা পেট থেকে পড়বার পর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। দুই একবার উঠতে যেয়ে তাকে পড়তে হয়েছিল, বার দু তিন তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে

হয়ে ছিল। তার পর সে আপনিই উঠে দাঁড়ালে। তখন ভোলা তাকে তার মার মাই ধরিয়ে দিলে। মাই চুষে চু ষ খানিকটা দুধ খাবার পর তার গায়ে এমন জোর হ'ল যে, তার লম্ফ ঝম্প দেখে কে। কিন্তু মানুষের বেলা অন্য রকম ব্যবস্থা। মাকে কত দিন ধরে সন্তানকে যত্ন করতে হয়। ইতর পশুর সন্তান যত দিন না নিজের খুটে খেতে শিখে তত দিনই তাদের মা-বাপ তাদের স্নেহ যত্ন করে। আপনি খেতে শিখলেই তাদের দূর করে দেয় যে, যাও নিজে নিজে চরে খাওগে, আমরা আর তোমাদের পুষতে পারব না। কিন্তু মানুষ মা-বাপ সন্তানকে এত বেশী স্নেহ করে যে, সন্তান নিজে নিজে সে সব কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পারে? সে সব কাজেও তাদের মা বাপ তাদের সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসে। এতে ছেলের অনিষ্টই হয়। যে ছেলে মা-বাপের কি ঝি চাকরের হাত নাধ'রে এক পা নড়তে চায় না, রাস্তায় বেরুলে তাদেরই গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়বার কি অন্য রকম বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্তু যাদের সে রকম সুবিধে নেই, কিম্বা কাজের গতিকে মা-বাপ ততটা পেরে ওঠে না, সে সব ছেলে মেয়ে অল্প বয়স থেকেই চালাক হয়ে ওঠে। সেই জন্যেই বলছি, ছেলেকে আত্ম-নির্ভরশীল হতে শিখতে দিতে হবে। জাপানীদের এই নিয়মটি খুব ভাল। তাদের ছেলে মেয়েরা হাঁটতে শেখবার সময় হাজারই পড়ুক, তাদের মা বাপ কি আত্মীয় স্বজন কখনই ছুটে এসে আহা উহু করে কোলে তুলে নেবে না; ছেলে পড়ল; আবার আপনিই উঠে ফের চলবার চেষ্টা করতে লাগল।"

এই সময়ে প্রফুল্ল একটু হাসিয়া কহিল, "কিন্তু মা, খোকা এই মাত্র পড়ে যেতে তুমি নিজেই ছুটে এসে ওকে কোলে তুলে নিলে!" বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু মাও হাসিলেন; কহিলেন, "ঠিক বলেছিস। কি আমিও যে বাঙ্গালী মা! আমার জন্মগত সংস্কার কোথা যাবে? তা' ছাড়া, ওর ত এখনও চলবার বয়স হয় নি! তুই যে অসময়ে ওকে চলতে শেখাতে যাচ্ছিস!

"কিন্তু তুমি তাই বল মা,—ছেলের উপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর না রাখলে কখন যে কি বিপদ ঘটিয়ে বসে তার ঠিক কি। হয় ত আগুণেই বা হাতটা দিয়ে বসল।"

"নজর রাখতে কি আমি বারণ করছি। বিপদের আশঙ্কা দেখলে সাবধান হতে হবে, বারণ করতে হবে বৈ কি! তবে তার যে সব কাজ নিজে নিজেই করা উচিত, সেগুলো তাকে করতে না দিলে, তার স্বভাব এমন খারাপ হয়ে যাবে যে, অন্য লোকে ধরে না দিলে, কি সাহায্য না করলে তার কোন কাজই হবে উঠবে না শুনেছি, কোন এক নবাবের সঙ্গে কাদের লড়াই হয়। লড়ায়ে নবাব হেরে যায়। তার পর পাছে সে শত্রুর হাতে পড়ে এই জন্যে পালাবে। পোষাক টোষাক পরে ঠিক ঠাক হয়ে রয়েছে, কেবল জুতোটা পরতে বাকী। তার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস চাকরে জুতো জোড়াটা তার পায়ের কাছে এগিয়ে দেবে, তবে সে জুতো পরতে পারবে। এখন, বিপদ আসন্ন দেখে চাকর বাকরেরা সব পালিয়েছে। নবাব হেঁকে হেঁকে একজনও চাকরের সাড়া পেলে না। কাজেই জুতো যোড়াটা এগিয়ে দেবার লোকের অভাবে তার জুতো পরা হল না, জুতো পায়ে না দিয়ে তার পালানোও হল না। শেষ তাকে ধরা পড়ে যেতে হল। এতটা পরমুখাপেক্ষী হওয়া কোন কারণেই ভাল নয়। ছেলেকে যত বেশী সাহায্য করবে, সে তত পরাধীন আর যত কম সাহায্য করবে, সে তত আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে।"

কলেরা নিবারণ।

গত বারে আমরা কলেরা রোগের উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি; এবার কলেরা নিবারণের উপায় বিবৃত করিব।

কলেরা রোগীর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা আরম্ভ যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। কারণ, রোগ নির্ণয় আরম্ভ করিতে যত বেশী সময় যায়, রোগ তত দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে, অনেক কলেরা রোগীই আরোগ্যলাভ করিতে পারে। কলেরার চিকিৎসার কথা কহিবার পূর্ব্ব আমরা প্রথমে কলেরার প্রতিকারের ব্যবস্থাগুলির উল্লেখ করিব। ঘোষ এণ্ড দাস প্রণীত Treatise on Hygiene Public Health গ্রন্থে কলেরার নিম্নলিখিত প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগত প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

১। বদহজম হইলে, অথবা পেটের অসুখ করিলে, কিম্বা পেটের কোনরূপ গোলমাল হইলেই, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হজমের গোলমাল হইলে, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করা না হইলে, কলেরার দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকে।

২। কলেরা মহামারীর আক্রমণের সময়ে কখনও খালি পেটে থাকিবে না। সর্ব্বদাই উদর পূর্ণ রাখিয়া পাচক রস নিঃসরণের সহায়তা করিবে। পাচক রসে অম্ল (acid) থাকায় কলেরার বীজাণু পাকস্থলীর মধ্যে জীবিত থাকিতে বা বংশবৃদ্ধি করিতে সুযোগ পায় না।

৩। যে খাদ্য গ্রহণ করিলে হজম হইবে না বুঝিবে, এমন খাদ্য যত্নসহকারে পরিত্যাগ করিবে। কলেরা মহামারীর সময় গুরুপাক খাদ্য অনিষ্টকর। অপক্ক বা অপরিপক্ক ফল কিম্বা পচা খাদ্য কখনও খাইবে না।

৪। রেলপথে ভ্রমণকালে কোনরূপ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিবে না। ঠাণ্ডা খাদ্য, আইস পুডিং, আইস ক্রীম প্রভৃতি খাইবে না। যাহা খাইবে তাহা গরম গরম খাইবে।

৫। বাজারের এরেটেডওয়াটার পান করিবে না। টাটকা তৈয়ারী সোডাওয়াটার খাইবে না। সোডা-ওয়াটারের সঙ্গে যে কার্ব্বলিক এসিড থাকে, সেগুলির কোমাব্যাসিলাস (কলেরার বীজাণু) করিয়া থাকে। কিন্তু এই ধ্বংস ক্রিয়া সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে তিন-চারি দিন সময় দিতে হইবে।

৬। কলেরার সময়ে কখনও জোলাপ লইবে না। বিশেষতঃ যে জোলাপে লবণ আছে, তাহা কদাচ গ্রহণ করিবে না; লবণঘটিত জোলাপ অতীব অনিষ্টকর।

৭। পানীয় জল এবং বাসন প্রভৃতি ধোত করিবার জল গরম করিয়া না লইয়া কখনও গ্রহণ করিবে না। এইটি নিয়মিতভাবে অতি অবিশ্যি করা চাইই। মৃদু চা, লেবুর রস, দধি, ঘোল ডাবের জল বেশ নিরাপদ পানীয়।

৮। কলেরার আক্রমণকালে কাহারও উদরাময় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করাইবে।

সাধারণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা অতীব আবশ্যক।

১। জল সংগ্রহের যে সকল ব্যবস্থা আছে, সেগুলি খুব কড়া পাহারা রাখিয়া রক্ষা করিবে যেন কোনরূপে সে জল দূষিত হইতে না পারে। যে সকল পুষ্করিণী বা কূপের জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে, সেগুলির উপরও খুব কড়া নজর রাখিতে হইবে, যেন কেহ তাহার জল ব্যবহার না করে। অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল সে জল ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ, কলেরার বীজাণু জলের মধ্যে প্রায় এক সপ্তাহকাল জীবিত থাকিতে পারে।

২। কোন পল্লীতে, বা কোন বাড়ীতে কলেরার প্রকোপ আরম্ভ হইলে, সেই পল্লী বা বাড়ীর লোক

যাহাতে বিশুদ্ধ জলের পুকুর বা কূপের জলের মধ্যে তাহাদের ঘটি, বাটি অথবা ঘড়া ইত্যাদি ডুবাইয়া জল লইতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এমন কি, তাহাদিগকে পুষ্করিণী বা কূপের নিকটে যাইতে না দেওয়াই উচিত।

৩। কোন কূপের জল কলেরা-বীজাণু দ্বারা দূষিত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ জন্মিবার কারণ ঘটিলে, সেই কূপের জলে পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটানা মিশ্রিত করিবে। আচ্ছাদিত কূপের জল দূষিত হবার সম্ভাবনা অনেকটা কম।

৪। পুকুরের কাছে কাপড় কাচা বা বাসন ধোয়া একেবারে বন্ধ করিতে হইবে।

৫। কোন একজন লোককে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়া পুকুর বা কূপের নিকটে রাখিতে হইবে। কেহ লইতে আসিলে এই ব্যক্তি জল তুলিয়া তাহার পাত্রে ঢালিয়া দিবে।

৬। রন্ধনশালা এবং রন্ধনকারিণী যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। রন্ধনকারিণীকে কোন কারণেই রোগীর ত্রিসীমায় যাইতে দিবে না।

৭। সকল পায়খানা ও ড্রেণ প্রত্যেক Byllin অথবা Phenyle দ্বারা শোধিত করাইবে।

৮। কোন স্থানে কলেরা আরম্ভ হইলে সেই স্থানের জনসাধারণকে কলেরার আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় শিক্ষা দিতে হইবে। বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে না পারিলে লোক-শিক্ষার সহায়তা হইতে পারে না।

৯। কলেরা রোগীর দেহনিঃসৃত সমস্ত পদার্থ প্রভৃতি এবং তাহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

১০। পানীয় জল ফুটাইয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কদাচ ফিলটার করা উচিত নহে।

কোন বাড়ীতে কলেরা আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত-ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১। সম্ভব হইলে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই ভাল হয়। তাহাতে, তাহার রীতিমত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইতে পারে। হাসপাতালের পাঠাইবার সুবিধা না থাকিলে, রোগীকে স্বতন্ত্র একটী কক্ষে রাখিতে হইবে; শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত পরিবারের অন্যান্য লোকে রোগীর সংস্রবে না আসিলেই ভাল হয়।

২। রন্ধনকরা সকল খাদ্য ফেলিয়া দিতে হইবে অথবা, নষ্ট করিয়া ফেলিলে আরও ভাল হয়। সমস্ত রন্ধনপাত্র ঔষধের দ্বারা শোধিত করিয়া গরম জলে ধৌত করিয়া লইতে হইবে।

৩। ব্যবহারের জন্য বাড়ীতে সঞ্চিত জল থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিয়া নূতন জল সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪। রোগী যে খাদ্য খাইয়াছে, অন্য কেহ যদি তাহা খাইয়া থাকে, তবে তাহার রোগ প্রকাশ না পাইলেও তাহাকেচিকিৎসাধীন রাখিতে হইবে।

৫। যে কোন ব্যক্তি রোগীর সংস্রবে আসিবে তাহাকেই প্রথমে সাবান-জলে হাত-পা ধুইয়া, পরে বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত জলে হাত পা ধুইয়া লইতে হইবে। দুই হাজার অংশ জলে এক অংশ Hydrol Perchlor মিশ্রিত করিলে যে লোসন তৈয়ারী হইবে তাহার প্রতি পাঁইট বোতলে এক ড্রাম হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড মিশাইলে এই বিশোধক ঔষধ প্রস্তুত হইবে।

৬। কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত মল, মূত্র বমি পদার্থ ফিনাইল দ্বারা শোধন বা কোন খনিজ অম্ল দ্বারা শোধিত করিতে হইবে। অ্যাসিড মাত্রেই কলেরা বীজাণুর পক্ষে বিষম মারাত্মক।

যে বাড়ীতে কলেরা রোগ প্রবেশ করিয়াছে, সে বাড়ী শোধনের ব্যবস্থা।

ঘোষ ও দাস প্রণীত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গ্রন্থে ইহার এইরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—দূষিত বস্ত্রাদি শয্যাদ্রব্য একত্র করিয়া, বাষ্প ঘটিত শোধক যন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে—বাষ্পের দ্বারাই সংশোধিত করিয়া

লইতে হইবে। অন্যথা, বস্ত্রগুলি ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ, পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ঘরের মেঝেগুলি পারক্লোরাইড অব মার্কারীর (১০০০ অংশ জলে ১ অংশ ঔষধ) মিশ্র করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে। আসবাব-পত্রের উপরের খানিকটা চাঁচিয়া ফেলিয়া সাবান দিয়া ফুটানো গরম জলে ধৌত করিয়া লইবে। তার পর, যে ঔষধের দ্বারা ঘরের মেঝে ধৌত হইবে, সেই ঔষধের দ্বারা আসবাবগুলিও ধুইয়া লইবে। প্রয়োজন হইলে মেঝে হইতে দুই তিন ফিট অবধি দেওয়াল ধুইয়া ফেলাও আবশ্যক। কারণ, রোগীর পরিত্যক্ত পদার্থে প্রধানতঃ ঘরের মেঝেই দূষিত হইয়া থাকে। তার পর পায়খানা Cyllin, Phenyle কিম্বা Chloride of Lime দ্বারা শোধিত করিবে। বাড়ীতে ড্রেণ থাকিলে তাহা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য; যেন ড্রেণে কোনরূপ ময়লা বা আবর্জ্জনা জমিয়া না থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ড্রেণের জল নিকাশের পথ কোন রকমে বন্ধ হইয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করা উচিত। ময়লা জল যেন ড্রেণে এক বিন্দুও জমিয়া না থাকে। তৎপরে পায়খানার ন্যায় ড্রেণগুলি শোধন করিয়া লইতে হইবে। গৃহস্থের ব্যবহার্য্য সমস্ত বাসন গরম জলে ফুটাইয়া লইবে; না হয়, কোন শোধক ঔষধের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। বাড়ীর প্রাঙ্গণস্থিত কোন পুকুর বা কূপের জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মিলে, উহার জলে ক্লোরাইড অব লাইম, ব্লীচিং পাউডার বা পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটাশ নিক্ষেপ করিবে। অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলেই কলেরার বীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,—এই সত্যটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে দূষিত জল প্রভৃতি শোধন করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। কূপের জল কলেরা ভিব্রিওজ দ্বারা দূষিত হইয়া থাকিলে, তাহাতে কিঞ্চিৎ খনিজ অম্ল, যথা, সলফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দিলে সুফল ফলিতে পারে।

নাগরিক জীবন।

আমরা সভ্যতার যে পর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছি তাহাকে নাগরিক সভ্যতা বলা যাইতে পারে। সভ্যতালক্ষ্মী পল্লীর শ্যামলস্নিগ্ধ অঙ্গন ছাড়িয়া পাষাণ-গড়া নগরে তাঁর স্বর্ণসিংহাসন গড়িয়াছেন; লক্ষপতিরা তাঁর বরপুত্র। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা তপোবনে গড়িয়া উঠিয়াছিল; বেদ ও পুরাণ, দর্শন ও কাব্য, স্মৃতি ও তন্ত্র, কবির ধ্যান ও যোগীর সাধনা হোমানলপূত তপোবনের স্নিগ্ধছায়ায় জন্ম লাভ করিয়াছিল, পুষ্ট হইয়াছিল, বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে পল্লী ঘেরিয়াই ভারত সভ্যতা আপনাকে বিকাশিত করিয়াছিল। নগর ছিল রাজার আসন নগর ছিল ভূমি-অধিকারীর আবাসভূমি; সে নগর স্থাপন ও গঠনের নানা নিয়ম ও প্রণালী ছিল। আমরা প্রাচীন নানা গ্রন্থে তার উল্লেখ পাই।

এক নগরের কেন্দ্র ঘিরিয়া নানা পল্লী দেশময় ছড়াইয়া পড়িত; ভারত-জীবন কৃষি-সর্ব্বস্ব, তাই পল্লীই ছিল তার সভ্যতার প্রকৃত রূপ। আজও ভারতের শতকরা নব্বই জন মানুষ পল্লীতে বাস করে। কিন্তু সে পল্লীতে আর লক্ষ্মী নাই; দেবী আজ নগরে তাঁর প্রাসাদ দেউল তুলিয়াছেন; এ নগরের ডাক সমস্ত দেশকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Industrialismর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের মধ্যযুগের নগরগুলি ভাঙ্গিয়া গড়িতে লাগিল, তাহাদের স্থানে কুলী ও মজুরদের, কারখানার কারিকর ও মিস্ত্রিদের

যাহাতে বিশুদ্ধ জলের পুকুর বা কূপের জলের মধ্যে তাহাদের ঘটি, বাটি অথবা ঘড়া ইত্যাদি ডুবাইয়া জল লইতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এমন কি, তাহাদিগকে পুষ্করিণী বা কূপের নিকটে যাইতে না দেওয়াই উচিত।

৩। কোন কূপের জল কলেরা-বীজাণু দ্বারা দূষিত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ জন্মিবার কারণ ঘটিলে, সেই কূপের জলে পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটানা মিশ্রিত করিবে। আচ্ছাদিত কূপের জল দূষিত হবার সম্ভাবনা অনেকটা কম।

৪। পুকুরের কাছে কাপড় কাচা বা বাসন ধোয়া একেবারে বন্ধ করিতে হইবে।

৫। কোন একজন লোককে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়া পুকুর বা কূপের নিকটে রাখিতে হইবে। কেহ লইতে আসিলে এই ব্যক্তি জল তুলিয়া তাহার পাত্রে ঢালিয়া দিবে।

৬। রন্ধনশালা এবং রন্ধনকারিণী যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। রন্ধনকারিণীকে কোন কারণেই রোগীর ত্রিসীমায় যাইতে দিবে না।

৭। সকল পায়খানা ও ড্রেণ প্রত্যেক Byllin অথবা Phenyle দ্বারা শোধিত করাইবে।

৮। কোন স্থানে কলেরা আরম্ভ হইলে সেই স্থানের জনসাধারণকে কলেরার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা দিতে হইবে। বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে না পারিলে লোক-শিক্ষার সহায়তা হইতে পারে না।

৯। কলেরা রোগীর দেহনিঃসৃত সমস্ত পদার্থ প্রভৃতি এবং তাহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

১০। পানীয় জল ফুটাইয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কদাচ ফিলটার করা উচিত নহে।

কোন বাড়ীতে কলেরা আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিতভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১। সম্ভব হইলে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে পারিলেই ভাল হয়। তাহাতে, তাহার রীতিমত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইতে পারে। হাসপাতালের পাঠাইবার সুবিধা না থাকিলে, রোগীকে স্বতন্ত্র একটী কক্ষে রাখিতে হইবে; শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত পরিবারের অন্যান্য লোকে রোগীর সংস্রবে না আসিলেই ভাল হয়।

২। রন্ধনকরা সকল খাদ্য ফেলিয়া দিতে হইবে অথবা, নষ্ট করিয়া ফেলিলে আরও ভাল হয়। সমস্ত রন্ধনপাত্র ঔষধের দ্বারা শোধিত করিয়া গরম জলে ধৌত করিয়া লইতে হইবে।

৩। ব্যবহারের জন্য বাড়ীতে সঞ্চিত জল থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিয়া নূতন জল সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪। রোগী যে খাদ্য খাইয়াছে, অন্য কেহ যদি তাহা খাইয়া থাকে, তবে তাহার রোগ প্রকাশ না পাইলেও তাহাকেচিকিৎসাধীন রাখিতে হইবে।

৫। যে কোন ব্যক্তি রোগীর সংস্রবে আসিবে তাহাকেই প্রথমে সাবান-জলে হাত-পা ধুইয়া, পরে বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত জলে হাত পা ধুইয়া লইতে হইবে। দুই হাজার অংশ জলে এক অংশ Hydrogen Perchlor মিশ্রিত করিলে যে লোসন তৈয়ারী হইবে তাহার প্রতি পাঁইট বোতলে এক ড্রাম হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড মিশাইলে এই বিশোধক ঔষধ প্রস্তুত হইবে।

৬। কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত মল, মূত্র বমি পদার্থ ফিনাইল দ্বারা শোধন বা কোন খনিজ অম্ল দ্বারা শোধিত করিতে হইবে। অ্যাসিড মাত্রেই কলেরা বীজাণুর পক্ষে বিষম মারাত্মক।

যে বাড়ীতে কলেরা রোগ প্রবেশ করিয়াছে, সে বাড়ী শোধনের ব্যবস্থা।

ঘোষ ও দাস প্রণীত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গ্রন্থে ইহার এইরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—দূষিত বস্ত্রাদি শয্যাদ্রব্য একত্র করিয়া, বাষ্প ঘটিত শোধক যন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে—বাষ্পের দ্বারাই সংশোধিত করি

লইতে হইবে। অন্যথা, বস্ত্রগুলি ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ, পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ঘরের মেঝেগুলি পারক্লোরাইড অব মার্কারীর (১০০০ অংশ জলে ১ অংশ ঔষধ) মিশ্র করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে। আসবাব-পত্রের উপরের খানিকটা চাঁচিয়া ফেলিয়া সাবান দিয়া ফুটানো গরম জলে ধৌত করিয়া লইবে। তার পর, যে ঔষধের দ্বারা ঘরের মেঝে ধৌত হইবে, সেই ঔষধের দ্বারা আসবাবগুলিও ধুইয়া লইবে। প্রয়োজন হইলে মেঝে হইতে দুই তিন ফিট অবধি দেওয়াল ধুইয়া ফেলাও আবশ্যক। কারণ, রোগীর পরিত্যক্ত পদার্থে প্রধানতঃ ঘরের মেঝেই দূষিত হইয়া থাকে। তার পর পায়খানা Cyllin, Phenyle কিম্বা Chloride of Lime দ্বারা শোধিত করিবে। বাড়ীতে ড্রেণ থাকিলে তাহা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য; যেন ড্রেণে কোনরূপ ময়লা বা আবর্জ্জনা জমিয়া না থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ড্রেণের জল নিকাশের পথ কোন রকমে বন্ধ হইয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করা উচিত। ময়লা জল যেন ড্রেণে এক বিন্দুও জমিয়া না থাকে। তৎপরে পায়খানার ন্যায় ড্রেণগুলি শোধন করিয়া লইতে হইবে। গৃহস্থের ব্যবহার্য্য সমস্ত বাসন গরম জলে ফুটাইয়া লইবে; না হয়, কোন শোধক ঔষধের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। বাড়ীর প্রাঙ্গণস্থিত কোন পুকুর বা কূপের জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মিলে, উহার জলে ক্লোরাইড অব লাইম, ব্লীচিং পাউডার বা পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটাশ নিক্ষেপ করিবে। অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলেই কলেরার বীজাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,—এই সত্যটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে দূষিত জল প্রভৃতি শোধন করিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। কূপের জল কলেরা ভিব্রিওজ দ্বারা দূষিত হইয়া থাকিলে, তাহাতে কিঞ্চিৎ খনিজ অম্ল, যথা, সলফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দিলে সুফল ফলিতে পারে।

নাগরিক জীবন।

আমরা সভ্যতার যে পর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছি তাহাকে নাগরিক সভ্যতা বলা যাইতে পারে। সভ্যতালক্ষ্মী পল্লীর শ্যামলস্নিগ্ধ অঙ্গন ছাড়িয়া পাষাণ-গড়া নগরে তাঁর স্বর্ণসিংহাসন গড়িয়াছেন; লক্ষপতিরা তাঁর বরপুত্র। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা তপোবনে গড়িয়া উঠিয়াছিল; বেদ ও পুরাণ, দর্শন ও কাব্য, স্মৃতি ও তন্ত্র, কবির ধ্যান ও যোগীর সাধনা হোমানলপূত তপোবনের স্নিগ্ধছায়ায় জন্ম লাভ করিয়াছিল, পুষ্ট হইয়াছিল, বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে পল্লী ঘেরিয়াই ভারত সভ্যতা আপনাকে বিকাশিত করিয়াছিল। নগর ছিল রাজার আসন নগর ছিল ভূমি-অধিকারীর আবাসভূমি; সে নগর স্থাপন ও গঠনের নানা নিয়ম ও প্রণালী ছিল। আমরা প্রাচীন নানা গ্রন্থে তার উল্লেখ পাই।

এক নগরের কেন্দ্র ঘিরিয়া নানা পল্লী দেশময় ছড়াইয়া পড়িত; ভারত-জীবন কৃষি-সর্ব্বস্ব, তাই পল্লীই ছিল তার সভ্যতার প্রকৃত রূপ। আজও ভারতের শতকরা নব্বই জন মানুষ পল্লীতে বাস করে। কিন্তু সে পল্লীতে আর লক্ষ্মী নাই; দেবী আজ নগরে তাঁর প্রাসাদ দেউল তুলিয়াছেন; এ নগরের ডাক সমস্ত দেশকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Industrialismর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের মধ্যযুগের নগরগুলি ভাঙ্গিয়া গড়িতে লাগিল, তাহাদের স্থানে কুলী ও মজুরদের, কারখানার কারিকর ও মিস্ত্রিদের

নগর গড়িয়া উঠিতে লাগিল। দেশের ধন ও শক্তি ভূম্যধিকারিদের হাত হইতে ব্যবসাদার ও কলের মালিকদের হাতে যাইতে লাগিল। সভ্যতার এরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান নগরের সৃষ্টি। এ নূতন নগরে মন্দিরের চূড়া বা রাজার প্রাসাদ কোথায় মিলাইয়া গেল, কলের চিম্‌নী ও মিলের স্তম্ভ, লক্ষপতিদের প্রাসাদ ও কুলী মজুরদের শ্লামস্ (Slums) মালের গুদামঘর ও কেরাণীর আফিসঘর, ব্যবসাদারের দোকানঘর ও পণ্যভরা জাহাজের মাস্তুলময় জেটি—এই হইল নূতন নগরের মূর্ত্তি। উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপে পল্লী ও নগরের যে ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে, আমাদের দেশেও সে ভাঙ্গাগড়া বহুদিন আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের লক্ষ্মী কৃষকের ধান্যে চঞ্চলা হইয়া ব্যবসাদারের পণ্যভারে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের পল্লীসভ্যতা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; Industrialism আমাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে ভাঙার কাজই চলিয়াছে, গড়ার কাজ আরম্ভ হয় নাই, গ্রামের পর গ্রাম নিস্তেজ নির্ব্বাক জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, ধসিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, আর নগরগুলির আয়তন বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু সে নগরে স্বাস্থ্য নাই, শান্তি নাই, শক্তি নাই; সে নগর গঠনে নিয়ম নাই, শ্রী নাই, আনন্দ নাই।

জগতের আদিম যুগের মানুষদের আমরা অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করি; কারণ তাহারা পাহাড়ের গহ্বরে বা গাছের পাতার ঘরে, বা মাটীর তৈরী ঘরে বাস করিত। কিন্তু সেই অসভ্য যুগের বর্ব্বর মানুষেরা যদি আমাদের সহরের মধ্যের বস্তি বা সহরতলীর কুলী মজুরদের আবাসঘর দেখিত তাহা হইলে আমরা তাহাদের নিকট লজ্জা পাইতাম। বর্ত্তমান নগরের সভ্যতার এত বড় কলঙ্ককালিমা আর নাই। এই বস্তিতে যাহারা বাস করে তাহারাই বর্ত্তমান সভ্যতাকে ঘাড়ে করিয়া বহন করিতেছে, দিবারাত্র তাহাদের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে কল ঘুরিতেছে, মিল চলিতেছে, ডকে কাজ হইতেছে, বড় বড় প্রাসাদ উঠিতেছে; লক্ষপতির স্বর্ণভাণ্ডার পূ হইতেছে; তাহাদেরই রক্তে তাহাদেরই মাংসপেশী বে সভ্যতার রথ চলিয়াছে। কিন্তু এই কুলীমজুরেরা যে ঘরে যে ভাবে থাকে তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয় ছোট ছোট মাটির খোলার ঘর, স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার সরু গলি ময়লা, কাদা, জঞ্জালভরা; দুর্গন্ধময় পরি আলো নাই, হাওয়া নাই, প্রাণের আনন্দ নাই দোকানের ভেজাল বাসী খাবার বা বাজারের সবচে খারাপ খাদ্যদ্রব্য খাইয়া তাহারা বাঁচে; আঁস্তাকু ধূলা জঞ্জালের ওপর খেলা করিয়া তাহাদের ছেলে বাড়িয়া ওঠে। তাহাদের কাছে রোগেরও বিভীষি কমিয়া যায়। যক্ষ্মা হইলে তাহারা বলে সামান্য কা হইয়ছে, রক্তামাশয় হইলে বলে সামান্য পেটের অ করিয়াছে, প্লুরেসিকে বলে বুকের ব্যথা, কম ম্যালেরি জ্বর হইলে তাহাদের কাজ কর্ম্ম করিতে বাধে ন পথের কলের জলেই তাহাদের সংসার চলে, তাহা পাইলে পথের ঘোলা গঙ্গাজল ব্যবহার করে। এ আলো-হাওয়াহীন দেশে ভেজাল ঘি ও ভেজাল মোটা চাল ও বাসী তরকারী এই খাইয়া রোগ দরিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে এক দুঃস্বপ্নে মত তাহাদের জীবনযাত্রা। মরণের মড়ক তাহাদে আলো-হাওয়া-বর্জ্জিত রাজ্য লাগিয়াই আছে; গেল ত কলেরা এল, কলেরা গেল ত বসন্ত এলো বসন্ত গেল ত আবার এলো ম্যালেরিয়া; মৃত্যুর হা হইতে ত্রাণ নাই।

নগর-জীবনের প্রথম সমস্যা হচ্ছে থাকবার সমস্যা ছোট ঘরের মধ্যে অনেক মানুষকে পুরিয়া রাখার ফ অন্ধকূপের ভীষণ ইতিহাসে লেখা আছে। বর্ত্তমা যুগের মানুষ নগরে এই অস্বাভাবিক চেষ্টা করিতেছে তাহার ফলও কম ভীষণ হইতেছে না।

মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত কলিকাতায় ৮৯৬,০৬ জন লোক বাস করে। তাহার পরিসর প্রায় ১৯ ব মাইল। কাশীপুর, মাণিকতলা, গার্ডেনরীচ ধরিয়া ব কলিকাতায় ১০৪,৩৩০৭ জন লোক বাস করে, তাহা

পরিসর ৩২ বর্গ মাইল। কলিকাতার ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে মুচিপাড়া ওয়ার্ডেই সবচেয়ে বেশী লোকের বাস—৬৩,৩৬২। কিন্তু বর্গএকার অনুসারে হিসাব করিলে কলুটোলাই অধিক জনাকীর্ণ—এই ওয়ার্ডে বর্গএকারে ২৫৫ জন বাস করে। এক বর্গএকার প্রায় তিন বিঘার সমান। কলিকাতার কতকগুলি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা নীচে দেওয়া গেল;—

	লোকসংখ্যা	এক বর্গএকার অনুসারে
জোড়াবাগান	৫২,১১৪	২১৪
জোড়াসাঁকো	৫৯,৫১৪	২২৭
বড়বাজার	৩০,৪৯৫	১৪১
বউবাজার	২৫.০১৪	১৭০
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট	৬,২৮৪	৩০
পার্ক ষ্ট্রীট	৫,২৯৪	৩৫
হেষ্টিংস	৫,৫৫০	৫১
বালিগঞ্জ	৩৯,৯৫২	১৯

তালিকার প্রথম চার ওয়ার্ডের সঙ্গে পরের চার ওয়ার্ডের তুলনা করিলে বেশ বোঝা যায়, মানুষের কিভাবে থাকা উচিত আর মানুষ কি ভাবে থাকে। কলিকাতার পঁচিশটি ওয়ার্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫১,২৫৩ পরিবার বাস করে। এই পরিবারে ৮০৬,৫০১ লোক আছে। সহরে বাসের ঘরের তালিকা ২৮৭,০০৬। ঘরের তালিকা ও জনসংখ্যা দেখিয়া বোধ হইতে পারে, থাকিবার এমন কি অসুবিধা, একটি ঘরে প্রায় তিনজন করিয়া পড়ে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সহরের বড় বড় বাড়ী সব ধনী লোকদের হাতে; গরীব লোকেরা এক ঘরে ৮।১০ জন করিয়া শোয়। কত কুলী মজুরের শুইবার ঘর নাই; তাহারা পথের ফুটপাথের উপরই রাত কাটায়; মধ্য রাত্রে কলিকাতার পথে ঘুরিলেই দেখা যায় কত মুটে মজুর ফুটপাথের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে।

এই রাত্রে শুইবার কথা। ছোট বদ্ধ ঘরে গাদা-গাদি ঠেসাঠেসি করিয়া ত রাত্রি কাটিল। তারপর কাজের ঘরগুলিও ক্ষুদ্র, বদ্ধ, জনাকীর্ণ। কলিকাতায় ৯৯টা প্রেসে প্রায় ১২,০০০ লোক খাটে, ৯০টি তেলের কলে প্রায় ৩,০০০, ২৪টি জুটের প্রেসে প্রায় ৬,০০০ ও ২০টি ওয়ার্কসপে প্রায় ৪,০০০ লোক খাটে। ৪৯৫টি কলকারখানায় মোট ৫০,৪৭১ লোক আছে, তার মধ্যে ৫১,০৫৪ পুরুষ ২,৪১৭ স্ত্রীলোক। এই কারিকর মজুরদের কথা।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ও কেরাণীদের দুঃখও সহরে কম নয়। অফিসের কেরাণী ও দোকানে, নানা ব্যবসাদারের অধীনে কাজ করে, এরূপ লোকের সংখ্যা ৭৫,৭১৯। ইহা ছাড়া নগরের চারিদিকে গ্রাম ও উপগ্রাম হইতে নানা লোক সহরে বাস করিতে আসে। ১৯০১ সালে হাওড়া ই, আই, আর এ Season Tickets ৩১,৫৪৩ ছিল, ১৯১০ এ ৫৪,১৮৭ হইয়াছিল; হাওড়া-আমতায় ১৯০১এ ১,০৩৪ ছিল, ১৯১০এ ৭,৫৫২ হইয়াছিল, শেয়ালদার ১৯১০এ Season tickets ২৪,৩১৯ ছিল। সুতরাং দিনে কলিকাতার জনসংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। কেরাণীগণ তাড়াতাড়ি ভাত মুখে গুঁজিয়া অফিসের দিকে ছোটে, ১০টা হইতে পাঁচটা বা ছয়টা পর্য্যন্ত অফিস ঘরে ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া কলম পেষা। তারপর পথের ধূলা ও ধোঁয়া খাইতে খাইতে শ্রান্ত দেহে অবসন্ন মনে ঘরে ফেরা। যাহারা ব্যবসাক্ষেত্রে বা দোকানে কাজ করে, তাহারা সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত পর্য্যন্ত দোকানদারের ঘরে বদ্ধ থাকে; মাঝে হয় ত খাইবার কয়েক ঘণ্টা ছুটি। সারাক্ষণ ক্রেতাদের সঙ্গে বকাবকি, বোঝান, বাজার দেখা, জিনিষপত্রের দর দেখা। বাজারের মাঝে কত লোকের গমনাগমন, ট্রাম, মোটর, গরুর গাড়ীর ঘড়ঘড় ধ্বনি; লক্ষ জনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে দূষিত বাতাস,—এর মধ্যে বাসনায় তপ্ত দেহ মন সজীব স্বাস্থ্যবান জীবনের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে না; জীবন-রস যে আনন্দরস ও অমৃতস্বাদ তাহা তাহারা পায় না।

নগরের দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, খাদ্যদ্রব্যের সমস্যা। বাংলার পল্লী-জীবন কি স্বপ্নের ছিল তাহা আজ ভাবিয়াই সুখ। গোলাভরা ধান, পুকুরেতে মাছ, বাগানের

শাকশব্জী, তরকারী, ঘরের গাভীর দুধ, ক্ষীর, সর, ননী; ঘরের আম, কাঁটাল, বাগানে কত আম, কাঁটাল খাইয়া সুখ, খাওয়াইয়া আনন্দ। এখন নগরে গ্রামের রপ্তানী খাদ্য আসে, তাহাতে খাবার জিনিষের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, ভাল তাজা জিনিষও মেলে না। খাঁটি দুধ, ঘি, তেল, পয়সা দিয়াও পাওয়া মুস্কিল। বরফে রাখা বা পচা মাছ, বাসী শাকশব্জী—তাহাই কত দাম দিয়া কিনিতে হয়। বাজারের জিনিষ পত্রে ভেজাল, দোকানদারের খাবার খারাপ জিনিষ দিয়া তৈরী। নগরে যত লোক বাস করে, সবাই আত্মীয়-স্বজন পরিবার লইয়া বাস করিতে পারে না। যাহারা বিদেশ হইতে আসে, তাহাদিগকে হোটেল বা মেসে খাইতে হয়; বিকালের জলখাবার অনেককেই বাজারের দোকানে বসিয়া খাইতে হয়। এই সব খাবার যে কেবল অখাদ্য জিনিস দিয়া ভেজাল ঘি, তেল, ময়দা দিয়া তৈরী তা নয়, ইহা অনেক সময় খোলা জায়গায় রাখা হয়, পথের ধূলা উড়িয়া আসে, মাছি বসে, অপরিষ্কৃত পাত্রে খাবার খাইতে দেওয়া হয়, তাহাতে কত ময়লা জড়িত থাকে। আজকাল কলিকাতায় কিরূপ চায়ের দোকান বিস্তৃত হইয়াছে তাহা কলিকাতা বাসীরা জানেন। প্রতি পাড়ায় প্রতি মোড়ে নিত্য নূতন চায়ের দোকান খোলা হইতেছে। কত চায়ের দোকান অপরিষ্কার, ময়লা দুর্গন্ধে ভরা। বর্ত্তমান বিজ্ঞান অনুসারে বহু রোগের উৎপত্তির কারণ বীজাণু বা জীবাণু। এই জীবাণু পথের ধূলায় বা মাছি দ্বারা বাহিত হয়। যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ যক্ষ্মা রোগীর মুখের ছোঁয়া জিনিষ দ্বারা বাহিত হইতে পারে। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা রোগের বাহক। কোন সংক্রামক রোগ তাঁহাদের পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাঁহারা সারিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাদের ছোঁয়া জিনিস খাইবে বা তাঁহাদের রান্না করা বা স্পর্শ করা জিনিষ খাইবে তাহারা রোগাক্রান্ত হইবে। এই সব লোকেরা খুনী লোকেদের অপেক্ষা বা চোর জোয়াচোর অপেক্ষা সমাজের কম অনিষ্ট করে না। অপরিষ্কৃত হোটেলে ময়লা টেবিলে ও পাত্রে খারাপ খাদ্যদ্রব্য খাইলে স্বাস্থ্য যে দিন দিন ভাঙ্গি পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। নগরের হোটে ও মেসজীবন লোকেদের প্রাণদান করিতেছে তাহাদিগকে প্রাণহীন করিতেছে।

নগর-জীবনের তৃতীয় সমস্যা বেড়াবার সমস্যা নগর শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হয় নাই, ইহা শিক্ষা কেন্দ্রও হইয়াছে। কলিকাতায়; পাঠের উপযুক্ত বয় ৯১১৫১ বালক ও ৩৩২৫৯ বালিকা আছে। তার ম ৫৪২৪৯ বালক ও ১২৬৬৮ বালিকা বিদ্যালয়ে প করে। তাহা ছাড়া কত কলেজের ছে গাছের অঙ্কুর আলো হাওয়া না পাইলে যে শুকাইয়া যায় সেইরূপ শিশুরা, স্কুলের ছোট ছেলেরা, প্র আলো হাওয়া না পাইলে শুকাইয়া মরিয়া যায়। শিশু হইতে যৌবন পর্য্যন্ত এই দেহ ও মনের বিকাশের ম আলো ও নির্ম্মল হাওয়া প্রচুর চাই! ছেলেদের খেলি স্থান, দৌড়াদৌড়ি করিবার জায়গা অনেক দরকার। কয়টা ছেলে খেলে বা খোলা জায়গায় বে বা নির্ম্মল বাতাসে ব্যায়াম করে। যাহারা অধিক মান পরিশ্রম করে প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ আলো হাওয়া স তাহাদেরই অধিক দরকার। কিন্তু সহরের কলে ছেলেরা এই প্রকৃতির সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। ব্যবসাদা দোকান ও কলের কারখানার পাশে কলেজ, হো মেস উঠিতেছে। বদ্ধ পঙ্কিল নগর-জীবনের শিক্ষার সাধন ব্যর্থ হইতেছে। হোষ্টেল ও ছেলেদের কি গাদাগাদি। হোষ্টেলের বাড়ী হইতে পারে, বাহির হইতে দেখিতে বেশ ভা কিন্তু ভিতরে হাওয়ার অবাধ গতি নাই; এক এক দুই তিন জন মিলিয়া থাকে, বামুনে যা বাঁধিয়া তাহাই খায়। গলির মেসের কথা ছাড়িয়া দিই।

আর, যাহারা সারাদিন আফিস ঘরে স্থির বসিয়া কাজ করে, দোকানে সারাদিন বেচা মাতিয়া থাকে প্রকৃতির শান্ত স্পর্শ তাহাদেরও দরকারী নয়। নির্ম্মল আকাশের নীচে শ্যামল কোলে বিমল বাতাসে বিহার তাহাদের ত

প্রয়োজন। কিন্তু নগরে প্রকৃতির সে স্পর্শ তারা পায় না। নির্ব্বাসিতা প্রকৃতি নগরবাসীর উপর কি ভীষণ প্রতিশোধ লইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে সকল নগরের মাঝে বড় বড় পার্ক, গার্ডেন, ছেলেদের খেলিবার জায়গা, সাধারণের বেড়াইবার জায়গা আছে। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, নগরবাসীরা প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন নগর ছাড়িয়া গ্রামে বেড়াইবার জন্য বাহির হয়। পাহাড়ের ধারে বা সাগরতীরে, শ্যামল ধরা পানে যাইয়া, নগর-বাসীরা তাহাদের শান্ত অবসন্ন দেহপাত্র নবজীবন রসে ভরিয়া লয়! নগরের বড় বড় পার্ক ও গার্ডেন নগরের ফুস্‌ফুস্। নগরের ধোঁয়া ধূলায় ভরা বাতাসকে তাহারা পরিষ্কার করে; যে নগরে পার্ক বা গার্ডেন নেই তাহা ফুস্‌ফুস্‌হীন দেহের মত; সে নগরে বাতাস কেবল দূষিত হইয়া উঠে। কলিকাতায় ৪৯৫টা কল আছে; এই চারি শত পচানব্বইটা কলের চিমনী হতে যে কি ধোঁয়া উঠে তাহা কলিকাতার মাণিক-তলায় বা খালের ধারে বেড়াইলেই বোঝা যায়। তাহা ছাড়া আস্তাবল, নর্দ্দমা, ড্রেণ, পচা জিনিষ হইতে কত রকমের গ্যাস উঠিয়া নগরের বায়ুকে দূষিত করিতেছে। এই দূষিত বাতাসে ৮৯৬;০৬৭ জন নরনারী প্রতিক্ষণ নিশ্বাস লইতেছে, প্রশ্বাস ফেলিতেছে। এই নগরে বড় বড় পার্কের যে কি দরকার তাহা ভগ্নদেহ অবসন্নমন আনন্দহীন নগরবাসীরাই বলিবেন।

নগর-জীবনের সমস্যা বহু। নগরের জীবন কেবল বিচিত্র জটিল হইতেছে না, তাহা পঙ্কিল আবিলময় হইয়া উঠিতেছে। নগরে অনেকে আপনার গ্রাম বা জন্মভূমি ছাড়িয়া কাজের জন্য আসে; এখানে আপন পরিবার পরিজন আনিতে পারে না। এখানে একা থাকে, সুতরাং নগরের নানা প্রলোভনে শীঘ্রই প্রলুব্ধ হয়, জীবন পাপময় করিয়া ফেলে। কলিকাতায় বাসিন্দা লোক খুবই কম আছে; বহুলোক অন্য দেশ হইতে আগত। তার মধ্যে অনেকে কলিকাতায় পরিবার লইয়া বাস করে, অনেকে পরিবারবর্গকে দেশে রাখিয়া আসিয়াছে; নগরে থাকিবার ও খাইবার খরচ বেশী বলিয়া একাই থাকে। বেহার ও উড়িষ্যা হইতে ২০৪,০০০ লোক কলিকাতায় আসিয়াছে, যুক্তপ্রদেশ হইতে ৯০,০০০। বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সংখ্যক লোক কলিকাতায় জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আছে, এক মেদিনীপুর হইতে ২৯,০০০।

ইয়োরোপ, আমেরিকার নগরে জনসংখ্যা দেখিলে বোঝা যায়, নগরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী বাস করে; কিন্তু ভারতের নগরসমূহে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ বেশী বাস করে। কলিকাতার জনসংখ্যা নীচে দেওয়া গেল।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
অবিবাহিত	২৮৮,০৪২	২০৬,১৪৬	৮১,৮৯৬
বিবাহিত	৫১৩,৭০৪	৩৭৯,৯২৪	১৩৩,৭৮৮
স্বামী বা স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে	৯৪,৩১৭	২২,৬০৪	৭২,৭১৩

মোটামুটি ধরিতে গেলে কলিকাতায় যত স্ত্রীলোক বাস করে তার তিন গুণ পুরুষ বাস করে। যে সব বয়স্ক পুরুষ স্ত্রীহীন হইয়া নগরে বাস করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বারবনিতার আলয়ে গমন করে; বিশেষতঃ উড়িষ্যা ও বাংলার পল্লীগ্রাম হইতে আগত নিম্ন শ্রেণীর অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকে। কলিকাতার বারবণিতার সংখ্যা ১৪,২৭১; ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন হিন্দু। এই পাপ ব্যবসায় নগরজীবনে দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতা মথিত করিয়া এই গরল উঠিয়াছে। সিফিলিস্ ও গনোরিয়া যে কি বিষম ভাবে বিস্তৃত হইতেছে তাহা দেশবাসীর ধারণা নেই। কলিকাতায় এক হাজার পুরুষের অনুপাতে ৪৭৫ জন স্ত্রীলোক আছে; চীন ইত্যাদি বিদেশীদের মধ্যে হিসাব করিলে এক হাজার পুরুষের গড়ে ৩৫৭ স্ত্রীলোক হয়।

বর্ত্তমান জনহিতৈষীগণ বলিয়াছেন, "Health problems are moral problems." বাস্তবিক ধর্ম্মনীতির সহিত স্বাস্থ্যের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আমাদের নগরে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়া পাপ জমিয়া উঠিতেছে, ও বাড়িয়া চলিতেছে; এ পাপের

প্রায়শ্চিত্ত না হইলে দেশবাসীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতেই থাকিবে; জাতি নির্জ্জীবও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে।

নগরের জীবনযাত্রা দিন দিন অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করিতেছে; অবিশ্রান্ত চেষ্টা, দিবারাত্র ভাবনা, কত দুশ্চেষ্টা, দুশ্চিন্তা। কামনার বাসনার অনলে মানুষ পুড়িয়া মরিতেছে; বল্গাহীন ঘোড়ার মত অর্থের সন্ধানে ঊর্দ্ধবেগে ছুটিয়াছে। শান্তি নাই বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যৌবন এখানে শুকাইয়া যায়, জীবন এখানে ফুটিতে পারে না, জরা এখানে শীঘ্র আসে। কি সংগ্রাম—ঠেলাঠেলি, ঠাসাঠাসি, মারামারি কাড়াকাড়ি দেহ ভাঙ্গিয়া যায়, মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। মানুষের বিশ্রামের অধিকার নেই। কোন ভীম দৈত্য যেন অহোরাত্র মানুষকে খাটাইতেছে। তাই বর্ত্তমান যুগকে সভ্যতার যুগ না বলিয়া "age of neurasthenia" "age of syphilis and gonorhœa" বলা যাইতে পারে। বাংলার এখন "age of malaria" চলিতেছে।

পাশ্চাত্যদেশে নগরজীবনে যে বিচিত্র জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে, তাহার সমাধানের ব্যবস্থাও চলিতেছে। সেখানে মানুষ নব নব চেষ্টার মধ্যে নব নব সমস্যার সমাধান করিয়া আপনার শক্তিকে সার্থক করিতেছে। ইংলণ্ডে এখন গভর্ণমেণ্ট হাজার হাজার বাড়ী তৈরী করিবার বিপুল আয়োজন করিতেছেন। সেখানে "Fresh Air movement" "Garden-city planning ইত্যাদি কত নব নব প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে পল্লী ভাঙ্গার কাজই চলিতেছে, নগর গড়ার কাজ আরম্ভ হয় নাই।

আজ বাংলাদেশ জুড়িয়া এক বাণী শোনা যায়, "গ্রামে ফিরিয়া চল"। কিন্তু যাহারা নগরে একবার আসিয়াছে, তাহারা মোহিনী মায়ায় ভুলিয়াছে তাহার আর গ্রামে ফিরিয়া যাইবে না; নগরের দুঃখ অশেষ কিন্তু তার সুখও কম নয়। এই পাকা পথ, এই ইটের ঘর, কলের জল, এই বায়স্কোপ, থিয়েটার, এই কলেজ, দোকান; ট্রাম, গ্যাস ইলেক্‌ট্রিক্। এ সব ছাড়িয়া সেই ম্যালেরিয়াভরা গ্রামে পথে এক হাটু কাদা, পানায় ভরা ডোবা, খোড়ো মাটির ঘর; বাজারে যা চাইব তা পাব না, অসুখ হলে ডাক্তার মেলা ভার; অন্ধকার রাতে পথ চলা দায়। নগরের লোক না খাইতে পাইয়া মরিবে, একঘরে দশজন করিয়া থাকিবে তবু গ্রামে ফিরিবে না।

বর্ত্তমান জগতের সামনে যে স্বপ্ন রহিয়াছে তা হচ্ছে পল্লী-নগর (Garden City)। গ্রাম ও নগরজীবনের সমন্বয় করিয়াই এ পল্লীনগর সৃষ্ট হইবে। এখানে নগরের কর্ম্মজীবন ও গ্রামের শান্তিরসাভিসিক্ত আলস্যময়জীবন মিলিবে—এখানে সমস্তদিনের কর্ম্মের পরে জনগণ তপ্ত দেহ মন স্নিগ্ধ করিবে। আমেরিকার এক ইঞ্জিনিয়ার এক নতুন নগরের প্লান করিয়াছেন। তিনি বলেন নগর এরূপ ভাবে গড়িতে হইবে যাহাতে বাড়ীর প্রতি ঘরে আলো ও হাওয়া অবাধে যায়। তিনি বলেন এক পল্লীনগরে এক সারির বেশী বাড়ী এক রাস্তায় হইবে না, বাড়ীগুলি পূর্ব্বমুখে হইবে। প্রতি বাড়ীর সারির সম্মুখে এক কি দুই মাইল বিস্তৃত বৃহৎ উদ্যান থাকিবে, তাহারই মধ্য দিয়া পথ থাকিবে—সেই পথ দিয়া এক পাড়া হইতে অপর পাড়ায় যাতায়াত হইবে। বাড়ীর সারি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইবে, এক বাড়ীর দেওয়াল আর এক বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে আসিয়া পড়িবে না।

ভারতের ইতিহাস সমন্বয়ের ইতিহাস। নব নব সভ্যতাকে ভারত আপন সভ্যতার সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া, মানবসভ্যতার নব নব রূপ প্রকাশিত করিয়াছে। ভারতের পল্লীসভ্যতা বর্ত্তমান জগতের ঘাত প্রতিঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; নগরজীবন তাহার দুঃখ ও দারিদ্র্য তাহার অশান্তি ও অস্বাস্থ্য লইয়া ভারতের উপর রহিয়াছে। জার্ম্মাণ প্রভৃতি ইয়োরোপের অনেক দেশে প্রতিপল্লীতে নগরের সুখ ও স্বাস্থ্য আছে; বাঁধানো রাস্তা, কলের জল, ডিস্‌পেন্‌সারী, বড় দোকান, পথে আলো, বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক্ থিয়েটার, বায়স্কোপ, স্কুল, হোষ্টেল সবই আছে। নগরের শক্তির সহিত পল্লীর শান্তির, নগরের দাহের সহিত পল্লীর স্নিগ্ধতার, নগরের

কর্ম্মের সহিত পল্লীর আলস্যের, নগরের প্রাসাদের সহিত পল্লীর বনানীর সম্মিলন হইলেই সুখ ও স্বাস্থ্য দেশে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমাদের দেশে ভাঙ্গার কাজ চলিতেছে সৃষ্টি কোথায়। আমরা চলিতেছি গরুর গাড়ীর মত ধীর মন্থরগতিতে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, আর পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা চলিয়াছে মোটরকারের মত ভীমগর্জ্জনে ছুটিয়া; তাহাতে যে পথের ধূলা উড়িতেছে তাহাই আমাদের নাকে চোখে মুখে আসিয়া পড়িতেছে।

পল্লীর স্বাস্থ্য।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত নাগপুর একটি জনবহুল বিখ্যাত পল্লীগ্রাম। এই গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা, বালিকা বিদ্যালয়, থানা, রেজেষ্টারী আফিস, ডাকঘর, ডাক বাঙ্গালা, দাতব্য ঔষধালয়, লাইব্রেরী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, হাট বাজার ইত্যাদি সমস্তই আছে। বর্ত্তমানে কেবল টেলিগ্রাফ আফিসের অভাব, টেলিগ্রাফ আফিসটি হইলেই ষোলকল পূর্ণ হয়। এ সমস্ত হইলে কি হয়? একের অভাবেই সমস্ত পল্লীটি শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। সে অভাব, স্বাস্থ্যের। গ্রামের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ এবং দিন দিন উহা অধিকতর খারাপ হইতেছে। এ বিষয়ে গ্রামবাসী কিম্বা কর্ত্তৃপক্ষ কাহারও কোন লক্ষ্য নাই! সম্প্রতি গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া একটি ভালরূপ হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, ইহা অবশ্য ভাল কাজ, ইহা দ্বারা গ্রামবাসী, শুধু গ্রামবাসী কেন, পার্শ্ববর্ত্তী এবং দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণও উপকৃত হইবে। উক্ত হাঁসপাতালে পাশ করা ডাক্তার (Asst. Surgeon) থাকিবেন। গ্রামবাসীরা বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিবে, দরিদ্রেরা বিনামূল্যে ঔষধপত্রাদি পাইবে এবং চিকিৎসিত হইতে পারিবে। এক কথায় রোগের ভালরূপ প্রতীকার হইতে পারিবে। এজন্য আমরা সতীশ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি এবং ভগবানের নিকট তাঁহার সুখ শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

রোগ হইলে তাহার প্রতিকার করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বোত্তম। সেরূপ ব্যবস্থা করিতে গ্রামবাসী বা কর্ত্তৃপক্ষ কাহারও কোনরূপ চেষ্টা নাই। ইহার ফলে গ্রামে ম্যালেরিয়া বারমাস লাগিয়াই আছে, তাহার উপর আবার নিত্য নূতন ব্যারাম আবির্ভূত হইয়া গ্রামবাসীদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার চেষ্টা পাইতেছে। এক ম্যালেরিয়াতেই প্রতি বৎসর কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, কতলোক যৌবনে জরাগ্রস্ত হইতেছে। ইহার উপর আবার কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ, অবস্থা যে দিন দিন কতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ম্যালেরিয়া দূর করিতে না পারিলেও, গ্রামের মন্দ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে না পারিলে, হয় ত এই জনবহুল গ্রাম কালে গভীর অরণ্যে পরিণত হইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে তাহার প্রতিকারের উপায়ও হইতে পারে।

আমরা যে গ্রামের কথা বলিতেছি, সে গ্রামটি জঙ্গলাকীর্ণ; কাজেই গ্রামের মধ্যে বাতাস ভালরূপ চলাচল করিতে পারে না, সূর্য্যকিরণও সর্ব্বত্র ভালরূপ ছড়াইতে পারে না। এ কারণে গ্রামটির অধিকাংশ স্থানই ভিজা সেঁতসেঁতে থাকে। গ্রামে কতকগুলি পুকুর আছে, কিন্তু সংস্কারাভাবে সকলগুলির জলই অল্পাধিক খারাপ। স্বাস্থ্যতত্ত্বের নির্দ্দেশানুসারে চলিলে উহাদের মধ্যে একটি পুকুরের জলও পানার্থ ব্যবহারের যোগ্য নয়, এমন কি উহাদের মধ্যে কতগুলির জল স্নানার্থ ব্যবহারেরও অযোগ্য। পুকুরগুলির চারি

ধারেই গাছপালা (পুকুরের চারিধারে গাছপালা বোনা বাঙ্গালীর স্বভাব), এজন্য পুকুরের জলে ভালরূপ বাতাস চলাচলাচল করিতে এবং সূর্য্যকিরণ পড়িতে পারে না। অধিকন্তু গাছপালার পাতা জলে পড়িয়া পচিতেছে, এই সমস্ত কারণে পুকুরের জল শীঘ্র খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এ সমস্ত ছাড়া আবার ইহাদের কতকগুলির মধ্যে পানা জন্মিয়া পচিতেছে। ইহা ছাড়া গ্রামে অনেকগুলি ডোবা আছে। তাহাদেরও চারি ধারে পুকুরের ন্যায় গাছপালা থাকায় তাহাদের জলও শীঘ্র খারাপ হইতেছে। অধিকন্তু তাহাদের মধ্যে পানা জন্মিয়া পচিতেছে। এই সমস্ত পুকুর এবং ডোবার জলে পানা পচিয়া যে এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্পের উৎপত্তি হইতেছে, তাহা সহজেই বায়ুমণ্ডলীকে দূষিত করিয়া ফেলিতেছে। এই সমস্ত ডোবায় বর্ষার স্রোতের জল চলাচল করিবার ও সুবিধা নাই। বদ্ধ জলে প্রতি নিয়ত অসংখ্য মশার সৃষ্টি হইতেছে। এই সমস্ত কারণে গ্রামটিতে ম্যালেরিয়া বারমাস লাগিয়াই আছে।

এই ম্যালেরিয়া প্রতিকারের সাধারণতঃ ২টি উপায় আছে। একটি সহজসাধ্য, অপরটি বহুব্যয়সাধ্য। সহজ-সাধ্য প্রতিকার করিতে হইলে, ডোবাগুলির চারিধারে যাহাতে গাছপালা জন্মিতে না পারে এবং উহাদের মধ্যে পানা জন্মিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে উহাদের জলে ভাল-রূপ বাতাস চলাচল করিতে এবং সূর্য্য কিরণ ছড়াইতে পারিবে। ফলে উহাদের জল শীঘ্র দূষিত করিতে পারিবে না, পানা পচিয়া বিষাক্ত বাষ্পের সৃষ্টি হইতে পারিবে না এবং মশককুলও সহজে জন্মিতে পারিবে না। এরূপ করিতে পারিলে গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপ ভাল না হইলেও অনেকাংশ যে ভাল হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাল করিতে হইলে সহজ সাধ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা ত করিতেই হইবে, ইহার উপর আবার ব্যয়সাধ্য প্রতিকার হওয়াও দরকার। ব্যয়সাধ্য প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমতঃ পুকুরগুলির সংস্কার সাধন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামটির জঙ্গল কাটিয়া যাহাতে গ্রামের মধ্যে ভালরূপ বাতাস চলাচল করিতে এবং সূর্য্যকিরণ ছড়াইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে ডোবাগুলির মধ্যে বর্ষার স্রোতের জল চলাচল করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে অথবা ডোবাগুলি একেবারে বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। এরূপ করিতে পারিলে গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাল হইবার আশা করা যায়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সম্বন্ধেও এরূপ ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

গ্রামবাসিগণের মধ্যে যাহারা বিত্তশালী, তাঁহারা প্রায় সকলেই সহরবাসী। গ্রীষ্মের দুই মাস যখন গ্রামের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত একটু ভাল থাকে, তখন তাঁহারা দিন কয়েকের জন্য কুটুম্বের (Guest) ন্যায় আসিয়া স্বগ্রাম দর্শন করিয়া যান। তাঁহাদের গ্রামের মন্দ স্বাস্থ্যের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। এমন কি তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বিদেশে নন্দন কানন সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু স্বগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে একটি মুদ্রাও ব্যয় করিতেছেন না; ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে!

আমরা উপরে যে পল্লীটির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অবস্থা বিবৃত করিলাম, বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীর অবস্থাই এইরূপ। আবার ইহার উপর অনেক পল্লীতে সুচিকিৎসকেরও অভাব আছে। মন্দ স্বাস্থ্যের প্রতিকার উপরিউক্ত ব্যবস্থা অনুসারে সকল পল্লীতেই করা যাইতে পারে, অন্ততঃ সহজসাধ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা সকল পল্লীতেই অনতিবিলম্বে হওয়া উচিত। প্রতি গ্রামেই জল পানার্থ ব্যবহারের জন্য অন্ততঃ একটী স্বতন্ত্র জলাশয় থাকা অত্যাবশ্যক। ক্বচিৎ দুই একটী ব্যতীত প্রায় সকল পল্লীতেই পুকুরগুলি স্নান এবং পান উভয়ার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সমীচীন নহে।

বাঙ্গালায় যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহার প্রধান কারণই পল্লীর স্বাস্থ্য হীনতা। এই স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কত জনপদ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে এবং শীঘ্র প্রতিকার না হইলে আরও কত জনপদ অরণ্যে পরিণত হইবে এবং বাঙ্গালী জাতি সংখ্যায় কমিতে কমিতে কোথায় আসিয়া উপনীত হইবে, তাহাই এখন বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশবাসীর এবং কর্ত্তৃপক্ষের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এ বিষম সমস্যার পূরণ হইতে পারে না, তাই আমরা এ বিষয়ে দেশবাসী এবং কর্ত্তৃপক্ষ উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যদি পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই ম্যালেরিয়া বিদূরিত হইতে পারে, তবে তাহা কেবলমাত্র আমাদের দেশ হইতেই বা কেন বিদূরিত হইতে পারে না! দেশবাসী এ বিষয়ে কি বরাবরই উদাসীন থাকিয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে?

BLANK PAGE(S)

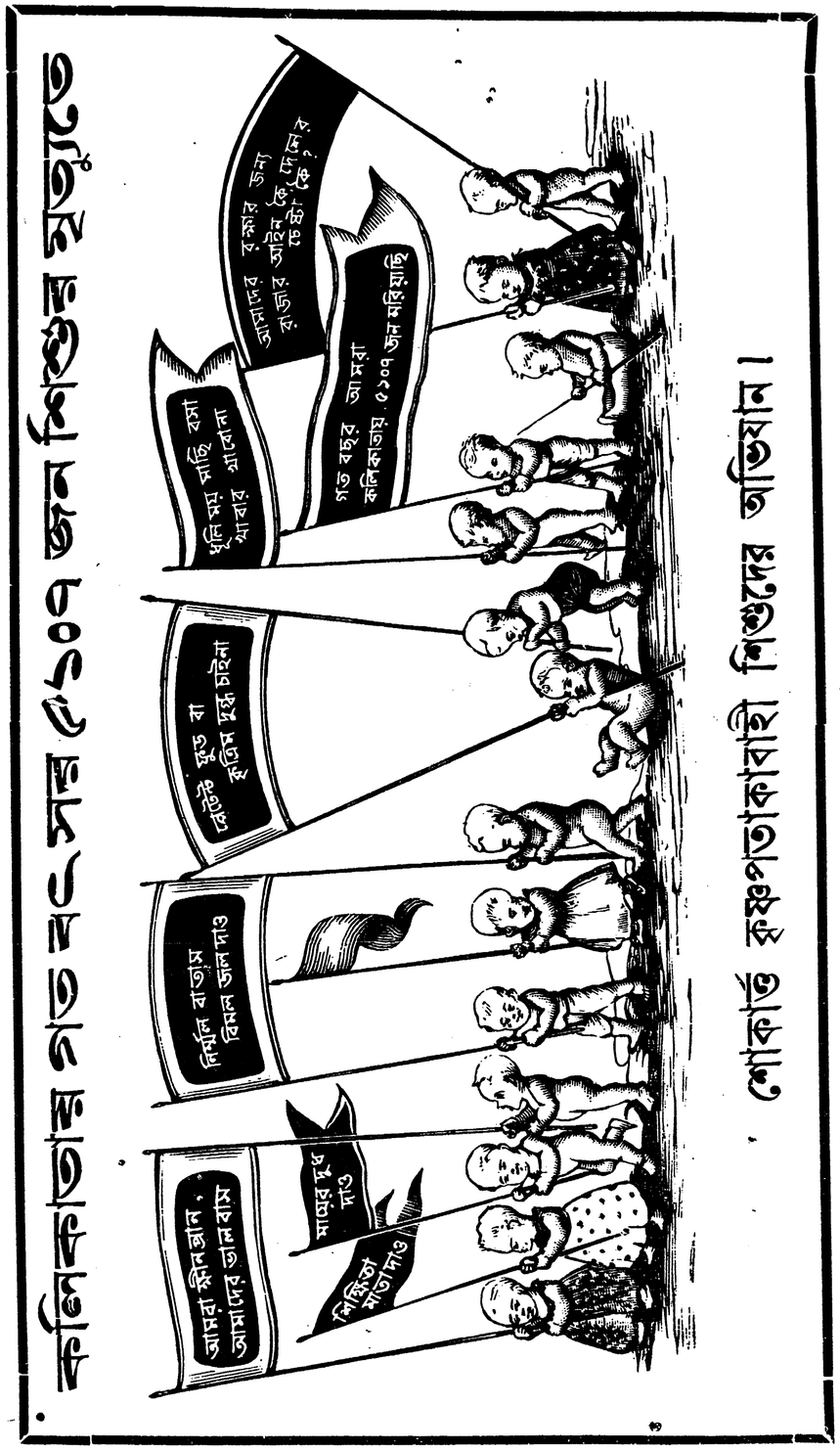

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ { আশ্বিন, ১৩২৬ সাল { ষষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

মদ্যপানের কুফল—

মদ্যপানের সহস্র প্রকার কুফলের কথা সকলেই প্রায় অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। তথাপি, মদ্যপানের পরিমাণ হ্রাসের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বরং আবগারি বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে দেখা যায়, মদের কাট্‌তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে মদ্যের ব্যবহার প্রায় সকল সমাজে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে, সকল সম্প্রদায়েই অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাতে মানব সমাজের যে কি ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, সে দিকে কাহারও বড় একটা দৃষ্টি নাই। সম্প্রতি ডাক্তার এইচ, এম, ভারনন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কয়েকটি পরীক্ষা করিয়া অতি সুন্দরভাবে মদ্যপানের কুফল প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, অতি অল্পমাত্রায় মদ্যপান করিলেও, নিখুঁতভাবে দ্রুত কার্য্য করিবার শক্তি কমিয়া যায়। ডাক্তার ভারনন ন্যাশনাল ইনসিওর্যান্স কমিশনের মেডিক্যাল রিসার্চ কমিটির পক্ষ হইতে এ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পরীক্ষা চলিয়াছিল। যাঁহারা টাইপ-রাইটার কিম্বা যোগ করিবার যন্ত্র ব্যবহার করে—এমনি কয়েক শ্রেণীর কর্ম্মী লোকের উপর পরীক্ষা হয়। আহারের সময় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে, এবং খালি পেটে, খাঁটি ও জল-মিশ্রিত মদ্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। ডাক্তার ভারনন স্বয়ং এই পরীক্ষার ফল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ফলে, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, মদ্যপান করিলে, ক্ষিপ্রকারিতার সহিত এবং নিখুঁত ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি নিশ্চয়ই কমিয়া আসে। মোট ৮ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোকের উপর এই পরীক্ষা হইয়াছিল। এই ১৩ জনের মধ্যে ১২ জনের উপরই পরীক্ষার কুফল স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। কেবল একজনের সম্বন্ধে একটু সন্দেহ থাকিয়া গিয়াছিল। এই সকল লোককে বিভিন্ন অবস্থায়, অর্থাৎ খালি-পেটে ও ভরা পেটে, নির্জ্জলা ও জল-মিশ্রিত মদ্য অল্প মাত্রায় পান করিতে দেওয়া হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, তাহাদের হাত পা তাহাদের সম্পূর্ণ বশে থাকে নাই। সহজ অবস্থায় তাহারা যেরূপ দ্রুত নির্ভুল ভাবে কাজ করিতে পারিত, মদ্যপানের অল্প ক্ষণ পরে, তাহারা আর সে ভাবে কাজ করিতে পারে নাই। তাহাদের কাজে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, এবং অনেক গলদ ও ভুল হইয়াছিল। আরও দেখা গিয়াছিল, ভরা-পেটে মদ্যপান করার অপেক্ষা খালি পেটে মদ্যপান করিলে বেশী নেশা হয়। অনেকের বিশ্বাস আছে, পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান করিলে কাজ

করিবার শক্তি বাড়ে। ডাক্তার ভারননের পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পরীক্ষা ত হইল। কিন্তু চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবে কি? ডাক্তার ভারননের পরীক্ষার ফলে মদ্যপানের পরিমাণ একটুও কমিবে কি?

ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার।—

একটী সরকারী সার্কুলারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার জেলা-বোর্ডসমূহের ১৯২০-২১ অব্দের আয়-ব্যয়ের তালিকায় উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসারের বেতনের বাবদ একদফা ব্যয় যেন ধরা হয়। এই প্রস্তাবে কাহারও কাহারও আপত্তি হইতেছে। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস, এই ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে বেতন দিয়া পোষণ করিতে যত অর্থব্যয় করিতে হইবে, সেই অর্থের অনুপাতে কাজ পাওয়া যাইবে না। কারণ, এই হেলথ অফিসারেরা কেবল জেলা বোর্ডের অধীন স্থানসমূহে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইবেন, অন্য কোন কাজ তাঁহাদিগকে করিতে হইবে না। ব্যবস্থা যদি বাস্তবিকই এইরূপ হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আপত্তির কারণ ঘটে। কিন্তু সত্য সত্যই কি ব্যবস্থা এইরূপ লঘুই হইবে? আমাদের তাহা বিশ্বাস হয় না। কারণ, ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার বলিলে আমরা এই বুঝি যে, যে কর্ম্মচারী চিকিৎসা-বিদ্যা এবং স্বাস্থ্য-তত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং যিনি জেলা-বোর্ডের অধীন স্থানসমূহের সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, গ্রাম্য স্বাস্থ্য কিরূপে উন্নত হইতে পারে তাহার পরামর্শ দিবেন, যাহাতে সংক্রামক ব্যাধিতে লোকক্ষয় না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন, তিনিই হেলথ অফিসার। অবশ্য তাঁহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে জানা চাই। পল্লীগ্রাম সকলের বর্ত্তমান অধিবাসীদের অধিকাংশই অধুনা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত নিরক্ষর লোক। তাহারা কাজ তেমন করিয়া আদায় করিতে পারিবে না। শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা পারিবেন; কিন্তু তাঁহারা এখন গ্রাম ছাড়িয়া প্রায় সহরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তবে একটা সুবিধার কথা এই যে, আজকাল গ্রামে ফিরিয়া করিবার দিকে অনেকেরই ঝোঁক পড়িয়াছে, সংবাদপত্রে এসম্বন্ধে অনেক দিন ধরিয়া আন্দোলনও চলিতেছে। অনেকেই পল্লীবাসের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং দেশের লোককে আবার পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাস করিতে পরামর্শ দিতেছেন। সহর-বাসের দুর্দ্দশা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া এখন অনেকে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাস করিতে ইচ্ছুকও আছেন। কিন্তু গ্রামগুলির অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা ভাবিয়া তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে বেশী দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছেন না। আচ্ছা, এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না যে, তাঁহারা গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করুন, এবং ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সাহায্যে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া লউন? তাহা হইলে তাঁহাদের আসার কারণ দূরীভূত হইতে পারে, এবং হেলথ অফিসার দ্বারা রীতিমত কাজ করাইয়া লইয়া তাঁহাকে বেতন দেওয়া সার্থক করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পাবলিক হেলথ সার্ব্বিস।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারাগ্রাফে আমরা বলিয়াছি যে, ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসাররা কেবল যে, টীকা পরিদর্শন করিয়া নিষ্কৃতি পাইবেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। এ বিশ্বাস না হইবার হেতু এই যে সরকার বাহাদুর এখন পাবলিক হেলথ সার্ব্বিস স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাবলিক সার্ব্বিসের কমিশনের পরামর্শ অনুসারেই পাবলিক হেলথ সার্ব্বিস স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে কলিকাতা গেজেটে একটা রেজোলিউসনও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সার্ব্বিসের প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলী এবং এই সার্ব্বিসে লোক নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে সাধারণের মতামত সংগ্রহ করিতে উক্ত রেজোলিউসন প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সার্ব্বিসভুক্ত উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরা রোগ উৎপত্তির কারণ এবং তাহা নিবারণের উপায় অবলম্বন প্রভৃতি

বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধান (research) করিবেন, কোন রোগ সংক্রামক ভাবে প্রাদুর্ভূত হইলে তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে এই সকল কর্ম্মচারীরা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহকে পরামর্শ দিবেন। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডসমূহে যে সকল স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে যাঁহাদের নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, তাঁহারাও সম্ভবতঃ এই সার্ব্বিসের অন্তর্ভুক্ত হইবেন; অন্ততঃ ইহার সহিত তাঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ভার প্রধানতঃ এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত হইবে। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা বেতনের অনুপাতে রীতিমত কাজ পাওয়া যাইবে না, এরূপ আশঙ্কা অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রস্তাবিত সার্ব্বিসে লোক নিযুক্ত করিবার জন্য লাট বাহাদুর একটী থ্যাড্‌ভিসরী বোর্ড অব হেল্‌থ গঠনের কল্পনা করিয়াছেন। এই বোর্ডের সদস্যগণ খুব অভিজ্ঞ লোক হইবেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ হইবেন ভারতবাসী। এই বোর্ডই পাবলিক হেলথ সার্ব্বিসের জন্য উপযুক্ত লোক বাছিয়া দিবেন। স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদচ্যুতির ভারও বোর্ডের হাতেই থাকিবে। পদের জন্য বেশীর ভাগ লোক ভারতবাসীদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইবে, এবং তাঁহারা যাহাতে এদেশে থাকিয়াই পাবলিক হেলথ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, এই ভাবে তাঁহাদিগকে তদনুরূপ শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করা হইবে। অর্থাৎ মোটের উপর, দেশের স্বাস্থ্যের যাহাতে দিন দিন উন্নতি হয়, গবর্ণমেণ্ট এইবার তাহার পাকারকম বন্দোবস্ত করিতেছেন, দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা।

ভারত-গভর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স ডিপার্টমেণ্ট হইতে প্রকাশিত ১৯১৭-১৮ অব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবরণীতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের এডুকেশন্যাল কমিশনারের রিপোর্টের যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একস্থলে নিম্নলিখিত কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়,—"Owing to the war and the consequent dearth of medical men, no great progress was possible with measures of school hygiene." অর্থাৎ যুদ্ধের দরুণ, এবং তদানুষঙ্গিক, যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসকের অভাববশতঃ, স্কুলসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারা যায় নাই।

বহু চিকিৎসক যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সাধারণ কার্য্যে সুচিকিৎসকের অভাব ত হইয়াছেই; তাহা ছাড়া, ভারতের বিদ্যালয়সমূহে স্বাস্থ্যনীতির রীতিমত প্রবর্ত্তন করিতে হইলে যতগুলি চিকিৎসকের দরকার, সহজ অবস্থাতেই ততগুলি চিকিৎসক সংগ্রহ করা কঠিন। বিদ্যালয়সমূহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, পল্লীঅঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির প্রাবল্য প্রভৃতি কারণে দেশে যে পরিমাণ চিকিৎসক থাকা আবশ্যক, তদনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা কম। এই কারণে দেশবাসী আরও অনেকগুলি চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের (স্কুল ও কলেজের) অভাব অনুভব করিতেছেন, এবং সে জন্য প্রার্থনাও করিতেছেন।

উক্ত রিপোর্টের অপর এক স্থলে (Appendix II, p. 245; ২নং ক্রোড়পত্র, ২৪৫ পৃষ্ঠা) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা হইয়াছে। ছাত্রগণের মঙ্গল বিধানার্থ স্কুল-কলেজের স্বাস্থ্যকর অবস্থা যে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, তাহা রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা হইতেছে না, তাহা আমাদেরই দোষে। গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই বলিতেছেন, "Hitherto

want of funds and the apathy of the people have been responsible for the comparatively small attention paid to hygiene." অর্থাৎ এযাবৎ স্কুল কলেজের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে যে বেশী মনোযোগ দিতে পারা যায় নাই, অর্থাভাব এবং দেশের লোকের ঔদাসীন্যই সে জন্য দায়ী। ইহা বড় গুরুতর কথা, এবং অতি সত্য কথা। গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টবাক্যে দেশবাসীর বিরুদ্ধে এই যে ঔদাসীন্যের অভিযোগ করিতেছেন, দেশের লোকেরা ইহার কি জবাব দিতে পারেন? স্কুলে ছেলে পাঠাইবার পর, সেখানে তাহাদের যে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কাটাইতে হয়, সেই সময়টা তাহারা স্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিতে পারে কি না, তাহা অভিভাবকেরা ত দেখেনই না, স্কুলের শিক্ষকেরাও বোধ হয় দেখিবার অবসর পান না, অথবা তাঁহাদের হয় ত সে ধারণাই নাই। কোন স্কুল বা কলেজের অবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল না হইলে, অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিকূল হইলে কাহাকেও কোনরূপ অভিযোগ করিতে দেখা যায় না। সংবাদপত্রেও এ সম্বন্ধে কোনরূপ আন্দোলন হইতে দেখি না। এমন কি, আমাদের মনে হয়, এই বিষয়টি দেখিবারই লোক নাই। ফলতঃ, এ বিষয়ে দেশবাসীর যেটুকু কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে না। স্কুল কলেজের স্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি দেশের লোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিবে,—কোথাও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন উত্থিত হইবে, এবং তাহার ফলে,—সরকারী স্কুল-কলেজ হইলে—গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; কিংবা,—বেসরকারী স্কুল কলেজ হইলে—গবর্ণমেণ্ট কড়া তাগিদ দিয়া উক্ত স্কুল বা কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করাইবেন, ইহাই ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইয়া গবর্ণমেণ্টই দেশবাসীর প্রতি ঔদাসীন্যের অভিযোগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।

তার পর, রিপোর্টে লিখিত আছে, কোন প্রদেশে স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সাদাসিদা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিবার যৎসামান্য ব্যবস্থা আছে; তবে ইহাও নেহাৎ বেগার-ঠেলা গোছের; ছাত্রজীবন সহিত এই শিক্ষার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। শিক্ষায় কোন ফলই ফলে না; ছাত্রেরা নিজ নিজ স্ব রক্ষা করিতে শিক্ষা করে না, ভবিষ্যৎ জীবনে রো সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি লাভের মত স্বাস্থ্য শিক্ষা পায় না। কোন কোন স্থলে স্কুল বাটীর অ স্বাস্থ্যকর কি না তাহা পরিদর্শনের কিঞ্চিৎ ব্য থাকিলেও, ছেলেদের শারীরিক অবস্থা স্বাস্থ্যসম্প না তাহা দেখিবার কোন বন্দোবস্তই নাই। ছেলে নিজেদের স্বাস্থ্যের হানি না করিয়া কতক্ষণ থাকিয়া পড়া শুনা করিতে পারে, স্বাস্থ্যের দিকে রাখিয়া পাঠ্য বিষয়ের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে কোন স্কুলেই চিকিৎসকগ পরামর্শ লওয়া হয় না। এই কারণে ভারত-গবর্ণমে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভা অনুসন্ধান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। চিকিৎসক শিক্ষকগণের মধ্য হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী ক্ষুদ্র কমিটি গঠনপূর্ব্বক স্কুল ও কলেজের স্বাস্থ্য স অনুসন্ধান করাইতে হইবে। কিরূপভাবে অনুস চালাইতে হইবে, তাহা প্রাদেশিক অবস্থার উপর নি করিবে,—বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা ক হইবে। তবে, মোটামুটি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি স প্রদেশের পক্ষেই খাটিতে পারে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট নি চনা করেন; যথা,—

(১) স্কুল-বাটী, হোষ্টেল, এবং অন্যান্য যে স স্কুলে ছাত্রেরা বাস করে,—স্বাস্থ্যের দিক হইতে সকল স্থানের অবস্থা কিরূপ।

(২) স্বাস্থ্যের দিক হইতে, পেশাদার লোকদি দ্বারা স্কুল-বাটীর নক্সা পরীক্ষা।

(৩) বেশ সহজ, কিন্তু কার্য্যকরী, স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন। স্কুলের পাঠ

করিয়া ছাত্রেরা যখন বিদ্যালয় ত্যাগ করিবে, তখন স্বাস্থ্যনীতি তাহাদের অবশ্য পাঠ্য বিষয় বলিয়া তাহাদের সার্টিফিকেটে উল্লিখিত হইবে কি না, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব পাঠ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরামর্শ দেওয়া হইবে কি না।

(৪) যেখানে সম্ভবপর সেখানে বালকদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, তাহাদের কোন ছোঁয়াচে রোগ আছে কি না, তাহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছে কিম্বা ভুগিতেছে কি না, এবং তাহাদের দৃষ্টিশক্তি কেমন,—চক্ষের কোন দোষ আছে কি না—বিশেষভাবে এইগুলি পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) ছাত্রেরা স্কুলে কতক্ষণ এবং গৃহেই বা কতক্ষণ অধ্যয়ন করিবে। এখনকার পরীক্ষা দিবার জন্য পড়িবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহার দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কি রকম থাকে।

(৬) ছেলেদের আমোদ প্রমোদের স্থান, উদ্যান, ব্যায়াম করিবার স্থান, পাঠাগার, 'কমন রুম' প্রভৃতির ব্যবস্থা; এ সম্বন্ধে কোন ত্রুটি আছে কি না।

(৭) স্কুল পরিদর্শন এবং স্কুলের কার্য্য পরিচালনের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। বর্ত্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া তাহার সহযোগিতা করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সম্ভবপর কি না। এই সকল কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য।

ইহা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা এবং বালকবালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি সাধনের জন্য যে প্রস্তাব হইতেছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বহু সংখ্যক নূতন বিদ্যালয় খুলিতে হইবে। যে সকল বাটীতে এইরূপ নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, সেগুলি যাহাতে বহু-ব্যয়সাধ্য না হয়, অথচ, সেগুলি যেন স্বাস্থ্যকর হয়, রিপোর্টে এইরূপ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বালক ও বালিকা এই উভয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের সাধারণ স্বাস্থ্য এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

স্কুলের বা কলেজের স্বাস্থ্যকর অবস্থা যাহাতে রক্ষিত হইতে পারে,—স্কুল বা কলেজে অধ্যয়ন কালে ছেলেরা যাহাতে সুস্থ থাকিতে পারে সে পক্ষে গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতে চাহিতেছেন, আমরা তাহার কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। এ পক্ষে কিন্তু জনসাধারণেরও করিবার যথেষ্ট বিষয় রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ত প্রথমেই বলিয়া দিয়াছেন যে, অর্থাভাবে তাঁহারা এদিকে বেশী কিছু করিতে পারিতেছেন না। এই অর্থের সংস্থান কিরূপে হইবে? আমাদের মনে হয়, প্রজাসাধারণেরই এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, গবর্ণমেণ্ট দিলেও, সেই প্রজার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তবে দিতে পারিবেন। যে দিক দিয়াই হউক, প্রজাকেই যখন এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেই হইবে, তখন,—গবর্ণমেণ্ট যতক্ষণ না চাহিতেছেন ততক্ষণ দিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকা ঠিক নহে। কারণ, তাহাতে ক্ষতি আমাদেরই; আমাদেরই ছেলেদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া আমাদেরই অনিষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ, গবর্ণমেণ্ট প্রজার ঔদাসীন্যকেই এজন্য দায়ী করিতেছেন। বিদ্যালয়ে আমাদেরই ছেলে মেয়ে অধ্যয়ন করিতেছে এবং করিবে। সুতরাং তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থের সংস্থান করিয়া দেওয়া আমাদেরই কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

শিশুর চিত্ত-বৃত্তি।

আজ রাত্রে বিমলা দেবীর স্বামী বাড়ীতে নাই; কি একটা প্রয়োজনে অন্যত্র গিয়াছেন,—রাত্রির মধ্যে আর বাড়ী ফিরিবেন না। তাই আজ বিমলা দেবী নৈশ আহারের পর কন্যাকে কাছে লইয়া শয়ন করিয়াছেন; পাশেই খোকা ঘুমাইতেছে। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে মায়ে ঝিয়ে গল্প হইতেছে। হঠাৎ বিমলা দেবী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে ফুলি, এই ক'দিনের মধ্যে তোকে ত একবারও খোকার সঙ্গে খেলা করতে দেখলুম না!"

প্রফুল্ল আশ্চর্য্য হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আমি খোকার সঙ্গে খেলা করব! কি রকম? আমি ছেলের মা! আমার কি এখনও খেলা করবার বয়েস আছে না কি? তাও আবার নিজের পেটের ছেলের সঙ্গে! ঐ একরত্তি খোকা! সমবয়সীদের সঙ্গে হলেও বা কথা ছিল!"

মা ততোঽধিক আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ও মা! সে কি কথা! তুই তোর ছেলের সঙ্গে খেলবি না ত আর কে খেলবে এখন? তোর সঙ্গে খেলা না করলে ছেলে শিখবে কোত্থেকে?"

"খেলা থেকে আবার কি শিখবে মা?"

"ও মা! তাও জানিস না? ছেলেরা খেলার ভেতর থেকে যতটা শিখতে পারে, বই পড়ে তত শিখতে পারে না। খেলাটাই হল তাদের প্রধান শিক্ষা। তুই ত এখন ঘরকন্নার কাজ বেশ শিখিছিস। সে কি তুই এত বড় হয়ে শিখিছিস, না, ছেলেবেলা পুতুল খেলতে খেলতে শিখিছিস?"

প্রফুল্ল এতক্ষণে মার কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল। কহিল, "তা বটে! কিন্তু সে ত আমি তোমার সঙ্গে খেলা করিনি, সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতুম ত!"

"তা খেলতিস। কিন্তু তার আগে আমার সঙ্গে কত খেলা করেছিস। সে তখন তুই খুব ছেলেমানুষ। সে সব কথা এখন তোর মনে না থাকারই কথা।"

"আচ্ছা মা, খেলা থেকে যদি শিক্ষা পাওয়া যায় তা' হলে খোকা ত তার সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতে খেলতেই শিখবে। আমি আবার ওর সঙ্গে কি খেলা করব?"

"তোর খোকার ত এখনও সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করবার বয়েস হয় নি,—এখন তুইই তার সঙ্গে খেলা করবি।"

"আচ্ছা, কি খেলা করব মা?"

"তাও কি আবার তোকে শিখিয়ে দিতে হবে? ছেলের যা খেলতে ভাল লাগে তাই খেলবি। দৌড়ো-দৌড়ি, হুটোপাটি—এই সব খেলবি। মায়ে পোয়ে ইসারা ইঙ্গিতে কত রকমই ত খেলা যায়।"

"তা' এ রকম মায়ে পোয়ে খেলা ক'দিন চলবে,—চির কাল না কি?"

"চির কাল নয়। যত দিন না ছেলেকে কিণ্ডারগার্টেনে পাঠানো হয়।"

"হাঁ মা, কিণ্ডারগার্টেন কি মা?"

"ঐ যে এখন সব কত রকম বিলিতি জিনিস হয়েছে—কিণ্ডারগার্টেন, নার্সারি—এমনি সব কত কি।"

"আচ্ছা মা, কিণ্ডারগার্টেন জিনিষটা কি রকম? সেখানে গিয়ে ছেলে কি করবে?"

"সেও একরকম খেলার সঙ্গে লেখাপড়া শেখা; তবে মায়ে পোয়ে নয়;—সে ইস্কুলের মাষ্টারদের সঙ্গে ছেলেদের খেলা আর পড়া। যাক্, সে কিণ্ডারগার্টেনের কথা পরে হবে এখন; আগে তুমি নিজে ছেলের সঙ্গে কি রকম করে খেলা করবে, তাই বুঝে নাও।"

"তুমি বলে দাও না মা!"

"তুমি ছেলেকে কথা কইতে শেখাবে। রোজ ছুটি একটী নতুন নতুন কথা শেখাবে। খেলনা দেবে, দিয়ে তার নাম বলে দেবে; কিম্বা, খেলা করবে, আর সেই খেলার সঙ্গে যে সব কথা এসে পড়বে, তাই শিখিয়ে দেবে। ছেলে তোমার দেখাদেখি কথাগুলো উচ্চারণ করতে শিখবে। একবারে পারবে না,—দশ বিশ বার চেষ্টা করতে করতে তবে কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারবে। শিশুর মুখের সেই আধ আধ বাণী শুনলে মার প্রাণ আহ্লাদে গলে যায়। এতে তুমি খুব আনন্দ পাবে। তুমি দেখতে পাবে,—ছেলে কথাগুলি শেখবার জন্যে কত চেষ্টা করচে। আরও দেখবে, মাঝে মাঝে সে পুরোনো পড়ার মত করে' আগের শেখা কথাগুলো আবার বার বার উচ্চারণ করবার চেষ্টা করে অভ্যেস করে নিতে চাচ্চে। তুমিও সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাগুলো আউড়ে যাবে। আর দেখ, ছেলের এ রকম চেষ্টায় কখনও বাধা দিও না, কখনও রাগ কোরো না, কখনও বিরক্ত হোয়ো না। ছেলেকে যখন খেলনা দেবে,—একেবারে এক ঝুড়ি খেলনা দেবে না, একটা কি দুটো খেলনা এক একবারে খেলতে দেবে। একেবারে অনেক খেলনা এক সঙ্গে ছেলেকে খেলতে দিলে, ছেলে হাঁপিয়ে উঠবে। মানে, ছেলেমানুষ সে,—সব খেলনাগুলো একসঙ্গে নিতেই তার ইচ্ছে যাবে, অথচ পারবে না। কাজেই খেলাও তার ঠিকমত হবে না, শেখাও ভাল রকম হবে না। এক এক দিন এক এক রকম খেলনা ছেলেকে খেলতে দিলে খেলা আর শেখা দুইই খুব ভাল রকম হবে। একটা খেলনা দিয়ে,—সেটা নিয়ে কেমন করে খেলা করতে হবে, তুমি প্রথমে তা দেখিয়ে দেবে; তার পর ছেলে নিজে খেলতে থাকবে। পারবে না,—তুমি আবার দেখিয়ে দেবে। এমনি যতবার দরকার হয় ততবারই দেখিয়ে দেবে। তবে, ছেলে নিজে খেলতে শেখে এইটেই উদ্দেশ্য কি না,—তাই, যখন তুমি দেখবে, একটা খেলনা নিয়ে সে আপনিই বেশ খেলতে শিখেছে, তখনই বুঝবে সে খেলনা নিয়ে তোমার কাজ শেষ হয়েছে। এমনি করে রোজ নতুন নতুন খেলা আর কথা শেখাতে হবে। মাঝে মাঝে পুরানো পড়া আবৃত্তি করতে হবে।

"তার পর, এক একটা খেলনা থেকে তার কত নতুন বিষয় শেখা হয় তা দেখ। ধর, তুমি তাকে একটা কাঠের ঘোড়া কিনে দিলে। আর বলে দিলে, এর নাম ঘোড়া। খোকা আপনি আপনি বার বার আবৃত্তি করে শিখে নিলে—ঘোড়া। তা পর, ঘোড়ার ঘাস চাই, দানা চাই, জল চাই। চারটি কুচো কাগজ হল ঘোড়ার খাবার ঘাস। চারটিখানি বালি হল তার দানা। একটু জল কোন একটা কিছুতে করে দিলে;—ঘোড়া সেই পাত্রে মুখ ডুবিয়ে জল খাবে। তার পর ঘোড়ার আস্তাবল চাই—ঘরের এক কোণে একটা কাঠের বাক্সে ঘোড়ার আস্তাবল হ'ল। বাক্সের ভেতরে কিছু পুরোনো ন্যাকড়া পেতে দিয়ে ঘোড়ার বিছানা করে দিলে। ঘোড়া ছুটতে ছুটতে পড়ে যেয়ে হাত পা ভাঙলে, আরাম হবার জন্যে তার আবার একটা হাসপাতাল চাই। এই এক ঘোড়া নিয়ে ছেলের সঙ্গে খেলতে খেলতে তুমি দেখবে, সে কত নতুন নতুন কথা শিখবে, আর চেষ্টা করে করে ঠিক মত উচ্চারণও করতে পারবে। ঘোড়ায় চড়বার জন্যে একটা সোয়ার চাই;—তাও তুমি ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী করে দেবে। ছেলে সেই সোয়ার ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিয়ে ঘোড় দৌড় করাবে। এই রকম খেলায় যেমন আমোদ তেমনি শিক্ষা হবে। কথাগুলো শিখতে আর উচ্চারণ করতে তাকে বেশ রীতিমত মানসিক চেষ্টা আর পরিশ্রম করতে হবে। ছেলের সঙ্গে তোমাকেও খেলতে হবে,—তার মানে এটা নয় যে, বরাবর তুমি একা একা খেলবে, আর ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে। তা নয়।—তুমি প্রথম প্রথম দুই একবার দেখিয়ে দিলে, তার পর ছেলে নিজেই খেলতে লাগল। তুমি নজর রাখবে,—সে ঠিকমত খেলতে পারচে কি না। ভুল হলে দেখিয়ে দেবে। আর ছেলে নিজেই তোমাকে জিজ্ঞেসা করবে। ভুলটা দেখিয়ে দেবার আগে, ছেলে নিজেই সেটা ধরতে পারে কি না,—শোধরাবার জন্যে

তোমাকে জিজ্ঞেসা করতে আসে কি না, তার জন্যে অপেক্ষা করবে। জিজ্ঞেসা করলে ত বলে দেবেই; আর যদি দেখ, ভুল ধরতে পারচে না, ভুলই করে যাচ্ছে, তখন দুই একবার অপেক্ষা করবার পর তুমি নিজেই সেটা শুধরে দেবে। মোট কথা, ছেলে তোমার দেখাদেখি নকল করতে চেষ্টা করবে,—এইটেই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তুমি তাকে এই বিষয়ে সাহায্য করবে। এই রকম এক একটা খেলার ভেতর থেকেই তার একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি আর বিচার বিবেচনা করে দেখবার ক্ষমতা অভ্যেস হয়ে যাবে। অনেক মা ছেলেকে অনেক রকম খেলনা কিনে দেন। কিন্তু কেমন করে সেই সব খেলনা নিয়ে খেলা করতে হয় তা দেখিয়ে দেন না। হয় ত সবগুলো খেলনা একসঙ্গেই খেলতে দিলেন। এতে তার বিশেষ কিছুই উপকার হয় না। সে কোন খেলনা নিয়ে ভাল করে নিখুঁত ভাবে খেলতে শিখতে পারে না। কাজেই কর্ম জীবনেও সব কাজ নিখুঁত ভাবে করবার অভ্যেস তার হয় না। হয় ত সে একেবারে অনেকগুলো কাজে হাত দিয়ে বসে, অথচ কোনটাই সে ভাল রকম করে শেষ করে নিতে পারে না। এক একটা কাজে অখণ্ড মনোযোগ দিতে শেখে না। সব কাজই তার আধা-খেঁচড়া করে করবার বদ্ অভ্যেস জন্মে যায়। খেলার ভেতর থেকেই এই মহৎ অভ্যেস হয়ে যেতে পারে, যদি মার সে দিকে লক্ষ্য থাকে। এই খেলার ভেতর থেকেই, মানুষের ছেলে হয় মানুষ হয়, নয় হয় পশু হয়।

ছেলে মানুষ করা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস লিখিত—

সকলেরই ইচ্ছা যে, তাঁহার ছেলেটি মানুষ হয়—কিন্তু মানুষ বাঙ্গালা দেশে কোথায়? স্বাস্থ্য, নীতি, শিক্ষা, চরিত্র লইয়াই মানুষ। তাহার কয়টা আমাদের আছে? বাঙ্গালাদেশ আজ রোগের আকার,—যে বাঙ্গালা "সুজলা" ছিল সে দেশে আজ জল অপেয়। "বহু বলধারিণী" বাঙ্গালা আজ রোগে জীর্ণ জীবন্ত-কঙ্কলে-মালিনী। আজ বাঙ্গালার মেরুদণ্ড পল্লীজীবন নাই, সমাজের শাসন নাই, ধর্ম্ম-ভয়, চরিত্রবল, নীতি-মাহাত্ম্য কিছুই নাই; তাই আজ বাঙ্গালাদেশে মানুষও নাই। আজ বাঙ্গালীর জীবন সহরের বিলাস-লাস্যে স্পন্দিত বাঙ্গালার ব্যবসায় বাণিজ্য পরহস্তগত, বাঙ্গালীর শিক্ষা পরমুখাপেক্ষী, বাঙ্গালীর আদর্শ আজ ছায়াবাজীর মত আকাশে উঠিতেছে আর মিলাইতেছে। বাঙ্গালী আজ রোগী, নগরে প্রবাসী; ইংরেজান্নভোজী, বাসাবাড়ীতে বসতশায়ী—আজ তাই বাঙ্গীর "যাবজ্জননম্ তাবন্মরণং।"

নিজ বাসভূমে এইরূপে পরবাসী হইয়া কতকাল আর আমরা "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" এই অবস্থায় থাকিব? আজ বাঙ্গালার প্রধান অভাব, শিক্ষার অভাব—কেতাবী বি, এ, এম্ এ শিক্ষায় নয়, যে শিক্ষায় মানুষকে ক্লীবত্ব ত্যাগ করিতে শিখায়, সেই শিক্ষারই দারুণ অভাব। এ শিক্ষার অভাব রাজ সরকার হইতে অপনোদিত হইবে না; এ শিক্ষায় দেশের লোকের প্রাণপাত করিতে হইবে তবে যদি এ শিক্ষার বিস্তার ঘটে। গ্রামে গ্রামে কথকতা আবার প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপিত করিতে হইবে এবং নির্লোভী, নিস্পৃহ শিক্ষককুলের সাংসারিক ভার সমাজকে লইতে হইবে, তবে সুশিক্ষা ও পাওয়া যাইবে। আত্মপর ভুলিয়া, ধনী নির্ধন হিন্দু-মুসলমান, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই এক প্রাণ হইয়া কাজ করিতে হইবে তবে যদি আমরা আবার মানুষ হইতে পারি!

আমাদের মধ্যে সকল রকমের বিদ্যার ও জ্ঞানের প্রচার হয়—শিখান হয় না কিন্তু দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব, শিশুতত্ত্ব! আমরা সকলেই সময়ে জনক জননী হইয়া পড়ি; কিন্তু কি করিয়া শিশুকে লালন পালন করিতে হয় তাহা জানি না। এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা যে এ সম্বন্ধে কিছু জানি না, তাহাও আমরা জানি না, জানা দরকারও মনে করি না! তাই অকালে এত শিশু মারা পড়ে, এত বালক সমাজের গলগ্রহ হইয়া উঠে, এত পণ্ডিত-মূর্খ সমাজে বিচরণ করে!

শিক্ষার পরে, স্বাস্থ্যলাভের দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হইবে। ছেলেদের জন্মকাল হইতে কি কি উপায়ে খাইতে, পরিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে দিতে হয়, সেসকল তথ্য রীতিমত জানিয়া শুনিয়া, কাজে লাগাইতে আমি যে বিষয় বলিতে বসিয়াছি সে সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ পুস্তক রচনা করিলে তবে সকল কথা বলা যায়। কিন্তু অগস্ত্য মুনি যেমন এক গণ্ডুষে সমস্ত সাগরবারি পান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমাকেও এক নিঃশ্বাসে সকল কথা বলিতে হইবে।

প্রথমে স্বাস্থ্য কথা। কি কি করা "উচিত," তাহা বলিতে অনেক স্থানের প্রয়োজন। অতএব কি কি "করিতে নাই," তাহাই সংক্ষেপে বলিব। গর্ভে বাস-কালীন শিশুটি জলে ভাসে; অতএব তাহার জন্মের পরে, যতদূর তাহার স্নানের অভ্যাস করান যায়, তাহা কর্ত্তব্য; —কিন্তু তাই বলিয়া ইচ্ছা করিয়া, ছেলেকে শক্ত করিবার আশায়, অযথা শীতাতপের মধ্যে ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। একদিকে যেমন গ্রীষ্মের দারুণ গরমে রাতদিন পেণ্টি, ফ্রক, পরান অন্যায়, পক্ষান্তরে, শীতকালে মাথায় উলের টুপি, গায়ে উলের জামা, অথচ নগ্নপদে জলে কাদায় ছেলেদের রাখা অনুচিত। মাতৃস্তন্যই ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত শিশুর ন্যায্য আহার। সে আহারে বঞ্চিত করিয়া বাসি বিলাতি "গাঢ় দুগ্ধ" বা "ফুড" খাওয়ান, অথবা দোকানের খাবার, প্রভৃতি মুখে দেওয়াও অন্যায়। ছয় মাসের পরে দন্তোদ্গম হইলে, আর মাতৃস্তন্য দেওয়া উচিত নয়। যতদিন শিশু মাতৃস্তন্য পান করিয়া জীবনধারণ করে ততদিন এলোমেলো ভাবে, যখন তখন বা ছেলে কাঁদিলেই স্তন্য দেওয়া অন্যায়। অযথা ভোজনের ফলে শিশুদের পেট কামড়ায়, তজ্জন্য তাহারা নিদ্রিতাবস্থায় নানা রকম মুখভঙ্গী করে; অথচ ঐরূপ করিলে, জননীরা মনে করেন যে, শিশু মা ষষ্ঠীর সঙ্গে "দেয়ালা" করিতেছে! সাধারণতঃ, যতক্ষণ ছেলে না কাঁদে, ততক্ষণ তাহার জননী তাহার জন্য আদৌ ব্যস্ত হন না; এবং কাঁদিলেই মনে করেন যে, শিশু ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদিতেছে! আবার, যতক্ষণ শিশুরা একেবারে রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ না করে, ততক্ষণ তাহাদের স্বাস্থ্য বলিয়া যে একটা ভাবিবার জিনিষ আছে, সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। ছেলেরা ধূলাকাদা ঘাঁটে, তাহাতে আমরা আপত্তি করি না; কিন্তু ছেলেদের ক্রিমি হইলেই আতঙ্কিত হই—ভুলিয়া যাই যে, ধূলাকাদার সঙ্গে, নানারূপ জন্তুর বিষ্ঠামিশ্রিত ক্রিমিডিম্ব উদরস্থ হয়। এক কথায়, ছেলেরা কি খায়, কি পরে, বা কি করে, সাধারণতঃ তাহা জনক-জননীর চিন্তাজগতের বহির্ভূত,—যাবত না ছেলেরা ব্যারামে পড়ে। কোন্ খাদ্য পুষ্টিকর, কোন্ খাদ্য অনিষ্টকর, তাহাও জনক-জননীরা জানেন না, জানা আবশ্যক মনেও করেন না। শিশুরা কি হারে বর্দ্ধিত হয়, এবং বৃদ্ধির মুখে কিরূপ আহার্য্য যোগান উচিত, তাহাও জানিবার স্পৃহা কাহারো নাই। ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, উদারময়, অজীর্ণ প্রভৃতি অতি সহজে নিবার্য্য ব্যাধি। কিন্তু আজন্ম-রোগের মধ্যে বাস করিয়া, অদৃষ্টকে চিরকাল প্রাধান্য দিয়া, অজ্ঞতার পঙ্কিল পল্বলে আকর্ণ নিমজ্জিত থাকিয়া, পিতামাতা রোগভোগকে অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। পঠনপ্রণালীর দোষে চক্ষুর্দৃষ্টি ক্ষীণ হইলে, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে দেহ শীর্ণ হইলে, অসাবধানতা ও অজ্ঞতার ফলে বালকেরা নিত্যই পীড়িত হইলে, বাঙ্গালীর ঘরে পিতামাতা চিন্তিত হইবার কারণ পান না। লোকে একটা কুকুর, কি বিড়াল, কি ঘোড়া, পাখী বা গরু পুষিলে, তাহার জন্য কত ভাবে, তাহার আহার-

বিহার প্রভৃতি বিষয়ে কত তত্ত্ব লয়; কিন্তু অযত্নে আগত শিশুদের জন্য বাঙ্গালায় ভাবে, এমন মানুষ ত দেখি না। ছেলেরা আজকাল সন্তান,—বংশধর নহে, সৃষ্টিধর নহে, পুত্রও নহে। লোকে আম কাঁঠাল গাছ রোপণ করিবার সময়ে, দীর্ঘিকা খনন করিবার সময়ে ও বাটী ঘর প্রস্তুত করাইবার সময়ে, ভবিষ্যতের দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাকাইয়া, তবে কার্য্যে লিপ্ত হয়; কিন্তু বংশের ধারা যাহার দ্বারা সুরক্ষিত বা কুরক্ষিত হইবে, সৃষ্টির সমস্ত বেগ যে ধারণ করিবে—সে পিতামাতার চেষ্টার ফলে "মানুষ" হয় না—পিতামাতার অপ্রত্যাশিত ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা সত্ত্বেও "মানুষ" হইয়া উঠে। এ দৃশ্য আর কত দিন দেখিতে হইবে?

স্বাস্থ্যের পরে শিক্ষার কথা। অর্থকরী বিদ্যা, অবিদ্যা। যে বিদ্যা চক্ষুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখায় না, হস্তপদাদিকে আত্মনির্ভর করিতে শিখায় না, মনকে চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে অবাধ ভ্রমণ করিতে শিখায় না, যে শিক্ষায় চরিত্র উন্নত হয় না, দেহ কর্ম্মঠ হয় না, আত্মা জাগরিত হয় না, হৃদয় পরসেবার জন্য উন্মুক্ত হয় না—সে শিক্ষা নয়—সে অশিক্ষাও নয়, সে অষ্টেপৃষ্ঠে কুশিক্ষা। বায়সের দ্বারা পরভৃত লালিত-পালিত হওয়া সম্ভব হইলেও, তাহার শিক্ষা স্বজাতীয়ের নিকট হইয়া থাকে। স্কুলে আমাদিগকে দাঁড়ের বুলি শিখান হয়,—তাহাতে আপত্তি নাই;—কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত স্থান প্রথমে গৃহে পরে বরাবর সমাজে। আজ শিক্ষককুলকে ক্ষুধার্ত্ত ফেরুপালে পরিণত করিয়াছি, যে যত বেশী মূর্খ, তাহাকে ততই অল্প বেতনে অধিক সংখ্যক তরলমতি বালকের শিক্ষার ভার দিয়াছি—গৃহে প্রাইভেট শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক উভয়কেই হীন দাসরূপে কল্পিত করিয়াছি—কাযেই শিক্ষা রসাতলে গিয়াছে! সমাজকেই শিক্ষার ভার লইতে হইবে, শিক্ষককে রীতিমত পদমর্য্যাদা দিতে হইবে এবং সমাজ তাহাদের সাংসারিক অভাব পূরণের চিন্তা করিবেন—তবে ত প্রকৃত শিক্ষার দিন আসিবে। সখ করিয়া, দুই চার জন ভদ্রলোক ঝোঁকের মাথায় পড়িয়া কামার-কুম্ভকারের বিদ্যা শিখিলে দেশটা সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হইয়া উঠে না!

যেই শিক্ষা তোরে আত্মস্থ করে না,
যে শিক্ষা নিত্যই জাগায় বাসনা,
সে কি শিক্ষা ভাই, খুঁজে নাহি পাই—
কেন্দ্রস্থান হ'তে মরম উপাড়ি'
বাহিরে টানিয়া, দেয় দূরে ছাড়! (বনফুল)

বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে আমরা প্রত্যক্ষে দুর্নীতি-পরায়ণ না হইলেও, আমাদের মধ্যে নৈতিক বন্ধনে যে যথেষ্ট শৈথিল্য ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। শিশুমাত্রেই অতীব অনুকরণশীল। তাহারা যাহা দেখে তাহাই শিখে। এদিকে পিতা মাতা মনে করেন যে, শিশুদিগকে যেটা শিক্ষা দেওয়া না যায়, তাহারা সেটা শিখে না; কাযেই, পিতামাতার অজ্ঞাতসারে, শৈশব হইতেই, বালকেরা অনেক হীননীতি ও দুর্নীতি অলক্ষিতে শিক্ষা করে। যাবতীয় নৈতিক বিকারের মধ্যে, অসংযম অন্যতম। বাক্যে, চিন্তায়, ভোজনে, ব্যবহারে, এমন কি আশা-আকাঙ্ক্ষায় অসংযম আজ বালকদিগের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অমানুষের যেগুলি লক্ষণ, অর্থাৎ অসংযম, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, পরমুখাপেক্ষিতা—তাহা আজ আমাদের প্রত্যেকের মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। অথচ এই বাঙ্গালী এখন কোন কোন স্থলে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কাহাকে কাকা, কাহাকেও মামা, বলিয়া আত্মীয় করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতেছে! বাঙ্গালীর চরিত্রে এই সকল দোষ ফুটিয়া কেন উঠিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। বাঙ্গালী বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব যাহা কিছু ছিল, সে সমস্ত ঘুচাইয়া দিয়া, আজ পাশ্চাত্য চরিত্রের লঘু দিকটা সহজায়ত্ত বলিয়া, আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়া, ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক হইয়া পড়িয়াছে। এ পথ পরিত্যাগ করা সহজ নহে।—বিশেষতঃ এখন সমাজ-বন্ধন নাই, আত্মীয়তার স্নেহডোর শিথিল, ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত-প্রায়।

আজ আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য অনেক। প্রথম কর্ত্তব্য, স্বজাতিপ্রেম জাগাইয়া তোলা ও স্বসমাজ-সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা। সমাজে প্রাণ না থাকিলে, ও দেশাত্মবোধ না জন্মাইলে, মানুষের মনের গতি উন্মার্গগামিনী হয়। সংঘবদ্ধ করা ও স্বজাতিপ্রেম জাগান পল্লীজীবনের পুনঃসংস্থাপন-সাপেক্ষ। নগর বা সহরগুলি কৃত্রিম—পল্লীজীবন স্বাভাবিক। পুরা হিন্দু ভাবে পল্লীজীবনকে পুনরায় গড়িয়া তুলিতে পারিলে, আবার আমরা সমাজ পাইব, সমাজের নেতা পাইব, স্বাস্থ্য পাইব, অর্থ-সম্পদ না পাই, ভাব-সম্পদ ও সুখ পাইব, জীবনের অনেক বিষয়ের আদর্শ পাইব। এখন আমরা ইংরাজী বুলি শিখিয়াছি, ইংরাজের দেশাত্মবোধ তলাইয়া বুঝি নাই। এই শিক্ষা যেমন ভাবে বাল্যবিবাহ, এদেশের আচার-ব্যবহার, জাতিভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ণে মন্ত্র দিতেছে, আমরা তাহাই বেদবাক্য মনে করিতেছি—ভাবি না দেখি না যে এত সহস্র বৎসরের প্রথাগুলির উদ্দেশ্য কি, মেরুদণ্ড কি; জাপানের আদর্শ দেখি; পরন্তু তলাইয়া বুঝি না যে, ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের বিশেষত্ব কোথায়। কাযেই, পল্লীজীবন গঠন করিবার কথা উঠিলেই নানারকমের ছায়াবাজীর চিত্র যুগপৎ মানসপটে উপস্থিত হয়।

যাহাই হউক, পল্লীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, দেশময় পূর্ব্বের সৌভ্রাত্র জাগাইয়া, বাঙ্গালীর জীবনের প্রধান উপকরণ ধর্ম্মানুপ্রাণতাকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তবেই দেশে বর্ত্তমান স্বার্থপরতার স্থানে নিস্পৃহতা আসিবে, কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বোধ আসিবে, আবার বাঙ্গালী প্রাণ পাইবে। তখন জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তনা করিলে, প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটিবে। সে শিক্ষায় মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ঘটিবে, এবং চরিত্রবল, নৈতিক বল ও তৎসঙ্গে দৈহিক বলের ও আত্মার শক্তি ও মুক্তির সঞ্চার হইবে। বহু সহস্র বৎসরের সমাজকে আমরা বহু বর্ষ ধরিয়া ভাঙ্গিয়াছি,—বহু যুগব্যাপী আরাধনায় আবার তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তজ্জন্য ধৈর্য্য, তিতিক্ষা যথেষ্টই চাই। পৃথিবীতে এমন আর কোনও জাতি আছে কি, যাহারা আমাদিগের ন্যায়, নিজের ঠাকুরও বিলাইয়া দিয়াছে, কিন্তু পরের কুকুরও ধরিতে পারে নাই?

৪৯শ বেঙ্গলীজ।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত কিরণ-চন্দ্র দে, আই-সি-এস মহোদয় চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ৪৯শ বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের জন্য সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সভাপতিত্বে সৈন্য সংগ্রহ কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের জন্য আবার সৈন্য সংগ্রহের উদ্যোগ আয়োজনের হেতু এই যে, গবর্ণমেণ্ট এই ৪৯শ বেঙ্গলীজ রেজিমেণ্টটিকে স্থায়ী করে দিলেন। ইহা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে অতি শুভ সংবাদ।

৪৯শ সংখ্যক বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠন করবার প্রথম আদেশ যখন প্রচারিত হয়, তখন বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন অধিকার লাভ করল বলেই সমগ্র বঙ্গদেশে আনন্দধ্বনি উঠেছিল। কিন্তু এই অধিকার স্থায়ী হবে কি না, তখন তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। তখন, উহা স্থায়ী হতেও পারে, না হতেও পারে—এই রকম কথাই কেবল শোনা গিয়াছিল। এখন গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে উহা স্থায়ী হয়ে গেল। এটা বাঙ্গলা দেশের পক্ষে একটা মস্ত লাভ। এজন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

৪৯শ বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট স্থাপিত এবং স্থায়ী হওয়া একটা অধিকার বটে, এবং সেটা দেশের পক্ষে একটা লাভ বটে,—কিন্তু আমরা সে দিক দিয়া ইহাকে লাভ বলছি না, এবং বলতে চাইও না। আমরা কেন ইহাকে লাভ বলছি, তা বলবার জন্যই আজ এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি।

বাঙ্গালী পল্টন গঠন করবার যখন প্রথম প্রস্তাব হয়, তখন অনেক বাঙ্গালী মা—বিশেষতঃ যাঁদের একটী মাত্র ছেলে—তাঁরা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন—পাছে তাঁদের ছেলেরা সৈন্যদলভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারায়। মায়ের প্রাণ এই চিন্তায় যে কাতর হবে, তা খুবই স্বাভাবিক; এজন্য তাঁদের কেউ দোষী করে নি। কিন্তু অমর যখন কেহই নয় এবং হতেও পারে না, তখন মনকে একটু প্রবোধও যে দেওয়া না চলত এমন নয়। ছেলে যুদ্ধে না হয় নাই গেল। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ ত সকল রোগেরই আকর। এই সকল রোগে কত শিশু, বালক, কিশোর, যুবক মায়ের কোল অন্ধকার করে অনন্তধামে চলে যাচ্ছে। কই, কোনও মা কি তাঁর ছেলেকে রোগে অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষে করতে পারছেন? সুতরাং যাঁদের অনেকগুলি ছেলে আছে, তাঁরা যদি তাঁদের এক একটী ছেলেকে দেশের কাজের জন্যে ছেড়ে দেন, তাতে দুঃখ করবার বিষয় এমন কি-ই বা আছে? এক সময়ে ত এই বাঙ্গলা দেশের মায়েরাই নিজের হাতে ছেলেকে বীরসাজে সাজিয়ে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিতেন। তবে আজই বা বাঙ্গালী মা ছেলের জন্যে এতটা কাতর হবেন কেন?

তার পর সৈন্য দলে যোগ দিলেই যে যুদ্ধ করতে যেতেই হবে, এমন কোন কথা নাই; আর, যুদ্ধ করতে গেলেই যে প্রাণ দিতেই হবে, এমনও কোন কথা নাই। যাঁরা প্রথমে সৈন্য দলে যোগ দিলেন, তাঁদের সকলকেই কিছু যুদ্ধ করতে যেতে হয় নি; আর, যাঁরা যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই কিছু মারা পড়েন নি। বরং তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই যুদ্ধে জয়-মাল্য লাভ করে দেশে ফিরে এসে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আবার যুদ্ধ কিছু চির দিন চলে না। এই যে এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, এরও শেষ হয়েছে। তার পর কবে আবার কোথায় যুদ্ধ বাধবে, কবে কোথায় আবার বাঙ্গালীর ছেলেকে লড়াই করতে যেতে হবে, তার কিছুই ঠিক নেই। দশ বিশ বছরের মধ্যে আর এমন যুদ্ধ বাধতে নাও পারে, যাতে বাঙ্গালীর ছেলে আর যুদ্ধে যেতে হতে পারে। যাক সে কথা। এ বাঙ্গালী মায়েদের আর ততটা আতঙ্কের কথা শোনা না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বুঝে নিয়েছেন যে, ছেলে সৈন্য দলে যোগ দিলেই ভয়ের কোন কারণ নেই; বরং তাতে গৌরবের কারণ আছে, এবং দেশের লাভ অনেক আছে।

৪৯শ বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট স্থায়ী হয়ে যাওয়ায় কেন আমাদের মনে এত আহ্লাদ হচ্চে, তার কারণ আর কিছুই নয়—আজ বাঙ্গালী জাতের অন্ততঃ হাজার দুই তিন লোকের মানুষের মত মানুষ হবার পথ খুলে গেল। আগে আমাদের ধারণা ছিল যে, মানুষ হতে গেলে খুব বেশী করে লেখা পড়া শিখতে হবে—দেশশুদ্ধ লোককে বি-এ, এম-এ পাশ করে উচ্চ শিক্ষিত বলে পরিচিত হতে হবে;—এক কথায়, বিদ্যের জাহাজ হতে হবে। সেই ধারণা অনুসারে বাঙ্গালীর ছেলে প্রাণপাত করে পড়তে লাগল, পাশও করতে লাগল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক একটী পাশ-করা ছেলে এক একটী রোগের জাহাজও হয়ে উঠতে লাগল। দেহখানা বলি দিয়ে তারা মনকে বিদ্যের চাপে পিষে ফেলতে লাগিল। দশ বছর বয়স না হতে হতেই তাদের চশমা ধরতে হল,—শরীর এমন পলকা হয়ে উঠল যে সামান্য একটু রোদ-বৃষ্টি লাগলেই মাথাধরা, সর্দ্দি, কাশি হতে লাগল। ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা কমে আসতে লাগল। হীনবীর্য্য হয়ে জাত গোল্লায় যাবার যোগাড় হয়ে এল! কিন্তু এ কথা কে বুঝতে পারলেন না। লেখাপড়ার খাতিরে, পণ্ডিত করে পণ্ডিত হবার লোভে, জীবনটাকে যে বলি দেওয়া হচ্ছে, এ ধারণাই কারো মনে জন্মালো না। অবশেষে যখন বাঙ্গালীকে সৈন্য দলে নেবার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়ে গেল, তখন এই ভ্রমটা ধরা পড়ল। তখন এ দিকে দেশের লোকের নজর পড়ল।

বাঙ্গালীকে সৈন্য দলে নেওয়া হবে, এই হুকুম হবা মাত্র, দলে দলে ছেলেরা ভর্ত্তি হতে গেল। মায়ে

মনের অবস্থা যেমনই হোক, ছেলেদের উৎসাহ-আগ্রহের এতটুকু অভাব ছিল না। কিন্তু উৎসাহের অভাব না থাকলে কি হবে,—স্বাস্থ্যের অভাব বিলক্ষণই ছিল। ভর্ত্তি হতে যেতেই ডাক্তারী পরীক্ষায় অনেককে ফেল হয়ে ফিরে আসতে হল। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল, সৈন্য হতে গেলে শরীর যে রকম তাজা থাকা আবশ্যক সৈন্য হতে ইচ্ছুক যুবকদের মধ্যে অনেকেরই শরীরের অবস্থা সে রকম নয়। শুধু আগ্রহ থাকলেই ত সৈন্য হওয়া যায় না। সৈন্যগণকে কত মেহনত করতে হয়, কত কঠোর কষ্ট সহ্য করতে হয়। এই সব কারণে, খুব সবল লোক না হলে, সৈন্য দলে নেওয়া হতে পারে না। পরীক্ষায় দেখা গেল, বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে সৈন্য হবার মত ছোকরা খুব কম। আর তা না হবেই বা কেন? আগেকার কথা ভাল জানা নেই, আর পুরাকালের কথায় তত আবশ্যকও নেই; কিন্তু ইংরেজের আমলে গত দেড়শো বছর বাঙ্গালীকে সৈন্য করা হয় নি। দেড়শো বছর চর্চ্চা না থাকায়, তার উপর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির আক্রমণে, বাঙ্গালীর শরীর সাধারণ ভাবেই ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এই কারণে, দলে দলে ছেলেরা সৈন্য হতে এলেও, একটা রেজিমেণ্টের উপযুক্ত সংখ্যক যুবককে ভর্ত্তি করে নিতে কিছু সময় লেগেছিল।

সৈন্য সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হতেই ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল, কারও বুক খুব কম চওড়া; অধিকাংশেরই চোখের দৃষ্টি-শক্তি খুব কম। এই রকম নানা কারণে অনেক লোককে বাতিল করবার পর, যারা এখানকার ডাক্তারী পরীক্ষায় কোন রকমে উৎরে গিয়ে নৌশেরায় কি করাচীতে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে গেল, তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ সেখানকার ডাক্তারী পরীক্ষায় ফেল হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হল। তার পর আবার দু' মাস ছ'মাস যুদ্ধ বিদ্যা শেখবার পর যাদের মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ করতে পাঠানো হলো, তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ শরীর গতিকে অপটু বলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল শুনেছি।

এই রকম অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে সকল ভাগ্যবান যুবক সেনাদলে টিকে যেতে পারল, অল্প দিন যুদ্ধবিদ্যা শেখবার পর তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ঘোর পরিবর্ত্তন দেখা গেল। নিয়মমত চলা-ফেরা, ঠিক সময়ে স্নানাহার, রোজ নিয়মিত ভাবে ড্রিল অভ্যাস করা—এই সবের দরুণ সকলেরই চেহারা দু'চার দিনের মধ্যে ফিরে গেল,—বুকের ছাতি ফুলে উঠল, হাতের কব্জির জোর বেড়ে উঠল, দুই বাহুর গুলি দুটো আর দু পায়ের ডিম দুটো যেন লোহার মতন শক্ত হয়ে উঠল। সকলেই বীরের মূর্ত্তি ধারণ করলে। সাধারণ বাঙ্গালী যুবকের শীর্ণ পাণ্ডুর চেহারা বদলে গিয়ে বীরত্বসূচক সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত চেহারা হল। আমরা চাই যে, বাঙ্গালী পল্টনের এই সুমহৎ দৃষ্টান্ত যেন বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বৃথা না হয়ে যায়; আমরা চাই যে, বাঙ্গালা দেশের সহর-মফস্বলের কি সরকারী কি বেসরকারী সকল প্রাইমারী, সেকণ্ডারী, মিডল ও হাই স্কুলের ছেলেরা প্রত্যহ এক আধ ঘণ্টা করে নিয়মিত ভাবে ড্রিল অভ্যাস করে। এই নিয়মিত ভাবে ড্রিল অভ্যাস করার গুণ এমনি চমৎকার যে, এটী অভ্যাস করলে, বাঙ্গালীর ছেলেরা অল্প দিনের মধ্যেই মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। ড্রিল কথাটার মানেই—নিয়মিত ভাবে কাজ করবার অভ্যাস জন্মানো। ড্রিল অভ্যাস করলে কেবল যে প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্য উন্নত হতে পারবে, তা নয়; এই ড্রিল শেখার গুণে সকল কাজেই সাধারণ ভাবেই নিয়মানুবর্ত্তিতা অভ্যাস হয়ে যাবে। এর ফল যে কি রকম চমৎকার হয়, তা অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই জানেন। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক; আর ছেলেদের ড্রিল শেখানো খাওয়া পরার মতই নিত্য নিয়মিত ও স্বাভাবিক ব্যাপার। এর ফলে ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সকল কাজে নিয়মানুবর্ত্তিতা এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে, তাঁরা সমস্ত কাজই বেশ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করতে পারেন। কলকাতার গড়ের মাঠে কি সাহেবটোলায় যাঁদের যাওয়া আসা আছে, তাঁরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে,

কি ছেলে, কি বুড়ো, দু'জন সাহেব যখন একসঙ্গে চলা-ফেরা করেন, তখন তাঁদের দুজনেরই হয় ডান পা, না হয় বাঁ পা এক সঙ্গে উঠছে, একসঙ্গে নামছে। আমি যতবারই সাহেবদের চলাফেরা দেখেছি, ততবারই এইটি লক্ষ্য করেছি,—এ যাবৎ এক দিনও কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখিনি। একাধিক ইউরোপীয়ান—তা তাঁরা এক দেশের লোক হউন, আর ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক হউন,—তাঁদের মধ্যে আগে থাকতে আলাপ থাকুক, কিম্বা এই প্রথম আলাপ হউক,—চলবার সময় তাঁরা সৈনিকদের মতন তালে তালে পা ফেলে চলে যাবেন। নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলে সকল কাজ কি রকম সুশৃঙ্খল ভাবে করা যায়, তার আরও দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। সাহেবেরা যখন কিছু লেখেন, তখন প্রায় রুল কাটা কাগজ ব্যবহার করেন। তার ফলে লাইন-গুলি কেমন সোজা হয়! একটা আর একটার ঘাড়ে এসে পড়ে না, কোন লাইনই বেঁকে যাবার ভয় থাকে না। তাঁরা যখন হিসেবপত্র লেখেন, তখন টাকা আনা পাইয়ের জন্য এক একটা আলাদা আলাদা ঘর কেটে নেন। কাজেই টাকার নীচে টাকা, আনার নীচে আনা, পাইয়ের নীচে পাই থেকে যায়। এতে যোগ বিয়োগ করবার কত সুবিধে হয়, ভুল হবার সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। আর, আমাদের দেশী হিসাব রাখবার প্রণালী ত সকলেই দেখেছেন। তাতে কত যে বিশৃঙ্খলা তার কথা না বলিলেও চলে। তাতে হিসাবে ভুল হবার সম্ভাবনাও খুব বেশী। ছেলেবেলা থেকে ড্রিল অভ্যাস করার দরুণ প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপীয়ানরা যেমন বলবান হয়ে ওঠেন, অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘ জীবন যাপন করতে পারেন, তেমনি সকল কাজে নিয়মানু-বর্ত্তিতা অভ্যাস হয়ে গিয়ে পরোক্ষ ভাবেও তাঁদের স্বাস্থ্যের খুব উপকার হয়—অনিয়মের কুফল তাঁদের একটুও ভোগ করতে হয় না। তা ছাড়া সকল কাজে শৃঙ্খলা থাকায়, তাঁরা জীবনে প্রায়ই সফলতা লাভ করে থাকেন,—তাঁদের জীবনে নিষ্ফলতার দৃষ্টান্ত খুবই কম। আর, আমাদের কি গার্হস্থ্য, কি সামাজিক কোন কাজেই শৃঙ্খলা নেই। কোন একটা সামাজিক ক্রিয়া বাড়ীতে অনেকগুলি লোকের সমাগম হলে, খুব বেশী রকম অভ্যর্থনা খাতির-যত্ন হয়,—আর দুর্ভাগ্য অতিথি খেতে পেলেন কি না সে কথা একবার তাঁকে জিজ্ঞাসাও করা হয় না। কাজে শৃঙ্খলা থাকলেই এই রকম হয়ে থাকে। ড্রিল অভ্যাস করার এমনি গুণ যে, দু' দিনে এ সকল বিশৃঙ্খলতা দূর হয়ে যেতে পারে।

ইস্কুলে ড্রিল শেখাবার ব্যবস্থা হলে কাজে অনেক সুবিধা হয়। ইস্কুলে অনেকগুলি ছেলেকে একসঙ্গে পাওয়া যায়,—তাদের ড্রিল শেখাবারও সুবন্দোবস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে শিক্ষার বিষয় এখনও রীতিমত হয় নি। যত দিন না বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সমস্ত দেশময় প্রবর্ত্তিত হচ্ছে, ততদিন ইস্কুলে অতি অল্প সংখ্যক ছেলেকেই পাওয়া যাবে, তা' বাদে অধিকাংশ ছেলেই বাইরে থাকবে। তাদের ড্রিল শেখাবার উপায় কি? সেইটেই মস্ত বড় ভাবনার কথা। গ্রামের মাতব্বর লোকদের এ বিষয়ে এখন চিন্তা করে দেখা উচিত। কাছাকাছি পাঁচ-সাতখানা গ্রামের ছেলেদের রোজ সকালে কি সন্ধ্যার সময় মাঝি কোন মাঠে জমা করে ড্রিল শেখাবার ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা তাঁদের ভেবে দেখা উচিত। রোজ না হয়, সপ্তাহে তিন দিন, কি দুদিন, অন্ততঃ এক দিন—আর সে দিনটা সপ্তাহের একটা নির্দ্দিষ্ট বার হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—ড্রিল অভ্যাস করবার ব্যবস্থা করতে পারলেও অনেকটা উপকার আছে। ড্রিল করতে গেলে যে ব্যায়াম হয়, তাতে সমস্ত শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের চালনা হয়—ছেলেদের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়,—সামান্য জ্বরজাড়িতে তাদের সহজে কাবু করতে পারে না। ম্যালেরিয়ার ভয় অনেকটা কমে যেতে পারে।

সমস্ত বাঙ্গলা দেশের সব ছেলেকে যদি ড্রিল শেখাবার ব্যবস্থা করা কোন দিন সম্ভবপর হয়, তা হলে সেই দিন থেকে দশ বছরের মধ্যেই দেখা যাবে, বাঙ্গালী

দেশের শ্রী ফিরে গেছে—রোগে অকালমৃত্যু অনেকটা কমে এসেছে। আর নিয়মিত ভাবে বরাবর ড্রিল চালাতে পারলে, ২৫ বৎসর পরে যে সকল ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বাঙ্গালী জাতি গঠন করবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হয়ে উঠবেন—বাঙ্গালী জাত তখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবে। সে শুভ দিন কি কোন দিন আসবে? আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে বাঙ্গালা দেশের সেই শুভ সূর্য্যোদয় কি দেখে যেতে পারব?

ভারতে শিশুর জন্ম ও মৃত্যু।

ভারতবর্ষে শিশুরা যেন মরিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে। তাহারা যেন বিদেশী,—পূজার ছুটিতে কি বড়দিনের ছুটিতে দুদিনের জন্য এদেশে বেড়াইতে আসে; এবং বেড়াইবার সাধ মিটিলেই নিজ দেশে চলিয়া যায়। ভারতভূমিতে তাহারা যে কয়দিন থাকে, তাহা যেন তাহাদের পক্ষে প্রবাস-বাস; পিতামাতার সংসারের সহিত মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়িবার পূর্ব্বেই সকল স্নেহ-মমতার বন্ধন কাটিয়া তাহারা প্রস্থান করে। তাহারা যেন অতিথি,—সংসারের অন্যান্য অতিথির মতই যেন ভারতের, ভারতীয় পরিবারের সহিত তাহাদের দু'দিনের সম্বন্ধ—তাহার বেশী নহে।

বস্তুতঃ, প্রতি বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে ভারতবর্ষের যে স্বাস্থ্য বিবরণ বাহির হয়, তাহা পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত ধারণাই মনে বদ্ধমূল হয়। ১৯১৭-১৮ অব্দের দরুণ যে ভারতীয় স্বাস্থ্য-বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে একটা হিসাব তুলিয়া দিলেই পাঠকেরা কথাটা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমে আমরা জন্মের হিসাব লইব। আলোচনার সুবিধার্থ আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্মের হার তুলিয়া দিব। তাহা হইলে, শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর সম্বন্ধে ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্যে কোন প্রদেশের আসন কোথায় আসিয়া পড়ে, পাঠকেরা তাহা সহজে নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১৯১১ অব্দে ভারতে যে লোকগণনা হইয়াছিল, সেই হিসাবে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লোক সংখ্যা যেরূপ, তদনুসারে প্রতি হাজার লোকে,—

মধ্যপ্রদেশে	৪৮টি
যুক্তপ্রদেশে	৪৬ ,,
পাঞ্জাবে	৪৫ ,,
বিহার ও উড়িষ্যায়	৪০ ,,
ব্রহ্মদেশে	৩৬ ,,
বঙ্গদেশে	৩৬ ,,
বোম্বাইএ	৩৬ ,,
মান্দ্রাজে	৩২ ,,
আসামে	৩১ ,,

এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে গড়ে ৩৯টি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং এই হিসাব হইতে দেখা যায়, জন্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশ, বোম্বাই এবং ব্রহ্মদেশের অবস্থা সমান; এবং তাহারা পঞ্চম স্থান অধিকার করিতেছে। ইহার সহিত আমাদের রাজার দেশের অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডমের জন্মের হার হাজার করা কিরূপ তাহাও দেখুন:—স্কটলণ্ড ২০·১; আয়র্লণ্ড ১৯·৯; ইংলণ্ড ১৯·৮ এবং সমগ্র ইউনাইটেড কিংডমে জন্মের হার গড়ে হাজার করা ১৯·৯। এইবার মোট জন্মের সংখ্যা দিতেছি,—(১) যুক্তপ্রদেশ ২১৫৭৬৪২; (২) বঙ্গদেশ ১৬২৭৮৭৩; (৩) বিহার ও উড়িষ্যা ১৩৯৫১৫৭; (৪) মান্দ্রাজ ১২৯৫০৭৮; (৫) পাঞ্জাব ৮৭৬৭৩৩; (৬)

বোম্বাই ৬৯৯৮৩২ ; (৭) সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস ও বেরার ৬৬৯৮৪২ ; (৮ ব্রহ্মদেশ ৩৫৬১৩৬ ; (৯) আসাম ১৮৯-৭৪১ এবং সমগ্র বৃটিশ ভারতে ৯৩৯৭৯৩৪৯। আর ইংলণ্ড ও ওয়েলস ৬৬৮৬৪০ ; স্কটলণ্ড ৯৭৪৮২ ; আয়র্লণ্ড ৮৬৪০৫ এবং সমগ্র ইউনাইটেড কিংডমে ৮৫২২২৭।

জন্মের কথা হইল। এইবার মৃত্যুর কথা আসিতেছে। লোক সংখ্যার অনুপাতে প্রাদেশিক মৃত্যু-সংখ্যা হাজার করা এইরূপ :—বোম্বাই ৪১ ; যুক্ত প্রদেশ ৩৮ ; পাঞ্জাব ৩৮ ; মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৩৬ ; বিহার ও উড়িষ্যা ৩৫ ; আসাম ২৭ , মান্দ্রাজ ২৮ ; বঙ্গদেশ ২৬ ; ব্রহ্মদেশ ২৫ ; এবং সমগ্র বৃটিশ ভারত ৩৩। আর ঐ সকল প্রদেশের মোট মৃত্যুসংখ্যা—যুক্ত প্রদেশ ১৭৭৪৮৯৬ ; বিহার ও ও উড়িষ্যা ১২১৪৫৫১ ; বঙ্গদেশ ১১৮৭৫০৯ ; মান্দ্রাজ ১০৪৯৫৪৫ ; বোম্বাই ৭৯৮৪০৬ ; পাঞ্জাব ৭৩৩১০৯ ; মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৫০১৮৩৪ ; ব্রহ্মদেশ ২৪৮৬০১ ; আসাম ১৬৩৯২৫ ; সমগ্র বৃটিশ ভারত ৭৮০৩৮৩২। এই সঙ্গে ইউনাইটেড কিংডমের হিসাবটাও লউন—আয়র্লণ্ডে হাজার করা মৃত্যুসংখ্যা ১৭ ; ইংলণ্ড ১৫ ; স্কটলণ্ড ১৪ এবং ইউনাইটেড কিংডম গড়ে ১৫। আর এই সকল দেশে মোট মৃত্যু সংখ্যা ইংলণ্ড ও ওয়েলস ৪৯৮৯৫৫ ; আয়র্লণ্ড ৭২৭৭০ ; স্কটলণ্ড ৬৯৪৮১ ও ইউনাইটেড কিংডম মোট ৬৪১২০৬।

এইবার কেবল শিশু মৃত্যুর সংবাদ লইব। লোকসংখ্যা অনুপাতে হাজার-করা—পাঞ্জাবে ২৪৬টি, মধ্যপ্রদে ও বেরারে ২২৭টি, বোম্বাই প্রদেশে ২১৭টি, যুক্তপ্রদে ২১৬টি, বর্ম্মায় ২১৩টি, মান্দ্রাজে ১৯৪টি, আসামে ১৮৯ বাঙ্গালায় ১৮৩টি, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৮০টি এবং ম বৃটিশ ভারতে গড়ে হাজার করা ২০৬টি শিশুর হইয়াছে। এবং মোট যুক্ত প্রদেশে ৪৬৫৪৬৭, বাঙ্গা ৩০০৫১৪, বিহার ও উড়িষ্যায় ২৫১৭৩৯, মান্দ্রা ২৫১১৯৪, পাঞ্জাবে ২১৭৩৮৫ ; মধ্য প্রদেশ ও বেরা ১৫১৯৫৬, বোম্বায়ে ১৫১৬৩৩, বর্ম্মায় ৭৫৯০৭ ও আসা ৩৫৯১৪টি এবং সমগ্র বৃটিশ ভারতে ১৯২৯৪৯১টি শি মারা গিয়াছে। ইউনাইটেড কিংডমে লোকসংখ্যা অনুপাতে হাজার করা স্কটলণ্ডে ৯৭, ইংলণ্ডে ৯ আয়র্লণ্ডে ৮৩টি শিশু মরিয়াছে। আর স ইউনাইটেড কিংডমে প্রতি ১০০০ লোকে গড়ে ৯ শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। বিলাতে মোট শিশু-মৃত্যুর সং পাওয়া যায় নাই।

১৯১৭ অব্দে বঙ্গদেশে এক বৎসরের কম ব ১৬২২১৫টি পুরুষজাতীয় ও ১৩৮২৯৯৪টি স্ত্রীজাতী শিশুর এবং এক বৎসরের অধিক কিন্তু পাঁচ বৎসর অনধিক বয়স্ক যথাক্রমে ৮২৪৮২ ও ৭৯৩০১টি শি মৃত্যু হইয়াছে। ঐরূপ অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যা—

প্রদেশ	১ বৎসরের কম		১ বৎসর হইতে ৫ বৎ	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
মান্দ্রাজ	১৩৩৮৩৫	১১৭৩৫৯	৭৭০২৬	৭৭৪৬২
বোম্বাই	৭৯৯৮৪	৭১৬৪৯	৬৭০২৯	৬৭৫৮৯
যুক্তপ্রদেশ	২৪৭১০৪	২১৮৩৬৩	১৮২৩০০	১৭৯৪৮৬
বিহার ও উড়িষ্যা	১৩৩১১৯	১১৮৬২০	১০৬৬৩৩	১০৬৩২১
পাঞ্জাব	১১৩৬	১০৩৭৮২	৮৫২৭০	৮৬৩৭০
দিল্লী	২৬০৭	২৩৩৬	১২৭১	১৪১৫
ব্রহ্মদেশ	৪১৩৩৫	৩৪৫৭২	১৪৬৯৯	১৪৪১৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৮২৩৮৫	৬৯৫৭১	৪৫৪৫৩	৪৩০৭৩
আসাম	১৯৪৩০	১৬৪৮৪	১২৪১৮	১১৯০২
পশ্চিমোত্তর সীমান্তপ্রদেশ	৭০৭১	৫৬৬৩	৫৩৯৫	৫২২৪
আজমীর-মারওয়াড়	৪৩৯৮	৪৩৯৬	৫৯৮৭	৬৪০০
কুর্গ	৬৯৯	৬১২	২৬৭	২৬১
সমগ্র বৃটিশ ভারত	১০২৭৭৮৫০	৯০১৭০৬	৬৮৬২৪০	৬৭৯২২৩

ভারতের বাহিরের অপর কোন দেশের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন বিবরণ এখন হাতের কাছে নাই, সেজন্য তুলনায় সমালোচনা করিবার কোন সুবিধা নাই। আর সকল সময়ে এরূপ তুলনায় সমালোচনা সমীচীনও নহে ;—অবস্থাগত প্রতিবেশ-প্রভাবের কতকটা অন্ততঃ সাদৃশ্য না থাকিলে তুলনায় সমালোচনা করা চলে না। ভারতের বাহিরের মধ্যে আমাদের রাজার জাতির দেশ—ইউনাইটেড কিংডমের সামান্য একটুখানি যে হিসাব পাইয়াছি, তাহাই আমাদের সম্বল। তুলনায় সমালোচনা এক্ষেত্রেও ঠিক হইবে না। তবে অধুনা—আমাদের দেশের অধিকাংশ বিষয়ই আমাদের রাজার জাতির আদর্শে ও দৃষ্টান্তে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া একটু আধটুও যে চলে না, তাহাও নহে।

ইউনাইটেড কিংডমে শিশু-মৃত্যুর হার যেরূপ কম, জন্মের হারও সেই রকম কম। ইউনাইটেড কিংডমে শিশুর জন্মের হার যে কম, জীবনীশক্তির ক্ষীণতা তাহার কারণ নহে। ঐ দেশের অধিবাসীদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং জীবনযাপন প্রণালীর দরুণই সেখানে শিশুর জন্মের হার অল্প। ইংরেজরা আমাদের অপেক্ষা বেশী বয়সে বিবাহ করেন ; এক স্ত্রী থাকিতে সেখানে দারান্তর গ্রহণ আইনানুসারে নিষিদ্ধ ; বিবাহ করিয়া গৃহস্থালীর সংসার ধর্ম্ম করিতে অনেকেই ইচ্ছুক নহেন এইরূপ নানা কারণে সে দেশে অল্প সংখ্যক শিশু জন্ম-গ্রহণ করে। কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার যে কম, জন্ম সংখ্যার অল্পতা তাহার একটা পরোক্ষ কারণ হইলেও, লোক-সংখ্যার অনুপাতেও তাহা খুব কম। এই অবস্থা তত্রত্য উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিচায়ক। বৃটিশ ভারতে ও ইউনাইটেড কিংডমে লোকসংখ্যার অনুপাতে জন্মের হার হাজার-করা যথাক্রমে ৩৯ এবং ১৯·৯ এবং শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা যথাক্রমে হাজার-করা ২০৬ ও ৯১। এই উভয় দেশের মধ্যে তুলনা করা যতই অসঙ্গত হউক, উহাদের মধ্যে মৃত্যুর হারের পার্থক্য অত্যন্ত বেশী, এবং ভারতের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে এখনও যে বহু উন্নতি সাধনের অবকাশ রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ভারতে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য কতকটা আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের দরুণ ঘটিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তবে সংক্রামক ব্যাধি, জীবনীশক্তির ক্ষীণতা, শিশু এবং তাহার পিতামাতার জীবনধারণোপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাব প্রভৃতি কারণের সমবায়েই যে প্রধানতঃ বেশী পরিমাণে শিশুদিগের মৃত্যু হয়, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার শিশুদিগের অকাল মৃত্যুর জন্য যেটুকু দায়ী তাহার কারণ এই যে আমরা এখনও দু' নৌকায় পা দিয়া চলিতেছি। আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও জন্মগত সংস্কারের সহিত আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ঘোর বিরোধ। আমরা প্রথমটি ষোল-আনা বজায় রাখিতে পারিতেছি না এবং শেষোক্তটিও ষোল আনা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না ; অথচ, উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া একটা মধ্যপন্থা খাড়া করিতেও পারিতেছি না।

শিশু-মৃত্যুর এইরূপ আধিক্যের কথা ভাবিয়াই আমরা গত শ্রাবণ মাসের "স্বাস্থ্য-সমাচারে" জন্মের সংখ্যা সংযত করা আবশ্যক কি না, পাঠক পাঠিকাগণকে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহারা শিশুর জন্ম-মৃত্যুর হিসাব দেখিয়া, সে কথাটা আরও একবার ভাবিয়া দেখেন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ। যেখানে লোক-সংখ্যার প্রায় সিকি ভাগ শিশুই অকালে মরিয়া যাইতেছে, সেখানে বেশী পরিমাণে শিশুর জন্মগ্রহণেরই বা সার্থকতা বা প্রয়োজন কি ? বরং জন্ম-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, শিশুর জনকজননীর জীবনীশক্তি কতকটা রক্ষা পায়, এবং তাহা সমাজের লাভ।

বঙ্গে শিশু-মৃত্যুর কারণ।

(Modern Review অবলম্বনে)

লেখক—শ্রীমণীন্দ্র লাল বসু।

ভারতে প্রতিবৎসর যত শিশু জন্মে, তাহার ⅛ অংশ জন্মের প্রথম মাসে মরিয়া যায়।

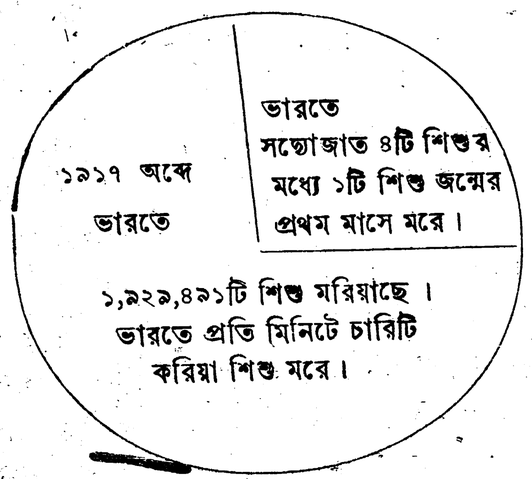

কলিকাতায় প্রতি বৎসর যত শিশু জন্মে, তাহার ⅓ অংশ জন্মের প্রথম মাসে মরে।

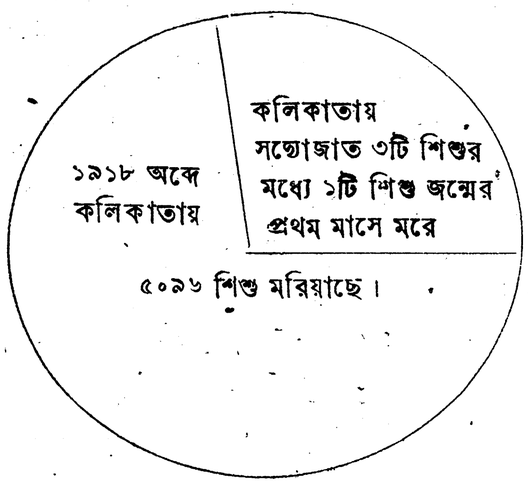

১৯১৭ অব্দে ভারতে যত শিশু মরিয়াছে, তাহা কলিকাতা ও সহরতলীর লোকসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

১৯১৮ অব্দে কলিকাতায় যত শিশু মরিয়াছে, তাহা প্রায় পার্কষ্ট্রীট ওয়ার্ডের জনসংখ্যার সমান।

এত শিশু মরে কেন?

মাতাপিতারা ভগ্নস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বা যক্ষ্মা, উপদংশ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত হইলে, শিশু অপূর্ণ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। দুর্ব্বল দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া শিশু শীঘ্রই রোগে পড়ে।

কলিকাতার স্বাস্থ্যপরিদর্শক ডাক্তার পিয়ার্স (Dr. Pearse) বলেন, ১৯০৯ অব্দে যে ২,৭০০ শিশু জন্মের প্রথম মাসে মরিয়াছে, তাহার মধ্যে ১,২০০ জন, অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক, অপূর্ণ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ, ক্ষীণজীবন।

গত বৎসর কলিকাতায় যে ১৭৯১ জন শিশু জন্মিয়া সাত দিনের বেশী বাঁচে নাই, তাহার মধ্যে

৫৪৫ জন অপূর্ণ অবস্থায় জাত;

৭৬৯ জন দুর্ব্বল অবস্থায় ভূমিষ্ঠ এবং

৩৯৫ জন ধাত্রীর দোষে মরিয়াছে।

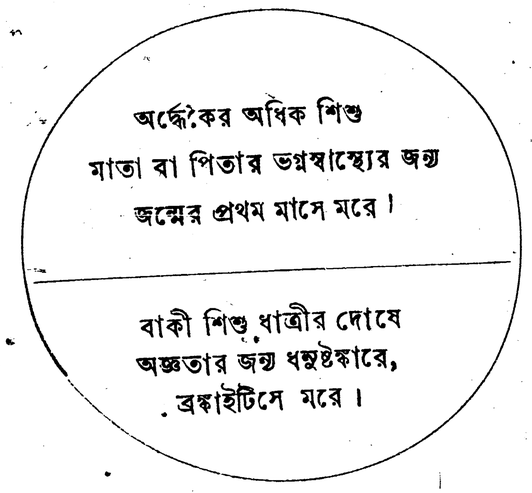

অপরিণত বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে, শিশুপালন সম্বন্ধে কিছু জানে না।

দেশ দরিদ্র, ভাবী মাতাপিতারা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, ম্যালেরিয়ায় ভোগে, নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

আমাদের দেশে অবরোধপ্রথা দূর হইল না; নগরবাসিনী নারীগণ নির্ম্মল বাতাস সেবন, বা কোন শারীরিক ব্যায়াম করেন না; কাজেই তাঁহারা শীঘ্রই অসুস্থ হন।

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবন জটিল, পঙ্কিলতাময় হইতেছে; সিফিলিস, গনোরিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি ব্যাধির বিস্তার হইতেছে; পুত্রেরা আপন আপন জীবন দিয়া পিতামাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

এই শিশুমেধ যজ্ঞে ১৯১৭ অব্দে বাংলায় ৩০০,৫১৪ জন শিশু বলি দেওয়া হইয়াছে; উহারা বাঁচিলে ৩০০ বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠিত হইতে পারিত।

শিশু জন্মিবার বহু পূর্ব্বে শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য মাতা ও পিতাকে সাবধান হইতে হইবে।

মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইবার বহু পূর্ব্বেই শিশু জন্মগ্রহণ করে। গর্ভের প্রথম মাস হইতেই শিশুর জন্ম হয়; মাতার রক্তে তাহার পুষ্টি, বৃদ্ধি হয়। গর্ভাবস্থায় মাতার যেরূপ স্বাস্থ্য থাকিবে, শিশুও সেইরূপ স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি লইয়া জন্মিবে।

গর্ভধারিণীর চাই —
- স্বাস্থ্য
- পুষ্টিকর খাদ্য
- প্রচুর বিশ্রাম
- নির্ম্মল বাতাস
- মনের শান্তি

সদ্যোজাত শিশুর বহু শত্রু। তাহারা ক্ষীণপ্রাণ, নতুন জগতে আসিয়াছে; আর জগতের লোকেরা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থাই করে। তাহারা বাঁচিতে চায়, হাসিতে চায়; কিন্তু মাতাপিতারা তাহাদিগকে বংশানুক্রমে ব্যাধিগ্রস্ত করে, অশিক্ষিতা ধাত্রী তাহাদের মারিবার উদ্যোগ করে।

অশিক্ষিতা ধাত্রীর অপরিষ্কার অস্ত্র ব্যবহারে ধনুষ্টঙ্কার হয়। মাতার দুগ্ধ না খাওয়াইয়া কৃত্রিম দুগ্ধ খাওয়াইলে পেটের অসুখ হইতে পারে।

ডাক্তার পিয়ার্স বলিতেছেন "Even a little ordinary cleanliness and a little common knowledge would reduce the death rate nearly one-half."

অর্থাৎ ধাত্রীরা একটু পরিষ্কার হইলে, শিশু সম্বন্ধে সাবধান হইলে ও শিশুপালন সম্বন্ধে তাহাদের সামান্য জ্ঞান থাকিলে, কলিকাতায় যত শিশু মরে তার অর্দ্ধেক বাঁচিতে পারিত। তিনি দেখাইয়াছেন, ১৯০৯ অব্দে কলিকাতার প্রায় ১,০০০ শিশু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য ধনুষ্টঙ্কার ও পেটের অসুখে মরিয়াছে। এই এক হাজার শিশুর মৃত্যু কেবল জ্ঞানাভাবে যত্ন না লওয়ার জন্য!

মাতার দুগ্ধই শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার।

কৃত্রিম দুগ্ধ খাওয়াইলে শিশু দুর্ব্বল অপূর্ণদেহ হইয়া গড়িয়া উঠে; তাহার পেটের অসুখ হয়।

একটি শিশুর মাতা শিশু প্রসব করিবার পর কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে শিশুকে আপন স্তন্য দিতে পারিল না; কৃত্রিম দুগ্ধ খাইয়া শিশু খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল, ক্ষীণপ্রাণ হইতে লাগিল।

১৩ই শ্রাবণ

বয়স চার মাস ওজন দুই সের

ডাক্তার বলিলেন, কৃত্রিম দুগ্ধ বন্ধ করিতে হইবে। অবশেষে এক ধাত্রী আপনার স্তন্যদানে ছেলেকে বাঁচাইল।

সেই ছেলে ২০শে পৌষ ওজন ৭সের

মায়ের দুধ খাইলে
- সহজে হজম হয়;
- জীবাণু থাকিতে পারে না;
- পেটের অসুখ হয় না;
- হাড় ও মাংস গড়িয়া ওঠে।

কেন ব্রঙ্কাইটিস হয়?

অযত্নের ঠাণ্ডা লাগিয়া বহু শিশু মরে। গত বৎসর ছয় হইতে বার মাস বয়সের শিশুদের গড়ে প্রতি মাসে ২০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তার মধ্যে ৯০ জন ব্রঙ্কাইটিসে মারা গিয়াছে। হঠাৎ জোলো হাওয়া লাগানো, খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করানো অথবা দরিদ্রতা, বা অজ্ঞতা হেতু শীতের দিনে গরম কাপড় জামা পরাইতে না পারায় শিশুদের সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস হয়।

অনেক সময়ে শিশুর পিতা, মাতা বা ভাই-বোনেরা শিশুর অসুখের কারণ।

মাতার সর্দ্দি বা কাশি হইলে শিশুর সর্দ্দি, কাশি হইবার সম্ভাবনা; কারণ, মাতার স্তন্য, মাতার রক্তই শিশুর আহার।

কখনও কাহাকেও ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া শিশুকে চুমা খাইতে দিবে না; রোগের জীবাণু শিশুর নাকে বা মুখে যাইতে পারে।

সর্দ্দি ছোঁয়াচে রোগ। সর্দ্দিওয়ালা লোক শিশুর নিকট যাইলে তাহারও সর্দ্দি লাগিবার সম্ভাবনা।

জনতার মাঝে, ধূলি বা ধোঁওয়া-ভরা ঘরে শিশুকে লইয়া যাইবে না।

শিশুকে নির্ম্মল বাতাস সেবন করিতে দাও।

মাতাপিতার পাপের ফলে, দেশজোড়া দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা, ম্যালেরিয়া ও কুসংস্কারের ফলে প্রতি দিন শত শত শিশু-বলি চলিতেছে। এই শিশুমেধ যজ্ঞ কি ভয়ানক!

প্রতি বৎসর যত লোক মরে, তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫ জন শিশু।

দেশ	শতকরা কত জন
উড়িষ্যা	২৬
দক্ষিণ বঙ্গ	২২
উত্তর বঙ্গ	২১
পূর্ব্ব বঙ্গ	১৮
ছোটনাগপুর	১৭
কলিকাতা	৩১

গত বৎসর কলিকাতায় যত সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার প্রতি হাজারের মধ্যে ২৮০ জন জন্মের কয়েকদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

জোড়াবাগানে	হাজার করা	৫৮১
বড় বাজারে	”	৪৭৬
বহুবাজারে	”	৪০৮
খিদিরপুরে	”	৩৫১
মুচিপাড়ায়	”	৩৪৫

শিশু মারা গিয়াছে।

পৃথিবীর সকল নগরের মধ্যে কলিকাতার শিশু মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহার কারণ কলিকাতার বস্তি। কলিকাতার বস্তিগুলিতে হাজার-করা ৬২৫ শিশু মরিয়াছে। ১৯১১ অব্দে কলিকাতা সহরে যক্ষ্মা রোগে ২০৬০ জন মরিয়াছে। লণ্ডনে সকল প্রকার রোগ হইয়া হাজার-করা ১৫ জন মরে; আর কলিকাতায় মরে ৩ জন। কলিকাতার বস্তিগুলি ভাঙ্গিয়া কুলী, মজুর, গরীব লোকদের জন্য নতুন করিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন তৈরী না করিলে এ মরণের সহিত লড়াইয়ে মানুষ

হার হইবে। বড়বাজারে মাড়োয়ারীদের লক্ষ লক্ষ টাকা জমা হইতেছে। সেই লক্ষপতিদের বস্তিতেই যক্ষ্মায় মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার জগতের সকল স্থান অপেক্ষা অধিক। বড়বাজারে ২৫,০০০ একার জমি আছে—যেখানে কোন গাড়ীঘোড়ার রাস্তা নেই। সেখানে বাড়ীর গায়ে কেবল বাড়ী উঠিয়াছে।

বস্তির ঘরগুলি যে কিরূপ ছোট ও তাহাতে এক এক ঘরে যে কতগুলি করিয়া লোক থাকে, সাধারণের সে ধারণা নেই। এক বস্তিপাড়ায় দেখিয়াছি কোন ঘর লম্বায় ৮ ফিট, প্রস্থে ৬ ফিট ও উচ্চ ৫ ফিটের বেশী নয়। এই রকম এক এক ঘরে অন্ততঃ ৪।৫ জনের কম লোক থাকে না। এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী ও তিনটি অল্পবয়স্ক পুত্র আর একটি সদ্যজাত শিশু। সে ঘর যে কি অন্ধকার, সেঁৎসেঁতে, দুর্গন্ধময় তা বলা যায় না; দুপুর বেলাও ঘরের কোণে অন্ধকার জমিয়া থাকে। সেইখানে যে নর-নারায়ণের জন্ম হয়েছে, যে দেবতা শিশুবেশে আসিয়াছে, তাহাকে আমরা উপেক্ষা করিয়া, ঘৃণা করিয়া, বদ্ধ কারাগারে রাখিয়া মারিয়া ফেলিতেছি। কৃষ্ণ যেমন কংসের কারাগারে জন্মিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগের কুলী মজুরদের ছেলেরা সেইরূপ মানবসভ্যতার এই বস্তি-গারদখানায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। কে বসুদেব আছে, তাহাদের উদ্ধার করিবেন?

শিশু মাতৃগর্ভ হইতে পৃথিবীতে জন্মিয়াই কাঁদে। সেই কান্নাই তাহাদের ব্যথার ভাষা। এই অপরিচিত জগতে ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্রকায় নবীন অতিথিরা সূর্য্যের আলোকে প্রথম চোখ মেলিয়া কাঁদিয়া ওঠে। তাহারা কি বুঝিতে পারে, জগৎ কি নির্ম্মম, কি নিষ্ঠুর, শিশুজীবনের প্রতি তাহার দয়া নাই। কিরূপে শিশুপালন হইবে তাহা জগতের লোক ভাবিতেছে না। প্রতি দিন শত শত শিশু-বলি চলিতেছে। সদ্যজাত শিশু কাঁদিয়া কি বলে? কাঁদিয়া বলে, আমায় বাঁচিতে দাও,—তোমরা আমায় মারিয়া ফেলিও না। আমায় যত্ন কর, সেবা কর, উপযুক্ত রূপে পালন কর। আমাদের দেশে ৯৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে মোটে ১ জন লিখিতে পড়িতে পারে; শিশুদের জননীরা শিশু-স্বাস্থ্য কিছুই পড়েন না বা ভাবেন না। তাই শিশুদের এ কান্না।

শিশুশিক্ষা।

মাতা যখন আদর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন, তখন যদি কেহ তাঁহাকে বলিয়া দেয় যে, এই বিদ্যালাভের অতি উৎসাহে শিশুর অমঙ্গল হইবে, তাহা হইলে তিনি কখনই কোলের ছেলেকে কোলছাড়া করিতে চাহিবেন না। চিরকাল কোলে করিয়া রাখাও যে কল্যাণকর নহে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। জ্ঞানলাভের চেষ্টা যে মনের, মস্তিষ্কের ও শরীরের পক্ষে হিতকর এ কথাও সত্য। কিন্তু শিশুকে যে ভাবে বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে; তাহা ঐ শিশুর উপযোগী কি না এবং তথায় সে যে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, তাহা আসল শিক্ষা কি না, এ সকল বিষয়ে একটুও না ভাবিয়া, ছেলেকে বিদ্বান করার ঝোঁকে বা পাশ করানর উৎসাহে, দূরে ঠেলিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না, বাঙ্গলার জনক ও জননীদের এ কথা একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মাতা নিজের হাতে রন্ধন করিয়া সামনে বসিয়া শিশুকে হাতে করিয়া খাওয়াইলে তবে তৃপ্তি লাভ করেন। অপরকে তিনি খাওয়ানর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, মনের জন্য তেমনি জ্ঞানলাভের প্রয়োজন আছে। নিজের হাতে এ বস্তু পরিবেশন করা সম্ভব নহে, এই বিবেচনায়, ও সকলেই ছেলেকে স্কুলে পাঠায় এই দৃষ্টান্তে,

জননীগণ হাতে খড়ি দিয়াই ছেলেকে স্কুলে পাঠাইয়া দেন। সেখানে যে ভাবে বিদ্যার পরিবেশন হইয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের ঘরের জননীদের এখনও তেমন হয় নাই। পিতাও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী নহেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিচার করিতে সক্ষম হওয়া দূরে থাকুক, গৃহে যতটুকু মানুষ করিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার তাহাও আমাদের অনেকের ঘরেই নাই। শরীরটি মানুষের মত করিতে গেলে যেটুকু চিন্তা চাই, তাহাও যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে মনের খবর লওয়া কত দূরের কথা। কিন্তু শরীরকে যখন মন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আলাদা ভাবে দেখা চলে না, তখন শরীর রক্ষা ও পোষণের সঙ্গে যে সকল বিষয়ের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিলেও আমাদের অনেকটা কাজ হইবে। ছেলের অকল্যাণ যখন মা কিছুতেই চান না, তখন যাহা কিছু অমঙ্গল আছে তাহা যাহাতে দূর হয় তাহার চেষ্টা করা দরকার। সেইজন্য শিশুদের শিক্ষার দিক দিয়া কয়েকটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাভারতে পড়িয়াছি, অভিমন্যু যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার মা সুভদ্রা চক্রব্যূহে প্রবেশ করিবার ও তাহা হইতে বহির্গত হওয়ার কৌশলের কথা শুনিতে-ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া সুভদ্রা ঘুমাইয়া পড়িলেন। পুত্র বড় হইয়া যুদ্ধে গেলেন। সপ্তরথী কর্ত্তৃক বেষ্টিত চক্রব্যূহে প্রবেশের কোনই অসুবিধা হইল না। কিন্তু বাহির হইবার কৌশল জানা না থাকায়, বাহির হইতে পারিলেন না। বাহির হওয়ার কথা যে সময়ে হয়, সে সময়ে মাতা সজাগ ছিলেন না, তাই পুত্রও বহির্গত হওয়ার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

মাতার জীবনের উপর, মাতার চিন্তার ও দেহের অবস্থার উপর, মাতার শরীর-চেষ্টার উপর সন্তানের ভবিষ্যৎ কতখানি নির্ভর করে, এই গল্প হইতে আমরা সেই শিক্ষা পাই। মাতার দেহ দুর্ব্বলও রুগ্ন থাকিলে সন্তানেরও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা। তাই শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, গর্ভবতী সদা প্রফুল্ল থাকিবেন, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিবেন, দেবতার ধ্যান করিবেন, এবং সংযতভাবে জীবন যাপন করিবেন। গর্ভধারিণীর পুষ্টির অভাবে সন্তানের শরীর রুগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। গর্ভধারিণীর মনের গঠন অনুযায়ী সন্তানের মনের গতি অনেকাংশে নিয়মিত হইবে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, মা যখন সন্তানকে দুগ্ধ পান করান এমন কি স্তন্যদান করার সঙ্গে সঙ্গে, সেই দুগ্ধের মধ্য দিয়া শিক্ষা ও দীক্ষা দান করেন। মাতা সন্তানকে প্রফুল্লমনে শান্তচিত্তে স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে দুধ পান করাইবেন। বিরক্ত মনে, অস্থির চিত্ত লইয়া অথবা ক্রোধ বা অপর কোন মানসিক উদ্বেগ লইয়া দুধ দিবেন না। ইহাতে যে শুধু শিশুর দেহের ক্ষতি হয় তাহা নহে; মনের গঠনও খারাপ হইয়া যায়। পোয়াতীর অসুখ হইলে চিকিৎসক সন্তানকে মাতার স্তন্য দিতে বারণ করেন। ভয়প্রাপ্ত বা ক্রুদ্ধ অবস্থায় স্তন্যদান করিয়া কত জননী অকালে সন্তানকে যমের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন তাহার অনেক বিবরণ পাঠ করা যায়। এ সকল তবু চক্ষে দেখা যায়। কিন্তু চক্ষে দেখিতে না পাইলেও মাতার বুকে ও কোলে থাকিবার কালেই যে শিশুর মানুষ হওয়া আরম্ভ হইয়া যায়, শিক্ষালাভও সুরু হইয়া যায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীন দেশের মায়েরা ছেলে কাঁদিলেও ছেলেকে কোলে করেন না বা দুধ দেন না—ইহাতে নিতান্ত কচি শিশুও এই ভাবে কান্না নিষ্ফল বুঝিয়া সাবধান হয়। অজ্ঞাতসারে আমাদের দেশের ছেলেরা যে 'কাঁদুনে" ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, ইহার গোড়া আঁতুড় ঘরে।

ছেলেবেলায় চণ্ডালবাড়ীর ময়না ও ভদ্র ব্রাহ্মণের পোষা পাখীর গল্প শুনিয়াছি—চণ্ডালের ময়না অশ্রাব্য বুলি শিখিয়াছিল, আর ভদ্রলোকের বাড়ীর পাখী ঠাকুরদের নাম আওড়াইত। কোন পাখীকেই শিখাইতে হয় নাই আপনিই শিখিয়াছে—যে সৎসংসর্গে থাকে সে সৎশিক্ষা পায়, যে কুসঙ্গে থাকে সে কু-শিক্ষা লয়। পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের মন্দ গুণ ও অভ্যাসগুলি অজ্ঞাতসারে শিশুদের আয়ত্ত হইয়া যায়

এমন মানুষ অতি অল্পসংখ্যক জন্মায় যাহারা এ সকল দোষ কাটাইয়া ভাল হইতে পারে। আমরা মনে করি শিশু কিছু বুঝে না। কিন্তু বাড়ীর লোকের প্রত্যেক দোষ মন্দচিন্তা, হিংসা আদি মনের ভাব ভিতরে ভিতরে শিশুর অকল্যাণ করিতে থাকে। শিশুর ভালবাসা বুঝিতে পারার ক্ষমতা ও মন্দ লোকের কাছে না যাইতে চাওয়া অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যে বাড়ীতে শিশু আছে সে বাড়ীতে "গোপাল" স্বয়ং আছেন জানিয়া গৃহস্থের সতর্ক হওয়া উচিত। সৎ চিন্তা, সৎপ্রসঙ্গ গোপালের ধূপধুনা—পবিত্র ও পুষ্টিকর আহার্য্য তাহার নৈবেদ্য। ভোগের সময়ের ব্যতিক্রম হইবে না—অপবিত্র দ্রব্য—বিরক্তির সহিত অপবিত্র ভাবে কোন জিনিস তাহাকে দেওয়া যাইবে না। এই শিশুর শিক্ষার ভার কাহার হাতে আমরা দিতে পারি? শিক্ষা তো সহজ কথা নয়! কোলের কচি ছেলেও যখন ক্ষুধিত থাকে না বা খাইতে চায় না তখন জোর করিয়া খাওয়ান'র ফল যেমন ভাল হয় না—যাহা শিশুর পক্ষে অহিতকর সহজে হজম হয় না বা পরিণামে অনিষ্ট উৎপাদন করে তাহা শিশুকে দিলে যেমন ক্ষতি হয়—জোর জুলুম করিয়া বিদ্যা-দানের চেষ্টায় ও শিক্ষাপ্রণালীর দোষে আমাদের গৃহের শিশুদের তেমনি অনিষ্ট হইতেছে। জ্ঞান লাভের জন্য একটা সহজ উৎসাহ সকলেরই আছে। সেই জ্ঞানের ক্ষুধা, সেই জানিবার, শুনিবার দেখিবার স্বাভাবিক ইচ্ছার সঙ্গে যোগ রাখিয়া এবং শরীরের কোন ক্ষতি না হয় এমন ভাবে সাবধানে যদি শিক্ষাদান করা হয়, তবেই দেশের কল্যাণ। নতুবা অল্পায়ু, ক্ষীণজীবী, অকর্ম্মণ্য জীর্ণ কঙ্কালে হয় ত বাঙ্গালা দেশ ভরিয়া যাইবে। তাহার পর আর এ জাতিকে হয় ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা।

লেখক—শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ।

দেহের সুস্থ ও সবল অবস্থাকে আমরা সাধারণতঃ স্বাস্থ্য বলিয়া থাকি। এই স্বাস্থ্য আমাদের শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়ার সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু শরীরের কোন যন্ত্রের কিছু বৈকল্য হইলেই, অন্যান্য যন্ত্রগুলির ও ক্রিয়ার সমন্বয় থাকে না এবং তাহাদের ক্রিয়া সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না। এই স্বাস্থ্যের উপরই প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে; কারণ ইহার অভাবে কোন কিছুই সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। জাতির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উপর জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। সেই জন্য স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সকলেরই সচেষ্ট থাকা উচিত।

সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে, আমাদের দৈনিক কার্য্য এবং শরীরের সেবা কিরূপে করা উচিত, তাহা মোটামুটী ভাবে এই আনুক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলিবার ইচ্ছা আছে। যদিও এই কার্য্যের খুটিনাটি লইয়া অনেকের মতের গোলমাল আছে; তবুও, কিন্তু, সাধারণ নিয়মাবলী সকলের একই।

স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে আমরা কি করিব, এই কথা মনে হইলেই প্রথমেই আমাদের ধারণা হয় যে, মানুষ সৃষ্ট জীবের (animal) সর্ব্বোচ্চ একটি শ্রেণী মাত্র; এবং সেই মানুষ অতি আদিকালে সুন্দর ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিত। দ্বিতীয়তঃ, সেই আদি মানুষের উপর জাতীয় সভ্যতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environments) এবং রিপুগুলি কি রকম আধিপত্য বিস্তার করিয়া, মানুষকে আধুনিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহা হইলেই, আমাদের নির্ণয় করিতে হইবে যে, প্রকৃতি-দত্ত স্বাস্থ্য (Physiological or animal efficiency) নষ্ট না করিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমরা আমাদের দৈনিক জীবন কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি।

আদিকালে মানুষ সম্পূর্ণ উলঙ্গ না থাকিলেও, অতি অল্প বসন ব্যবহার করিত; মুক্ত আকাশের নীচে জীবন-যাপন করিত; মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজে নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিত। কিন্তু সে তাহা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিয়া সমস্ত জিনিষটাকেই একে-বারেই পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। সে এখন সমস্ত শরীরকে পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া রাখে, মুক্ত আকাশের তলে বিচরণ না করিয়া বদ্ধ ঘরের ভিতর বাস করে,

নিজের আহার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সংগ্রহ না করিয়া মস্তিষ্কের প্রভাবে আহরণ করে। এখন মানুষ আর সেরূপ নীরোগ নয়, সর্ব্বদাই ব্যাধি পীড়ায় কাতর প্রকৃতির দত্ত অভ্যাসের পরিবর্ত্তনই মানবের সাধারণ স্বাস্থ্য-হীনতার কারণ।

মানুষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, পরিশ্রম করিয়া কালাতিপাত করিবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি; কেবল মানসিক পরিশ্রম নয়, তৎসঙ্গে যথোচিত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে। লৌহ নির্ম্মিত কোন জিনিষ যেমন রীতিমত ব্যবহার না করিয়া অযত্নে ফেলিয়া রাখিলে, মরিচা ধরিয়া কিছুদিন পরে ব্যবহারের অনুপযোগী বা সম্পূর্ণরূপ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মানসিক প্রবৃত্তিগুলির সদ্ব্যবহার ও উপযুক্ত অনুশীলন না করিলে, সেগুলি ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য ও ধ্বংসোন্মুখ হইতে থাকে। প্রত্যেক জীবেরই জন্ম হইতে একটা কার্য্যকরী শক্তি (inherent energy) আছে, সেটা কখন চুপ করিয়া বসিয়া সুস্থ থাকিতে পারে না; সে সর্ব্বদা একটা কাজ চায়। তাহাকে সুপথে চালনা করিলে সে সেই দিকে যাইবে; নচেৎ কুপথে যাইবে অথবা অব্যবহারের জন্য ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সেই জন্য প্রত্যেকের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির (Organs) এবং সদ্বৃত্তিগুলির যথাসাধ্য উৎকর্ষ্য সাধন করা উচিত।

স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ হইতে হইলে ব্যায়াম করিতে হয়। তাহা না করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ক্রমশঃ নষ্ট ও সমন্বয়হীন হইতে থাকে। ফলে, প্রয়োজনের সময়ে সেই ইন্দ্রিয়ের কাজ ভাল পাই না। প্রত্যেকেই জানেন যে, জীবের পক্ষে অম্লজান (Oxygen) কত প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী জিনিস। ইহা ব্যতীত তাহারা জীবনধারণ করিতে পারে না। ব্যায়াম করিলে দৈহিক উপাদানগুলির ভালরূপে শ্বাস ও প্রশ্বাস (tissue-respirat on) হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বিশ্রামের দিন হইতে পরিশ্রমের দিনে মানুষ ৭½ আউন্স বেশী অম্লজান গ্রহণ করে। সেই জন্যই ব্যায়াম-স্থান যত উন্মুক্ত হয় তত ভাল; কারণ তত বিশুদ্ধ অম্লজান আমরা পাইতে পারি। বদ্ধস্থানে ব্যায়াম করা শরীরের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর।

ব্যায়ামের অনেকগুলি উপকারিতা আছে। তাহার মধ্যে Albult নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ উপকারিতার উল্লেখ করেন।

১। ব্যায়াম দুর্ব্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সবল করে।

২। অঙ্গ বৈকল্য (deformities) শোধন করে।

৩। ফুসফুসের কোন রোগ হইলে, পরে তাহা আ... হইয়া গেলেও কিছু কালের জন্য ইহার কার্য্যকরী শক্তি কমিয়া যায়। ব্যায়ামের দ্বারা সেই শক্তি বৃ... করা যায়।

৪। দুর্ব্বলতা ও মেদরোগ দূর করে। শরীরকে সতেজ করে।

৫। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করে।

৬। মানসিক সদ্বৃত্তিগুলির বিকাশে সাহায্য করে। ব্যায়াম করিলে ফুসফুসের শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়। এই কার্য্যের যাহাতে কোন ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য যত কম বসন ও ভূষণ পরা যায়, তত ভাল; ও খালি গায়ে করিতে পারিলে সবচেয়ে ভাল। ফুসফুসের আভ্যন্তরিক রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি পায়। রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাইলেই অম্লজান গ্রহণ এবং অঙ্গারজান (Carbon dioxide) ত্যাগকার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তজ্জন্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে শরীরের মাংস ও পেশীগুলি যথেষ্ট তেজস্কর (Oxygenated) রক্ত পায় এবং পরিণামে তাহাদের উৎকর্ষ্যও বৃদ্ধি পায়। রক্ত চলাচলের বৃদ্ধি হেতু ত্বকের উন্নতি সাধন হয় এবং যথোপযুক্ত ঘর্ম্ম নিঃসরণ হও... লোমকূপগুলি পরিষ্কার থাকে। ঘর্ম্ম শুকাইয়া গেলে দেহ বেশী শীতল হইয়া পড়ে; তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিজনক। সেই জন্য যাহাতে শরীর গরম থাকে সেইরূপ পরিচ্ছদ ব্যায়ামের পরে পরিধান করা উচিত। ঘর্ম্মের সহিত অনেক প্রকার লবণাক্ত পদার্থ (Salts) বাহির হয়,—তাহা ত্বকের উপর শুকাইয়া লাগিয়া থাকে। সেইগুলি ধৌত করিবার জন্য ব্যায়ামের এক ঘণ্টা পরে জল দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে হয়। ব্যায়াম করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলে উপযুক্ত আহার পাইলে রক্তে পেশীর সংস্করণ ও গঠনের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। কো... বদ্ধতা বা হজমশক্তিহীনতা দূর হয়। এই সময় ফলে শরীরের স্বাস্থ্য ও কান্তি ফিরিয়া আসে। যাঁহারা স্বাস্থ্য ও কান্তি হারান নাই তাঁহাদের ঐগুলি বৃদ্ধি পায়।

তাই বলিয়া অত্যধিক পরিশ্রম করা উচিত নয়; তাহাতে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, শরীরের আরও ক্ষতি হয়।

স্বাস্থ্যসমাচার

“শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্”

৮ম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২৬ সাল | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

কাউণ্টেস অব ডফারিন ফাণ্ড—

ভারতীয় মহিলাদিগের জন্য নারী-চিকিৎসক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে একটী জাতীয় সভা আছে (National Association for the Provision of Female Medical Aid to the Women of India; ইহা সাধারণতঃ Countess of Dufferin's Fund নামে পরিচিত), সে দিন সিমলায় বড়লাটের প্রাসাদে ঐ সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লেডী চেমসফোর্ড সাহেবা এই সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সভায় অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এবং অনেক বে-সরকারী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। লেডী সাহেবা এই সভায় একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। যুদ্ধের গোলযোগে ১৯১৫ অব্দ হইতে এই সভার অধিবেশন প্রায় বন্ধ ছিল, এবং ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কাহারও তেমন অবসর ছিল না,—এই কথার উল্লেখ করিয়া বড়লাট মহিষী দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে সভার অন্তর্ভুক্ত সেণ্ট্রাল কমিটির কাজ ভালরূপই চলিয়াছিল। সভানেত্রী মহোদয়া এই কার্য্যের কিছু পরিচয় প্রদান করেন। এই সভার সাহায্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে একটী Women's Medical Service গঠিত হইয়াছে। মহিলা চিকিৎসকগণ যাহাতে উচ্চাঙ্গের চিকিৎসা কার্য্য চালাইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রণালীর বিজ্ঞানসম্মত হাঁসপাতাল স্থাপন এবং তদুপযোগী লোকজনকে শিক্ষা দান প্রভৃতি বিষয়ও সভা অবহিত আছেন। এই সার্ব্বিসের সংস্রবে দিল্লীতে যে Women's Medical College and School স্থাপিত হইয়াছে, সেই কলেজ ও স্কুলের জন্য উপযুক্ত অধ্যাপক ও ব্যাখ্যাতা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ বিশেষ প্রকার পীড়ার চিকিৎসায় স্ত্রীচিকিৎসকগণকে যেরূপ বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহারও যতদূর সাধ্য ভাল বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা, ও তত্ত্বানুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতাও অনুভূত হইতেছে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ব্বিস-ভুক্ত চিকিৎসকগণের এ দিকে যে সকল সুবিধা আছে, গবর্ণমেণ্ট অচিরে উইমেন্স মেডিক্যাল সার্ব্বিসের জন্যও তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন,—লেডী চেমসফোর্ড মহোদয়া এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দেশের অত্যন্ত প্রয়োজন বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট মহিলা চিকিৎসকগণকে স্বেচ্ছাব্রতী হইবার জন্য আহ্বান করেন। উক্ত সভা কয়েক দিনের মধ্যেই এই কার্য্যের জন্য চারিটী মহিলা চিকিৎসক গবর্ণমেণ্টকে প্রদান

করেন। এই সময় হইতে দুই বৎসর কাল এই চিকিৎসকগণ ভারতের নানা স্থানে সামরিক বিভাগের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। লেডী চেমসফোর্ড সাহেব এইরূপে কাউণ্টেস অব ডফারিন ফাণ্ডের নানা কার্য্যের পরিচয় দিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা গেল, সরকারের দিক হইতে এ বিষয়ে কোন ত্রুটিই হইতেছে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশে শিক্ষার রীতিমত বিস্তার না হওয়ায় দেশের কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, এই মহৎ অনুষ্ঠানের যথোচিত সহায়তা গ্রহণে অগ্রসর হয় না। গর্ভবতী, বিশেষতঃ আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত সময়ে লেডী ডফারিন হাসপাতালের সহায়তা গ্রহণ করিলে বোধ হয় শিশু মৃত্যুর হার অনেকটা কমিতে পারে। কিন্তু দেশে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার বিস্তার না ঘটিলে এ বিষয়ে কোন ফল ফলিবে বলিয়া বোধ হয় না।

বিহারের পল্লী-স্বাস্থ্য—

বিহার ও উড়িষ্যার স্যানিটারি কমিশনার মহাশয় তাঁহার রিপোর্টে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিহারে গ্রাম্য স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতেছে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। কয়েকটি কূপের সংস্কার এবং দুই চারিটি নূতন কূপ নির্ম্মাণ করা এবং কোন সংক্রামক রোগের প্রবল প্রাদুর্ভাব কালে দুই চারিজন ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার প্রেরণ করা ছাড়া, গ্রাম্য স্বাস্থ্য রক্ষা কল্পে আর কিছুই বড় একটা করা হয় না। স্যানিটারী কমিশনার মহাশয় এই হেতু প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মুজঃফরপুর জেলায় চারিশত বর্গ মাইল স্থানে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে কি করা যাইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে; এবং স্বাস্থ্যোন্নতি সাধিত হইলে গ্রামবাসীদিগের কি উপকার হইতে পারে, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে হইবে। জন কয়েক স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া একটী স্যানিটারী সার্ব্বিস গঠনেরও কল্পনা হইতেছে। পল্লী অঞ্চলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই সকল স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন, এবং সম্ভবপর হইলে রোগের সংক্রামকতা নিবারণের ব্যবস্থাও করিবেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাঙ্গলার পল্লীগ্রামগুলির অবস্থাও যে আশানুরূপ উন্নত এমন কথাও বলা যায় না। বরং বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী ও সুচিকিৎসকের অভাব নিবন্ধন সংবাদ পত্রে প্রায়ই অভিযোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গলার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয় এ দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

কলিকাতার চপ কাটলেটের দোকান—

কলিকাতায় এখন অসংখ্য চপ-কাটলেটের দোকান হইয়াছে। এত চপ কাটলেট কে খায়, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু দোকানগুলির অবস্থা দিন দিন উন্নতিই হইতে দেখা যায়। সুতরাং বিবেচনা হয় এই সকল দোকানে খরিদ্দারের অভাব হয় না। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মত এক একটা বড় রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলে, প্রায় প্রতি পদে এক একটা চপ কাটলেটের দোকান এইরূপে রাস্তার উভয় পার্শে যত দোকান আছে, তাহা গণিয়া উঠা কঠিন। প্রথমতঃ একটী ছোট ঘর ভাড়া করিয়া এক পয়সা বা দুই পয়সায় এক পিয়ালা চা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হয়; দুই চারি দিনের মধ্যেই সেই দোকানে চপ-কাটলেটের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ক্রমশঃ আশে পাশের আরও দুই চারিখানি ঘর লইয়া দোকানের আয়তন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা হয়। শুনিতে পাই, কলিকাতার স্কুল কলেজের ছেলেরাই এই সকল দোকানের প্রধান পৃষ্ঠ পোষক। এরূপ অবস্থায় এই সকল দোকানে যাহাতে ভাল খাবার রাখা হয়, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহার আবশ্যকতা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। সুখের বিষয়, কয়েক দিন হইল, কলিকাতা কর্পোরেশনের একটী বৈঠকে মিঃ এস, সি, ঘোষ এ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার এই

"ধরণের ইটিং হাউসের" সংখ্যা কত? স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয় এই সকল দোকান পরিদর্শন করেন কি না? সেখানে ভাল খাবার দাবার রাখা হয় কি না? ইত্যাদি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জবাব দেন যে, কলিকাতার লাইসেন্স-লওয়া ঐরূপ দোকানের সংখ্যা ৭৬৭। ফুড ইনস্পেক্টররা প্রায়ই এই সকল দোকানের খাদ্য পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার মহাশয়েরা স্বয়ং এই সকল ইনস্পেক্টরের কার্য্যের তদারক করেন। খোদ হেলথ অফিসার মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। চেয়ারম্যান মহাশয় আরও বলিয়াছেন, এই সকল দোকানের অবস্থা খারাপ নয়, বরং ভালই। কখনও কোথাও কোনরূপ ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করা হয়। এই সকল দোকানে যে ঘৃত ও তৈল ব্যবহৃত হয়, তাহা ঘন ঘন পরীক্ষা করা হয়। আমরা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মহাশয়ের কথায় আশ্বস্ত হইলাম। যেখানে আমাদের ছেলেপুলেরা সর্ব্বদা জল খাবার খাইতে যায়, সেখানকার খাবার যে খারাপ নয়, ইহা বাস্তবিকই আনন্দের কথা। এত দিন আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। বাড়ীতে চপ কাটলেট তৈয়ার করিতে গেলে যখন এক এক খানিতে চারি পয়সার বেশী খরচ পড়ে, তখন চপ কাটলেটের দোকানে ঘর ভাড়া, লোকজনের মাহিনা, দোকানদারের লাভ প্রভৃতি দিয়াও যখন এক এক খানি চপ কাটলেট চার পয়সায় বিক্রীত হইতে পারে, তখন উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন চেয়ারম্যান মহাশয়ের কথায় আমরা আশ্বস্ত হইলাম। এখন কেবল একটী প্রশ্নের মীমাংসা হইলেই হয়। চপ কাটলেটের দোকানে অপরাহ্ণ কালে খাদ্যাদি প্রস্তুত হয়, এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কেনা বেচা চলে। প্রত্যহ যে খাবার তৈয়ারী হয়, তাহা সব দিনই যে সমস্তই বিক্রীত হইয়া যায়, এমন মনে করা যায় না। অবিক্রীত চপ কাটলেটগুলি কি ফেলিয়া দেওয়া হয়, না, পরদিন এপিট ওপিট ভাজিয়া early customerদের গছানো হয়? মিঃ ঘোষ এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি কিম্বা অপর কোন কমিশনার এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে চেয়ারম্যান সাহেব কি জবাব দেন সেইটি শুনিবার জন্য আমাদের সাধ হইতেছে।

আই এম-এস—

সহযোগী পাইওনীয়ার প্রকাশ করিয়াছেন যে, যত দিন না প্রতিযোগী পরীক্ষা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়, ততদিন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে স্থায়ীভাবে লোক মনোনয়ন করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী Board of Selection গঠন করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডাইরেক্টার জেনারেল এই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। তিনি ছাড়া আর দুইজন সদস্য এই বোর্ডে থাকিবেন। পদপ্রার্থীগণকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে; (১) যাঁহারা ইংলণ্ডে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন; (২) যাঁহারা তাহা করেন নাই। প্রথম শ্রেণীর পদপ্রার্থীগণকে ইংলণ্ডের একটী Selection Board মনোনয়ন করিবেন; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর পদপ্রার্থীদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া মনোনীত ব্যক্তিগণের নাম ভারতসচিবের নিকট প্রেরণ করা হইবে; তিনিই চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় ভারতীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ তাদৃশ প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া শুনা যাইতেছে।

সেকালের হাসপাতাল—

বিংশ শতাব্দীর প্রথম উনিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল। এখন ঘোর বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে। অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি বিধানেও বিজ্ঞানের কোনরূপ কৃপণতা দেখা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপ্রণালী ও রোগ নিবারণের ব্যবস্থা সভ্য জগতের গর্ব্বের বিষয়। কিন্তু একালে মনুষ্য সমাজে সহৃদয়তা বড় বেশী দেখা যায় না; কিন্তু সুদূর অতীত কালের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সেকালে চিকিৎসা-বিদ্যার উন্নতি

না হউক, রোগ নিবারণের ব্যবস্থা অবলম্বনে কোন ত্রুটি ছিল না। প্রাচীন কালের ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ কেবল যে জীবহিংসায় বিরত ছিলেন তাহা নহে; তাঁহারা মানুষের রোগশোকজনিত দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্যও সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। ভারতের বৌদ্ধ সম্রাটগণ তৎকালে রোগীগণের চিকিৎসার্থ বহুসংখ্যক হাঁসপাতাল স্থাপন করিতেন। কেবল মানুষের জন্য নহে,—পশু পক্ষীগণের জন্যও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইত। শ্যামদেশের বালক সহর হইতে প্রকাশিত একখানি চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রে সম্প্রতি এই বিষয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা জয়বর্ম্মনের আমলে তাঁহার সাম্রাজ্যে অসংখ্য হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দের একটী সংস্কৃত ভাষায় খোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে, সে সময়ে অন্ততঃ ১০২টা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল হাঁসপাতালের প্রয়োজনীয় ধান্য উৎপাদন কার্য্যে ৮১৬৪০টি নরনারী নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক হাসপাতালে ৩২ জন করিয়া বেতনভোগী ও ৬৪ জন করিয়া স্বেচ্ছাব্রতী কর্ম্মী নিযুক্ত থাকিত। প্রতি হাসপাতালে দু জন করিয়া চিকিৎসক থাকিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের একজন করিয়া ভৃত্য ও দুটী করিয়া দাসী থাকিত। ঔষধ বণ্টনের জন্য দুইজন ভাণ্ডারী, দুইজন সূপকার, এবং দুইটি করিয়া দাসী প্রত্যেক হাসপাতালেই নিযুক্ত থাকিত। চৌদ্দজন কম্পাউণ্ডার গোছের লোক রোগীদিগকে ঔষধ খাওয়াইত; ছয়টি রমণী জল গরম করিত ও ঔষধ বাটিত। দুইটী রমণী হাসপাতালের জন্য ধান ভানিয়া তাহা হইতে চাউল বাহির করিত। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, সেকালের জিনিসের নাম শুনিলেই নাক সিঁটকাইবার প্রয়োজন নাই।

জননীর প্রতি

পরমেশ্বর যে নারীকে সন্তান প্রসব করিবার শক্তি দিয়াছেন, তার সঙ্গে তিনি সন্তানদিগকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সুখী, সৎ করিয়া গড়িয়া তুলিবারও শক্তি নারীকে দিয়াছেন। ভাবী সন্তানের মাকে অনাগত শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিতে হইবে। গর্ভধারিণী নারী আপনার দেহের স্বাস্থ্য, অভ্যাস ও ব্যারামের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; তিনি সদা প্রফুল্ল থাকিবেন, অত্যধিক কাজ করিবেন না। শিশু প্রসূত হইলে মাতার দুগ্ধই তাহার আহার, এই প্রকৃতির ব্যবস্থা। কারণ মাতার দুগ্ধ সর্ব্বসময়েই তাজা, সর্ব্বসময়েই পরিষ্কার, সর্ব্বসময়েই গরম, জীবাণুহীন। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মাতার দুগ্ধই শিশু শীঘ্রই হজম করিতে পারে। দিনের বেলায় ঘড়ি খুলিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর শিশুকে দুধ খাওয়াইতে হইবে, রাত্রে খাওয়াইতে হইবে না। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে খাওয়াইলে শিশুর পাকস্থলী ঠিক খাইবার সময় দুধ হজম করিবার উপযোগী হইয়া উঠিবে। মায়ের দুধ যদি প্রচুর না পাওয়া যায় আর ডাক্তার যদি উপদেশ দেন, তবে গাভীর দুগ্ধ জল মিশাইয়া পাতলা করিয়া মায়ের দুধ খাইবার পরেই খাওয়াইতে হইবে। যদি দেখা যায় যে মাসে মাসে শিশুর যেমন বৃদ্ধি উচিত ছিল, ওজনে সেইরূপ বাড়িতেছে না, তবেই গাভীর দুধ খাওয়ান যাইতে পারে। যদি মায়ের দুধ একেবারে না পাওয়া যায়, ডাক্তারের উপদেশ লইয়া গাভীর দুধ জলে পাতলা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; তবে ধাত্রীমার দুধ দিলেই ভাল হয়। কখনও পেটেণ্ট খাবার বা বিলাতী যোতের দুধ দেওয়া উচিত নয়। সব জিনিষই গোড়ায় শক্ত হইলে, পরে দৃঢ় হইয়া বাড়িয়া উঠে ও স্থায়ী হয়।

শিশুকে সৎ অভ্যাস ও স্বাস্থ্যের নিয়ম গোড়া হইতেই শিখাইতে হইবে। ঘুমানো, খাওয়ানো, ব্যায়াম করানো, স্নান করানো, প্রতিদিন যেন ঠিক সময়ে হয়, এমন একটা নিয়ম থাকে। দিনে ও রাতে শিশুর সেবনের জন্য পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা বাতাস খুব দরকারী। শিশুর গায়ে যদি গরম কাপড় থাকে তবে ঠাণ্ডা বাতাসে কোন ক্ষতি হয় না। তবে বাতাস জোলো বা বৃষ্টির না হয়। শুইবার ঘর ও থাকবার ঘর যেন খোলা, আলোয় ভরা হইবে। তবে খুব হাওয়ার মুখ হইতে শিশুকে সরিয়ে রাখাই দরকার। রাতে শিশু তাহার নিজের এক ছোট বিছানায় শুইবে; তাহার মাথা যেন মাতার মুখ হইতে দূরে থাকে—মাতার নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন তাহার মুখে গিয়া না পড়ে; মাতার বা পিতার মুখ বা নাক হইতে রোগের বীজাণু শিশুর নিশ্বাসের হাওয়াতে যেন না ঢোকে। মনে রাখিতে হইবে, বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের চেয়ে শিশুর অধিক নির্ম্মল হাওয়ার দরকার। শিশুর জামা কাপড় হাল্কা হইবে, গরম হইবে, বেশ নরম হইবে। পৃথিবীর জীবনের প্রথম ছয় মাস শিশু প্রায় সর্ব্বক্ষণই ঘুমাইবে; ছয় মাস হইতে এক বছর বয়স পর্য্যন্ত তাহার সকালে দুই ঘণ্টা ও বিকালে দুই ঘণ্টা ঘুমানো চাই। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ এক ঘণ্টা চুপচাপ শুইয়া থাকিবে। যখন শিশু ঘুমাইবে, তখন তাহাকে যেন কোনরূপে বিরক্ত করা না হয়; শুধু খাবার সময় হইলে জাগাইতে পারা যায়। মাঝে মাঝে তাহাকে এক পাশ হইতে অপর পাশে ফিরাইয়া দিতে হইবে; সব সময়ে এক পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকা ভাল নয়। সর্ব্ব বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব আবশ্যক। শিশুর দেহ, তাহার কাপড় জামা, তাহার ঘর, তাহার দুধ বা দুধ খাওয়াইবার বাটী,—কোনও জিনিসে যেন ধূলা বা মাছি বা ময়লা পড়িতে না পারে। দুধ বা খাবার জিনিষ ঠাণ্ডা জায়গায় চাপা দিয়া রাখিতে হয়।

শিশুর দেহের নাড়াচাড়া দরকার, তাহার মাংসপেশীর চালনা চাই। মাতা শিশুর হাত দুইটি ও পা দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইবেন ও নামাইবেন। অন্ততঃ দিনের মধ্যে দুইবার শিশুর সব জামা খুলিয়া দিবেন, শিশু যাহাতে নগ্নদেহে হাত পা ছুড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া, হাসিয়া, চেঁচাইয়া, করতালি দিয়া দেহকে চালনা করিতে পারে যাহাতে সে হাত দিয়া জিনিস নানারূপে ধরিতে শেখে, দেখিতে, শুনিতে ও স্পর্শ করিতে উৎসুক হয়—এইরূপ খেলা তাহাদের দরকার। ধীরে ধীরে শিশু বসিতে, দাঁড়াইতে শিখিবে, ও আপনার ছোট কাজ আপনি করিবে—যেমন আন্‌লা হইতে জামা আনা, দুধের বাটী বাহিয়া নিয়ে আসা, ইত্যাদি। শিশুর মনন শক্তি খুব বেশী। যে কোন জিনিস পাইলে স্থির নয়নে তাকাইয়া থাকে, দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে—সে সময়ে তাহাকে চঞ্চল করা, বিরক্ত করা উচিত নয়। চুপ করিয়া অবাক হইয়া সে যখন দেখে তাহার ঘরের চারিদিকে কি ঘটিতেছে, তখন তাহার মনের গতিকে অন্য দিকে ফিরানো অনুচিত। শিশু মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ যেন বেশ টানিয়া টানিয়া খায়; তাহাতে মুখের মাংসপেশীগুলির নাড়াচাড়া হয়, মুখ শক্ত হয়। কাঁদিয়া শিশুরা মাতাদের নিকটে আপনার অস্বস্তি, অভাবের কথা বলে,—মাতারা প্রায়ই ভাবেন যে শিশু ক্ষিদেতে কাঁদিতেছে। যখন নিয়মিতরূপে খাওয়ান হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, ক্ষুধা শিশুর কান্নার কারণ নয়। কাঁদিলেই মাতারা প্রায়ই স্তনের দুধ দিয়া ভোলান; ইহা শিশুর স্বাস্থ্যের অত্যন্ত ক্ষতি করে। গরম হইলে, বা কোথাও বেদনা হইলে, ব্যথা পাইলে, ভয় পাইলে, ঈপ্সিত বস্তু না পাইলে শিশু কাঁদে। কান্না তাহাদের আব্‌দার, অভিযোগ ব্যথার ভাষা। সর্ব্ব সময়ে শিশুকে নিজের কাজ নিজে করিতে অভ্যাস করান উচিত, তাহাতে তাহারা আত্মনির্ভরশীল ও সংযমী হয়। বেশী আদর দেওয়া ঠিক নয়। ভালবাসিয়া উপদেশ দিয়া ও অনেক জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া শিশুকে সৎপথে লইয়া যাইতে পারা যায়। ছোট ছোট কাজ সুচারুরূপে, সহজভাবে, আনন্দের সহিত কিরূপে করা যায়—এইটি শিশুদের শিখাইতে হইবে। তাহারা যেন সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও স্বার্থত্যাগী হয়। তাহারা যাহাতে ঝগড়াটে

ও স্বার্থপর না হয়, সকল জিনিস ভাই বোনেরা মিলিয়া মিশিয়া খায়,—সব খেলা, সব কাজ ভাইবোনেরা আনন্দের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া করে—মাতারা শিশুদের খাইবার সময়, তাহাদের খেলায় যোগ দিবার সময় এইগুলির দিকে মন রাখিবেন। খাবারের কিছু পরে শিশুর জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়ানো দরকার। স্তন্য দুগ্ধ খাইবার পর শিশু সামান্য জল খাইতে পারে। শিশুরা সামান্য বড় হইলে, নিজেদের ইচ্ছামত জল খাইবে। প্রচুর জল পান করিলে ভাল ভিন্ন মন্দ হয় না। দাঁত উঠিবার সময় শক্ত খাবার দিলে ভাল হয়; তাহাতে দাঁত শীঘ্র উঠিতে পারে। শক্ত খাবার চিবাইতে যাইয়া দাঁতের নাড়াচাড়া হয়, দাঁতে রসের চলাচল বেশী হয়। শিশুদের ভাত হইবার পর হইতে তাহাদের দাঁত দিনে অন্ততঃ দুইবার ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। শিশুরা যখন মাতার দুধ ছাড়া ভাত, মাছ, আলু ইত্যাদি খাইতে আরম্ভ করে, তখন তাদের দাঁতের যত্ন লইতে হইবে। শিশুদের চো[illegible] প্রতিও নজর রাখা চাই। শিশুকে অন্ধকারে লইয়া [illegible] ভয় দেখান অত্যন্ত অন্যায়; এটা শিশুদের উপর ভয়া[illegible] অত্যাচার। অন্ধকারকে বুঝিতে দেখিতে,—অন্ধকা[illegible] মধ্যে ভয় না পাইতে পারে—এইরূপভাবে শিশুকে শি[illegible] দিতে হইবে।

শিশুকে যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যবান, সুখী ও সৎ ক[illegible] গড়িয়া তুলিতে মাতাকে অনেক বিধিনিষেধ মা[illegible] হইবে। মাতা অনেক কাজ করিবেন না। যেমন।—

কখনও কৃত্রিম দুধ দিবেন না!

রবারের লম্বা নলওয়ালা বোতলে দুধ খাওয়া[illegible] না।

ময়লা জামা পরাইবেন না।

ধূলাপড়া খাবার দিবেন না।

ভয় দেখাইবেন না ইত্যাদি।

(ন্যাসানাল্ হেল্থ্)

বিল্ব।

লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

পরিচয়ঃ—বিল্ববৃক্ষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে আম ও জাম গাছের মত উচ্চ হয়। প্রত্যেক দলে তিনটী করিয়া পত্র থাকে। পাতাগুলি ২॥০ ইঞ্চি হইতে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ফুলগুলি ছোট ছোট ও শ্বেত বর্ণের। শাখাগুলির প্রত্যেক গ্রন্থিতে দুইটী কিম্বা ১টী করিয়া কাঁটা থাকে। কাঁটাগুলি ১ ইঞ্চি হইতে ১॥০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। চৈত্র মাসে বিল্ববৃক্ষের পাতাগুলি ঝরিয়া যায় এবং নূতন পত্র বাহির হয়, এবং সেই সময়ে বেলও পক্ক হয়। বৈশাখ মাসে আবার নূতন ফুল হয় ও ফল ধরে। বেলের বীজ মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই গাছ হয়। ইহার ডালে গাছ হয় না।

বিল্বের পর্য্যায়ঃ—"বিল্বঃ শাণ্ডিল্যশৈলুষৌ মা[illegible] শ্রীফলাবপি"—বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলুষ, মালুর ও শ্রী[illegible] এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায়। কচি বেলের পর্য্যায় "[illegible] বিল্বফলং বিল্বকর্কটী বিল্বপোষিকা" বিল্বকর্কটী ও [illegible] পোষিকা এই দুইটী কচি বেলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নাম ভেদঃ—বেলকে হিন্দু[illegible] বেল, মহারাষ্ট্রে ও বোম্বাই প্রদেশে বেলফল ও [illegible] বলে। গুজরাটে বিলোবিলু, কর্ণাটে বেলল, তৈ[illegible] মারেডীপন্দু-বিল্ব এবং তামিলে বিল্বাপাম বলে। [illegible] ডাক্তারী নাম Aegle marmelos.

বিল্বপত্র, বেলছাল, বিল্বমূল, কচি বেল পো[illegible] বেলশুঁঠ ও পাকা বেল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়।

বিল্বপত্রের রস মল পরিষ্কারক ও জ্বরনাশক। বিল্বপত্রের রস আধ তোলা ও মধু এক তোলা মিশ্রিত করিয়া খাইলে মল পরিষ্কার হয় ও জ্বর-বেগ কমায়। যাহাদের শ্বাসের পীড়া আছে, বিল্বপত্রের রস তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সম পরিমাণে বিল্বপত্র রস ও মধু পান করিলে তাঁহারা শ্বাস বেগ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। বিল্বপত্ররস যকৃতের উপর অধিক পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে। কামলা রোগেও বিল্বপত্র রস বিশেষ উপকারী এবং বাহ্য প্রয়োগে কামলাজনিত শোথে বিল্বপত্রের রস বিশেষ উপকারী।

বিল্বপত্ররস কুষ্ঠ নাশক।

"বিল্বনিম্বদলানাঞ্চ চূর্ণমামলকৈসহ।

"প্রত্যহং ভক্ষয়েৎ যস্তু তস্য কুষ্ঠং বিনশ্যতি।"

বিল্বপত্র ও নিম্বপত্র চূর্ণ করিয়া আমলকীর সহিত প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ ভাল হয়।

অনেক প্রদেশে চক্ষু উঠিলে ৭।৮ দিন পরে কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধে কচি বিল্বপত্র ঘর্ষণ করিয়া সেই ঘৃষ্ট পদার্থ এক বিন্দু চক্ষুতে দিয়া থাকে, তাহাতে প্রথমে কিছু জ্বালা করে, পরে আরাম বোধ হয়। তাহাকে চলিত কথায় "আজন" বলিয়া থাকে। তাহাতে চোখ উঠা সম্পূর্ণ রূপে ভাল হয়।

বিল্বত্বক্ স্থবিরেচনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুই তোলা বিল্বত্বকের রসে কিঞ্চিৎ মধু দিয়া পান করিলে দূষিত মল বাহির হইয়া যায়। বিল্বমূল আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ "দশমূল" পাচনে বিল্বমূল ব্যবহৃত হয়। বিল্বমূল জ্বর, বিশেষতঃ বাতিক জ্বর নাশ করে। ইহা বিল্বাদি, পঞ্চমূলাদি, ভূনিম্বাদি সুদর্শন-চূর্ণ, চ্যবনপ্রাশ ও পিপ্পল্যাদি ঘৃতে ব্যবহৃত হয়।

কপিত্থ বিল্ববৃহতী পটোলেক্ষু নিদিগ্ধিকা।

মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি দাপয়েদ্ভিষগষ্টমে॥

কয়েদ্ বেলের মূলের ছাল, বেলের মূলের ছাল, বৃহতী মূল, পানের মূল, ইক্ষুমূল, কণ্টিকারী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আটতোলা দুগ্ধ ও ৩২ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। যখন দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া শীতল হইলে উক্ত কাথ অষ্টম মাসের গর্ভে সেবন করিলে গর্ভস্থিত বালকের কোন বিঘ্ন ঘটে না এবং প্রসব করিতে গর্ভিণীর কোন প্রকার কষ্ট হয় না।

কৃত্তিকানক্ষত্রে একটী বিল্বমূল তুলিয়া জল দিয়া বাঁটিয়া যাঁহাদের মৃতবৎসা দোষ আছে, তাঁহাদিগকে ঋতুর প্রথম তিন দিবস খাইতে দিলে, মৃতবৎসা দোষ নষ্ট হয়।

কচিবেল পোড়া আমাশয়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কচি বেল পোড়া গুড়, তিল তৈল, পিপুল, ও শুঁঠ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খাইলে আমাশয়ের বিশেষ উপকার করে। কচি বেল পোড়ার শস্য, উহার সমান নিস্তুষ তিলকল্ক দধির সরে অম্লীকৃত ও স্নেহযুক্ত করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা প্রশমিত হয়। ছোট ছেলেদের পেটের অসুখের সময় কচি বেল পোড়া বিশেষ উপকার করে।

বেলশুঁঠঃ—কাঁচা বেলের আবরণ ও বীজ বাদ দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বেলশুঁঠ প্রস্তুত হয়। এই বেলশুঁঠ অতিসার, আমাশয়, গ্রহণী রোগের ঔষধে প্রয়োগ হয়। ইহা অতিসার, গুড়ুচ্যাদি, বিল্বাদি, শুঁঠ্যাদি বৎসকাদি, ভূমিম্বাদি, বিল্বপঞ্চকং, উৎপলষটুকম্, কলিঙ্গাদি গুড়িকা, বৃহৎ-কুটজাবলেহ, ভুবনেশ্বর ও ধান্যপঞ্চকং প্রভৃতি অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় এবং গ্রহণীরোগোক্ত পাঠাদ্যচূর্ণ স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধেও ব্যবহৃত হয়।

বেলশুঁঠ অর্শনাশক ইহা অর্শরোগে "দশমূলগুড়ে" ব্যবহার হয়। পাকা বেল চিনি দিয়া খাইলে অর্শ রোগে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। বেলশুঁঠ, চিনি ও গোলাপ জল মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে অর্থাৎ কিছু না খাইবার পূর্ব্বে খাইলে যাঁহাদের তরল দাস্ত হয় তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়।

কচিবেল ধারক, অগ্নি বৃদ্ধি করে, আম পরিপাক করে, লঘু, স্নিগ্ধ। বায়ু ও কফ নাশ করিয়া থাকে। কিন্তু পাকা বেল গুরু, সহজে জীর্ণ হয় না, অগ্নিমান্দ্য করে।

বিল্বার্ক ঃ—বেলশুঁঠ বেশ করি চূর্ণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর বকযন্ত্রে চুয়াইয়া তাহার আরক বাহির করিয়া লইবে। ইহাই বিল্বার্ক। অর্ক অর্থাৎ আরক আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালীর যথেষ্ট প্রচলন হওয়াতে, আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত অর্ক এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক কয়েক-জন শিক্ষিত চিকিৎসকের উৎসাহে সেই প্রাচীনকালের অর্ক আবার অভিনব উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। উক্ত বিল্বার্ক শ্লেষ্মানাশক, বলকারক, লঘু, উষ্ণ ও পাচন যথা।

"বৈল্বঃ শ্লেষ্মহরো বল্যো লঘুরুষ্ণশ্চ পাচনঃ"।

বিদুক্ষয়রোগে বিল্বমূল ও আকন্দমূল পেষণ করত বটিকা প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে উক্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বিল্ববৃক্ষ আর্য্য জাতির চিরপ্রিয়। বহুকালপূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রে ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিল্ববৃক্ষ মহাদেবের অতিশয় প্রিয়। বিল্বপত্র না হইলে মহাদেব ও দুর্গার পূজা হয় না। দুর্গা-পূজার সময় যে নবপত্রিকা বাঁধা হয়, যাহাকে চলিত কথায় "কলাবউ" বলে, তাহাতে বিল্ববৃক্ষের শাখা থাকে। "কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ। বিল্বোশোকে জয়ন্তীচ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা"। এবং যজ্ঞীয় কোন জিনিস নির্ম্মাণ করিতে হইলে বিল্ববৃক্ষের করিতে হয়। যেমন উদূখল মুষল ও উপনয়নের সময়ে ব্রহ্মচারীর দণ্ড বিল্ববৃক্ষ হইতে নির্ম্মিত হয়। বিল্ববৃক্ষের হিন্দুশাস্ত্রে এত আদর কেন? নিশ্চয়ই ইহার কোন গুণ আছেই; তাহা না হইলে বিল্ববৃক্ষের এত আদর কেন? আর দেব-দেবীর অতিশয় প্রিয় কেন? বহুদিবস পূর্ব্বে পশ্চিম প্রদেশ হইতে একজন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমান জেলার একটী গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথোপকথন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে বিল্বপত্রের এবং বিল্ব কাষ্ঠের চিত্ত সংযত করিবার শক্তি আছে। বিল্বপত্রের আঘ্রাণ লইলে কাম প্রবৃত্তির অনেকটা সংযম হয়। এই বিষয় কত দূর সত্য তাহা বলা যায় না। কারণ আমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। তবে যখন এত আদর এবং ইহার অশেষ উপকারিতা আছে, ইহা সত্য হইতে পারে। বিল্বফল হইতে একপ্র মালা প্রস্তুত হয়। আধ পাকা বেল লইয়া দ্বিখ করিবে এবং তাহার শাঁস বাহির করিয়া দিয়া কেবল মাত্র কঠিন আবরণটি থাকিবে তখন আবরণটী লইয়া সুন্দররূপে শুষ্ক করিবে। তাহা মালাকাটা এক রকম যন্ত্র আছে (তাহা সহজেই করা যায়), সেই যন্ত্রের সাহায্যে অতিশয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাটা হয়। মালা কাটা হইলে সেই বেলের "খো ঠিক ঝাঁজরার মত দেখায়। এই মালা অধিকাং জাতীয় লোকেরা পরিয়া থাকে। এই মালা ব জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বৈঁচি গ্রামের বৈ গণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বিল্ব ফলের গঁদে অনেক কার্য্য সাধিত হয়। এর সহিত মিশ্রিত করিয়া চিত্রকরগণ চিত্র রঞ্জিত থাকে। মৃণ্ময় প্রতিমায় রং দিবার জন্য বেলের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। প্রথমে কাঁচা বেল দ্বিখণ্ডিত কাঠি কিম্বা লোহ শলাকার দ্বারা বীজগুলি বাহির হয় এবং কিঞ্চিৎ জলে নিক্ষেপ করিয়া পরে জলের মিশ্রিত করিয়া ন্যাকড়ার দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে সুন্দর গঁদ পাওয়া যায়। সেই গঁদ রংএর সহিত মি করিয়া মৃণ্ময় প্রতিমা রঞ্জিত করা হয়। রংএ রঞ্জিত প্রতিমাতে তৈল দিলে রং নষ্ট হয় কিন্তু অন্য গঁদ দ্বারা প্রস্তুত রংএ রঞ্জিত প্রতি তৈল দিলে রং নষ্ট হয়। সেই জন্য বেলের গঁদে রংএ রঞ্জিত প্রতিমায় পুনরায় আতব চাউলের গঁদ মাখাইতে হয় না। এতৎব্যতীত কাঁচা বেলের প্রস্তুত হয়। কাঁচা বেলরশাঁস লইয়া প্রথমে করিয়া ধুইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া চিনির রসে করিলে মোরব্বা প্রস্তুত হয়। পেটের অসুখ যাহাদের তরল ভেদ হয় তাহারা বেলের খাইলে বিশেষ উপকার পাইবেন। কলিকাতায় মোরব্বার বিশেষ আদর ও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

উচ্ছিষ্ট ভোজন।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সিংহ শর্ম্মা।

উচ্ছিষ্ট ভোজন, অন্যের ভুক্তবিশিষ্ট আহার,—এই অর্থে আমি ব্যবহার করিলাম।

এখন দেখা দরকার, উচ্ছিষ্ট ভোজনে কোন পাপ, পুণ্য, অপকার কি উপকার আছে কি না। আমার যতদূর ধারণা, তাহাতে এই মনে হয় যে, ইহাতে অপকার এবং পাপই অত্যধিক। ইহাতে পুণ্য ও উপকার নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস; কারণ, এই প্রকার ভোজনে অনেকের প্রবৃত্তিই হয় না; এবং কোন কোন স্থানে কেহ কেহ বাধ্য হইয়া উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। আজকাল হাঁপী (Asthma), যক্ষ্মা (Phthysis) ইত্যাদি সাংঘাতিক রোগের বিস্তার হইতেছে। এক বাড়ীতে হয় ত কাহারো ঐ প্রকার কোন ব্যাধি আছে,—সেই সংস্রবে ঐ সব রোগ বৃদ্ধি পায়। সেই সব রোগীর নিঃশ্বাসেই যখন এই সব রোগ সংক্রামিত হয়, তখন তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে যে ভয়ানক ফল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মাধব নিদানে লেখা আছে যে;—

"প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ।
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্।"

মাধব নিদান, কুষ্ঠরোগ, ১২ শ্লোক।

মৈথুন, গাত্র-সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন এবং রোগীর বস্ত্র, মালা, অনুলেপন ব্যবহার—এই সকল কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, চক্ষুরোগ (চোখ উঠা) পাপজ এবং ভূতোপসর্গজ্বাদি রোগ সকল এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। অর্থাৎ এই সকল রোগ সংক্রামক।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই অতি আবশ্যক ও মোটা কথার প্রতি কেহই লক্ষ্য করেন না। এই কারণে (অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ) নানা প্রকার সংক্রামক ব্যারামের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার বাড়ীতে এই প্রকার রোগী থাকে, তাহার নিজেরই সাবধান হওয়া উচিত। কেবল হাঁপী যক্ষ্মা কেন, সর্ব্বপ্রকার রোগই এই প্রকারে সংক্রামিত হইতে পারে ও হইতেছে। আর একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে যাঁহারা ধূম্রপান (তামাক চুরুট ইত্যাদি সেবন) করেন, তাঁহারা এই সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন। এক হুঁকায় ও এক চুরুটে বহু লোকে ধূমপান করিয়া থাকেন। ইহাতে যে কত রোগ সংক্রামিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তাই নাই। যথা,—কাহারও হয় ত মুখে নানাপ্রকার ঘা ও দাঁতের (gum) ব্যারাম আছে,—তাহাদের হুঁকায় তামাক খাইলে ঐ সমস্ত সাংঘাতিক ব্যারাম সংক্রামিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সব কারণে না খুইয়া এক গ্লাসে একাধিক ব্যক্তির কখনই জল পান করা উচিত নয়। যাঁহারা তামাক ইত্যাদি ব্যবহার করেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটী স্বতন্ত্র নল ও চুরুট নল (cigarette pipe) থাকা আবশ্যক।

কখনই কাহারও উচ্ছিষ্ট (চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়) খাওয়া বা দেওয়া উচিত নহে। ঋষিরা শাস্ত্রে পীড়িত ছাগ ও ছাগের মাংস পূজায় দিতে এবং খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার যতদূর বিশ্বাস, রোগ সংক্রমনাশকাই এই নিষেধের অন্যতম কারণ। আজকাল সহরে কশাইয়ের দোকানে যে মাংস বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা পীড়িত জন্তুর মাংস কি না জানি না। যদি তাই হয়, তবে ইহাতেও নানাপ্রকার ব্যারাম সংক্রামিত হইতেছে ও হইতে পারে। এই প্রকারে সর্ব্বপ্রকার খাদ্যের উপরই লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু সব জিনিসেরই ভাল মন্দ ঠিক করা

বড়ই কঠিন যথা, মাছ, দুধ প্রভৃতি। তবে কথা এই যে যতদূর পারা যায় ততদূর সাবধান হওয়াই বিধেয়। এ সম্বন্ধে যতই ঔদাসিন্য হইবে, ততই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবেই হইবে। কেবল স্বাস্থ্য নিবাসে (Sanitarium) থাকিলেই রোগমুক্ত হওয়া যায় না। ইহার সঙ্গে সর্বপ্রকার আহার বিহারের সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক; নতুবা কোন ফল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

রাস্তায় ঘাটে চলাফিরার সময়, দোকানে ষ্টীমারে এবং হোটেলে যে সমস্ত খাদ্য ব্যবহার করা হয়, তাহা অত্যন্ত খারাপ, এবং ঐ সব উদরস্থ করায় নানাপ্রকার ব্যারাম হয়। এই সমস্ত বিষয়ে সুধিগণের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। আমার ধারণা এই যে, কোন কোন হোটেলে উচ্ছিষ্ট কখনই ফেলিয়া দেওয়া হয় না, তাহা উঠাইয়া রাখিয়া অন্যকে দেওয়া হয়। ইহা সত্য কি না আমি ঠিক জানি না। তবে লোক মুখে শুনিতে পাই, তাই লিখিলাম। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করি নাই; কিন্তু ঐ সমস্ত স্থান এত নোংরা যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে অত্যন্ত ঘৃণার সঞ্চার হয়। উচ্ছি ভোজন যে কত প্রকারে হইতেছে, তাহা লিখিতে গে ঐকখানা বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সেই ভয়ে মোটা রকমে সচরাচর যাহা ঘটিতেছে, তাহা দেখাইয়াই প্রবন্ধ লিখিলাম।

এখন আমার এই প্রবন্ধ পাঠে যদি একজনও এতটু সাবধান হন, তবে আমাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকে কি লিখিয়াছেন দেখুন?—

"নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাঘাচ্চৈব তথান্তরা।
নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্‌ব্রজেৎ॥"

"কাহাকেও উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রদান করিবে না দিবাকাল ও রাত্রিকালের ভোজন সময়ের মধ্যে ভোজন করিবে না; অতিশয় ভোজন করিবে না উচ্ছিষ্ট মুখে কোথাও যাইবে না।"

এই সব ঋষিবাক্য অবহেলা করিয়া ও সাধা মায়াবশে আমরা এই সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির বিস্তা সহায়তা করিতেছি।

রক্ত দূষিত হয় কেন?

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে যাঁহারা অমনোযোগী, যে-কোন দিন যে কোন মুহূর্ত্তে সামান্য কারণে তাঁহারা গুরুতর বিপদে পড়িতে পারেন। অনেক সময়েই আমরা দেখিতে পাই, দেহের কোন যায়গায় অল্প-একটু আঁচড় লাগিয়া, দেখিতে-বলবান্ অনেক লোক একান্ত অসহায়ের মত মরণের মুখে গিয়া পড়িয়াছেন। রক্ত বিষাক্ত হওয়াই ইহার কারণ। কিন্তু রক্ত কিছুতেই বিষাক্ত হইতে পারে না—মানুষ যদি স্বাস্থ্যের বিধান নিয়মিত ভাবে বুঝিয়া এবং মানিয়া চলে।

রক্ত বিষাক্ত হয় কেন? দেহের চামড়া যখনই নোংরা নখ বা ময়লা আলপিনের খোঁচায় বা অন্য কোন কিছুর দরুণ ছড়িয়া যায়, তখনি সে যায়গাটি যন্ত্রণাময়, তপ্ত, স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠে,—অর্থাৎ সেখানে প্রদাহে প্রথম লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ইহার অর্থ কি জানেন দেহের ভিতরকার স্থানীয় খবর-দাররা এই সব লক্ষণে সাহায্যে শরীরের মধ্যে খবর পাঠায় যে, শত্রুপ আক্রমণ করিতে উদ্যত। নানাবিধ ব্যাধি ও রো বীজাণুর আক্রমণে বাধা দিবার জন্য আমাদের দেহে মধ্যে যে সদা-প্রস্তুত সৈন্যদল আছে, সংবাদ পাইবামা তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমরা কোন কাল্পনিক গল্প বলিতেছি না। রো বাহী জীবাণুগণের সহিত, মানব-দেহের সৈন্যসামন্ত সর্ব্বদাই সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া আছে। দেহমধ্যস্থ সেনাদলের নাম, শ্বেত-রক্ত রেণু।

মানবের স্বাস্থ্য যখন নির্দ্দোষ থাকে, তখন যে মুহূর্ত্তে কোনরূপ আঘাতের ছিদ্র পথে রোগবীজাণুরা দেহ-দুর্গে ঢুকিতে উদ্যত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই অমনি দেহের ভিতর হইতে লক্ষ লক্ষ শ্বেত-রক্ত-রেণু তাহাদের প্রবেশ-পথে আসিয়া যথাসাধ্য বাধা প্রদান করে। ফলে, স্বাস্থ্যবান লোকের বলবান রক্তরেণুদের কবলে পড়িয়া, রোগজীবাণুরা দেখিতে দেখিতে মরিয়া যায়।

এখন রোগজীবাণুদের আক্রমণ পদ্ধতির কথা বলিতেছি। ধরুন একটী ময়লা আলপিনের মুখে কয়েক হাজার দর্শনাতীত জীবাণু আছে। আঁচড় লাগিয়া মানুষের গায়ের চামড়া যেই একটু ছিঁড়িয়া গেল, অমনি তাহারা দলে দলে ক্ষতস্থানের ভিতর গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল:—ছিল তিন হাজার, হইল বারো হাজার। তাহাদের দল ভারি হইবার উপায়ও খুব সোজা। তিন হাজার জীবাণুর প্রত্যেকে আপনাদের দেহকে দুই ভাগ করিয়া ফেলে এবং ছয় হাজারে পরিণত হয়। তার পর সেই ছয় হাজার জীবাণু আবার ঐ উপায়ে বারো হাজারে গিয়া দাঁড়ায়। এমনি করিয়া তাহাদের দল ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, মানুষের দেহের মধ্যে এই ভয়ানক জীবাণুগুলি ঢুকিয়া যদি কোন বাধা না পায়, তবে অবস্থাটা অচিরেই কতদূর সাংঘাতিক হইয়া উঠে! দেহের মধ্যে জীবাণুদের অনধিকার প্রবেশে বাধা দিবার জন্য, রক্তবহা নাড়ীর মধ্য দিয়া শ্বেত-রক্ত-রেণুরা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি; নহিলে কেহ নোংরা নখে গা আঁচড়াইয়া দিলেই আমরা খুব শীঘ্র অনিবার্য্য মৃত্যুমুখে গিয়া পড়িতাম।

দূষিত ক্ষতের উপরে অণুবীক্ষণ ধরিলে দেখা যাইবে, রোগজীবাণু এবং শ্বেত-রক্তরেণুর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে। রক্ত-রেণুরা প্রত্যেক দশ, বিশ, পঞ্চাশ—এমন কি একশোটি পর্য্যন্ত রোগজীবাণুকে বেড়িয়া হজম করিয়া ফেলিতেছে!

লড়ায়ে যদি রক্তরেণুরাই বেশী বলবান হয়, তবে তারা সমস্ত শত্রুকে নিঃশেষে নাশ করিয়া, রণক্ষেত্র ছাড়িয়া আবার স্বস্থান ফিরিয়া যায়, এবং স্বাভাবিক অবস্থা পাইয়া ক্ষতস্থান আবার সারিয়া আসে।

কিন্তু দেহের স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ থাকিলে মানুষের কি দুরবস্থা হয় জানেন? সে ক্ষেত্রে উক্ত রক্ত-রেণুরা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ক্ষতের মুখে যখন জীবাণু-সমাগম হয়, শ্বেত-রক্তরেণুরা তখন অশেষ চেষ্টা করিয়াও (এমন কি, জর্ম্মণদের মত এক রকম বিষাক্ত বাষ্প ছাড়িয়াও), শত্রুপক্ষের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। বরং শেষটা রোগ-জীবাণুদের আক্রমণে তাহারাই দলে দলে মরিয়া যাইতে থাকে; এবং সর্ব্বশেষে মানুষের কু-রক্ষিত দেহ-দুর্গ শত্রুপক্ষের হস্তে গিয়া পড়ে। কড়ে আঙ্গুলের ডগায় সামান্য একটু আলপিনের খোঁচার ফলে, তখন অত বড় দেহের সমস্ত রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে।

মানুষ গড়া।

হিন্দুর সাধারণ বিশ্বাস মানিতে হইলে, পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে দেবতার আসন দিতে হয়। পৌরাণিক বৃত্তান্তে মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপ বিবরণে দেখা যায়, চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর দেহে কোন পাপ অর্শে না; অর্থাৎ, এই বয়স পর্য্যন্ত শিশু ভাল মন্দ যে সকল কাজ করে তাহার জন্য সে দায়ী নহে; এই সময় পর্য্যন্ত তাহার বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করে না,—সেই জন্য সে যাহা করে, তাহার ফলাফল কি হইতে পারে, তাহা

বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারে না। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি,—শিশুকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যত্নসহকারে লালন পালন করিতে হইবে।

কিন্তু এ বিশ্বাস এখন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য আমাদের দেশের পিতামাতারা নিজ নিজ সন্তানগণের প্রতি স্নেহ-বিমুখ নহেন; তাঁহারা ছেলে মেয়েকে আদর যত্ন করিতেও ত্রুটি করেন না; কিন্তু তথাপি, যে ভাবে কাজ হওয়া উচিত, দুঃখের বিষয়, ঠিক সে ভাবে কাজ আদৌ হইতেছে না। ছেলে মানুষ করার প্রকৃত অর্থ,—ছেলেকে 'মানুষ' গড়িয়া তোলা। সে যাহাতে স্বাস্থ্যসম্পন্ন, বীর্য্যবান, দীর্ঘজীবী, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, বলবান হইয়া স্বজাতির মঙ্গল সাধন করিতে পারে, এমন ভাবে তাহাকে গড়িয়া তোলা। ইহার নাম ছেলেকে 'মানুষ' করা। কিন্তু যে ভাবে আমাদের ছেলে-মেয়েরা গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা কে না জানেন? ছেলেরা ঠিক মত 'মানুষ' হইতেছে, এ কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন কি? আদর, যত্নের নামে আমরা ছেলেমেয়েদের যেমন অনাদর, অযত্ন করি, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এমন করা হয় না। আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের যেমন দুরবস্থা, পৃথিবীর অপর কোন দেশের অবস্থা সেরূপ নহে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। আমরা সেকালের ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়াছি, অথচ এ কালের ব্যবস্থা ঠিক মত ধরিতে পারি নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে, দেড়শতাধিক বৎসর পাশ্চাত্য রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত হইয়া, এখন আর আমাদের সেকালের রীতি-নীতিতে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে; বিশেষতঃ, দেশের, জাতির, সমাজের অবস্থা অনেকটাই বদলাইয়া গিয়াছে;—এখন আর প্রাচীন কালের অবস্থায় ফিরিবার উপায়ও নাই। কাজেই, এখন আমাদিগকে কতকটা পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। দেশ, কাল, পাত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, যতটা সম্ভব পাশ্চাত্য রীতি-নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করিতে হইলেও—পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। বিচার-বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে, তাহাতে আমাদের লাভ বই ক্ষতি হইবে না। পাশ্চাত্য দুর্নীতি অনেকটা পরিমাণে, বিনা চেষ্টায়ে আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে; তাহা ত আমরা রোধ করিতে পারিতেছি না। তখন, পাশ্চাত্য ভাল নীতি গ্রহণ করিলে দুর্নীতির প্রভাবটা কতকটা কমিতে হইতে পারিবে। নীতির কথা এখন থাকুক; এইবার শিশু পালনের কথাই বলি।

খুব উচ্চ ইমারত নির্ম্মাণ করিতে হইলে, প্রথমে যেমন তাহার বনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া লইতে হয়, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন মঙ্গলময় করিতে হইলে তদ্রূপ, শিশুর জন্ম দিবস হইতেই, তাহার খাদ্যাখাদ্য পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যত্ন লইতে হইবে। বনিয়াদ ভাল না হইলে যেমন তাহাদের উপর উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে পারে না,—তদ্রূপ, শৈশবকালে শিশু উপযুক্তরূপে লালনপালনে অবহেলা করিয়া বয়সকালে যতই যত্ন করা হউক না কেন,—সে ছেলে দীর্ঘজীবী এবং 'মানুষ' হইয়া পিতামাতার আনন্দ উৎপাদন করিতে পারিবে না। অতএব শিশুর জন্ম দিবস হইতেই তাহার সুপালন আরম্ভ হওয়া আবশ্যক।

প্রসূতি সুস্থ এবং নীরোগ এবং যথাসম্ভব সবল থাকিলে, শিশুর জন্মদিন হইতে প্রথম ছয়মাস কাল মাতৃ-স্তনদুগ্ধই তাহার সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র খাদ্য। সুস্থদেহ নারীর স্তনদুগ্ধ ঈষৎ নীলবর্ণাভ; তাহা হইতে সামান্য জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। উহার স্বাদ মিষ্ট। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে উহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাখন-কণা ভাসমান দেখা যায়। অন্যান্য রাসায়নিক পরীক্ষায় মাতৃ-স্তন-দুগ্ধের দোষগুণ নির্ণয় করা যাইতে পারে।

মাতৃস্তনদুগ্ধের উপাদানগুলি এই;—

১। জল, শতকরা ৮৫ হইতে ৯০ অংশ।

২। মাখন প্রায় প্রোটীডের সহিত সম্মিলিত ঘনীভূত ভাবে থাকে। ইহার অংশ শতকরা ৩ হইতে ৫; অথবা গড়ে ৩.৫। এই দুগ্ধ কিছুক্ষণ স্থির ভাবে রাখিয়া দিলে মাখনের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে।

৩। চিনি। মাতৃদুগ্ধের কার্ব্বোহাইড্রেট অংশের নাম ল্যাক্‌টোজ। ইহার অপর একটী পর্য্যায় মিল্ক-সুগার। দুগ্ধে ইহা শতকরা ৬ হইতে ৭ অংশ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।

৪। মাতৃদুগ্ধের প্রোটীড অংশ কেসেইন এবং ল্যাকটালবুমিন আকারে থাকে। দ্বিতীয়টি, দ্রব অবস্থায় থাকে বলিয়া, সর্ব্বাগ্রে পরিপাক হইয়া শোষিত হয়। ইহার পরিমাণ কেসেইনের প্রায় দ্বিগুণ। কেসেইন মাতৃদুগ্ধে মাঝখানে ভাসমান থাকে এবং শীঘ্রই থিতাইয়া পড়িতে পারে। মাতৃস্তন্যে ম্যাসেটিক ম্যাসিড মিশ্রিত করিলে যে দধিবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত গোদুগ্ধজাত দধির অনেকটা পার্থক্য আছে। মাতৃস্তন্যে প্রোটীডের পরিমাণ শককরা ১ হইতে ২ অংশ বা গড়ে ১.২৫ অংশ। ক্ষেত্রবিশেষে এই পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কমের দিকে ৩.৭ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশীর দিকে ৪.৫ অংশ হইতে দেখা যায়।

৫। লবণ। মাতৃদুগ্ধে প্রধানতঃ ক্যালসিয়ম ফসফেট এবং পটাসিয়ম কার্ব্বনেট—এই দুইটী লবণ দেখা যায়। এই দুইটীর মোট পরিমাণ শতকরা ০.২ মাত্র।

মাতৃস্তন্য কেন যে শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, গোদুগ্ধের সহিত মাতৃস্তন্যের একটুখানি তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। মাতৃস্তন্যে দুগ্ধের ধাতব অংশ গোদুগ্ধের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শিশুর দেহে শোষিত হইবার উপযোগী অবস্থায় থাকে। গোদুগ্ধের অপেক্ষা মাতৃস্তন্যে প্রোটীডের অনুপাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে আলকালির অংশ থাকায়, উহা শিশুর শরীর গঠনে বেশী পরিমাণে সহায়তা করিয়া থাকে। মাতৃস্তন্যে প্রোটিডের অংশ কম। কিন্তু অধিক পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার মাখনের অংশ এমন অবস্থায় থাকে, যাহা শিশুর দেহে শীঘ্র শোষিত হয়। গোদুগ্ধ হইতে শিশু কিছু বেশী পরিমাণে প্রোটীড পায় বটে, কিন্তু উহাকে, এবং মাখনের

অংশকে জীর্ণ করিবার উপযোগী, এবং তাহা হইতে কোষ গঠনের উপযোগী, আলকালি যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। এই জন্য গোদুগ্ধে প্রোটীডের অংশ বেশী থাকিলেও, তাহাতে শিশুর দেহের বেশী উপকার হয় না।

তবে মাতৃস্তন্যের একটা ত্রুটিও আছে। উহাতে চুণের অংশ নিতান্ত কম। এই জন্য শিশু মাতৃদুগ্ধের উপর ছয়মাস কালমাত্র নির্ভর করিতে পারে, তাহার বেশী আর পারে না। ছয় মাসের পরও শিশুকে কেবল মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে, তাহার অস্থিগঠন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, অস্থি দুর্ব্বল বলিয়া, যে শিশু rickets রোগে ভুগিতেছে, তাহার জননীর দুগ্ধে চুণের মাত্রা অত্যন্ত কম। একটী কুকুর, যাহার বাচ্ছা হইয়াছে, এবং, যে বাচ্ছা এখনও মাই ছাড়ে নাই,—তাহার উপরও এই পরীক্ষা হইয়াছে। ঐ কুকুরটিকে এমন খাদ্য দেওয়া হইতে লাগিল, যাহাতে চুণের অংশ মোটেই নাই। ফলে, কিছুদিন বাদে দেখা গেল, তার বাচ্ছাগুলির মানব-শিশুর মতই র‍্যাচিটিস রোগ হইতে আরম্ভ করিল। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মাতৃস্তন্যে চুণের অংশ কম থাকিলে, শিশু র‍্যাচিটিস রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মাতৃস্তন্যই শিশুর সর্ব্বপ্রধান খাদ্য, এবং তাহার জন্মের দিন হইতে প্রথম ছয় মাস প্রধানতঃ ইহারই উপর শিশুকে নির্ভর করিতে হয়। ইহা সাধারণ নিয়ম মাত্র। কিন্তু সকল প্রসূতির শরীরের অবস্থা সমান নয়; এবং প্রসূতির শরীরের অবস্থা সকল সময়ে সমান, অর্থাৎ, সন্তান-পালনের উপযোগী অবস্থায় থাকে না। সে জন্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রসূতির দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। সম্পূর্ণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সকল সময়ে এবং সর্ব্বত্র এরূপ পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যায় না। সেই জন্য মোটামুটী পরীক্ষার কথাই এখানে বলা যাইবে।

প্রথমতঃ দুগ্ধের পরিমাণ অর্থাৎ ওজন নির্ণয় করিতে হইবে। ছেলেকে মাই দিবার সময়-বরাবর প্রসূতির

স্তন দুইটী দুগ্ধে ভর্ত্তি হইয়া আসে। তখন মাই সুড় সুড় করে, এবং ছেলেকে মাই দিবার জন্য মায়ের মনে স্বতঃই প্রবল ইচ্ছা হয়। এইরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে, মাই দুটীতে পূর্ণ দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে। এই দুধটুকু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া ওজন করিয়া লইলেই দুগ্ধের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। মাই হইতে দুধ বাহির করিয়া লইবার জন্য কাচের একপ্রকার 'পাম্প' আছে। কিন্তু এই উপায়ে সবটা দুধ বাহির হয় না, সেইজন্য দুগ্ধের পরিমাণও ঠিকমত নির্দ্ধারিত হয় না। দুগ্ধ ওজন করিবার আরও একটী সদুপায় আছে। আধুনিক বিজ্ঞানাগারে অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত ভাবে ওজন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (দাঁড়িপাল্লার মত) আছে। শিশু মাই খাইবার পূর্ব্বে তাহাকে এই যন্ত্রে ওজন করিয়া লইতে হইবে; এবং দুধ খাইবার পরও আর একবার ওজন লইতে হইবে। তাহাতে দেখা যাইবে, প্রথম বার শিশুর ওজন যত হইয়াছিল, দ্বিতীয় বার তাহার ওজন তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। এই বেশী অং দুগ্ধের ওজন। এইরূপে বার তিন-চার শিশুর দুগ্ধপানে আগে পিছে তাহাকে ওজন করিয়া লইলে যে ওজ দাঁড়াইবে, সেটা প্রায় মাই-দুধের ঠিক ওজন।

তার পর, দুধের গুণ কিরূপ, অর্থাৎ উহা কি পরিমা পুষ্টিকর তাহা ঠিক করিতে হয়। যাহার স্তনের কো গুলি (glands) বেশ পুষ্ট ও আকারে বৃহৎ, তাহা দুগ্ধও সেই পরিমাণে পুষ্টিকর। সন্তান প্রসব করিবা পর যে সকল প্রসূতির স্তন অল্প দিনের মধ্যে ঝুলি পড়ে, সহজেই বুঝা যায় তাহাদের স্তনের glandsগু দুর্ব্বল, এবং তেমন পুষ্টও নয়। এইরূপ স্তনে ভাল দু জমিতে পারে না। কিন্তু সন্তান প্রসব করিবার প যাহাদের স্তন মোচার ডগার মত আকারের, এ যথাসম্ভব নিরেট থাকে—যাহা আকারে খুব বড় ন এবং যাহাতে চর্ব্বির ভাগ খুব কম, সেই স্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তাহার glandগুলি বেশ পুষ্ট; তাহা ভাল দুধও জমিয়া থাকে।

মাদ্রাজে প্রসূতির মড়ক।

মাদ্রাজে শিশু-মৃত্যুর হার বড় অল্প নহে; ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে যত শিশু মরে, এক মাদ্রাজেই তাহা অপেক্ষা তিন চারিগুণ শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু মাদ্রাজে প্রসূতির মৃত্যু-হার দেখিলে আতঙ্কিত হইতে হয়। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রতি ২০০ প্রসূতির মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়া থাকে; কিন্তু মাদ্রাজে প্রতি ২০ বা ২৫ জন প্রসূতির মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, সন্তান-প্রসবের সময় প্রতি ৫০ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু ঘটে।

মাদ্রাজের হেল্‌থ অফিসারের ১৯১৮ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, প্রসব-কালীন দুর্ব্বিপাকে ৪১১ জন প্রসূতি ভবলীলা সম্বরণ করেন। এই ৪১১ জনের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু হয় শরীর বিষাক্ত হইয়া; ৯২ জনের মৃ হয় আক্ষেপ-রোগে; ৬১ জনের মৃত্যু হয় রক্তস্রা প্রভৃতি অন্যান্য পীড়ায়। এই সালে মোটের উপর হাজার শিশুর জন্ম হয়। এই হিসাবে দেখা যাইতেছে, এ ১০০০০ জন প্রসূতির মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

মাদ্রাজে ৪১১ জনের মধ্যে ২৫৮ জনের মৃ হইয়াছে শরীর বিষাক্ত হইয়া। এই বিষ বা রক্ত তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল কেমন করিয়া? নির ধাইদিগের দ্বারা মানুষের রক্ত যে দূষিত হইতে পা এ জ্ঞান উহাদের নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতে মূর্খ ধাইদিগের দ্বারা শতকরা ৬০ জন প্রসূতির রক্ত-দুষ্টির জন্য মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রতি ৬৫০ জন প্রসূতির মধ্যে রক্তদুষ্টি রোগে মাত্র ১ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে। লণ্ডন সহরে প্রতি সহস্র প্রসূতির মধ্যে মাত্র ৩ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু এক মাদ্রাজ সহরে প্রতি ১০০০ জন প্রসূতির মধ্যে ৫০ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে।

ধাত্রীরা শিক্ষিতা হইলে, প্রসূতিরা শিক্ষালাভ করিলে, এবং প্রাচীন সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারিলে প্রসূতি-মৃত্যুর এই ভীষণ বৃদ্ধি হ্রাস হইতে পারে।

[হিন্দুস্থান।]

পল্লী-স্বাস্থ্যোন্নতি।

লেখক—শ্রীযামিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

আমাদের শাস্ত্রে আছে:—

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষানাং আরোগ্যম্ মূলমুত্তমম্"; মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া, ইহ সংসারে আসিয়া, মানুষের যাহা কিছু প্রার্থনীয়,—ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, মোক্ষ বল,—চতুর্ব্বর্গের মধ্যে যাহা কিছু অভিলষনীয়—তাহাই লাভ করিবার জন্য স্বাস্থ্যই সর্ব্বপ্রধান উপায় ও উপাদান। স্বাস্থ্য ব্যতীত ইহাদের কিছুই লাভ করা ত যায়ই না; পরন্তু, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু সৌভাগ্য-ফলে কোনটী লাভ হইলেও, উপভোগ হয় না। স্বাস্থ্য অর্থে সুস্থ ও শক্তিশালী দেহ, এবং শান্তিপূর্ণ ও সবল মনের একত্র সমাবেশ বুঝায়।

স্বাস্থ্যের মূল্য।

শরীর যদি অসুস্থ, চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ইহ-সংসারে যাহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দান করিয়া মহামূল্য জ্ঞান করি, ও জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করি, সেই অর্থের উপার্জ্জন কি উপায়ে হইতে পারিবে? শরীর অসুস্থ থাকিলে, মনও সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেইরূপ অসুস্থ শরীর ও মন লইয়া, পরলোকে সদ্গতি কামনায়, বা পরমার্থ লাভেচ্ছায়, ধর্ম্ম-সাধনই বা কি করিয়া হইতে পারে? শাস্ত্রেও স্পষ্টভাবেই উপদেশ আছে:—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। অতএব স্বাস্থ্যের অভাবে ইহলোক, পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়,—দুর্ল্লভ মানবজন্ম বিফল হয়, জীবনধারণ উদ্দেশ্যহীন—বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া পড়ে। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারত্ন—স্বাস্থ্য-ধনের মূল্যের পরিমাণ কোথায়?

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক ও বিনামূল্যে।

জীবনধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, মহামূল্য জল ও বায়ু যেমন স্নেহময়ী প্রকৃতি-মাতা তাঁহার সুসন্তানগণকে বিনামূল্যে, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বিতরণ করিয়া থাকেন এই মহামূল্য স্বাস্থ্যরত্নও তিনি তেমনই অযাচিতভাবে প্রিয় সুসন্তান-গণকে প্রদান করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য জগন্মাতার স্বাভাবিক স্নেহের দান,—সকলেই দেহের সহিত প্রকৃতিগত-রূপে ইহা পাইয়া থাকেন।

স্বাস্থ্যনাশ।

কিন্তু দুর্ম্মতি মানবের নিকট যে জিনিস যত স্বল্প-আয়াসসাধ্য, বিনামূল্যে প্রাপ্ত বা অনায়াস-লব্ধ, তাহা ততই অকিঞ্চিৎকর ও অযোগ্য জ্ঞানে অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। হৃদয়ের রক্ত-দানে লাভ না করিলে, কোন দ্রব্যের উচিত মূল্য, যথার্থ সত্ত্বা মানব-মনে উপলব্ধি হয় না। তাই আমরা অনয়াস-লব্ধ, স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত, মহামূল্য জল, বায়ু, স্বাস্থ্য প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও তাহাদের অযথা অপব্যবহার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মহৎ উপকার লাভে বঞ্চিত হই, এবং তাহাদিগকে অসময়ে হেলায় হারাইয়া ফেলি। প্রকৃতির

অমূল্য উপদেশ জ্ঞানে অজ্ঞানে অবহেলা করিয়া আমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠ দানগুলি হইতে বঞ্চিত হই। এই সমস্ত অমূল্য মহোপকারী দ্রব্যগুলি আমরা অযাচিতভাবে, অনায়াসে লাভ করি বটে, কিন্তু রক্ষা করিবার আয়াস স্বীকার না করায়, এবং অধিকাংশ স্থানে তাহাদের প্রকৃত মূল্য ভুলিয়া অপব্যবহার করায় শীঘ্রই ইহাদিগকে হারাইয়া ফেলি। ইহাদের অবর্ত্তমানে বিপথে বহুদূর চলিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের কঠিন কশাঘাতে যখন চৈতন্যের উদয় হয়, তখন আর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্যোদ্ধার করা কঠিন ও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। এই ভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে করিতে, ক্রমে জাতি ও দেশগতভাবে অস্বাস্থ্যের আবির্ভাব হইয়া পড়ে।

এই প্রকার অস্বাস্থ্যের ক্রমবিবর্ত্তনে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যহীনতা বর্ত্তমানে ভীষণ অবস্থা ধারণ করিয়াছে।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কথা।

বাঙ্গালার এ দুর্দ্দশা চিরদিন ছিল না; কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালার শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলি, সুমিষ্ট শীতল পানীয় জল পূর্ণ অসংখ্য স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীসমূহ, ক্রমবিকশিত মনোরম ষড়ঋতু, বিচিত্র ফলপুষ্প পরিশোভিত বৃক্ষ-লতা, সুবর্ণ-কিরীট সুশোভন হিমগিরিশৃঙ্গ ও পদ প্রক্ষালিত অনন্ত নীলাম্বুরাশি, সর্ব্বত্র বিদ্যমান বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাবলী বাঙ্গালা দেশকে ভূস্বর্গে পরিণত করিয়া "সোণার বাঙ্গালা" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিল। তখন সুখশান্তিপূর্ণ বাঙ্গালীর মনে কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ, শত দিকে শতধারে উচ্ছলিত হইয়া ফুটিয়া বাহির হইত! গোচারণের মাঠে কৃষক বালকের সুমিষ্ট শিশুকণ্ঠনিঃসৃত মধুর গীতরবে, শ্রমজীবীর সারা-দিনের অদম্য পরিশ্রমান্তে দিবাবসানে সুমধুর হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যঞ্জক সঙ্গীত, সান্ধ্য বৈঠকে অফুরন্ত আনন্দ কলহাস্যে ও প্রাণারাম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে, বারমাসে তের পার্ব্বণে প্রতি কার্য্যে নানা আমোদ উৎসবে, শত শত স্বভাব কবির স্বাভাবিক রসোচ্ছ্বাস, সাহিত্য গীতি, কবিতায়, ঢপ, তর্জ্জা, কবি ও পাঁচালীর গানে—শতমুখে, সহস্রভাবে সে আনন্দ সুধার অভিব্যক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু "চিরদিন কভু সমান না যায়।" সুখের অবসা দুঃখের আগমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সু আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গেই যেন দুঃখের বীজ অলক্ষ্যে উপ্ত হইয়া পড়ে। সোণার বাঙ্গালার এ সুখের চিরকাল রহিল না। কি কুক্ষণেই উনবিংশ শতা মধ্যভাগে, প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে (১৮৫৬ খৃঃ ভীষণ দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর ভয়ঙ্কর নরশো পিপাসু রাক্ষসীর ন্যায় করাল মুখ ব্যাদান করিয়া বাঙ্গালা দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিল! স্বাস্থ্যানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ধনধান্য, সুখশান্তি, আমোদপ্র চিরতরে অন্তর্দ্ধান হইল। সোণার বাঙ্গালা রোগশো জর্জ্জরিত, সর্ব্বগ্রাসী মহারাক্ষসী ম্যালেরিয়া-প্রপী হইয়া নরকঙ্কাল-শবপূর্ণ ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল।

অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ ও তদানুষ নানাপ্রকার দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা দেশ

বঙ্গের সুপ্তিভঙ্গ।

নতির একটানা স্রোতে ভা চলিল। সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার বিধানে অকস্মাৎ এক সময়ে সে স্রোতের গতি হইল; বাঙ্গালীর মোহ ভঙ্গ হইল; নিজের শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নি করিল। অভাবের উপলব্ধি হইলেই উপায়ের উদ্ভা হইয়া থাকে। নিজ ভীষণ দুর্দ্দশা দূর করিবার বাঙ্গালীর দুর্ব্বল দেহে, ক্ষীণশক্তি ও অবসাদগ্রস্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। সামাজিক, রাজনৈ আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন জন্য বা বিবিধ প্রকারে চেষ্টিত হইল।

দেশের উন্নতি-বিধানোদ্দেশ্যে চারিদিকে কর্ম্মোৎসাহ, চেষ্টা ও যত্নের মধ্যে বুঝিতে বড় হইল না যে যে স্বাস্থ্যভঙ্গের

স্বাস্থ্যোন্নতির প্রয়োজনীয়তা।

বাঙ্গালা দেশের এই ভীষণ অ হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধান স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধান ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। দেশবাসিগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি না কখনই নৈতিক, ধর্ম্ম বিষয়ক, সামাজিক, আর্থি

রাজনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। শরীরই সমস্ত উচ্চ ও মহৎ গুণ সমূহের কর্ম্মক্ষেত্র এবং শারীরিক স্বাস্থ্যই সকল প্রকার সৎকর্ম্ম ও উন্নতির ভিত্তিভূমি। অতএব দেশের কোন প্রকার উন্নতি বিধান করিতে হইলে, দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এবং দেশ-ব্যাপী স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য দেশব্যাপী স্বাস্থ্যোন্নতি প্রয়াস প্রয়োজন। পৃথকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিলে এই বিশাল দেশব্যাপী মহাব্যাধির প্রতিকার কখনই সম্ভাবপর নহে।

দেশবাসিগণ এই বিষয়টি বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করিতেছেন; এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি

দেশবাসীর উপলব্ধি।

প্রধান সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নিজ অভিভাষণে দেশের মর্ম্মকথাই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন:—

"শরীর বহিলে তবে কর্ম্মসাধন হয়, লোকযাত্রা সাধন হয়; শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কিছুই হয় না, কোন কিছুই ভাল লাগে না। শিক্ষা বল, বিদ্যা বল, গুণপনা বল, বল বল, যশ বল, শরীর বহিলেই সব। যাহাতে আমরা সেই শরীর রাখিয়া বসবাস করিতে পারি তাহার জন্য অগ্রে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। * * * সর্ব্বরূপ আন্দোলনে বিশ্রাম দিয়া এই পরম মঙ্গলকর কার্য্যে লাগিয়া যাও; আর উদাসীনতায়, আলস্যে, নির্ব্বুদ্ধিতায় আসল খোয়াইয়া নকলের জন্য লালায়িত হইও না। কতবার বলিয়াছি, আবার বলি, সমস্ত বাজে কথা আর কাজের কথা ফেলিয়া রাখিয়া এখন দিনকতক বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা ভাবিতে হইবে। যাহার যতটুকু সাধ্য, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহাকে ততটুকু চেষ্টা করিতে হইবে। যে মহাপুরুষ—তিনি সন্ন্যাসী হউন, গৃহী হউন, হিন্দু হউন, মুসলমান হউন,—বাঙ্গালী জনসাধারণের মন এ বিষয়ে লাগাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালীর বন্ধু। আর যিনি এখন অন্য বিষয়ে বাঙ্গালীকে মন লাগাইতে উপদেশ দিবেন, তিনি বাঙ্গালীর পরম শত্রু। আমরা অস্বাস্থ্য-তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি. হাবুডুবু খাইতেছি,—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও।"

দেশীয় সংবাদপত্র সমূহে এবং নানা স্থানে জনসঙ্ঘ মধ্যে আলোচনা ও বক্তৃতায় স্বাস্থ্যোন্নতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে দেশবাসীর জ্ঞানোদয়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্টও সম্প্রতি দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। নানা স্থানে

গবর্ণমেণ্টের উপলব্ধি।

উপায় উদ্ভাবনের জন্য স্বাস্থ্যোন্নতি-বৈঠক (Sanitary Commission) বসিতেছে, সহরে (Municipal towns) স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আইন (Sanitary bill) প্রণীত হইতেছে; এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ সাহায্যও মঞ্জুর করিতেছেন; এবং এই মহদনুষ্ঠানে সফলতা লাভ করিবার জন্য দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

যাহাদের কায তাহারা উদ্যোগী না হইলে, নিজেদের অভাব উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া তাহা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা না করিলে, কখনই দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে না। অতএব ব্যাধি প্রপী-

স্বাস্থ্যোন্নতির সুবর্ণ সুযোগ।

ড়িত দেশবাসীরই সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার পর, এরূপ বহুব্যয়-সাপেক্ষ কার্য্য নিরুদ্যম, অনভিজ্ঞ দেশবাসি-গণ কর্ত্তৃক, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত, সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব এ মহৎ কার্য্যে ব্যথিত দেশবাসী এবং তাহাদিগের রক্ষণভার-প্রাপ্ত রাজপক্ষীয়ের সম্মিলিত আন্তরিক চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট নিজে উদ্যোগী হইয়া অলস, নিরুদ্যম গ্রামবাসীদিগকে জোর করিয়া কার্য্যে প্রণোদিত না করিলে, তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না; এবং গ্রামবাসীরাও স্বাস্থ্যোন্নতির আবশ্যকতা ও তৎসম্বন্ধে নিজ দায়িত্ব উত্তমরূপে বুঝিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কর্ম্মভার গ্রহণ না করিলে, উত্তম ফলোদয়ও হইবে না। অতএব এ পুণ্যকার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর আন্তরিক সাহায্য কার্য্য-সিদ্ধির জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। সৌভাগ্যের বিষয়, এখন শাসিত ও

শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই শুভ সম্মিলনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, অতএব অবনত বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধাতার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ, এ কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, দেশব্যাপী ব্যাধির প্রতিকার জন্য দেশব্যাপী আয়োজনই আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট শুধু মিউনিসিপ্যাল সহরগুলির বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানবিশেষের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যই যেন অধিক ব্যস্ত বলিয়া মনে হয়।

স্বাস্থ্যোন্নতির কর্ম্মক্ষেত্র।

দেশবাসিগণও স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করিয়া সেইরূপ অতি সামান্ত ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানবিশেষের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা কম এবং বাস্তব কার্য্যেও (practically) আমরা তাহাই জানিতে পারিতেছি। গবর্ণমেণ্ট তদনুষ্ঠিত স্বাস্থ্যোন্নতি প্রয়াসে বিশেষ সুফল ফলে নাই বলিয়া গত বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে (Annual Sanitary report) দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ বাদ দিয়া শুধু সহরগুলির স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিলে সে অসম্পূর্ণ, আংশিক চেষ্টা ত বিফল হইবেই, অর্থ ও উদ্যম বৃথা নষ্ট হইবেই; পরন্তু যে দেশে সহস্র মধ্যে ৯৩৫ জন লোক পল্লীগ্রামে বাস করে প্রকৃত পক্ষে সে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে, পল্লী-স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন। অতএব যথার্থ বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের মিলিত ভাবে বঙ্গীয় পল্লী-সমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইবে।

বর্ষা শেষ হইয়াছে, এখন বঙ্গের প্রত্যেক পল্লী-গ্রামেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। চারিদিকের মাঠগুলি জলপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, গ্রামান্তরে যাতায়াত বিষম কষ্টকর; বৃক্ষলতাচ্ছাদিত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথগুলি একহাঁটু জলকাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে, বিবিধ আগাছা পরিপূর্ণ খানা ডোবাগুলি জলপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বৃক্ষলতাপত্রাদি পচিয়া সেই জল গাঢ় সবুজবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বনজঙ্গল ও পতিত পত্রগুলি পচিয়া দুর্গন্ধে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাসগৃহ ও পরিধেয় দিবরাত্রি জলসিক্ত, তাহাই সর্ব্বদা হইতেছে, মশকের দল অষ্টপ্রহর কর্ণে রাগিণী আলাপ করিতেছে, মশক তাড়নে বিশ্রাম নাই, ত্বকের অনুভব শক্তিও লোপ বসিয়াছে। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে এই নারকীয় দৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় মনের স্ফূর্ত্তি থাকে, না সুস্থ থাকে? দু'দিন যাইতে না যাইতেই ঘরে ম্যালেরিয়ার অপ্রতিহত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ভীষণ জ্বরে হইতেছে;—কে কাহাকে দেখে, কে কাহার সেবা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে? প্রতি বৎসর সমগ্র অযত্ন-সেবিত রোগভবনের (Hospital) আকার করে—এক একটী ভীষণ শ্মশান বলিলেও অত্যুক্তি না। এই অবস্থাতেই ছয়মাস কাল কাটিয়া যায়। এই বর্ষাকাল রোগ-শয্যাই সকলের আশ্রয় স্থান, রোগ ভোগই একমাত্র জীবনের কার্য্য! অজস্র রোগীর কাতরোক্তি, মুমূর্ষু রোগীর শেষ বিদায় বিলাপ ও স্বজনের হৃদয়বিদারক শোকোচ্ছ্বাস, রোগশোক নিস্তব্ধ, নীরব পল্লীর ভয়াবহ দৃশ্য—সত্য সত্যই গুলিকে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর একাধিপত্যবিশিষ্ট শ্মশানে পরিণত করে। যে দেশের সহস্র মধ্যে ততোধিক জন লোকের বর্ষের অর্দ্ধেককাল এই অবস্থায় কাটিয়া যায়, সে দেশের উন্নতি কো সে দেশে মনুষ্যত্বের আশা করা নিশার ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যদি দেশবাসীর হৃদয় থাকে ও সেই হৃদয়ে হিত-ইচ্ছা স্থান পায়, যদি গবর্ণমেণ্ট অধীনস্থ দেশে সুখ স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে বঙ্গীয় পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া জীবন্মৃত বঙ্গবাসীর জীবনদান করুন! পাইলে তখন আর সমস্তই ক্রমে ক্রমে লাভ

বঙ্গপল্লীর অবস্থা।

হইবে না।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ-সাধ্য (Preventible) ব্যাধি—ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; এবং মানবের চেষ্টা দ্বারা বহু ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থান এক্ষণে ম্যালেরিয়া মুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া-তত্ত্বের গবেষণা দ্বারা ইহার নিদান সম্বন্ধে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থিরীকৃত হইতেছে। অন্যান্য কঠিন সমস্যান্বিত বিষয়ের মত এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মত; ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ম্যালেরিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করেন। সেসকলের আলোচনা করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, ভূমির আর্দ্রতা ও মশককুলই ম্যালেরিয়ার স্থিতি ও বিস্তৃতির প্রধান কারণ। অতএব ভূমির আর্দ্রতা নাশ ও মশকবংশধ্বংস দ্বারা ম্যালেরিয়ার বহু পরিমাণে নিবারণ সম্ভব। এই উপায় কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। ভূমির আর্দ্রতা নিবারণ এবং মশক বংশ ধ্বংস বিবিধ প্রকারে হইতে পারে, এ সম্বন্ধে সহজ এবং অল্প শক্তি ও অল্প ব্যয়সাধ্য উপায়গুলিই সর্ব্বপ্রথমে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী সহজসাধ্য একটী প্রাথমিক উপায়ের কথাই আজ দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি।

ম্যালেরিয়ার কারণ ও প্রতিকার।

প্রত্যেক পল্লীগ্রামে, ক্ষুদ্র হইলে দুই চারিটী একত্র করিয়া, স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিবার জন্য তত্রস্থ কয়েকজন উৎসাহী, সম্ভব হয় ত স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিদ্যা-ভিজ্ঞ, যোগ্য ব্যক্তিকে লইয়া একটি করিয়া "পল্লী-স্বাস্থ্য-সমিতি" গঠিত করা হউক। যেখানে অনেক শিক্ষিত পল্লীবাসী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছেন, সেখানে অতি সহজেই আপনা হইতেই এইরূপ সমিতি স্থাপিত হইতে পারিবে। কিন্তু অন্যত্র, যৌথ সমবায়-সমিতি (Co-operative Credit Society) সম্বন্ধে যেরূপ হইতেছে, সেইমত গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষা বিভাগের সাহায্যে গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া, এইরূপ সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন। এই সমিতি পুত্রকন্যার বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ও বারোয়ারী ফণ্ড হইতে কিছু কিছু চাঁদা আদায় করিয়া এবং অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় অর্থের কতক অংশ সমর্থ গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে সামান্য বার্ষিক চাঁদা স্বরূপ আদায় করিয়া নিজেদের মধ্যেই গ্রাম হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবেন। অসমর্থ দরিদ্র গ্রামজীবিগণ সাধ্য ও সময়মত শারীরিক পরিশ্রম দান করিবেন। গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় সংগৃহীত অর্থের সমতুল্য সাহায্য প্রদান করিবেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ হইতে এবং ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকালবোর্ডের ফণ্ড হইতে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এ সাহায্য করিতে পারেন। উপরন্তু পল্লী-শান্তি-রক্ষক চৌকিদার-পোষণের ব্যয়ভার কিয়দংশ পুলিস বিভাগ হইতে প্রদান করিলে চৌকিদরী ট্যাক্স স্বরূপ গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে আদায়কৃত টাকা কিয়ৎ পরিমাণে এই স্বাস্থ্যোন্নতি কার্য্যে সাহায্য করিলে কাহারও উপর অধিক ভার পড়িবে না, কাহারও কষ্ট হইবে না, অথচ প্রয়োজন মত অর্থ সহজেই সংগৃহীত হবে। এইরূপে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সমিতি—

(১) বৎসরে দুইবার—বর্ষার পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠমাসে একবার ও বর্ষার পরে কার্ত্তিক মাসে একবার—গ্রামের সমস্ত বন-জঙ্গল কাটাইয়া পরিষ্কার করিবেন এবং জল নিকাশের জন্য পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ ও সংস্কার করিয়া দিবেন। ইহাতে জল জমিয়া ভূমির আর্দ্রতা বৃদ্ধি করিতে, লতাপাতা পচিয়া বিকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি করিতে পারিবে না, সহজে বৃষ্টির জল গ্রামের বাহির হইয়া যাইবে, রৌদ্রতাপে ভূমি শুষ্ক থাকিবে এবং বনজঙ্গলের অভাবে ও মুক্ত বায়ু প্রবাহে মশককুলেরও বসবাস করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই উপায়ে ভূমির আর্দ্রতানাশ ও মশককুল ধ্বংস দ্বারা ম্যালেরিয়ার প্রতিকার অনেকাংশে

পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতি ও তাহার কার্য্যপ্রণালী।

স্বাস্থ্যোন্নতির পন্থা।

হইতে পারিবে। আমরা এইরূপ চেষ্টা করিয়া বিশেষ সুফল দেখিয়াছি। ম্যালেরিয়ার প্রিয় আবাসভূমি যশোহরেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দৃঢ় ভাবে এইরূপ চেষ্টাই আরম্ভ হইয়াছে।

(২) অর্থে ও সামর্থ্যে কুলাইলে দরিদ্র পল্লীবাসিগণের সুলভে ও অনায়াসে কুইনাইন ও জ্বরঘ্ন ঔষধাদি প্রাপ্তির সুবিধা ও সুব্যবস্থা করিতে পারিলে এবং তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক (personal hygiene and public health) উপদেশাদি প্রদানের ও তৎসম্বন্ধীয় সরল পুস্তকাদি প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, গ্রামের মধ্যস্থ খানাডোবাগুলি বুজাইবার বা অসমর্থ পক্ষে বর্ষাকালে তাহাতে মৎস্যের চাষের ও সপ্তাহে সপ্তাহে কেরোসিন তৈল নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, গ্রামের নিকটে কোন স্থানে পাট প্রভৃতি পচান বা মৃতদেহ নিক্ষেপ ও সৎকারের রোধ করিতে পারিলে, বালক ও যুবকগণের মধ্যে শারীরিক ব্যায়ামানুশীলনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ঘরবাড়ী, পথঘাট, বাগিচাগুলি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুসংস্কৃত রা পারিলে, পল্লীস্বাস্থ্যোন্নতি আরও উত্তম, দৃঢ় ও ভাবে সত্বর হইতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টের সহকারে পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতিগুলি ক্রমে ক্রমে এ কার্য্যও দক্ষতার সহিত করিতে পারিবেন, ইহা আশা করা যাইতে পারে।

ব্যাধিজর্জ্জরিত দেশবাসিগণ এই সহজ, প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার অদম্য উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেশ পুণ্যব্রত সাধন ও জীবনকে ধন্য, গৌরবান্বিত এবং অসংখ্য দুঃস্থ আর্ত্তের সেবার দ্বারা জগৎ প্রকৃত, প্রত্যক্ষ পূজার ব্যবস্থা করিতে, যথাযোগ্য যত্নবান হইবেন কি? আশা করি এই মহৎ প্রয়োজনীয় দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে রাজা কোন পক্ষেই বুদ্ধি ও শক্তির সদ্ব্যবহারে ত্রুটি বা হইবে না।

স্কুলে স্বাস্থ্যরক্ষা।

আমরা আমাদের ছেলেদের লেখাপড়া শিখাই,—তাহাদের সভ্য-ভব্য, শান্ত-শিষ্ট 'বাবু' করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য। এমন কি, যে মুসলমান সমাজের মধ্যে এখনও একটু মনুষ্যত্বের আমেজ, একটু জীবনের লক্ষণ দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা লেখাপড়া শিখিতেছেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ 'বাবু' হইয়া উঠিতেছেন। দুষ্টামি করা ছেলেদের স্বভাব। কিন্তু ছেলেরা একটু দুষ্টামি করিলে, আমরা তাহাদের এমন কড়া শাসন করি যে, তাহারা ভয়ে এতটুকু হইয়া যায়; সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে,—কখন কি অন্যায় করিয়া ফেলে, এবং বাপ মায়ের কাছে শাস্তি পায়। অনেক ছেলে দুষ্টু ত বটেই, তাহার সঙ্গে এমন একগুঁয়ে এবং অভিমানী, যে তাহাদিগকে শাসন করিলে তাহারা দুষ্টামি ত করেই না; পরন্তু, পিতামাতার উপর অভিমান করিয়া, মনমরা থাকিয়া, অচিরে তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফে বাধ্য হয়। এই সকল ছেলেকে যদি তাহাদের স্বভা যায়ী বাড়িতে দেওয়া হয়, তাহাদিগকে সর্ব্বদা অকারণে তিরস্কার বা কঠোর শাসন না করা যায় হইলে, তাহারা যথার্থ 'মানুষ' হইয়া উঠিতে পা বিলাতে ছেলেরা কিন্তু অন্য ভাবে 'মানুষ' হইয়া তাহারা দুষ্টামি ত করেই; এবং সে সকল স্থলে, তা অভিভাবকেরা প্রায়ই তাহাদিগকে দাবাইয়া দিয়া দের আখের মাটী করিয়া দিতে চাহেন না; তাহারা প্রতিবেশিদের সামান্য সামান্য অনিষ্ট করি তাঁহারা হাসিমুখে তাহা সহ্য করিয়া যান। শিশু-পালন প্রথা আবার আরও বিচিত্র।

অতি শৈশব কাল হইতেই ছেলেমেয়েদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপে আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য জাপানী ছেলেমেয়েদিগকে সকল বিষয়ে নিজেদেরই exertion করিতে হয়। তাহার ফলে, তাহারা যে কেবল আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে, তাহা নয়; তাহারা সঙ্গে সঙ্গে বলবান, দৃঢ়কায়, সুস্থ ও সতেজ হইয়া গড়িয়া উঠে। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ প্রতিবেশি বা নিঃসম্পর্কীয় অপর লোকের কোনরূপ অনিষ্ট করিলে তাহাদের আর কিছুতেই রক্ষা থাকে না; অধিকন্তু, তাহারা কাহাকেও সামান্য মাত্র বিরক্ত করিলেও, অভিভাবকের নিকট তিরস্কার বা শাসন লাভ করে। এমন কি অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিজেদের সামান্য সামান্য ক্ষতিও সহ্য করিতে পারেন না। এরূপ স্থলে তাঁহাদের শাসনের চোটে ছেলেমেয়েদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। এমন কি, আমাদের ছেলেমেয়েরা তাহাদের অভিভাবকগণকে সামান্য মাত্র বিরক্ত করিলেও, তাঁহারা তাহাদিগকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাবে শাসন করিয়া থাকেন। বিলাতে ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ে এমন practical joke করিয়া থাকে, যাহা আমাদের ছেলেমেয়েরা করিলে অভিভাকেরা চটিয়া লাল হ'ন। কিন্তু সেরূপ practical jokeএ যদি বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তবে বিলাতী ছেলেমেয়েদের অভিভাবকেরা, আত্মীয়স্বজনেরা বা পাড়া-প্রতিবেশিরা তাহাদের বুদ্ধির তারিপ করিয়া থাকেন। মোটের উপর, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের নিতান্ত নিরীহ, গোবেচারী, ভালমানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাই; আর বিলাত বা জাপানের অভিভাবকেরা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের বলবান, সতেজ, সাহসী, ও আত্মনির্ভরশীল ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলিতে চান। অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের যথার্থ 'মানুষ' গড়িয়া তুলিতে হইলে, তাহাদিগকে, যতটা পারা যায়, স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে দিতে হইবে। কিন্তু আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের সেরূপভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি কি?

স্কুলেও আমাদের ছেলেদের অবস্থা বাড়ীর চেয়ে একটুও ভাল নয়। সেখানেও সেই শাসনেরই প্রাধান্য। কেবলই শাসন, আর শাসন, আর শাসন। পড়া বলিতে না পারিলে শাসন,—দুষ্টামি করিলেও শাসন। স্কুলে ছেলেরা সব সময়ে পড়া বলিতে না পারিলে, সেটাতে ছেলেদের যতটাই দোষ থাকুক, শিক্ষকদেরও দোষ কম নয়। তাঁহারা ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে পারিলে, ছেলেরা অনেক সময়েই পড়া বলিতে পারে। সকল ছেলের মেধা সমান নয়। কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষা দান প্রণালী সকলের পক্ষেই সমান। কাজেই খুব মেধাবী ছেলেরা অল্পায়াসে শিক্ষকদের প্রদত্ত শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের মেধা তাদৃশ তীক্ষ্ণ নয়, তাহাদের শিক্ষাদান প্রণালীও একটু স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। তাহা হয় না; অথচ তাহারা মেধাবী ছাত্রদের মত শিক্ষকদের প্রদত্ত সাধারণ শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারে না। শিক্ষকেরা অনেকেই এই তত্ত্বটুকু জানেনও না, বুঝেনও না। তাঁহারা কেবল শাসনই করিতে জানেন। এইরূপে বাড়ীতে অভিভাবকের শাসন, এবং স্কুলে শিক্ষকের শাসন,—এই উভয় শাসনের পেষণে শিশুর প্রাণ ত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে। দুই দিকে দুই রকম শাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া, শিশু মানুষ হইবে কি করিয়া? বিলাতের বিদ্যালয়সমূহে ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিয়া, দুষ্টামি করিয়া থাকে। সেখানকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছেলেদের অন্যায় দেখিলে শাসন করেন বটে, কিন্তু সেই শাসনের মধ্যে ছেলেদের উপর তাঁহাদের এমন একটু মমত্ব বোধ থাকে, যে সে শাসন অতীব ফলপ্রদ হয়। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে এরূপ মমত্ববোধ বড় একটা দেখা যায় না। সংবাদ-পত্রে মধ্যে মধ্যে শিক্ষকদের এমন কড়া শাসনের কথা শুনা যায়, যে ক্ষেত্রে শাসনের চোটে ছেলেদের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। ইহাকে সুশাসনের পরিবর্ত্তে কুশাসন বলিলে কোন দোষ হয় বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ভাল শিক্ষক যে একেবারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু average শিক্ষকেরা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে

পারেন না। আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, শিক্ষক ভাল হইলে ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে, তাঁহার আদেশ উপদেশ বেদবাক্যের ন্যায় মনে করিয়া থাকে। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় এরূপ বহু শিক্ষকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইদানীং এরূপ শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ছাত্রদের নিজের পুত্রতুল্য স্নেহ করেন, এমন শিক্ষকের যেরূপ অভাব হইয়াছে, তাহাতে ছেলেরাও শিক্ষকদের তেমন দেবতার মত ভক্তি করিতে শিখিতেছে না।

আমরা গোড়াতেই বলিয়াছি যে, ছেলেরা যখন ভাল রকম পড়া বলিতে পারে না, তখন সে দোষটা তাহাদের একলার ঘাড়ে চাপানো সঙ্গত নহে, ইহাতে শিক্ষকদের, অর্থাৎ, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরও অংশ আছে। সে দোষ বা দোষগুলি কি কি, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব। শরীর ভাল থাকিলে তবে মন ভাল থাকিবে; মন ভাল থাকিলে তবে ছেলেরা শিক্ষকের পড়ানো আয়ত্ত করিতে পারিবে। কিন্তু ছেলেদের শরীর যাহাতে ভাল থাকে, সকল স্কুলে এমন ব্যবস্থা আছে কি? আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি,—আমরা নিজেদের বাল্যকালে এই কলিকাতা সহরে এমন স্কুলে পড়িয়াছি, যে স্কুলের অবস্থা অনেকগুলি ছেলের প্রত্যহ চার পাঁচ ঘণ্টা একসঙ্গে বাস করিবার উপযোগী নয়। সেই স্কুলে এমন একটা ঘরে আমাদিগকে (অন্ততঃ ৪০।৪৫টি ছেলেকে) প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে দশটা হইতে (মাঝে আধ ঘণ্টা টিফিনের সময় বাদে) অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত থাকিতে হইত, যে ঘরে দুপুর বেলাও ঘোর অন্ধকার; এবং একটুও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা সেখানে নাই। গ্রীষ্মের কয় মাস অতিরিক্ত দক্ষিণার পরিবর্ত্তে টানাপাখার বন্দোবস্ত হয় ত হইত,—এখন সে কথা আমাদের ঠিক মনে নাই; কিন্তু শীতকালের কয় মাস টানাপাখার বালাই নিশ্চয়ই থাকিত না। সে স্কুল এখনও আছে। তবে তাহার আভ্যন্তরীন অবস্থা এখন কিরূপ, তাহা বলিতে পারি না; কারণ, সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর হইতে আর সেখানে পদার্পণ করি নাই।

তার পর, স্কুলে কেবল মানসিক পরিশ্রমের ব্যবস্থা (এবং সে ব্যবস্থা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণেই) আছে, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের ব্যবস্থা আদৌ নাই বলিলেই হয়। স্কুলের পড়াইবার পাঁচ ঘণ্টা সময় ছাত্রদের সহিত শিক্ষকের সম্বন্ধ। সেই সময় বাদে শিক্ষকেরা ছেলেদের কোন খোঁজই রাখেন না। তাঁহারা কেবল ছেলেদের মানসিক পরিশ্রম করান, শারীরিক পরিশ্রম করান না; ছেলেরা শারীরিক পরিশ্রম (অর্থাৎ ব্যায়াম) করে কি না, সে খবরও তাঁহারা রাখেন না,—রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না; রাখা যে উচিত, সে জ্ঞান বা ধারণাই হয় ত তাঁহাদের নাই। অনেক স্কুলে ব্যায়াম করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, হয় ত তাহার স্থান পর্য্যন্ত নাই। ইহা কি শিক্ষকগণের, তথা শিক্ষাদান প্রণালীর ত্রুটি নহে? শরীর ও মনের সমান ভাবে পরিশ্রম হইল তবে ত ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে! তা' নয়,—শারীরিক পরিশ্রমের,—ব্যায়ামের কোন ব্যবস্থাই নাই,—অথচ, প্রত্যহ কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, পাঁচ ঘণ্টা একই ভাবে মানসিক পরিশ্রম। স্কুলের এই সকল ত্রুটিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই ত্রুটি কিরূপে সংশোধন করিতে হইবে, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। বিষয়টি অতি গুরুতর। ইহাতে আমাদের ছেলেদের,—বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এই বিষয়টির একটু বিশদ ভাবেই আলোচনা করিতে হইবে।

ছেলেদের ব্যায়াম করিতে উৎসাহ দিতে হইবে বটে; তাই বলিয়া, প্রত্যেক ছেলেকেই যে এক একটী পেশাদার পালোয়ানে পরিণত করিতে হইবে, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ছেলেদের শাসন-সংযম করিতে হইবে বলিয়া যে তাহাদিগকে এক একটী শয়তানে পরিণত হইতে দিতে হইবে, এমন কথাও আমরা বলি না। আবার, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে বলিয়া, তাহারা যে চব্বিশ ঘণ্টা, অহোরাত্র

কেবল পড়াশুনা লইয়াই থাকিবে,—এবং ক্রমে ক্ষীণজীবী, ক্ষীণদৃষ্টি, সামান্য-হাওয়ায়-উড়িয়া-যাওয়া নরকঙ্কালে পরিণত হইবে, ইহাও কখনও কাহারও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সকল বিষয় সামঞ্জস্য করিয়া কাজ করিতে হইবে। স্কুলে তাহারা পড়াশুনা করিবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতভাবে এই পরিমাণ ব্যায়াম করিবে, যাহাতে তাহাদের মাংসপেশীগুলি দৃঢ় হয়; তাহারা কর্ম্মময় জীবনে প্রবেশ করিয়া, পূর্ণ উদ্যমে, পূর্ণ উৎসাহে, পূর্ণ তেজে কাজ করিয়া জীবনে যেন সফলতা লাভ করিতে পারে। পড়াশুনার চাপে,—পাশের পর পাশ করিয়া উপাধির বোঝার ভারে জীবনের মধ্যাহ্নে তাহাদের মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ে; তাহারা যেন পাশ-করা অকর্ম্মণ্য জীবে পরিণত না হয়।

স্কুলে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল তাহার গৌর-চন্দ্রিকা ভাঁজিয়া রাখিলাম। বারান্তরে ক্রমান্বয়ে আমরা ইহার মূল পালাগুলি আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগকে শুনাইয়া দিব।

পোষাক পরিচ্ছদ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত—

পোষাক পরিচ্ছদ অত্যধিক শীতলতা এবং উষ্ণতা হইতে শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা রক্ষা করে এবং শারীরিক অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করে। ত্বকের স্বাভাবিক কার্য্যের সাহায্য করাই ইহার Physiological উদ্দেশ্য। ত্বক শীতে কুঞ্চন করিয়া শারীরিক উষ্ণতা রক্ষা করে এবং উষ্ণে প্রসারণ করিয়া শারীরিক উষ্ণতা কমায়। পোষাক ত্বককে সাহায্য করিতে গিয়া তাহার প্রকৃতি-দত্ত স্বাভাবিক কার্য্যের (Physiological efficiency) ব্যাঘাত না করিয়া প্রকৃতই যেন তাহাকে সাহায্য করে; অর্থাৎ বাহিরের তাপের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ত্বক শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতা রক্ষা করিতে যখন পারে না, তখন পোষাক ত্বকের সেই অক্ষমতা পূরণ করিবে। অক্ষমতা পূরণ করিতে গিয়া যতখানি সাহায্যের দরকার তাহার চেয়ে বেশী যেন না করে। বেশী করিলেই ত্বকের স্বাভাবিক কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া শরীরের অনিষ্টসাধন করিবে। ইহার প্রতি সকলের বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত যদি প্রকৃতই সত্য হয়, তবে দেখা যায় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই আবশ্যকের চেয়ে বেশী পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। ইহার অত্যধিক ব্যবহার ছোট শিশুর ও বালকের স্বাস্থ্যের যতটা ক্ষতি করে, তত যুবা বা প্রৌঢ়ের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না। ছোট ছেলেকে সদা সর্ব্বদা অনাবশ্যক পরিচ্ছদ পরিধান করাইলে সে দৌড়াদৌড়ি করে না বা কোন প্রকারে অঙ্গচালনা করিয়া শারীরিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে একেবারেই চেষ্টা করে না। কিন্তু এই অঙ্গচালনার উপরই শিশুর শারীরিক পুষ্টতা এবং বর্দ্ধন সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এবং তাহাতে শরীরে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ক্ষমতা সতেজ থাকে। একে ত অঙ্গচালনা না করিয়া স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করা হইল; তার উপর শিশুর শরীরের কার্য্যগুলির (Physiological functions) সমন্বয় এত সুন্দর ভাবে হয় নাই, যে কোন ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহারের জন্য সাধারণ শারীর কার্য্যের কোন ক্ষতি হইবে না। ফলতঃ দুইটী মিলিয়া শিশুর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে। সেই জন্যই বড়লোকের ছেলেদের মধ্যে rickets,

adenoids, illformed chest বা delicate health বেশী দেখা যায়। লালন পালনের দোষে শিশুর স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য নষ্ট হয়। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে ত্বকে "পরিমিত" ভাবে ঠাণ্ডা লাগিলে তাহার স্বাভাবিক কুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া ভাল থাকে এবং ত্বক সমস্ত আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয়গুলিকে sensory stimulus দিয়া বেশ সতেজ রাখে। শরীরকে উষ্ণ রাখিবার নিমিত্ত শিশু নিজেই কোন না কোন প্রকারে অঙ্গচালনা করিবে। ফলে শিশুর স্বাস্থ্য এবং দৈহিক বর্দ্ধন সুন্দররূপে সাধিত হইবে। সেই জন্যই শিশুর স্নানের জল এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে হাত ডুবাইলে শীতলতা বা উষ্ণতা বোধ করা যায় না। অন্য সকলের স্নানের জল যথাসম্ভব শীতল হইবে।

ত্বকের উপরেই ফ্লানেল বা পশমী পোষাক পরা উচিত নয়। কেন না ত্বক সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম বা তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসারণ করিতেছে; ফ্লানেল ও পশম নির্ম্মিত জিনিষ নিঃসারিত কোন পদার্থ শোষণ করিতে পারে না; ফলে ত্বক সর্ব্বদাই পূতিগন্ধময়, অনিষ্টকারী অবস্থায় থাকে এবং লোমকূপগুলি বন্ধ হইয়া যায়। তুলা বা রেশমী জিনিষের শোষণ করিবার ক্ষমতা থাকা। পশমী জিনিষ ব্যবহার করিতে হইলেই, তাহার নীচে সুতি বা রেশমী পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। নচেৎ ত্বকের স্বাভাবিক কার্য্য ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইবে।

আঁটা পোষাক কাহারও ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার এবং স্থানীয় রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত করিয়া পুষ্টির ক্ষতি করে। পোষাক যথোচিত বড় থাকিলেই আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়।

পোষাক যত হালকা হয় ততই ভাল এবং তাহার রংএর উপর শরীরের তাপ রক্ষণ ও বিকীরণের ক্ষমতা নির্ভর করে। ঈষৎ হল্‌দে ও সাদা পোষাক বাহিরের তাপ বিকীরণ করিয়া শরীরকে শীতল রাখে; সেই জন্য গ্রীষ্মকালে ইহার ব্যবহার অধিক। কাল পোষাক বাহিরের সমস্ত তাপ সঞ্চয় করে; সেই জন্যই শীতকালে কাল পোষাক সকলের ব্যবহার করা উচিত।

"মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা"

লেখক—শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র লাহা কবিরাজ।

২৩। ভোজনের পূর্ব্বে খেলে আদা আর নুন।
আহারেতে রুচি হয় বাড়ে পেটের আগুন॥

২৪। ঘিয়ে ভাজা হিং দুই রতি বিটলবণ রতি ছয়।
যোয়ানের জল সহ খেলে পেট ফাঁপা নাশ হয়॥

২৬। একটু কর্পূর মিশাইয়া কেরোছিন ও তার্পিন সনে।
ফিক্ ব্যথাতে মালিস কর আরাম পাবে সেইক্ষণে॥

২৬। আরবি গদ ও শ্বেত চন্দন কাঁচা দুধে ঘসে।
মাখন চিনি সহ খেলে যোনির জ্বালা নাশে॥

২৬। বাসক পাতার চুরুটের কর্‌লে ধূমপান।
ধূমে সদ্য নাশ হয় দারুন শ্বাসের টান॥

২৮। মধুর সহিত পিপুল চূর্ণ করিলে লেহন।
শ্বাস, কাস, মেদরোগ করে নিবারণ।

২৯। আমলকী, যজ্ঞডুমুর, গুরুচি হল্‌দির রসে।
কাঁচা দুধ মিশিয়ে খেলে মেহের জ্বালা নাশে॥

৩০। তেলাকুচার পাতার রস করিলে মর্দ্দন।
হাত, পায়ের জ্বালা-পোড়া করে নিবারণ॥

৩১। তুলসী পাতার রস আধ ঝিনুক, কর্পূর সিক রতি প্রমাণ।
মধুর সাথ খাওয়াইলে সারে শিশুর কাসি টান॥

৩২। টাট্‌কা শিমুল পুষ্প রেধে ঘৃত, বৈদ্যব যোগে।
খাইলে অব্যর্থ ফল, প্রদরাদি রোগে।

৩৩। সোদালের কচি পাতা বেটে নিমে মাখন সনে।
প্রয়োগেতে যায় শুকায়ে পচা ঘাও ৩।৪ দিনে॥

৩৪। আয়াপানের রস খেলে অল্প চিনি সনে।
যক্ষ্মারোগে রক্ত পড়া সারে এক্ দিনে॥

৩৫। রক্তমাশয়, রক্তবমি বা স্ত্রীলোকের রক্তপাতে।
দূর্ব্বার রস এক ঝিনুক দিবে একটু সাফ চিনিরসাথে॥

৩৬। সমুদ্রফেণ ও আফিং ঘসে, ধুতরা পাতার রসে
ঈষৎ-উষ্ণ প্রলেপ দিলে গলা ফোলা নাশে।

৩৭। স্তনদুগ্ধ ও মুড়ি ভিজান জলে চন্দন ঘসে।
সেবনে হিক্কার নাশ, মিনিট নয়, দশে॥
সোরার জল মিশিয়ে খেলে ঘুম, পা, ফোলা ভাল হয়।

৩৯। ওলকচু চূর্ণ সনে মাখম মিশ্রী আর।
তিন বেলা খেলে হয় অর্শে প্রতীকার॥

৪০। আহারান্তে ডাব খেলে শরীর শীতল হয়।
আর্য্যকীর্ত্তি আয়ুর্ব্বেদের গাও সবে জয়॥

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ সাল | ৮ম সংখ্যা

আলোচনা

মধ্য প্রদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগ—

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, ভারতের নানা স্থানে ক্রমশঃ সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে গবর্ণমেণ্টের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি পড়িতেছে এবং তদনুযায়ী উপায়ও অবলম্বিত হইতেছে। গত মাসে আমরা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের কথার উল্লেখ করিয়াছি; এবার মধ্য প্রদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নতির কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। মধ্য প্রদেশের স্যানিটারী কমিশনার মহোদয় ১৯১৮ অব্দের জন্য ঐ প্রদেশের যে স্যানিটারী রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিয়াছেন, তাহার উপর সরকারী মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মন্তব্যে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের উন্নতি সাধনের প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। এই বিভাগের উন্নতিকল্পে কয়েকজন ডেপুটী স্যানিটারী কমিশনারের নিয়োগ, একটী পাবলিক হেল্‌থ রিসার্চ্চ ইনিষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা, এবং গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটী স্যানিটারী সার্ব্বিসের উন্নতি সাধনের কল্পনা হইয়াছে। তবে গোড়াতেই এই একটী অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত কার্য্যের জন্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোক পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, এই অসুবিধা বেশী দিন থাকিবে না,—ঘোড়া যখন হইয়াছে, তখন চাবুকের জন্য বিশেষ ভাবনার কারণ নাই, তাহা হইয়া যাইবেই। তবে দুঃখের বিষয়, মধ্য প্রদেশে যে সকল মিউনিসিপ্যালিটি আছে, তাহাদের অধীন স্থানসমূহে স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে সকল উপবিধি বাহাল আছে, মিউনিসিপ্যাল কমিটিসমূহ, প্রকাশ, তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করিতে বা তাহাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। অপিচ, এই সকল উপবিধি পালিত হইতেছে কি না, তদনুযায়ী কাজ হইতেছে কি না, সে দিকেও কাহারও বড় একটা দৃষ্টি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। তবে সরকারী রেজোলিউসনে এইরূপ আশার বাণী শুনা যাইতেছে যে, লোক-শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে লোকে যখন ক্রমশঃ স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় অমনোযোগী হওয়ার ফলে লোকক্ষয়ের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন এ দিকে উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ ঘটিতে পারে। আমরাও পূর্ব্বে একবার এই কথাই বলিয়া রাখিয়াছি যে, শিক্ষার বিস্তৃতি না ঘটিলে, স্বাস্থ্য রক্ষার সরকারী ব্যবস্থায় তেমন কাজ হইবে না। কারণ, সরকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে

কি হইবে,—যাহাদের জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার বন্দোবস্ত তাহাদের বাদ দিয়া ত কোন কাজ হইতে পারে না; এবং তাহারা শিক্ষা না পাইলে স্বাস্থ্যরক্ষার যে সকল বন্দোবস্ত করা হইবে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝিবে কিরূপে? মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াও লোকাভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তার উপর, দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত, নিরক্ষর। মোটের উপর, তাহা হইলে,—এই দাঁড়াইতেছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষার বিস্তৃত বন্দোবস্ত করিবার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নতি সাধনের জন্য, সর্ব্বাগ্রে মেডিক্যাল স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ লোক তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃতি সাধন করিয়া লোকে যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা কল্পে সহায়তা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এপিডেমিক ড্রপ্‌সি—

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষকের সহকারী শ্রীযুক্ত হীরালাল সিংহ মহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ-সংলগ্ন রাসায়নিক পরীক্ষকের আপিস হইতে সংবাদপত্রে পত্র লিখিয়া কলিকাতা সহরে এবং অন্যান্য স্থানে এপিডেমিক ড্রপ্‌সি রোগের পুনরাবির্ভাবের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই রোগের কারণ কি তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইল না। মাজা চাউল যে ইহার কারণ, তাহা চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করিতেছেন না। এখন যখন আবার এই রোগের পুনরায় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তখন চিকিৎসকগণ ইহার নিশ্চিত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, হীরালাল বাবু বাঙ্গলার চিকিৎসক সম্প্রদায়কে এইরূপ পরামর্শ দিতেছেন। কোন কোন চিকিৎসক না কি পাকড়া মিশ্রিত সরিষার তৈলকে এই রোগের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। এই জন্য হীরালাল বাবু বলিতেছেন, কোন লোক বা কতকগুলি লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গেলে, তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যহ যে সরিষার তৈল ব্যবহার করিতেছিল, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া, তাহাতে পাকড়া মিশ্রিত ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এপিডেমিক ড্রপ্‌সি রোগের কারণ নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হইতে পারে। সরিষার তৈলে পাকড়া সন্ধান কিরূপে করিতে হইবে, হীরালাল বাবু সম্বন্ধে উপদেশ দিতেও বিস্মৃত হ'ন নাই। এই উপায় যদি পরীক্ষা করার সুবিধা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সন্দেহজনক তৈলের নমুনা হীরালাল বাবুর নিকট (মেডিক্যাল কলেজে রাসায়নিক পরীক্ষকের আপিসে) পাঠাইলে তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। পাকড়া তৈল এপিডেমিক ড্রপ্‌সির কারণ বলিয়া যে সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন পরীক্ষাটা হইয়া যাওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। পাকড়া তৈল এপিডেমিক ড্রপ্‌সির কারণ বলিয়া নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ত চিকিৎসকগণ এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আর, তাহা না হইলে রাসায়নিক পরীক্ষায় যে সকল সরিষার তৈলের নমুনার ভিতর হইতে পাকড়া তৈল বাহির হইবে, সেই তৈল বিক্রেতাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবারও সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু, পূর্ব্বে যখন একবার কলিকাতা এবং অন্যত্র এপিডেমিক ড্রপ্‌সির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তখন কিন্তু পাকড়ার তৈলের নামও কেহ শুনে নাই, তাহার অস্তিত্বের কথাও কেহ অবগত ছিল না। তখন কি এপিডেমিক ড্রপ্‌সি অন্য কারণে ঘটিতেছিল? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সে কারণটি কি, তাহা নির্ণীত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে কারণ নির্ণয়ের কোন সুযোগই এখন পাওয়া যাইবে না। আর এখন যদি পাকড়া তৈল এপিডেমিক ড্রপ্‌সির কারণ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠে যে, তৈলের কলওয়ালারা কি সেই তৈল হইতেই চুপি চুপি সরিষার তৈলে পাকড়ার তৈল মিশাইয়া সাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ

করিয়া আসিতেছিল? এরূপ অবস্থায়, যে দিক দিয়াই হউক, আমাদিগকে বিলক্ষণ ধাঁধায় পড়িয়া যাইতে হইতেছে।

আমেরিকার মদ্য বর্জ্জন—

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা শীঘ্রই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি হইয়া উঠিবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাহারা দৃঢ় চিত্তে মদ্য বর্জ্জন করিয়াছে। সুধার আস্বাদন কিম্বা অর্থলাভের প্রলোভন-কিছুতেই তাহাদিগকে তাহাদের সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা আর মদ্য স্পর্শ করিবে না। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু দিন পরে আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেন এবং আইন রচনা করিয়া দেশে মদ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; ঐ অস্থায়ী আইনের পরমায়ুও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলিয়াছিলেন, আর ঐ আইন রাখিয়া কাজ নাই, উহা বাতিল করা হউক। কিন্তু মার্কিন সেনেট-সভা ঐ আইনটিকে পাকা রকমে বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট উইলসনের খাতির রাখেন নাই। মদের মাশুল হইতে সরকারের অনেক টাকা আয় হয়। এই আয়ের প্রলোভন আমেরিকা হেলায় সংবরণ করিয়াছে। যে জাতির চরিত্রবল এত বেশী, সে জাতি বড় হইবে না ত কি!

ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়া—

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যে সকল ইংরেজ সেনা স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের অনেকের রক্তে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট দেখা গিয়াছে। এই সকল লোকের দেহের রক্ত শোষণ করিয়া মশকেরা অন্য সুস্থ লোকের দেহে ম্যালেরিয়ার বিষ সংক্রামিত করিতে পারে, এবং এইরূপে ক্রমে ইংলণ্ডে ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হইতে পারে—এমন আশঙ্কা কর্ত্তৃপক্ষের মনে জন্মিয়াছিল। সরকারী রিপোর্টে এই আশঙ্কার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্যবস্থা-গুণে এই আশঙ্কা এখন কমিয়া গিয়াছে, কিম্বা একেবারেই দূর হইয়াছে। চিকিৎসকেরা জানেন, ম্যালেরিয়ার বাহন এনোফেলেস জাতীয় মশকেরা অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে। যে সব বাড়ীতে খুব আলো আসে সে সকল বাড়ীতে, কিম্বা আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে নির্ম্মিত হাসপাতালে এনোফেলেস মশকেরা পদার্পণ করিতে সাহস করে না। এই সকল স্থানে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকেও, সুতরাং এনোফেলেস মশকেরা দংশন করিতে পারে না। এই জাতীয় মশকেরা প্রায় গোহালে, আস্তাবলে, ক্ষীণালোকিত কুটীরের অন্ধকারময় কোণে বাস করে। আধুনিক বাসগৃহে এনোফেলেস মশকেরা প্রবেশ করিলেও, অত্যন্ত ছটফট করিয়া থাকে, যেন পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে। এখানে তাহারা মানুষকে দংশন করে না। এই তত্ত্ব অবগত হইবার পর হইতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত সেনাগণকে এইরূপ উত্তম গৃহে রাখা হইতেছে, এবং তাহাদের রীতিমত চিকিৎসা করিয়া তাহাদের দেহের রক্ত হইতে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট ধ্বংস করা হইতেছে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলও খুব ভাল হইতেছে। চিকিৎসার দ্বারা রোগীরা আরোগ্যলাভ করিতেছে, এবং মশকের দ্বারা রোগের বিস্তারের সম্ভাবনা থাকিতেছে না। ইহার ফলে, ১৯১৭ অব্দে যত লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল, ১৯১৮ অব্দে তদপেক্ষা অনেক কম লোক এই রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। নৌবিভাগে ১৯১৭ অব্দে ২৫ জন ম্যালেরিয়া রোগী ছিল, ১৯১৮ অব্দে ৯জনের বেশী এই রোগী দেখা যায় নাই। সেনা বিভাগে ১৯১৭ অব্দে ১৬৩ জন ম্যালেরিয়া রোগীর স্থলে পর বৎসর ৬১ জন মাত্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। আর অসামরিক জনগণের (civil population) মধ্যে ১৯১৭ অব্দে ৪৩ জন ম্যালেরিয়া রোগী দেখা গিয়াছিল; ১৯১৮ অব্দে মাত্র ২৫ জন লোক ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হইয়াছিল। সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সকল স্থানই এইরূপে ম্যালেরিয়াশূন্য করা যাইতে পারে।

বঙ্গশিশু ও হুক ওয়ারম্।

লেখক—ডাক্তার শ্রী রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ।

অস্মৎদেশে শিশুর মৃত্যু সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সম্বন্ধে 'স্বাস্থ্য-সমাচারে' বহুবার আলোচনা হইয়াছে; তথাপি শিক্ষিত সমাজে স্বাস্থ্য-বিধিমত সুব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। পাশ্চাত্যদেশের লোকে স্বাস্থ্যের নিয়মানুসারে থাকায় তথায় মৃত্যু-সংখ্যা অনেক কম,—হাজারকরা ১৫ অংশ। আমাদের দেশে সুতিকাগারেই প্রায় ½ অংশ শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে ও প্রতি সহস্র নবজাত সন্তানের অর্দ্ধাংশ প্রায় দশ বৎসরের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কলিকাতা সহরে মৃত্যুর হার শতকরা ৩৫ অংশ; অন্যান্য দেশে প্রায় শতকরা ২৫ জন। কিন্তু বিলাতে নবজাত সন্তানের এই অর্দ্ধাংশ ৫০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বিলাতের তুলনায় পঞ্চম বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালক ও পঞ্চাশোর্দ্ধ প্রবীণের মৃত্যুর পরিমাণ এ দেশে দ্বিগুণ হইয়া থাকে। ইহা বড় কম আক্ষেপের কথা নয়। বঙ্গের ভাবী বংশধর-গণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক জননীকে শিশু পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া এইরূপ ভয়াবহ অবস্থায় প্রতিকার করা উচিত। আমরা অন্ধকূপের মত বদ্ধ কারাগারে সুতিকা-গৃহ নির্দ্দিষ্ট করি বলিয়া এক মাসের মধ্যেই শিশু ক্ষীণজীবী হইয়া পড়ে এবং সামান্য অযত্নের ফলে সর্দ্দি বা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে নূতন সংসারে অধিক দিন বাঁচিতে পারে না। এজন্য পিতা-মাতাকে যথেষ্ট মনস্তাপ পাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যে গৃহে উত্তমরূপে বায়ু পরিচালন ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে, সেই প্রকার গৃহ সুতিকাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা শিশু ও বালক-বালিকাদিগের পোষাকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখি না, দাস দাসীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উত্তম পোষাক ব্যবহার করা আবশ্যক। পোষাক পরিধান এমন ভাবে ঢিলে থাকা উচিত, যেন পেশীসমূহের প্রসারণে বাধা না দেয়। ঢিলে পেণী বা ত্বক দ্বারা শিশু ও বালকবালিকাগণের সমস্ত মেরুদণ্ড উত্তমরূপে আচ্ছাদিত রাখা কর্ত্তব্য এবং উহা এমন ভাবে প্রস্তুত (কাঁধে বোতাম দিয়া) করিবে, যেন সহজেই খুলিতে পারা যায়। ছেলেদের কোর্টো বোতাম চোস্তভাবে আঁটা উচিত নয়। কারণ, তাহাতে পঞ্জরাস্থির স্বাধীন গতি রহিত হইয়া ফুস্‌ফুস্ যথে আবশ্যকমত বিশুদ্ধ বায়ু যাইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। উহাদের কোমরবন্ধের দ্বারা সর্ব্বনিম্নস্থ পঞ্জরাস্থির উপ যেন চাপ না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উন্মুক্ত স্থানে কিছুক্ষণ খেলা করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত দৌড়াদৌড়ি করিলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া অনুচিত। কারণ তদ্দ্বারা পেশী ও অস্থি বলবান হয়। ব্যায়াম কালে সকল স্থানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়; বিশেষতঃ ত্বকের নিম্নস্থ রক্তবহা নাড়ীসমূহ অধিক রক্তে পরিপূর্ণ হওয়ায় ঘর্ম্ম হইতে থাকে। ব্যায়ামের সময় ঐ প্রকার ঘর্ম্ম হওয়া আবশ্যক। ঐ সময়ে শরীরাভ্যন্তরস্থ উত্তাপ কমিয়া যায়। এই ঐ সময়ে ঠাণ্ডা লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এবং অথবা আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রের প্রদাহ হইতে পারে। এজন্য ব্যায়ামের সময় গাত্রে ঢিলে আচ্ছাদন থাকা উচিত। ব্যায়াম শেষ হইলে ঐ পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া শুষ্ক ও গরম পরিচ্ছদ ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সকল বালকবালিকাদিগের পৈত্তিক বাত বা কফের পীড়া থাকে, তাহাদিগকে সর্ব্বদা পশমী পোষাকে আচ্ছাদিত রাখিবে। কিন্তু সাধারণ সুস্থ বালকবালিকাদিগকে ঐ প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়মে রাখিবার আবশ্যক নাই। তাহারা আদুড় গাত্রে খেলিয়া বেড়াইলেও দোষ হয় না। তবে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় তাহাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের একটু লক্ষ্য রাখা উচিত।

ছেলেদের কাপড় ও জামা একদিন অন্তর সাবান দিয়া ধৌত করা আবশ্যক; নচেৎ তন্মধ্যস্থ ময়লা লোম-কূপের ছিদ্র দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ হইতে পারে। সুস্থ বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ উত্তমরূপে সরিসার তৈল মাখাইয়া ঠাণ্ডা জলে গাত্র ধৌত করান আবশ্যক। স্নানের পর শুষ্ক তোয়ালে দিয়া গাত্র ঘর্ষণ করিলে শরীর উত্তপ্ত থাকে। এজন্য ঘর্ষণ করা উত্তম প্রথা। ঠাণ্ডা জলে স্নান করান অভ্যাস করাইলে ঋতু পরিবর্ত্তন সময়ে হঠাৎ কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। স্বাস্থ্য রক্ষা ও সৌন্দর্য্যের জন্য বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ স্নান করাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক। স্নান না করাইলে ত্বকের ছিদ্রসমূহ আবদ্ধ হইয়া যায়। ফলে, শরীর মধ্যস্থ দূষিত পদার্থ বহির্গত হইতে না পারায় নানা প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করে। স্নানের পর চুলগুলি ব্রুস দ্বারা আঁচড়াইয়া পরিষ্কার রাখা উচিত। ছেলেদিগকে জলে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক; কারণ, সকল প্রকার ব্যায়াম অপেক্ষা সন্তরণ উৎকৃষ্ট এবং অনেক সময়ে বিপদ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে।

আজকালকার বালকেরা শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত না ধুইয়া বিছানাতেই 'চা' পান করিয়া থাকে। এ প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রত্যহ প্রাতে দাঁতন অথবা ব্রুসের সাহায্যে কয়লার গুঁড়া কিম্বা চাখড়ি দিয়া দন্ত ধাবন করা উচিত। দন্ত ধাবন না করিয়া কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করা দোষাবহ। তদ্দ্বারা অনেক সময়ে কৃমি এবং অজীর্ণ রোগে ভুগিতে হয়।

বালকবালিকাদিগকে খালি পায়ে আর্দ্র ভূমির ঘাসের উপর বেড়াইতে দেওয়া অতীব অন্যায়; কারণ, হুকওয়ারম্ নামক কীটাণু পদ দ্বারা ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রক্তবহা নাড়ীর সহিত হৃৎপিণ্ডে চালিত হইয়া ফুস্‌ফুসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু উহারা আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়া ফুস্‌-ফুসের সূক্ষ্ম শিরা মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এ্যালভিওলির প্রাচীর ভেদ করিয়া ফুস্‌ফুসের গর্ত্ত মধ্যে থাকে। অবশেষে শ্বাসনালীর দ্বারা ল্যারিংসে আসিলে উক্ত হুকওয়ারমের কীটাণু সকল কফঃ বা গয়েরের সহিত গলাধঃকৃত হইয়া পাকাশয়ে পতিত হয়। তথা হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে গিয়া নিজ নিজ হুকের ন্যায় দন্ত দ্বারা অন্ত্রস্থ ঝিল্লির রক্ত শোষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ রক্ত পাতলা হইয়া রক্তহীনতা রোগ জন্মে। ফলে, তাহারা মাথাধরা, অজীর্ণ, পেট বেদনা, বুক দুড় দুড় করা এবং শোথ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্যানিটারি কমিশনারের তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মেদিনীপুরে শতকরা ৬৪.৭, হুগলিতে ৮৬ এবং কলিকাতায় ৪৭.৯ জন লোক হুকওয়ারম্ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্ত্রী-জাতীয় কীটাণু অন্ত্র মধ্যে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬০০০ ডিম্ব প্রসব করে। পরে মলের সহিত ঐ ডিম্ব সকল নির্গত হইয়া যায়। ভিজে, সেঁতসেতে ছায়াযুক্ত স্থানে অথবা গরম মৃত্তিকায় ডিম্বসমূহ ছোট ছোট কীটাণুতে পরিণত হয়, কিন্তু তাহা সাধারণ চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ সকল কীটাণু অনেকের পদ-তলের নিম্ন কিম্বা উপরিস্থ চর্ম্ম ভেদ করিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অথবা ঐ জীবাণু কাঁচা তরকারি কিম্বা পুষ্করিণী, পাতকুয়া অথবা নদীর জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মুখ গহ্বর দিয়া মানব দেহে প্রবেশ করে। এই প্রকার ভয়াবহ ও মারাত্মক ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে কদাচ খালি পায়ে থাকিবে না। জুতা বা

খড়ম ব্যবহার করিলে এবং মূলা, শশা, ইক্ষু, আম ও পেয়ারা ইত্যাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া খোসা ছাড়াইয়া বালকবালিকাদিগকে খাইতে দিলে হুকওয়ারম ব্যাধি হইবার আশঙ্কা থাকে না। নদী পুষ্করিণী এবং পাতকুয়ার জল ফুটাইয়া ব্যবহার করিলে নিরাপদে থাকা যায়। মাঠে মলত্যাগ করিবার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পায়খানা অথবা কুঁয়া পায়খানা প্রস্তুত করি মলত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। উক্ত ব্যা দ্বারা আক্রান্ত হইলে চিনোপডিম তৈল এবং খাইব ডাক্তারের উপদেশ মত ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট ম পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যতত্ত্বে উপেক্ষা।

লেখক—শ্রীচক্রধর সাহা।

মানব-জীবনের বহির্ভাগে শরীর ও অভ্যন্তরে মন অথবা আত্মা—যিনি যাহাই বলুন, এতদুভয়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সুস্থতাতেই জীবনের শুভ নির্ভর করিতেছে। জীবনের এই অংশদ্বয়কে সৃষ্টিকর্ত্তা এমনি সুন্দর ভাবে গঠন করিয়া প্রতিনিয়ত সুসম্বদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন যে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়। এমনি অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম শৃঙ্খলায় বিশ্ব-স্রষ্টা এই মানব-জীবনকে বিধৃত ও পরিচালিত করিতেছেন যে, ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলেই এই জীবন যন্ত্র বিকল হইতে চায়। আমি শিশুই হই বা বৃদ্ধই হই, অজ্ঞানই হই বা পণ্ডিতই হই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জানিয়া বা না জানিয়া যখনি প্রকৃতির এই নিয়ম শৃঙ্খলের একটী অতি ক্ষুদ্রতম অংশকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করি, তাহার ফল তখনি হাতে হাতেই ভোগ করিতে হয়। এখানে ব্যতিক্রম নাই, এখানে ক্ষমা নাই। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। দেহ ও মন এমনি অচ্ছেদ্য নিয়মে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতেছে যে, একের বৈকল্যে অপরের বৈকল্য অনিবার্য্য। এ সব সাধারণ তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত থাকিলেও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিস্মৃতি, উপেক্ষা বা প্রলেভনের বশে ইহার প্রতিকূলে চলিতে চাহিয়া নিজেকে বিপন্ন করিয়া ফেলি। হয় ত তাহা না বুঝিয়া আমরা প্রকৃতির বা অদৃষ্টের দোষ দিয়া থাকি। মনের মধ্যে অসুখ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে শরীর অসুস্থ বোধ হয়। আবার দেহে ব্যাধি উপস্থি হইলে মনও তাহার ফলে অসুস্থ, নিরাশ বা অবসাদা হইয়া পড়ে। শারীরিক স্বাস্থ্যই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তা উদ্দেশ্য। এই স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব শি জন্য সম্প্রতি দেশমধ্যে কিঞ্চিৎ আন্দোলন উপস্থি হইয়াছে। এটী শুভ লক্ষণ। "স্বাস্থ্য-সমাচারের" স সমূহ এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ ভা ব্যবহৃত হইতেছে; তাই সাহস করিয়া এই নগণ্য ব্যক্তি ঐ মূল্যবান পত্রের কিঞ্চিৎ স্থান অধিকারে প্রা হইতেছে।

সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগ প্রথমিক বিদ্যালয়স্থ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিতে ইচ্ছা ক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তম লাট বাহাদুরও দেশের স্বাস্থ্য-সংস্কারে বিশেষ ভা সঙ্কল্প রূঢ়। সুতরাং এই শুভ সুযোগে যাহাতে দে স্থায়ী কল্যাণ আনয়নে সমর্থ হওয়া যায়, দে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লা যাউন। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এই শুভ সূচনা বৃথা না হইতে পারে। কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রাম্য পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম ব সমূহেও কেন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা (Theoret and practical) প্রবর্ত্তিত হইবে না, তাহা বু

পারি না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় না থাকিলেও, কলেজে অনেক রকম বিজ্ঞানই অধীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান কেন্ যে এত দিন স্থান প্রাপ্ত হয় নাই তাহাই অবোধ্য। কলেজে এমন সকল বিজ্ঞানও ছাত্রগণ পড়িতে বাধ্য হয় বা পাদ-পূরণের জন্য বাছিয়া লয়, যাহা তাহাদের জীবনের কোন সময়েই কোন কাজে আসে না। কিন্তু এই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান যদি কলেজ-সমূহে অবশ্য গ্রহণীয় (Compulsory) বিষয় থাকিত, তবে খুব সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে, আমাদের যুবকদের মধ্যে বর্ত্তমানের ন্যায় এতটা স্বাস্থ্যহীনতা, এতটা ব্যাধি-পীড়ার অধিকার বুঝি বা বিস্তৃত হইতে পারিত না। যে দেহ-যষ্টীর উপর ভর করিয়া ব্যক্তি ও জাতি দাঁড়াইবে, যদি তাহাই এরূপ বিকল, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য থাকে, তবে এত জ্ঞান বিজ্ঞান, এত বিদ্যার অট্টালিকা কোথায়, কোন্ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে? সুতরাং প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহে যত শীঘ্র স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের শিক্ষা, দীক্ষা-হাতে হাতিয়ারে প্রবর্ত্তিত হয় ততই মঙ্গল। মেডিকেল স্কুল ও কলেজসমূহে যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কয়জন লোকে সে শিক্ষা প্রাপ্তির সুবিধা পায়? দেশের লোক সংখ্যা ও ছাত্র-সংখ্যার তুলনায় কতজন লোক মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজে যায় বা স্থান পায়? আর ডাক্তারদের মধ্যেই বা কয়জন কার্য্যগত জীবনে স্বাস্থ্য-নীতি পালন করিয়া থাকেন? অনেক স্থলেই দেখা যায়, ডাক্তাররা রোগীদের জন্য যে ব্যবস্থা দেন, নিজেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। ধূমপান, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অনেক বেলায় শয্যাত্যাগ, বদ্ধ গৃহে বা বদ্ধ বায়ুতে বাস বা নিদ্রা যাওয়া অনেক ডাক্তারের অভ্যাস। আহার, পান ও ব্যায়ামাদিতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিধি লঙ্ঘনও করিতে তাঁহারা ছাড়েন না। সর্ব্বত্রই এইরূপ উদাসীনতা ও উপেক্ষা। এই সমস্ত সাধারণ ঘটনা; ইহাদের প্রতিকার-কল্পে সম্ভবতঃ তেমন মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ মতভেদ উপস্থিত হইলেও সসম্মানে ও সানুনয়ে বিরোধিগণের নিকট নিবেদন, যেন তাঁহারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় কল্যাণের অনুরোধে পুনঃ পুনঃ কথাগুলির নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করেন। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তিরা এবিষয়ে লেখনী-ধারণ ও কার্য্যগত জীবনে বিজ্ঞানের নির্দ্দেশসমূহ প্রতিপালন করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। তাহাই বর্ত্তমান লেখকের উদ্দেশ্য। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন যদি স্কুল-কলেজে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন তবে খুবই আশার কথা। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারেন আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা। প্রত্যেকে আপন আপন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যদি স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী প্রতিপালনে সদা মনোযোগী থাকেন, তবে শীঘ্রই সমগ্র জাতি এ বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষিত প্রৌঢ় ও যুবকদের অধিকাংশই এ বিষয়ে উদাসীন। কেবল উদাসীন হইলেও দুঃখের বিষয় হইত না, তাঁহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয় যে শরীর সম্বন্ধে প্রকৃতির নিয়ম পালন অপেক্ষা উহা লঙ্ঘন করাই অনেকে গৌরবজনক মনে করিয়া থাকেন। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য অনেক স্থলেই ভাল। তবে যে সকল পল্লী অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার আবাস, সেখানকার অধিবাসী শিক্ষিত ও ধনী লোক মিলিত হইলে ম্যালেরিয়াকে একবারে দূর করা, অথবা ইহার ধ্বংস-কারিনী শক্তির হ্রাস করা খুবই সম্ভব। পুরাতন দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের সংস্কার, নূতন পুকুর ও ইন্দারা প্রভৃতি খনন ও তাহার জল রক্ষা করা সর্ব্ব প্রযত্নে কর্ত্তব্য। মল-মূত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া, তাহার দুর্গন্ধ ও দূষিত বাষ্প হইতে গৃহ ও গ্রামের বায়ুমণ্ডলকে যথাসম্ভব নিরাপদ রাখা,—এই সমস্ত বিষয়ে স্থানে স্থানে শিক্ষিত অভিভাবকের উপদেশ ও কর্ত্তৃত্বাধীনতায় মিলিত হইয়া কাজ করিলে যুবক দল অনেক কাজ করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরূপ চেষ্টা প্রায় কোথাও দেখা যায় না। বরং তাহার বিপরীত ব্যবহারই সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। যদি কোন স্থানের যুবকমণ্ডলী অথবা প্রবীণ দেশহিতকারী ব্যক্তিরা উক্তরূপ কিম্বা অন্য প্রকার আয়োজনে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়তায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন,

তবে তাঁহাদের নিকট বর্ত্তমান লেখক বিশেষ কৃতজ্ঞ। পল্লী-গ্রামে একই জলাশয়ের জলে সকলের হাত মুখ, বাসন ও বস্ত্রাদি ধৌত করা, মূত্রত্যাগ করা ও থুথু ফেলা, মল-ত্যাগের পরে হস্ত মার্জ্জনা, প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেই জলাশয়ের জল বিনা শোধনে সকলের পানার্থ ব্যবহার করা, খুব সাধারণ ব্যবস্থা। অশিক্ষিত লোকেরা যে এরূপ করে সেটা ক্ষমার যোগ্য হইলেও শিক্ষি লোকেরা যে এরূপ কাজ নিজেরা করেন, বা তাঁহাদে চক্ষের সম্মুখে অন্যকে করিতে দেন, ইহাই লজ্জার বিষ স্বাস্থ্য তত্ত্বে ঈদৃশ উপেক্ষা ও অবজ্ঞাই বাঙ্গালী জাতি একটী মহৎ কলঙ্ক।

সন্তান পালনে প্রসূতির অবস্থা।

সন্তানের সংখ্যাধিক্য

সন্তান পালনে সফলতা অনেকটা পরিমাণে প্রসূতির শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বহুসন্তানবতী নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য অনেকটা খুন্ন হইয়া পড়ে। তবে ইহাতে প্রসূতির ক্লেশ ছাড়া, সন্তান পালনে আর বিশেষ কোন অসুবিধা উপস্থিত হয় না। কিন্তু সন্তানের সংখ্যা যত অধিক হয়, স্তনে তত শীঘ্র শীঘ্র দুগ্ধ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়। অতএব যে প্রসূতি প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তানকে উত্তমরূপে স্তন দিয়া পালন করিতে না পারে, তৃতীয় হইতে অপর সন্তানগুলির পালনে তাহার সেরূপ কোন অসুবিধা হইতে দেখা যায় না।

গুরুতর পীড়া

সন্তান প্রসব করিবার পর প্রসূতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সন্তান পালনের ব্যাপারে বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়। পীড়া যদি মৃদু এবং স্বল্পকালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে রোগের প্রভাব প্রসূতির দেহে স্থায়ী হয় না। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠিন রোগে ভুগিলে, স্তনে দুগ্ধের পরিমাণের হ্রাস হয়, মাখনের অংশ কম থাকে, এবং খুব বেশী পরিমাণে প্রোটীড জমিতে আরম্ভ হয়। রোগবিশেষে দুগ্ধে ব্যাকটেরিয়া জন্মিতে দেখা যায়। নব প্রসূতির পথ্যাপথ্যের তদারক করিলে, তাহাকে লঘু-পাক অথবা পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিলে, দুগ্ধে মাখন ও প্রোটীড সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। বিলাতে আঁতু খোকাখুকির জননীরা নাইট্রোজেনবহুল খাদ্য, মাংস, দুগ্ধ, ডিম্ব, সীম বা মটর জাতীয় খাদ্য, ইত্যা ভক্ষণ করেন। ইহাতে তাঁহাদের স্তনে প্রোটীড অপেক্ষা মাখনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু, প্রসূ যদি একটুআধটু ব্যায়াম চর্চ্চা করেন, তাহা হই মাখনের সমানুপাতে প্রোটীডও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

আমাদের দেশে আঁতুড়ের কাঁচা পোয়াতি (শরীরের রস শুকাইবার জন্য) খুব ঝাল (লঙ্কা, মরি ইত্যাদি), শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য দুগ্ধ, মৃগু মৎস্য ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হয়। আজকাল আ প্রসূতিরা আঁতুড় ঘরে প্রচুর পরিমাণে চা সেবন করি আরম্ভ করিয়াছেন। শরীরের রস শুকা বার জ বোধ হয় চা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। এ উদ্দে কেহ কেহ যয়ফলও ব্যবহার করেন। স্তনে দুগ্ধ জন্য মৎস্যাদি ব্যবহৃত হয়; দুগ্ধের পরিমাণ নিয় কমিয়া গেলে গেঁড়ির ঝোল দিবার ব্যবস্থাও আ এতদ্ব্যতীত ঘৃতযুক্ত খাদ্য বেশী পরিমাণে দেওয়া যথ চিঁড়ে ভাজা, গজা প্রভৃতি। এই পথ্যাপথ্য আ দের গার্হস্থ্য ব্যবস্থা। ইহা কতদূর চিকিৎসা-বিজ্ঞা সম্মত তাহা কেহ কখনও পরীক্ষা করিয়াছেন বলি শুনি নাই। বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহাদের উপযোগি পরীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্য

দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয়ান নবপ্রসূতি-গণকে বেশী পরিমাণে তরল পদার্থ পান করিতে দেওয়া হয়। তাহাতে দুগ্ধের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু তাহা কেবল তরল অংশ; দুগ্ধের যে অংশ কঠিন, তাহার পরিমাণ বরং কমিয়া যায়। তবে malted দুগ্ধ পান করিলে, স্তনদুগ্ধের পরিমাণ যেমন বাড়ে, তাহাতে মাখনের অংশও তেমনি বেশী থাকে। কিন্তু প্রসূতির খাদ্য অপ্রচুর এবং কম পুষ্টিকর হইলে, স্তনদুগ্ধের পরিমাণও কমে এবং মাখন ও প্রোটীড কমিয়া যায়। আর এরূপ অবস্থাতেও যদি দুগ্ধ, মাখন ও প্রোটীডের আয়তন বাড়ে, তবে তাহারা আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না, তাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রসূতিকে যেমন খাদ্যই দেওয়া হউক না কেন, তাহার দুগ্ধের শর্করার অনুপাতের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

শিশুর দেহে ঔষধ ক্রিয়া

যে সকল শিশু এখনও মাই ছাড়ে নাই, তাহারা পীড়িত হইলে, তাহাদের জননীদের ঔষধ সেবন করাইতে হয়। সেই ঔষধ স্তন-দুগ্ধের সহিত শিশুর উদরস্থ হইয়া তাহার শরীরে ক্রিয়া করে। স্তন্যপায়ী শিশুর জননী পীড়িত হইলে, যেমন দুগ্ধ বিকৃত হয়, সেই পীড়ায় প্রসূতিকে ঔষধ সেবন করাইলে সেই ঔষধও তেমনি শিশুর দেহে সঞ্চালিত হয়। তবে সকল ঔষধ এরূপভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। সেরূপ ঔষধের সংখ্যা কয়েকটি মাত্র; এবং তাহারা বিভিন্ন অনুপাতে শিশুর উদরস্থ হয়। এলকোহল, অহিফেন, এট্রোপাইন, ক্লোরাল এবং আইওডাইড ঘটিত ঔষধ দুগ্ধের সহিত স্তন হইতে বাহির হইতে পারে। কি পরিমাণে ঔষধ প্রসূতিকে সেবন করাইলে তাহা শিশুদেহে ক্রিয়াশীল হইতে পারে, তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। রুবার্ট, সেন্না, ক্যাষ্টর অয়েল এবং স্যালাইন ক্যাথারটিক জাতীয় ঔষধও স্তনদুগ্ধের সহিত বাহির হইয়া আসে। মধ্যে মধ্যে স্যালেসিলেটস, কোপাইব, কোলচিকম, এণ্টীপাইরিন, [illegible]প্রিন, লৌহ এবং আর্সেনিক জাতীয় ঔষধও দুগ্ধের সহিত শিশুর দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া পারদঘটিত ঔষধ প্রসূতিকে সেবন করাইলে, তাহার অতি সামান্য অংশমাত্র শিশুর উদরস্থ হয়।

প্রসূতির ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা

প্রসূতি সামান্য পরিমাণে ব্যায়াম করিলে, সচরাচর তাহার দুগ্ধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে প্রোটিডের পরিমাণ কম থাকে।

স্নায়বিক বিকার বা ভাব-বৈলক্ষণ্য।

প্রসূতির স্নায়বিক বিকার ঘটিলে তাহাতে দুগ্ধের যেমন বিকৃতি ঘটিতে পারে, এবং এই বিকৃতি যতটা দ্রুত ঘটিয়া থাকে, এমন আর কিছুতেই হয় না। দুঃখ, ক্রোধ, আতঙ্ক ইন্দ্রিয়বিকার; অতিরিক্ত উত্তেজনা এবং ক্লান্তির ফলে দুগ্ধ অতি দ্রুত বিকৃত না হইয়া যায় না। এরূপ অবস্থার শিশুকে স্তন্য পান করাইলে, তাহা শিশুর দেহে বিষবৎ করে, এই বিকৃত দুগ্ধ শিশু হজম করিতে পারে না। ইহার ফলে সময়ে সময়ে শিশুর আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। দুগ্ধের এই বিকৃতি প্রধানতঃ তাহার প্রোটীড অংশেই ঘটিয়া থাকে। এই দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে হইলে, একটা স্তন হইতে সমস্তটা দুধ বাহির করিয়া লইয়া পরীক্ষা করা উচিত।

দুগ্ধের উপাদানের পরিমাণ নির্ণয়।

অতঃপর, দুগ্ধে কোন উপাদান কি পরিমাণে আছে, তাহা যথাসম্ভব স্থির করিতে হইবে। মেজার গ্লাসের ন্যায় চিহ্নিত একটি কাচের নলাকার গ্লাসে দুগ্ধ রাখিয়া ঘরের সাধারণ উত্তাপে ২৪ ঘণ্টা কাল স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত মাখনের অংশটা উপরে ভাসিয়া উঠিবে, তাহার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ মাতৃ-স্তন্যের তৈলজ পদার্থ।

দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং তৈল জাতীয় পদার্থের

পরিমাণ অধিক থাকিলে উহাতে প্রোটীডের অংশও বেশী আছে বুঝিতে হইবে। আর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ও মাখনের অংশ কম হইলে বুঝিতে হইবে, উহাতে প্রোটীডের অংশও কম। দুগ্ধ উত্তম হইলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ ১০৩০; এবং উহাতে মাখনের অংশ শতকরা ৮। এই পরিমাণের ইতরবিশেষ হইলে দুগ্ধও ভাল অথবা মন্দ বিবেচন করিতে হইবে।

স্তন উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে, এবং প্রথম যে খানিকটা দুগ্ধ বাহির হইবে, তাহা ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী দুগ্ধ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, সাধারণতঃ উহাতে কোন রোগের বীজাণু (Bacteria) থাকে না। প্রসূতির (suppurative) কিম্বা যক্ষ্মা রোগ থাকিলে, কিম্বা প্রসূতি অপর কোন প্রকার সাধারণ বীজাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত হইলে, তাহার দুগ্ধেও ঐ সকল রোগের বীজাণু পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এই সকল পরীক্ষাই মাতৃস্তন্যের সম্বন্ধে চূড়ান্ত পরীক্ষা নহে। দুধ খাইয়া ছেলে কেমন থাকে, শিশুর দেহে উহা কতখানি সহ্য হয়, তাহা দেখাই প্রসূতির দুগ্ধের সর্ব্বপ্রধান পরীক্ষা। রাসায়নিক পরীক্ষায় যে দুগ্ধ উত্তম বলিয়া বুঝা গেল, তাহাও শিশুর দেহে সহ্য হইতে নাও পারে; এমন কি শিশুর দেহে উহা বিষবৎ কার্য্য করিতে পারে। ঠিক নিয়মিত সময়ে এবং নিয়মিত পরিমাণে মাই খাওয়াইয়াও যদি দেখা যায়, শিশুর ঐ দুধ হজম হইতেছে না, তাহা হইলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে; অর্থাৎ মাই দিবার পূর্ব্বে শিশুকে বার্লি খাওয়াইয়া অল্প পরিমাণে মাই দুধ দিতে হইবে; কিম্বা হয় ত শিশুকে অপর কোন ধাত্রীর স্তন্য পান করাইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

প্রসূতির দেহের অবস্থা, স্বাস্থ্য এবং বয়স অনুসারে তাহার দুগ্ধের গুণের ইতরবিশেষ ঘটে। সচরাচর ২০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকদিগের স্তনদুগ্ধ উত্তম। বেশ হৃষ্ট পুষ্ট স্বাস্থ্য সম্পন্ন প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ বেশী হয়। আবার অনেক ক্ষীণকায়া স্ত্রীলোকের দুগ্ধও ভাল হইতে পারে।

সন্তান প্রসব করিবার কিছু দিন পরে প্রসূতি আবার ঋতুমতী হইতে আরম্ভ করে। ইহাতে শিশুর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে ঋতুর প্রথম দিন বা প্রথম দুই দিন তাহার স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ কম হয়; এবং ঐ দুই দিন দুগ্ধের গুণেরও কিছু ব্যত্যয় ঘটে। তাহার পর আবার দুগ্ধ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

জনৈক চিকিৎসক ১৮০টি প্রসূতিকে পরীক্ষা করেন। তাহাদের মধ্যে ৭৯ জনের সন্তানের বয়স ছয় মাস হইতে তাহাদের আবার ঋতু আরম্ভ হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও সন্তান পালনে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। সকলেরই রক্তস্রাব খুব বেশী পরিমাণেই হইতেছিল, অথচ তাহাদের কোলের শিশুরা মাই খাইয়া বেশ পুষ্টি লাভ করিতেছিল। তবে শিশুরা প্রথম প্রথম দুই চারি দিন একটু ছটফট করিয়াছিল, কাহারও কাহারও উদারাময় বা অজীর্ণতার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, কেহ কেহ বা করিয়া দুধ তুলিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যে তাহারা সুস্থ হয়। কিন্তু গর্ভ হইলে মাইতে দুধের পরিমাণ খুব কমিয়া যাইতে থাকে; যেটুকু দুধ পাওয়া যায়, গুণাংশেও তাহা নিকৃষ্ট।

কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিবার পর প্রথম প্রশ্ন এই উঠে যে, সে তাহার সন্তানকে মাই দিয়া কি মানুষ পালন করিতে পারিবে কি না? অনেক চিকিৎসক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হন। অনেক প্রসূতির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহার পক্ষে সন্তানের লালন পালনের ভার গ্রহণ করা অসম্ভব, কিম্বা হয় ত বাঞ্ছনীয় নহে। আবার, ক্ষেত্রবিশেষে প্রসূতির তাহার শিশুকে পালন করিতে পারিবে কি না, তাহা দুই চারি দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। তবে এই কথাটী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গর্ভধারিণী সমর্থা হইলে, তাহারই হাতে তাহার শিশুর লালন পালনের ভার থাকা উচিত। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সভ্যদেশের নারীদিগের মধ্যে শতকরা ৩৯ হইতে ৫৫ জন

নিজ নিজ সন্তানকে স্তন পান করাইয়া মানুষ করে। আর দুই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বয়সের মধ্যে যে সকল শিশু মারা পড়ে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৪টি শিশু কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু শতকরা ৯০টি জননীই স্ব স্ব সন্তানকে স্তন দিয়া পালন করিতে সমর্থ। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজের মাই দিয়া ছেলে মানুষ করা অনেক মা-ই পছন্দ করিত না। তবে সুখের বিষয় আজকাল এই ভাবটি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এখন অনেক মা নিজের সন্তানকে মাই দিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু একটু উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সন্তান পালনে ক্রমশঃ অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন কোন অবস্থায় প্রসূতিকে সন্তান পালন করিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সেই অবস্থাগুলি কি কি,—এইবার তাহার আলোচনা করিব। প্রথমতঃ স্তনে যদি যথেষ্ট দুধ না জমে, তাহা হইলে সন্তান পালনের চেষ্টা করা বৃথা। এরূপ চেষ্টার ফলে, শিশুও পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, প্রসূতিরও কষ্ট হয়, সে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার স্বাস্থ্য আরও ক্ষীণ হইয়া যায়। জননীর যক্ষ্মা রোগ থাকিলে, তাহার পক্ষে শিশু পালন করা অনুচিত এবং অনিষ্টকর। বুকের কোন শক্ত ব্যায়রাম থাকিলেও জননী শিশু পালনের অযোগ্যা। জননীর chorea, মৃগী বা মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ থাকিলে শিশুর পালনের ভার অপরের হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল ক্ষেত্রে জননী শিশুর পালন ভার গ্রহণ করিলে প্রসূতি ও শিশু উভয়েরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। আবার কোন প্রসূতি তাহার পূর্ব্ব সন্তানকে অনুকূল অবস্থাতেও পালন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিলে তাহার পক্ষেও শিশু পালনের চেষ্টা করা সঙ্গত নয়। প্রসূতি দুর্ব্বল হইলে সে যেন ছেলেকে মাই দিবার চেষ্টা না করে।

পচন-নিবারক চিকিৎসা।

ANTISEPTIC TREATMENT.

লেখক—ডাক্তার শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

মহামতি লর্ড লিষ্টার মহোদয় দ্বারা পচন-নিবারক চিকিৎসা আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে, পচনশীল ক্ষতাদি, এমন কি, আভ্যন্তরীন যন্ত্রাদিতে কোন প্রকার পচনশীল অপায় সংঘটিত হইলেও পচন-নিবারক পদ্ধতি অবলম্বনে জগতে অসংখ্য রোগী মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইতেছে। অধুনাতন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তর্গত অস্ত্রচিকিৎসা-শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রকার্য্য-নির্ব্বাহার্থ পচন-নিবারক পদ্ধতিই একমাত্র অবলম্ব্য হইয়াছে; এবং তজ্জন্যই পাশ্চাত্য শল্য-চিকিৎসাই জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়া সমগ্র পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মুখরিত করিয়াছে। পচন-নিবারক পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হইলে, কঠিন কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা কার্য্যে কুশলতা লাভ করা অসাধ্য হইত। যদিও আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রে শল্য-চিকিৎসা বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ কথিত আছে; এমন কি, উদরমধ্যস্থ স্ফোটক ও অর্ব্বুদাদিতে অস্ত্রোপচারের বিষয় উল্লিখিত আছে; কিন্তু অধুনাতন আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞানানুসারে শল্যচিকিৎসা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব; কারণ, কার্য্যকুশল কর্ম্মকার দ্বারা নানাবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া পূর্ব্বকালে তদ্দ্বারা শল্য-চিকিৎসা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। সেকালের যন্ত্রাদি দেখিয়া তদ্রূপ যন্ত্রাদি প্রস্তুত

হইতে পারে ; কিন্তু সেরূপ যন্ত্রসকল কোন বৈদ্যের নিকটে আছে বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে সেইরূপ বর্ণনা অবলম্বনে কোন প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না ; যথা,—

শাস্ত্রে এর্ব্বারু, কুরর, ক্রৌঞ্চ, তরক্ষু ; অবভঞ্জন, নন্দিমুখ, বাজপক্ষী ইত্যাদি পশু পক্ষীর মুখের আকৃতির ন্যায় বহুবিধ যন্ত্রাদির বিবরণ আছে। সেই সকল যন্ত্রের চিত্র অথবা যন্ত্র দেখিলে তদনুরূপ যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে পারিত ; নচেৎ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

শাস্ত্রানুসারে শস্ত্রক্রিয়া করাইতে গৃহস্থকে বৈদ্যের আদেশানুসারে নানাবিধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হইত ; যথা ;—যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ, জোঁক, তিত লাউ, জাম্ববোষ্ঠ (এক প্রকার শলাকা) তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সুতা, পাতা, পাট, মধু, ঘৃত, বসা, দুগ্ধ, তৈল, (তিল তৈল) তর্পণ দ্রব্য, কষায় দ্রব্য, আলেপন দ্রব্য, স্বল্ক দ্রব্য, পাখা, শীতল জল, উষ্ণজল, ও কড়া ইত্যাদি। বৈদ্য শস্ত্রক্রিয়া করণানন্তর ক্ষতস্থানে বন্ধনাদির পর বিহিত স্থানে রোগীকে রক্ষা করিয়া রক্ষামন্ত্র পাঠ করিতেন। এই প্রকার বিধি ব্যবস্থায় অস্ত্র কার্য্যাদি হইত ; কিন্তু এরূপ পদ্ধতি অনুসারে অস্ত্র কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কার্য্যকুশল বৈদ্য আবশ্যক এবং আবশ্যক দ্রব্যাদিরও অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আজিকালি উক্ত রূপ সুপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, প্রায় সর্ব্বত্রই কুশল বৈদ্যের অভাব এবং আবশ্যক দ্রব্যাদিরও সংগ্রহ হওয়া কঠিন।

আবার, যথায় কুশল বৈদ্য আছেন, হয় ত তথায় তাঁহার যন্ত্রাদিরও অভাব ; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে কার্য্য ঘটিয়া উঠে না। কার্য্য না হওয়ায় শিক্ষার্থীদেরও শল্য চিকিৎসা কার্য্যের দর্শন ঘটে না। শল্য-চিকিৎসা দর্শন না করিলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা হইতে পারে না। এই সকল নানাবিধ কারণে শাস্ত্রানুসারে শল্য-চিকিৎসা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৃহস্থগণও শাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না ; এমন কি, তাঁহারা অনেকেই মনে করেন যে, আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রে অস্ত্র-চিকিৎসা বিষয়ক কোন বিশে বিধি-ব্যবস্থা নাই ; এবং এ বিষয়ে আর্য্য চিকিৎসা-শা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে পশ্চাৎপদ। অবশ্য শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ এ কথা বলা কঠিন ; কার সর্ব্বদা আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্রানুসারে যদ্যপি অস্ত্র-চিকি সাদি কার্য্য দেখ যাইত, তাহা হইতে বুঝিতে পারা য হইত যে, পাশ্চাত্য সার্জ্জারী হইতে আর্য্য শল্য-তন্ত্র কা করী কি না।

এই সকল বহুবিধ কারণে আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্রানুসারে শল্য চিকিৎসা লোপ পাওয়ায়, অন্য পক্ষে পাশ্চাত্য সার্জ্জারীর প্রভূত উন্নতি হওয়ায় জনসমাজের যথে উপকার সাধিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, আরও বিশে সুবিধার বিষয় যে, অস্ত্র চিকিৎসার জন্য যে সকল দ্রব্যা আবশ্যক, তাহা সংগ্রহের জন্য বিশেষ ক্লেশ ভোগ করি হয় না এবং তাহাদের মূল্যাদিও যথেষ্ট সুলভ। পূর্ব্বে কতকটা বলা হইয়াছে, পাশ্চাত্য সার্জ্জারীর একমাত্র পচন নিবারক পদ্ধতিই প্রধান সহায় ও সম্পত্তি ; সুতরাং উহা অনুসরণ করিলেই কার্য্যের কুশলতা ঘটিয়া থাকে। কি দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ এ সম্ব বিষয়ের কোন তত্ত্বই রাখেন না ; অথচ সংসারে প্রত্য নানাবিধ আভিঘাতিক অপায় আদি সংঘটিত হইতেছে কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই সেই সকল অপায় আদি হইতে রক্ষা পাইতে পারা যায়। অনেক সময়ে দেখা যা অনবধানেই অধিক রোগী কষ্ট পাইয়া থাকে ; এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সকল দুর্ঘটনা যাহাতে সহ ঘটিতে না পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক গৃহস্থেরই আধুনি পচন নিবারক পদ্ধতি অবগত হওয়া উচিত।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, কতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু শরীরস্থ হইয়া ক্ষত, ফোটক প্র ইত্যাদি নানাবিধ জটিল রোগ উৎপাদন করে। সকল জীবাণু সর্ব্বদা বায়ুমণ্ডলে এবং জলে প্রচুর পরিমা অবস্থান করে। উহারা বাসের উপযুক্ত স্থান পাই যথেষ্ট বংশবৃদ্ধি করে ; এমন কি, তখন একটী জী ২৪ ঘণ্টায় ১৬ লক্ষ জীবাণুর সৃষ্টি করিতে পার

প্রত্যেক জীবাণু দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া দুইটী জীবাণু হয় ; এবং পুনরায় দুইটী জীবাণু চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া চারিটি জীবাণু হয়। এইরূপ ক্রমে উহাদের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। উহারা সর্ব্বদাই নিশ্বাস, পানীয় ও আহার্য্যের সহিত আমাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করে ; কিন্তু আবার দৈবানুগ্রহে আমাদের শরীরস্থ শ্বেত-রক্ত-কণিকা উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে।

কোন কারণে শ্বেত-কণিকার বল কম হইলে উহারা জাতি অনুসারে শরীরের আভ্যন্তরীণ বিশেষ বিশেষ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে ; এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে শ্বেত কণিকাসকল ধাবিত হয়। এ কারণ সেই স্থানে অধিক পরিমাণে রক্ত চালিত হয় ; ফলে, স্নায়ু সকলে চাপ পড়িয়া বেদনা উৎপাদন করে। শ্বেত-রক্তকণিকাগুলির নাম বৈজ্ঞানিক ভাষায় (white blood corpuscles) হোয়াইট ব্লড কারপস্কলস্। ঐ সকল হোয়াইট ব্লড কারপস্কলস্ যখন জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিতে আইসে, তখন উহাদের নাম হয় (phagocytes) ফ্যাগোসাইটস্ এবং ঐ সকল জীবাণু ধ্বংস করা ক্রিয়ার নাম (phagocytosis) ফ্যাগোসাইটোসিস্। এই ফ্যাগোসাইটোসিস্ ক্রিয়ার দ্বারা জীবাণুসকল ধ্বংস হইয়া থাকে। যদ্যপি শারীরিক শ্বেতকণিকার দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত (phagocytosis) ফ্যাগোসাইটোসিস্ ক্রিয়া কম হয়, তাহা হইলে জীবাণু সকল শ্বেতকণিকাদিগকে ধ্বংস করিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়া শারীরিক নানাবিধ কঠিন কঠিন অপায় সংঘটিত করে। কোন স্থানে স্ফোটক উৎপাদন করিয়া পুঁয জন্মায় ও ও পচন হয়। পুঁয জন্মাইয়া পচন আরম্ভ হইলে পুঁয বাহির করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। সেই কারণেই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া পুঁয বাহির করিয়া দেওয়া হয় পুঁয বাহির হইলে জীবাণুসকল কতক পরিমাণে পুঁযের সহিত বাহির হইয়া যায়। কিন্তু সম্যক বাহির না হওয়ায় পুনরায় জীবাণুর প্রভাবে পচন হইয়া প্রত্যহই পুঁয জন্মায় এ কারণ ঐ জীবাণুসকলকে কৃত্রিম উপায়ে ধ্বংস করিতে পারিলে, সহজেই পচন ও পুঁয বন্ধ হইয়া ভিতরে সুস্থ রক্ত পরিচালিত হওয়া ক্ষত পুরিয়া উঠে ও নূতন মাংসাঙ্কুর (cicatrix) সিকেট্রিক্স দ্বারা ক্ষতের মুখ জুড়িয়া যায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই সকল নিয়মেই শারীরিক অপায় আদি সংঘটিত হয়, এবং এই স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার নিরাময় হয়। স্বাভাবিক নিয়মে নিরাময় হয় বলিয়া অনেকে পীড়াগ্রস্ত হইলেও সহজে চিকিৎসাধীন হইতে চাহেন না ; বলিয়া থাকেন, স্বভাবের উপর থাকিলেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই বোঝেন না যে, প্রকৃত স্বাভাবিক নিয়ম কি, এবং কি নিয়মেই বা স্বভাবের উপর থাকা হয়। অপিচ, প্রায়ই দেখা যায়, তাঁহারা বরং স্বভাবের প্রতিকুলাচরণই করিয়া থাকেন, এবং তাহার ফলে অনেক সময়ে তাঁহারা দুরারোগ্য কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়েন। চিকিৎসা-কার্য্য যে কেবল স্বাভাবিক নিয়মের অনুসরণ মাত্র, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষিত হয় চিকিৎসাশাস্ত্রে মাত্র তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। কি উপায়ে রুগ্ন শরীরে স্বভাবের কার্য্য সুলভ ও দ্রুততর হয়, চিকিৎসকমাত্রেই তদ্বিষয়ক চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকেন। সুতরাং চিকিৎসা-কার্য্যই যে কেবল স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষার প্রধান সহায়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহামতি লর্ড লিষ্টার মহোদয় এই স্বাভাবিক নিয়ম-রক্ষা-সূত্র অবলম্বন করিয়া পচন-নিবারক চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, কোন উপায়ে পচন উৎপাদক জীবাণুদিগের ধ্বংস সাধন করিতে পারিলেই পচন-ক্রিয়া স্থগিত হইয়া অপায় সংঘটিত স্থানের পরিবর্ত্তন হইবে। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঠিক ; কারণ, পচন-উৎপাদক জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য শরীরস্থ শ্বেতকণিকাসকল সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া থাকে ; ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কৃত্রিম উপায়ে ঐ স্বাভাবিক নিয়মের সহায়তা করিতে পারিলেই, অর্থাৎ জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিতে পারিলেই, স্বাভাবিক নিয়মের অনুকূলাচরণ করা হইল।

স্ফোটকাদিতে অস্ত্রোপচার করিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দেওয়ার পর ক্ষতের চিকিৎসার জন্য অর্থাৎ

ক্ষত মধ্যস্থ জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি ও পচন নিবারণার্থ পচন-নিবারক চিকিৎসা কার্য্য প্রযোযিত হইয়া থাকে; সে কারণ সুচিকিৎসক মাত্রেই পচন-নিবারক পদ্ধতি অনুসারে ক্ষতাদি ধৌত ও বন্ধন করিয়া থ্যকেন।

ক্ষত অনাবৃত রাখিলে বায়ুমণ্ডল হইতে পচন-উৎপাদক জীবাণু সকল ক্ষতে প্রবিষ্ট হইয়া পচন ও পূঁযোৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং ক্ষত আবৃত করিবার জন্য বন্ধনী (Bandage) আবশ্যক হয়। ক্ষত হইতে বিগলিত বিধান ও পূঁয়াদি নির্গত করাইবার জন্য পচন-নিবারক ধাবন (Lotion) লোসন দ্বারা তাহা ধৌত করাই বিধেয়।

স্ফোটক আদিতে অস্ত্রোপচার করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়।

গুরুতর অস্ত্রকার্য্য, যথা, অঙ্গচ্ছেদ (Amputation, এমপুটেশ্রন, উদর মধ্যস্থ স্ফোটক (Abscess এবসেস্) ও অর্ব্বুদ (Tumour টিউমার ইত্যাদিতে অস্ত্রকার্য্য করিতে হইলে অধিক সময় লাগে এবং রোগীও অসহ্য কষ্ট পায়। তজ্জন্য রোগীকে চেতনাহীন করিয়া অস্ত্রকার্য্য করা হইয়া থাকে। চেতনাহীন করিতে প্রায়শঃ ক্লোরফরম (Chloroform) ও ইথার (Ether) ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ক্লোরোফরম ও ইথারের আঘ্রাণে রোগীর চেতনাশক্তি লুপ্ত হয় এবং সে অজ্ঞান অবস্থায় অবস্থান করে। তৎকালে অনেকক্ষণ ধরিয়া অস্ত্র-কার্য্যদি করিলেও রোগী কিছুমাত্র অবগত হইতে পারে না। ইহাতে অস্ত্রকার্য্যের বিশেষ সুবিধা ঘটে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ দেশীয় কোন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—"Tropacocainæ" ট্রোপেকোকেন নামক এক প্রকার ঔষধ চর্ম্মনিম্নে পিচকারি দ্বারা প্রয়োগ করিলে বক্ষদেশের নিম্ন হইতে সম্যক্ অধোদেশ অনেক ক্ষণের জন্য অসাড় হইয়া যায়। তদবস্থায় একখানি পদ উচ্ছেদ করিয়া দিলেও রোগী কোন প্রকার ক্লেশ বোধ করিবে না। অথচ রোগীর সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিবে এবং ভবিষ্যতে কোন প্রকার হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। শুনিয়াছি এদেশেও না কি ঐ প্রকার পদার্থের দ্বারা অস্ত্র-কার্য্য হইতেছে। অবশ্য এ সকল উপায় সম্পূর্ণ নূতন। [সে] কারণ সকলে উহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি[তে] চাহেন না। কিছুদিন উহার কার্য্য কলাপ দেখি[লে] সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা চলিবে বলিয়া বোধ হয়।

গৃহস্থ-বাড়ীতে চিকিৎসক দ্বারা সাধারণ অস্ত্রকা[র্য্য] করা হইলে পর, অনেক সময়ে গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা ক্ষতাদি ধৌতি প্রভৃতি কার্য্য করান হইয়া থাকে। সম্পা[ন্ন] পন্ন ব্যক্তিদিগের গৃহে চিকিৎসকের দ্বারাই সে কা[র্য্য] নির্ব্বাহ হইলেও, চিকিৎসার সাহায্যার্থ সাধারণ ব্যক্তি[গণ] নিয়োজিত হইয়া থাকে। এ কারণ সর্ব্বদাই দেখি[তে] পাওয়া যায়, সাধারণ ব্যক্তি পচন-নিবারক পদ্ধতি অব[গত] না থাকায় যথানিয়মে কার্য্যাদি ঘটিয়া উঠে না। সে [জন্য] চিকিৎসকদিগকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হ[য়]। এই হেতু, জনসাধারণ এ বিষয়ে একটু মনোযো[গী] হইলে, বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তৎবি[ষয়ে] সন্দেহ নাই।

সাধারণ ক্ষতাদি আরোগ্য করণার্থ যেরূপ আচর[ণ] করা উচিত, তদ্‌বিষয়ে যৎসামান্য বলা যাইতেছে :—

যে সকল স্ফোটক ও ক্ষতাদিতে প্রচুর পরিমা[ণে] পূঁযাদি সঞ্চিত হয়, তাহা প্রত্যহই ধৌত করিয়া ব[ন্ধনী] দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয়।

যে সকল ক্ষতের বিগলিত অংশ ও পূঁয এবং র[ক্ত] নিস্রাব কম থাকে, তাহার ধৌতাদি কার্য্য ২।৩ দিন অ[ন্তর] করিলেও ক্ষতি হয় না। উদর-অভ্যন্তরস্থ স্ফোটকাদি[র] আবরণ ইহা অপেক্ষা দীর্ঘকাল অন্তর পরিবর্ত্তন ক[রা] হইয়া থাকে। বৃহৎ বৃহৎ চিকিৎসালয়ে তৎসমুদায় ধৌ[ত] করিবার সময় বিশেষ ভাবে পচন-নিবারক পদ্ধ[তি] অবলম্বিত হয়। যে গৃহে ঐ সকল কার্য্যাদি হয়, [সে] সমুদায় অংশ গৃহের পচন নিবারক ধাবন (Lotion) [দ্বারা] ধৌত হইয়া যাহাতে সেই গৃহের বায়ু পর্য্যন্ত পচন[কারী] জীবাণু হইতে মুক্ত থাকে তাহাও অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য পরিষ্কার জল অর্দ্ধ[ঘণ্টা] কাল অগ্নির উত্তাপে ফুটাইলে সমুদায় জীবাণু [ধ্বংস] হইয়া যায় এবং ঐ প্রকার ৩৯ ভাগ জলে (Carbolic acid) কারবলিক এসিড ১ ভাগ মিশ্রিত করিলে সুন্দর পচন-নিবারক ধাবন প্রস্তুত হয়। বলা আবশ্যক, উক্ত উষ্ণ জল শীতল করিতে সাধারণ শীতল জল মিশান উচিত নহে; আপনা হইতেই শীতল হইবার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার পচন-নিবারক জীবাণুনাশক পদার্থের দ্বারা ঐ প্রকার ধাবন প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা আধুনিক সুচিকিৎসক মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। উক্ত ধাবন ইত্যাদি ধৌত করণার্থ বিশেষ উপযোগী ও সুলভ। ইহা প্রস্তুত করিবার পর একটী কলাইকরা কাচ, প্রস্তর, চিনা মাটি কিম্বা নূতন মৃন্ময় পাত্র, উক্ত ধাবন Lotion) লোশনে বিশেষ রূপে ধৌত করিয়া তাহাতে উক্ত ধাবন ঢালিয়া রাখিতে হইবে। ক্ষতে বন্ধনী দিবার জন্য পচন-নিবারক বন্ধনী বাজারে বিক্রীত হয়। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ধোপ-কাচা বস্ত্রখণ্ড অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল জলসহ অগ্নিতাপে ফুটাইয়া পূর্ব্ব কথিত লোসনে ডুবাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উত্তম পচন-নিবারক বন্ধনী প্রস্তুত হইতে পারে। ক্ষতাদি যে ব্যক্তি ধৌত করিবে সে ব্যক্তি প্রথমে উত্তমরূপে সাবান (Soap, সোপ্) দ্বারা হস্তদ্বয় ধৌত করিয়া পরে উক্ত লোসনে ভাল করিয়া হস্ত ধৌত করিবে। তৎপরে ক্ষতের আবরণ উন্মোচন করিবে। উক্ত রূপে হস্ত ধৌত করিলে হস্তে কোন প্রকার জীবাণু থাকিতে পারে না। সুতরাং ক্ষতের উপর অঙ্গুলি সংলগ্ন হইলে নূতন জীবাণু ক্ষতের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। ক্ষতের আবরণ অপসারিত করিয়া পূর্ব্ব কথিত (Carbolic lotion) কারবলিক লোসন ক্ষত মধ্যে পিচকারি অথবা (Absorbent cotton) এবসরবেণ্ট কটন (একপ্রকার বিশুদ্ধ তুলা) কিম্বা (Douche) ডুস (ঊর্দ্ধ হইতে জল পাতিত করণার্থ যন্ত্র) সাহায্যে ধৌত করিয়া পূঁয ও বিগলনাদি বাহির করিয়া দিবে (ডুসই উক্ত কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী যন্ত্র)। বিগলিত অংশ (Slough, শ্লফ) যথাসাধ্য উঠাইয়া দিবে। শ্লফ উঠাইতে Forceps) ফরসেপস্ (চিম্‌টা) আবশ্যক হয়। কার্য্যকালে যন্ত্রাদি চিমটা, ডুস (Probe) (শলা) ইত্যাদি কারবলিক লোসনে ধৌত করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে; নচেৎ যন্ত্রাদি হইতেও ক্ষতে কোন প্রকার জীবাণুর সংস্পর্শ ঘটিতে পারে। অস্ত্র-কার্য্যাদি করিবার কালে ১৯ ভাগ জলে ১ ভাগ কারবলিক এসিড দিয়া লোসন প্রস্তুত করিয়া যন্ত্রাদি ভিজাইয়া রাখা হয় এবং চিকিৎসকও উক্ত লোসনে হস্তাদি প্রক্ষালন করিয়া অস্ত্র-কার্য্য করিতে ব্রতী হন। ক্ষতে ও উহার চতুষ্পার্শে যতদূর বন্ধনী দ্বারা আবৃত থাকিবে, ততদূর উত্তমরূপে ৩৯ ভাগে ১ ভাগ কারবলিক লোসনে ধৌত করিয়া দেখিতে হইবে, উহাতে বিগলন (Slough) শ্লফ অধিক আছে কি না। যদি অধিক শ্লফ থাকে, তবে উহাতে (Boric acid) বোরিক এসিড ৫ ভাগ (Iodoform) আইডোফরম ১ ভাগ একত্রে মিশাইয়া ক্ষতের উপর ছড়াইয়া দিবে এবং তৎপরে (Iodoform gauze) আইডোফরম গজ নামে এক প্রকার বস্ত্রখণ্ড ৩।৪ পুরু করিয়া ক্ষতের উপর আবরণ করিবে। এবং তৎপরে তদুপরি (Boric wool) বোরিক উল (বোরিক এসিড মিশ্রিত তুলা) বেশ পুরু করিয়া দিবে এবং পূর্ব্বোল্লোখিত বন্ধনী দ্বারা উত্তমরূপে অতিরিক্ত চাপ না দিয়া বন্ধন করিবে। এইরূপে বন্ধন করিলে ক্ষতে বহিরস্থ কোন জীবাণু প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। এবং জীবাণু-নাশক ধাবন (Lotion) লোসন দ্বারা ধৌত হওয়ায় ও (Boro-Iodoform Powder) বোরো আইওডোফরম পাউডার (বোরিক এসিড ও আইওডোফরম মিশ্রিত চূর্ণ) প্রয়োগ করায় অভ্যন্তরস্থ জীবাণু সকল ধ্বংস হইয়া যায়। ক্ষতে ক্রমশঃ (Slough) শ্লফ, (বিগলন) কম হইলে কেবল মাত্র (Boric ointment) বোরিক অয়েণ্টমেণ্ট মাখাইয়া তদুপরি পূর্ব্বমত গজ ও তুলা দিয়া বন্ধনী প্রয়োগ করিবে। বোরিক এসিড্ একটী উত্তম পচন-নিবারক ও জীবাণুনাশক ঔষধ। আইওডেফরম ও ততোধিক। তবে উহার উগ্র গুণ থাকায়, অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ক্ষতে কেবল মাত্র আইওডোফরম প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া দিলে, ক্ষতের

দ্বারা উহা শোষিত হইয়া শরীরস্থ হইলে, রোগীকে অনেক সময় পাগলের ন্যায় করিয়া তুলে। সে কারণ উহা বোরিকের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে তদ্রূপ হয় না। এই সকল ঔষধ দ্বারা যথা নিয়মে ক্ষতাদি ধৌত করিলে, ক্ষত সহজেই আরোগ্য হয় এবং কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকে না। রোগীর বস্ত্র ও শয্যাবরণাদি প্রত্যহ ধোপ-কাচা অথবা ক্ষারে ফুটাইয়া ব্যবহার করা বিধেয়। মলিন বস্ত্রাদিতে সর্ব্বদা পচনশীল জীবাণু প্রচুর পরিমাণে অবস্থান করে। এই সকল বিষয়ে মনোযোগী না হইলে অনেক সময়ে সামান্য ক্ষ কোন প্রকার বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করিয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে পারে। ক্ষত জীবাণুদিগের বাসের পক্ষে উপযোগী স্থান। সুতরাং সামান্য ক্ষতেও যাহাতে জীবাণু সকল প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য মহামতি লর্ড লিষ্টার মহোদয় প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে পরিচালিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।

স্কুলে স্বাস্থ্য-রক্ষা

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের কি অভিভাবক, কি ছাত্র, কি শিক্ষক—সকলেই মনে করেন যে, স্কুলে গিয়া কতকগুলা বই মুখস্থ করিয়া বছর বছর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলেই ছাত্র-জন্ম, তথা, মানব জন্ম সার্থক হইল। কিন্তু বাস্তবিক কথা তাহা নহে। স্কুলে যেমন মানসিক অনুশীলন হইবে, ঠিক সেই অনুপাতে এবং সেই পরিমাণে শারীরিক অনুশীলন হইবে। পড়াশুনা করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, ব্যায়াম করাও তেমনি অবশ্য করণীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্কুলে যে সকল বিষয়ে অধ্যাপনা হয়, কোন ছাত্র যদি তাহাদের মধ্যে কোনটিতে কিছু কাঁচা থাকে, তাহা হইলে, সেই বিষয়টিতে যেমন তাহাকে একটু অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়া একটু বেশী পরিমাণে অনুশীলন করিতে হয়, ব্যায়ামের সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যেক ছাত্রের শারীরিক অবস্থার ডাক্তারী পরীক্ষা হওয়া উচিত; সেই পরীক্ষায় যদি কম জানা যায় যে, তাহার শরীরের কোন অংশ কিছু developed, কিম্বা কিছু দুর্ব্বল,—তাহা হইলে ব্যায়ামকালে সেই ত্রুটি যাহাতে সংশোধিত হয়, সেই দিকে একটু বিশেষ ভাবে রাখিতে হইবে। বিদ্বান হওয়া যেমন সকলেরই বিষয়, সুস্থ থাকা, সবল, কষ্টসহিষ্ণু হওয়াও সকলের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। শরীর যদি থাকিলে, যতই লেখা পড়া শেখা যাউক না কেন, কোন কাজের হয় না। কবি গাহিয়াছেন,—

"মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন;
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন।"

এক সময় ছিল, যখন কবির ঐ কথাটিই বিবেচিত হইত; ছাত্রেরা মন দিয়া সকল ধনের বিদ্যা মহাধন উপার্জ্জন করিলেই, সকলের সীমা থাকিত না। কিন্তু, সে দিন এখন আর এখন কেবল ঐ কথাটিতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে আধুনিক কবিকে ঐ কথা ত গাহিতে হইবেই; উপর ইহাও গাহিতে হইবে,—

"মন দিয়া কর সবে স্বাস্থ্য উপার্জ্জন;
সকল ধনের সার স্বাস্থ্য মহাধন।"

আবার, কেবল ব্যায়াম করিলেই যথেষ্ট হইবে ব্যায়ামটি পরিমিত ভাবে হওয়া চাই।

পরিশ্রমের অনুপাতে যতটুকু ব্যায়াম করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে, তদতিরিক্ত ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন নাই। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে অনেক ছেলে ব্যায়ামের পরিমাণ ঠিক করিতে পারে না। ফুটবল খেলার সময়ে এইটি বেশ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। খেলার ঝোঁকে,—ম্যাচ খেলার সময়ে গোল করিয়া প্রতিপক্ষকে হারাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে—ছেলেরা প্রায়ই অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং শরীরে যতটা সহ্য হয়, তাহার বেশী দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া, খেলার শেষে একেবারে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ব্যায়াম করিতে হইবে বটে. কিন্তু অতিমাত্রায় যাহাতে ব্যায়াম করা না হয়, সে-দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

তার পর, অনেকগুলি ছেলে প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘণ্টা স্কুলে আসিয়া এক সঙ্গে বাস করে। সাধারণ ভাবে, তাহাদের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইটি করিতে হইলে, স্কুল-গৃহ স্বাস্থ্যকর স্থানে নির্ম্মাণ করিতে হয়। ম্যালেরিয়া-দুষ্ট স্থানে যেন স্কুল-গৃহ নির্ম্মিত না হয়। গ্রাম হইতে একটু তফাতে খোলা ময়দানে সর্ব্ব প্রকার দুর্গন্ধ ও আবর্জ্জনাশূন্য স্থান স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। ভাগাড়, গোহাল, পচা-পুকুর, বা যে স্থানে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা নাই, এমন সকল স্থান হইতে সুদূরে স্কুলের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। স্কুলের স্থান নির্ণয়ের জন্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Science) এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের (Sanitary Science) সহায়তা গ্রহণ করা উচিত।

স্থান নির্ব্বাচিত হইলে, গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। স্কুল-গৃহ দেখিতে খুব সুদৃশ্য না হইলেও কোন হানি নাই; স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণে আড়ম্বরেরও কোন প্রয়োজন নাই। কেবল দেখিতে হইবে, ক্লাস বসিবার কক্ষগুলি অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে না হয়; ঘরগুলিতে বেশ হাওয়া খেলে, এবং যথেষ্ট আলো আসে। ক্লাসে অনেকগুলি ছেলে যখন একসঙ্গে বসিয়া পড়াশুনা করিবে, তখন তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে কক্ষের বায়ু দূষিত হইতে পারে। ঘরে রীতিমত হাওয়া খেলিলে এই দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়, এবং তাহার স্থলে তাজা নির্ম্মল বায়ু আসিতে পারে। যে কক্ষে ক্লাস হইবে, সে কক্ষটি যত বড় তদনুপাতে সেই কক্ষে যতগুলি ছাত্র স্বচ্ছন্দভাবে থাকিতে পারে কেবল ততগুলি ছেলে লইয়াই সেই ক্লাস বসিবে। ক্লাসে ছাত্র-সংখ্যা তদতিরিক্ত হইলে, অন্য কক্ষে তাহাদের স্থান দিতে হইবে। অথবা কোন ক্লাসে যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি করিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে, সেই ছেলেগুলি স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে, এমনি মাপের কক্ষ প্রস্তুত করিতে হইবে।

স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণকালে তিনটি মাথা একসঙ্গে কাজ করিলে ভাল হয়; (১) স্থপতি, (২) হেডমাষ্টার, (৩) চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। স্থপতি গৃহের নক্সা প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু তিনি কেবল বাটীর সৌন্দর্য্য বিধান করিতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট অর্থের মধ্যে স্কুলের প্রয়োজন অনুযায়ী বাটীর নক্সা তিনি প্রস্তুত করিয়া দিবেন। তাহাতে চমৎকার শিল্পকার্য্যের সমাবেশ করিয়া ব্যয়-বাহুল্য না করা হয়, অথচ, বাড়ীটি দেখিতে বিশ্রীও না হয়, ইহাই তাঁহাকে দেখিতে হইবে। হেডমাষ্টার মহাশয় বিদ্যালয়ের তহবিলের পরিমাণ বুঝিয়া এবং যত ছাত্র পড়িবে, যতগুলি ক্লাসরুম, আফিস-গৃহ, ব্যায়ামাগার, ভৃত্যদিগের বাসগৃহ, টিফিন করিবার কক্ষ, পায়খানা ড্রেন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন, তাহাই বিবেচনা করিয়া স্থপতিকে নক্সা প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিবেন। আর চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দেখিবেন, স্কুলগৃহ এমন ভাবে তৈয়ার করাইতে হইবে, যেন তাহাতে ছাত্রদের, শিক্ষকদের এবং স্কুল সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ না হয়; সকলেই স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে; হাওয়া এবং আলো যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, পাইখানা ড্রেন প্রভৃতি হইতে দুর্গন্ধ বাহির না হয়, কিম্বা তদ্দ্বারা কাহারও স্বাস্থ্যহানি না ঘটে। বাঙ্গালা দেশে বৎসরের প্রায় সকল সময়েই বেগবান বায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং একটু কৌশল সহকারে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে সকল সময়েই

সকল কক্ষেই স্বাভাবিক ভাবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আর, আলোর ব্যবস্থা করিবার জন্য, এক সারির বেশী ঘর নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। অর্থাৎ, মাঝখানে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ তাহার চারিদিকে এক সারি করিয়া ঘর, আর তাহার চারিদিকে ফাঁকা। যেখানে ইহা সম্ভবপর নহে, কিম্বা যেখানে অনেক ঘরের দরকার, সেখানে ভিতরে খুব বড় উঠান রাখিয়া তাহার চারিদিকে পাশাপাশি দুই সারি ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাহিরের দিকে—চারিদিকেই অনেকটা স্থান ফাঁকা রাখিলে, কক্ষগুলি একরকম আলোকিত হইতে পারে। হোষ্টেল বা dormitory নির্ম্মাণের সময়েও আলো হাওয়ার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কিন্তু কেবল এই সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। যাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই সকল ব্যবস্থা করা হইতেছে, তাহারা যাহাতে ইহার উপকার বুঝিতে পারে তাহাও করা কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ, টাটকা, তাজা বায়ু ও আলোর কি উপকার তাহাও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে; নচেৎ এই সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য, স্কুলে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতিও অবশ্য পাঠ্যরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

ক্লাসে বসিয়া ছেলেরা যখন মানসিক শ্রমে নিরত থাকে, তখন তাহাদের ক্লাসে যদি রীতিমত প্রবহমান বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকে, তবে তাহাদের পরিত্যক্ত প্রশ্বাস বায়ুর কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস ঘরের মধ্যে জমিয়া তাহাদের বিলক্ষণ স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে পারে। এরূপ স্থলে মাথ ধরা, বিমর্ষ ভাব, খিটখিটে মেজাজ এবং অজীর্ণতা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনুসারে ক্লাসে যতগুলি ছেলে পড়িবে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য অন্ততঃ ৬০০ ঘন ফিট স্থান থাকা চাই। ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে ক্লাস-রুম এই পরিমাণে বড় হওয়া দরকার। আর ঐ ঘরের বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এমন হওয়া আবশ্যক যে, প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যেক ছাত্রের মাথা পিছু ৩০০০ ঘন ফিট বায়ু যেন ঘরের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতে পারে।

বালকেরা ক্লাসে অধ্যাপনার সময়ে যখন পড়াশুনা ভাল করিয়া মনোযোগ দিতে পারে না, যখন তাহারা শিক্ষকের প্রশ্নে বোকার মত জবাব দেয়, অথবা বিমা ভাব ধারণ করে, কিম্বা অসাবধান হয়,—যখন অধিকাং ছাত্র হাই তুলিতে কিম্বা আলস্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে তখন শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে তাড়না না করিয়া বুঝিয়া দেখিবেন যে, ঘরের বায়ু অবিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে,—বায়ু-চলাচল ঠিক মত হইতেছে না এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, শিক্ষা মহাশয়দের এই জ্ঞানটুকুর বিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে।

ক্লাস রুমে আলোর ঠিকমত ব্যবস্থা না থাকিলে অনেক প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে। বইয়ের অক্ষরগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িবার জন্য ছাত্রকে যদি আলো স্বীকার করিতে হয়, বই ও চক্ষুর মধ্যেকার স্বাভাবিক ব্যবধান কমাইয়া তাহাকে যদি বইয়ের কাছে চক্ষু আনিতে কিম্বা চক্ষুর কাছে বই আনিয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঘরের সকল জায়গায় আলো যথেষ্ট পরিমাণে আসিতেছে না। ইহার ফল দৃষ্টিক্ষীণতা এবং মেরুদণ্ডের বক্রতা বা কুব্জতা। অনেক ছেলে দেখা যায়, যাহারা সোজা হইয়া বুক ফুলাইয়া মাথা সোজা করিয়া বসিতে বা চলিতে পারে না, তাহাদের মাথা কি বসিয়া থাকিবার কালে, কি চলিবার সময়, সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। ইহা অস্বাস্থ্যতার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ। ইহার পরিণামে ঐ ছাত্রটির যক্ষ্মারোগে, অথবা ফুসফুস বা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কম আলোর দোষটি যে আমাদের স্কুল কলেজে কত বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ছাত্র সমাজের চশমার বাহুল্য, এবং তাহাদের মেরুদণ্ডের ধনুকের আকৃতি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আলোর বেশীর দরুণ ছেলেদের চক্ষের তিনটি দোষ জন্মে; (১) তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়; (২) দ্রষ্টব্য পদার্থ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া নিখুঁত দেখিতে পারে না,—যে জিনিস তাহারা দেখিল, তা

সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সেই সকল প্রশ্নের ঠিক মতন জবাব দিতে পারে না,—ভাসা ভাসা জবাব দেয় কিম্বা জবাব এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করে; আর (৩) কোন একটা জিনিসের প্রতি বেশীক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারে না, চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠে। এই তিনটি দোষকে ইংরেজীতে যথাক্রমে short sight, amblyopia এবং asthenopia বলে।

এই দোষগুলি অপরিহার্য্য নহে। প্রথমতঃ, ঘরে যথেষ্ট পরিমাণ আলোকের সংস্থান করিতে হইবে। তার পর, আলোক ও ছেলেদের বসিবার আসন ও ডেস্ক এমন ভাবে থাকিবে, যেন আলোটুকু ছাত্রের মাথার উপর দিয়া যথাসম্ভব বাম দিক হইতে আসিয়া ডেস্কের উপর পড়িতে পারে। ছেলেটি ঘাড় তুলিয়া সোজাভাবে বসিবে। বইখানি তাহার চক্ষুর নিকট হইতে ১২ইঞ্চির কম দূরে না থাকে। আর, লিখিবার সময় খাতা খানি ২০° ও পরিবার সময় বইখুনি ৪০° হেলাইয়া ধরিতে হইবে। আলো বাম দিক হইতে আসিলে ঠিক বইয়ের উপর পড়িবে, এবং বেশ দেখা যাইবে; কিন্তু ডান দিক হইতে আসিলে হাতের আড়াল পড়িয়া বইয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত হইবে না। আলোক পিছন দিক হইতে আসিলেও ঠিক এই রকম অসুবিধা হয়; যেহেতু মাথা এবং দেহের অন্তরালে বই থাকায় তাহার উপর ভাল আলো পড়িতে পারে না। আলো সামনের দিক হইতে আসা আবার আরও খারাপ; ঠিক চোখের উপর আলো আসিয়া পড়িলে, চক্ষুর জ্যোতিঃ শীঘ্রই খারাপ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাম স্কন্ধের দিক হইতে আলো আসাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। পিটটা কুঁজো হইয়া যাওয়া অনেকটা স্কুলে ছাত্রদের আসনের বন্দোবস্তের ত্রুটিতে ঘটিয়া থাকে। ছাত্রদের আসন ও ডেস্ক স্থাপন করার সময় এই সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অনেক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল বিষয়ে কেহ নজর দেন কি? আমাদের ত বোধ হয় না।

কর্ণ, নাসিকা ও গলনালির পীড়া।

কর্ণ, নাসিকা ও গলনালির পীড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি শৈশবে এবং বাল্যকালে শিশুর প্রতি পিতামাতার অযত্ন, অবহেলা ও অমনোযোগিতার ফলে ঘটিয়া থাকে। শিশুরা এবং অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা প্রায় নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস টানে না, এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করে না। শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য তাহারা মুখ দিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহার ফলে যত কর্ণরোগ, নাসিকার রোগ এবং গলনালির রোগ ঘটিয়া থাকে। পিতামাতা যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহা হইলে এই বদ অভ্যাসটি ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এবং একটু সতর্ক হইলেই, অতি শৈশবে অনেক রোগকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে পারেন। অনেকের নাক-ডাকা বদ অভ্যাস আছে। ইহা শৈশবে মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করার ফল। মুখ দিয়া নিশ্বাস টানা ও প্রশ্বাস ফেলার জন্য কত রকম রোগ হইতে পারে তাহা দেখাইয়া দিয়া, পিতামাতা যাহাতে সন্তানের এই বদ অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা করেন, সে বিষয়ে তাঁহাদের চোখ খুলিয়া দেওয়াই আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য।

এই মন্দ অভ্যাসের ফলে বাড়ের মুখেই ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়; নানারকম রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে; এবং তাহার মানসিক ও শারীরিক পূর্ণ বিকাশের পক্ষেও ব্যাঘাত ঘটে।

অতএব ছেলেমেয়েরা নাক দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন না করিয়া মুখ দিয়া করিতেছে দেখিলেই, তাহাদের মুখ চাপিয়া রাখিয়া নাক দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য করাইতে হইবে। দুই চারিদিন এইরূপ ভাবে সতর্ক হইলেই ঐ মন্দ অভ্যাসটি দূর হইয়া যাইবে, এবং স্বাভাবিক ভাবে নাক দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলিবে। তাহা হইলে শিশুদিগের অকাল-মৃত্যু অনেকটা নিবারিত হইবে; এবং গলা, ফুসফুস, কর্ণ ও নাসিকার অনেক রোগ অঙ্কুরে নষ্ট হইয়া যাইবে। ফলে, তাহাদের দেহ বেশ সুস্থ ও সবল থাকিলে, তাহাদের রোগ-প্রতিষেধের শক্তিও বাড়িয়া যাইবে।

শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্যই নাসিকার সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্যের উপযোগী করিয়াই নাসিকা-যন্ত্রটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতর অনেক কল কৌশল আছে। খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া লালা মিশ্রিত হইলে তাহা প্রায় অর্দ্ধেক পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া উদরমধ্যস্থ পাকযন্ত্রে গিয়া উপস্থিত হয়। ঠিক সেই ভাবে বায়ুও নাসিকার ভিতর দিয়া গমন করিলে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ফুসফুসে গিয়া উপস্থিত হয়। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া লালা মিশ্রিত না করিয়া লইলে পাকযন্ত্রে তাহার জীর্ণ হইবার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত ঘটে। সাধারণ বায়ু নাসিকা পথে রূপান্তরিত না হইয়া ফুসফুসে গমন করিলেও তদ্রূপ তদ্দ্বারা ষোলআনা উপকার পাওয়া যায় না। অপরিষ্কার জল পান বা রন্ধনার্থ ব্যবহার করিতে হইলে, তাহা ফিলটার নামক যন্ত্রের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া লইলে তাহার ময়লা বেশীর ভাগ দূর হইয়া যায়, এবং তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে। সাধারণ বায়ুতে ধূলিকণা, কলের চিমনির ধোঁয়া, রোগবীজাণু প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। এই সকল আবর্জ্জনা দূর করিয়া বায়ুকে পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য নাসিকা যন্ত্র ফিলটারের কাজ করে। বায়ু অনেক সময়ে শুষ্ক থাকে; নাসিকার ভিতর দিয়া গমন কালে তাহা সেখানে রস সংগ্রহ করে। আবার নাকের ভিতর তাজা রক্তের সংশ্রবে আসিয়া বায়ু একটু উষ্ণ হইয়া উঠে। ফলে যখন তাহা ফুসফুসে উপস্থিত হয়, তখন বায়ু অনেকটা নির্ম্মল, আর্দ্র এবং দেহের তাপের সমান উত্তপ্ত থাকে। ইহাই স্বাভাবিক। মুখ হইতে ফুসফুস পর্য্যন্ত পথ যতটা দীর্ঘ, নাসিকা হইতে ফুসফুস পর্য্যন্ত পথ তদপেক্ষা অনেক বেশী দীর্ঘ। অতএব, নাসিকা পথে দীর্ঘ নিশ্বাস সহজেই টানা যায়; মুখ দিয়া সেটুকু হয় না। এই কারণে নাসারন্ধ্র পথে নিশ্বাস টানার ফলে ফুসফুস, এবং তৎসহ বক্ষের আয়তন বিস্তৃত হয়। এই দীর্ঘ নিশ্বাস টানার একটা মস্ত উপকার এই যে, ইহাতে বেশী পরিমাণে অম্লজান বায়ু বা প্রাণবায়ু ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এই অম্লজান স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপাদান। শিশুরা যদি নাক দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য না করিয়া মুখ দিয়া করে, তাহা হইলে তাহারা যে কতগুলা উপকার লাভে বঞ্চিত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস করায় শিশুদিগের হঠাৎ নানা বিপদ ঘটিতে পারে। মুখ দিয়া দমকা নিশ্বাস টানা হয় বলিয়া, উহাতে বেশী বায়ু, তথা অম্লজান, গৃহীত হয় না। ফুসফুস ও বুকের রীতিমত বিস্তার ঘটে না। মুখ দিয়া গৃহীত বায়ু ঠিকমত 'হজম' হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে না। উহা তেমন পরিষ্কারও নহে; শারীরিক উত্তাপের সহিত মুখ দিয়া গৃহীত বায়ুর তাপের সমতা রক্ষিত হয় না। উহা রীতিমত আর্দ্র হয় না। ইহাতে দেহ যথেষ্ট পরিমাণে অম্লজান বায়ু হইতে বঞ্চিত হয়। ফিলটার-করা কলের জলের সঙ্গে রাস্তার ধারের পচা পুকুরের পানা-মিশ্রিত জলের যে পার্থক্য, নাক দিয়া গৃহীত বায়ুর সহিত মুখ দিয়া গৃহীত বায়ুরও সেই রূপ পার্থক্য।

অনেক ছেলেমেয়েকেই এই কুঅভ্যাসের অধীন হইতে দেখা যায়। সর্দ্দিতে নাক বুজিয়া গেলে, কিম্বা নাকের গঠন বিকৃত হইলে নাসিকার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের অসুবিধা ঘটিলে, কিম্বা অন্য কোন পীড়ার দরুণ নাকে ব্যথা হইলে, ছেলেরা সহজে পীড়িত নাসিকার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য করিতে চায় না; তদপেক্ষা

মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করা অপেক্ষাকৃত সহজ; এবং তাহারা সেই সহজ পন্থাটিই গ্রহণ করে। ছেলের মা কিম্বা ধাত্রী কিম্বা ঝি চাকরেরা ইহার অনিষ্টকারিতা জানে না বলিয়া ইহাতে বাধা দেয় না, ইহা নিবারণের চেষ্টা করে না। ফলে অভ্যাসটি দাঁড়াইয়া যায়। অতএব শিশুদিগের এই অভ্যাস দূর করিতে হইলে তাহাদের জননী, ধাত্রী, ঝি-চাকরকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে,—

(১) নাসিকার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলিলে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন ভালরূপ গঠিত হইতে পারিবে;

(২) একটু চেষ্টা করিলেই শিশুদিগকে নাসিকার দ্বারা নিশ্বাস টানিতে এবং প্রশ্বাস ফেলিতে অভ্যাস করানো যায়;

(৩) ছেলে কি কারণে নাক দিয়া নিশ্বাস না টানিয়া মুখ দিয়া টানিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি উহা কেবল আলস্যজনিত অভ্যাসের ফল হয়, তাহা হইলে মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া নাক দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস করান অভ্যাস করা যাইতে পারে। আর যদি নাসিকার গঠনের দোষে কি কোন পীড়া অথব বেদনার দরুণ হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে।

শ্বাস গ্রহণ কালে যে অম্লজান দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা শরীরের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করে। অতএব দেহের পুষ্টিসাধন কার্য্য রীতিমত চালাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অম্লজান দেহস্থ হওয়া আবশ্যক। শ্বাস বায়ু ফুসফুসে গমন করিবার পর, বায়ুস্থিত অম্লজানের অংশ রক্ত কর্ত্তৃক শোষিত হয়। রক্তের দ্বারা উহা দেহের শিরাগুলির মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া, তত্রত্য খাদ্যদ্রব্যগুলিকে অম্লজান পূর্ণ করে। অতএব শিশুদিগের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ঠিক ভাবে হওয়া কতখানি আবশ্যক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পাকযন্ত্রে পাচক রস সাহায্যে পরিপক্ক ও রূপান্তরিত হইবার পর খাদ্যদ্রব্যগুলি শিরাগুলির দ্বারা শোষিত হইলে সেখানে অম্লজানের সাহায্যে আবার রূপান্তরিত হইয়া তাহা দেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। তার পর তাহা ক্রমে ক্রমে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করে। জীবদেহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহার পর বৃদ্ধি কিছু দিন স্থগিত থাকে। তার পর আবার শরীরের ক্ষয় আরম্ভ হয়। শৈশব কালে এই বৃদ্ধি খুব বেশী পরিমাণে সাধিত হয়। অম্লজানের সাহায্য ব্যতীত এই বৃদ্ধি ক্রিয়া ঠিকমত হয় না; এবং নাসিকার পথে প্রচুর বায়ু গ্রহণ না করিলে অম্লজান তাহার কার্য্য আদৌ সাধন করিতে পারে না। মুখ দিয়া শ্বাস টানিলে এই জন্যই শিশুর দেহের সম্যক পুষ্টি হইতে পারে না।

শরীর সম্যকরূপে পুষ্টি লাভ করিতে না পারিলে, সংক্রামক রোগকে বাধা দিবার জন্য দেহের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহা কমিয়া যায়। যক্ষ্মা রোগর প্রসঙ্গে এ কথা সকলেই অবগত আছেন যে, গৃহে বায়ু চলাচলের উত্তমরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, এই রোগের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কথাটা আর এক ভাবে বলিলে ঠিক বলা হয়; অর্থাৎ, বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্তের অভাবে, রোগকে বাধা দিবার পক্ষে শরীরের স্বাভাবিক যে ক্ষমতা আছে, তাহা কমিয়া গিয়া যক্ষ্মা রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ছেলেদের খাদ্য উত্তম না হইলে তাহারা যেমন রীতিমত বাড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যকর বায়ুও ঠিক সেই পরিমাণে দরকার। উত্তম খাদ্য এবং উত্তম বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে পাইলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের রোগকে বাধা দিবার শক্তি এমন বাড়িয়া যায় যে, কোন রোগ তাহাদিগকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের দোষে তাহাদের দেহ পুষ্টি লাভ করিতে না পারিলে তাহারা রাত দিন নানান রোগে ভুগিয়া থাকে।

ছেলেরা যখন নাসিকার স্বাভাবিক কার্য্য বন্ধ রাখিয়া মুখ দিয়া নাকের কার্য্য করিতে আরম্ভ করে; তখন একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের নাক সর্দ্দিতে হউক অথবা অন্য কোন কারণে হউক বুজিয়া গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকবালিকারও এইরূপ অবস্থা ঘটে। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শিশু-শিক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" অর্থাৎ "পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পালন করিবে ও তার পর দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাড়না করিবে।" এই নীতি শিশুদের প্রতি প্রয়োগ করিবার সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, দশ বৎসর যে তাড়নার কথা আছে উহার মধ্যে পালন করিতে বারণ নাই, এবং পাঁচ বৎসর পালন করার মধ্যেও শিক্ষা দিবার কোন বাধা নাই। পাঁচ বৎসর পালন করার দিকেই বেশী দৃষ্টি দিতে হইবে এবং তার পর কেবল যত্ন করিয়া স্নানাহার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। পাঁচ বৎসর পালন করার সঙ্গে সঙ্গেও অনেকটা শিক্ষা সহজে হইয়া যাইবে এবং দশ বৎসর শিক্ষার দিকে বেশী মন দিলেও শরীরের যত্ন কমিবে না—পালন করা বন্ধ হইবে না।

প্রথম পাঁচ বৎসর পালনের মধ্যেও সুশিক্ষা বা কুশিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। প্রথমতঃ শারীরিক নিয়ম পালন করিতে শিক্ষা দেওয়া চাই এবং মনের স্থৈর্য্য, ভালবাসা, সৎভাব, ভক্তি—এ সকলই নিতান্ত কচি বয়সেই শিক্ষা হইয়া থাকে। প্রভাতে সর্ব্ব প্রথম মলত্যাগ করা, মুখ হাত ধুইয়া ফাঁকায় বাহির হওয়া, দেবতাকে প্রণাম ইত্যাদি দ্বারা শরীর ও মনের পরিতোষ সাধন করার অভ্যাস ২।৩ বৎসর বয়স হইতেই আরম্ভ হয়। কেহ কেহ হয় ত হাসিয়া উঠিবেন যে, প্রাতে মুখ হাত ধোয়া, পায়খানায় যাওয়া, এও কি শিক্ষা দিতে হয়! আমি দেখিয়াছি, অনেক বাড়ীতেই এ সামান্য অথচ স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কাজ শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। শিশুরা যখন ইচ্ছা তখন মল ত্যাগ করে—কখন রাত্রে শয়নের কালে, কখন বা দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে, কখন কখনও হয় ত দুই তিন দিন বাদই গেল। যাহাদের এই প্রকার অনিয়ম অভ্যাস হইয়াছে, তাহাদেরও অল্প চেষ্টায়ে ভাল অভ্যাস করান যায়। মাতার মনোযোগের অভাবে এই প্রকার অনিয়মে অনেক সময়ে শিশুদে পীড়া হইতে দেখা যায়।

একটু একটু করিয়া সংযত হইতে শিক্ষা করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। ইহ হইলেই খাওয়া—যখন তখন যে যা আদর করি। অনাদর করিয়া দেন শিশু তাহাই মুখে পুরিয়া দিতে এ সকল কু-অভ্যাস মাতা বাঁচিয়া থাকিতে ছেলে হওয়া নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। (খারাপ খাদ্য কে কেহ স্বহস্তে শিশুদের দেন—ফেলিয়া না দিয়া এই ভা উহা খরচ করেন) মাছি-বসা খাবার—দাকানে মিষ্টি খাইতে চায় না এই প্রকার শিক্ষিত ৪ বৎসর শিশু কয়েকটি আমার চক্ষে পড়িয়াছে। বাড়ীর অ ভাবক বা মাতার গুণে এ প্রকার শিক্ষা সম্ভব হয়।

লোভ ক্রোধ প্রভৃতি দমন করিতে শেখান বয়সে খুবই সহজ। শিশুদের যুক্তি ও জ্ঞান আছে উহা বাড়িতে দেওয়া—উহার চর্চ্চা করান আশ্চর্য্যের কাজ নয়। শিশুদের বুঝাইয়া দিলেই সহজে তাহারা সকল কথাই বুঝিতে পারে। তা মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে এরূপ মাতার দোষেরই পরিচয় দেয়।

শারীরিক ও মানসিক নিয়মসকল অভ্যাস সঙ্গে সঙ্গে ৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাতৃভাষা যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ীতে যাহাদের মধ্যে বিচরণ করে, তাহাদের জ্ঞান, তাহাদের ভাষা ও ভা উপর শিশুর উন্নত ভাব ও মার্জ্জিত সুন্দর ভাষা

অনেকাংশে নির্ভর করে। গণনা শিক্ষা ও প্রকৃতির নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় শিশুরা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়া গ্রামের পথে মাঠে ঘাটে আকাশে সর্ব্বত্র দেখিয়া থাকে এবং গল্প শুনিয়া থাকে। হাতে-খড়ি হওয়ার আগেই মনে খড়ি হইয়া যায়; চিত্তবৃত্তির মধ্যে জ্ঞানের বিচিত্র তত্ত্ব অঙ্কুরিত হইতে থাকে।

জানিবার শুনিবার ও দেখিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ শিশু বয়সে যেরূপ সজাগ থাকে, একটু বড় হইলে আর তেমন থাকে না—তাই এ সময়ের মধ্যে শিশুদের দেখিবার শুনিবার ও জানিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া চাই। ভ্রমণ করার ছলে পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদি দেখান—বৃষ্টি, ঝড়, মেঘ, বিদ্যুৎ—জলের স্রোত—কত বিচিত্র বিশ্বলীলা—এ সকল যত বেশী প্রত্যক্ষ করিবে, শিশু তত অধিক জ্ঞান লাভ করিবে। ছয়মাস কোন শিশুকে কোনও গ্রামে রাখিয়া দিলে দেখা যায় সহরে স্কুলে বসিয়া সে যাহা শিক্ষা করে, গ্রামে কোনও শিক্ষা না দিলেও তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষালাভ করে। রাত্রে ঠাকুরমা বা মা'র কাছে শুইয়া ভাল গল্প শুনিয়া কত লোকের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে।

অধুনা এই সকল শিক্ষার স্থলে ৪ বৎসর বয়সেই দেয়াল ঘেরা স্কুল নামক জেলখানায় শিশুদের কয়েদ রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। মাতা বাঁচিয়া যান,—দিবসে নিদ্রায় ও পরচর্চ্চায় ব্যাঘাত কেউ করে না,—প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া কেহ উত্যক্ত করে না—ছেলেরা স্কুলে গিয়াছে—বাড়ীটা যেন জুড়াইয়াছে। ও দিকে শিশু কি শিখিতেছে, কেমন ভাবে মানুষ হইতেছে,—যদি চক্ষু থাকিত, দেখিয়া সতর্ক হওয়া চলিত—কিন্তু কে দেখিবে—চক্ষুই যে নাই—বুঝি না কি ভাল কি মন্দ! অনেক শিশুরই পড়া ভাল লাগে না—ছুটি পাইলেই আনন্দ,—শিক্ষক না আসিলেই ভাল—বই বাক্সে রাখিতেই সুখ—বই খুলিলেই বিষাদ—এ অস্বাভাবিক অবস্থা কেমন করিয়া হইল? একটু ভাবিতে হইবে না কি? এ দিকে রান্না হইতে দেরী হইল, কোন প্রকারে ভাত গিলিয়া ছেলে ছুটিল, স্কুলে বেলা হইলে শাস্তি হইবে—ছুটিতে ছুটিতে পথে আহার্য্য বমন হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল। এত প্রায়শ্চিত্ত কোন্ বিদ্যার জন্য ভাবিয়া দেখিব না কি? রাশিকৃত পাঠ্য পুস্তক, একখানাও সমাপ্ত হয় না। ৫ বৎসর স্কুলে যাওয়ার পর পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে বিশেষ শিক্ষা হয় নাই; লাভ হইয়াছে চক্ষুর জ্যোতিহীনতা—শরীর ক্ষয়—মনের স্ফূর্ত্তির হ্রাস। লাভ হইয়াছে, না বুঝিয়া পড়া—অর্থ গ্রহণ না করিয়া পাখী-পড়ার ন্যায় আবৃত্তি—পরীক্ষার ভয়ে স্বভাবের বিকৃতি। চাষার ছেলেরা বরং থাকে ভাল—মাঠে ঘোরে গরু চরায়, বাতাস পায়—পাখীর গান শোনে—গাছের ফল পাড়ে—মহা আনন্দে বিচরণ করে।

অধিকাংশ স্কুলেই খেলিবার স্থান নাই, বেড়াইবার ব্যবস্থা নাই, আছে কেবল নিয়ম। নড়িবে না, কথা বলিবে না, খাড়া হইয়া বসিবে। ছুটাছুটি করিয়া যে ক্লান্তি হয়, আনন্দের দ্বার বন্ধ করিয়া বসাইয়া রাখিলে তাহার অপেক্ষা কম ক্লান্তি হয় না। স্নায়ুসকল শেষোক্ত কাজেই বেশী নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দেহ ও মনের তত্ত্ব যাঁরা জানেন, তাঁহারা এ বিষয়ে সত্য সাক্ষ্য দিবেন।

কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যাস বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকার পর, আবার কিছুক্ষণ অঙ্গচালনা ও নির্ম্মল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা যে সকল বিদ্যালয়ে আছে, সে প্রকার বিদ্যালয় ভারতে শতের মধ্যে একটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অধিকাংশ স্থানেই এসব দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আহারের অব্যবহিত কাল মধ্যেই পাঠে মন সংযোগ, অল্প আলোকে পাঠ দেখা, অঙ্গচালনা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকা, ক্ষুধা পাইলেও না খাইয়া বা নামমাত্র টিফিন—একপয়সার দূষিত খাদ্য সহ জলযোগ করিয়া আবার পড়িতে বসা—ক্ষুধিত অবস্থায় Drill করা, এসকল পাপ বিদ্যালয়েই সম্ভব—বাড়ীতে এত পাপ ঘটিবার সুযোগ নাই।

কিন্তু এত দুর্ভোগ ভুগিয়া আমাদের সন্তানেরা যতটুকু শিক্ষা লাভ করে, তাহা কষ্টের অনুপাতে, আয়ুক্ষয়ের অনুপাতে, কতটুকু তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—এবং পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে

যে, সাধারণ বিদ্যালয়ে ৩।৪ বৎসরে যে শিক্ষা পাওয়া যায়—ঘরে পিতামাতার সাহায্যে অল্প আয়াসে অল্প সময় কাজ করিয়া হেলায় খেলায় ১ বৎসর ১॥০ বৎসরে তাহা অপেক্ষা উত্তম শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে। অথচ শরীর খারাপ হইবে না—পরীক্ষার ভয় থাকিবে না—পাঠ শিক্ষার উৎসাহের অভাব হইবে না।

গৃহস্থ যদি একটু শিক্ষিত হন, ঘরের সকলেরই, যদি স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগীর শুশ্রূষা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অল্প জানা থাকে, তাহা হইলে যেমন কুচিকিৎসক সে বাড়ীতে আমল পান না, তেমনি শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষা-প্রণালীর দোষগুণ এসকল বিষয়ে সন্তানগণের পিতামাতা যদি একটু চিন্তা করেন এবং জানিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে ক্রমশঃ স্কুলগুলিরও অনেক উন্নতি হয়, শিক্ষকগণও একটু সজাগ থাকেন।

বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য রক্ষার একটি প্রধান অন্তরায়, বেলা ১০টা হইতে আফিস ও স্কুল আরম্ভ হওয়ার প্রথা। বিশেষতঃ; শিশুদের শরীরের উপর এবং ছাত্রের জীবনের উপর এই নিয়মের কুফল বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইতেছে। একেই ত স্থিরভাবে বসিয়া চিবাইয়া আহার করা এক প্রকার ভুলিতে বসিয়াছি; তাহার উপর সময়ের তাড়ায় আরও বেশী অত্যাচার সম্ভব হইয়াছে।

পূরাকালে টোলের শিক্ষা-প্রণালী এবং কিছুদিন পূর্ব্বে ও পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসার যে নিয়ম ছিল, তাহাতে স্নানাহারের অনিয়ম হই ত পারিত না। এ গ্রীষ্মের দেশে দ্বিপ্রহরে একটু বিশ্রাম দরকার। ১০টায় বা ১০॥ টায় স্কুল বসার নিয়মে অতি ত্বরানিবন্ধন ছাত্রদের ধীর ভাবে আহার ও আহারের পরে কিছুকণ বিশ্রাম করা এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় হিতকর অভ্যাসদূর হইয়াছে। ইহাতে হজমশক্তি ও শারীরিক বল ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া ছাত্রদিগকে মানসিক পরিশ্রমের অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কিছুতেই আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। ছোট ছোট শিশুদেরও এই অনিয়ম ও অত্যাচারের স্রোতে ঠেলিয়া দেওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। গ্রামে বা সহরে প্রধান প্রধান পরিবারে যদি এক একটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপিত হয়, স্বাস্থ্যের নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে না দিয়া সহজভাবে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হয়। মাতার কতকটা সময় শিশুর শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। এত যে রন্ধনের আয়োজন, পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপিয়া পরিশ্রম, উহা পাঁচ মিনিটে বাছাদের উদরস্থ হয়। তাহা যে ঠিক হজম হয় না ও তাহা হইতে যে পুষ্টিলাভ হয় না এ কথা অনেক জননীই জ্ঞাত নহেন। শিক্ষা দানের সঙ্গে আনন্দ দান—শিক্ষা লাভের সঙ্গে সুখ লাভ—এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, শিশুদের শরীর ও মনের সঙ্গে তাল ঠিক রাখিয়া, যাহাতে শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, এ বিষয়ে শিশুদের পিতামাতার বিশেষ চিন্তা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

প্রচলিত স্কুলে প্রচলিত নিয়মের অধীনতায় শিশুদের শিক্ষা দেওয়া ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইলে, পরিণামে আদর্শ শিক্ষালয় স্থাপিত হওয়ার আশা করা যায়।

DOUBLE COLOUR PAGE

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | পৌষ, ১৩২৬ সাল | ৯ম সংখ্যা

আলোচনা

গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ড।—

গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের কার্য্য পরিচালনের জন্য যে সকল নূতন নিয়ম সম্প্রতি বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গ্রাম্য স্বাস্থ্য-রক্ষা সংক্রান্ত নিয়মগুলির আভাষ আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। (১) ইউনিয়নের এলাকায় কোথাও যাহাতে আবর্জ্জনাদি জমিয়া থাকিয়া সাধারণের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডকে ঐ সকল আবর্জ্জনাদি স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (২) কোন ইউনিয়নের কোথাও কোন মেলা (fair) বা অন্য কোন কারণে বহুজনসমাগম ঘটিলে, তত্রত্য স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইউনিয়নসমূহকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রায়ই দেখা যায়, বড় বড় এবং কিছুদিন স্থায়ী মেলায় সময়ে সময়ে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এরূপ সংক্রামক রোগ যাহাতে উৎপন্ন হইতে না পারে, সে পক্ষে পূর্ব্বাহ্নে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতেই হইবে; অধিকন্তু সংক্রামক রোগের আক্রমণ আরম্ভ হইলে, রোগীদের segregate করিয়া সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করাও কর্ত্তব্য। (৩) ইউনিয়নের এলাকাভুক্ত স্থানে যে সকল জলনিকাশের প্রণালীর অপর কোন মালিক নাই, ইউনিয়ন বোর্ড সেই সকল ড্রেন প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিবার ভার গ্রহণ করিবেন। (৪) সাধারণভাবে ইউনিয়নসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষার সকল প্রকার বন্দোবস্ত করা, যথা, ড্রেন প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা এবং আবর্জ্জনাদি স্থানান্তরিত করা—এসকলও ইউনিয়নের কার্য্য। (৫) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করিলে ইউনিয়নসমূহকে ১৮৭৩ অব্দের জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রেসন আইন অনুসারে নিজ নিজ এলাকায় জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রেসনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। স্বাস্থ্য-রক্ষার সৌকর্য্যার্থ ইউনিয়ন বোর্ড কতকগুলি অধিকার পাইয়াছেন। স্বাস্থ্য রক্ষার্থ প্রয়োজন হইলে বোর্ড কুটীর বা পায়খানা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন; ব্যক্তিবিশেষের বা সাধারণের ব্যবহার্য্য ড্রেন তৈয়র করিয়া দিতে, বদলাইতে বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। কোন কূপ, জলাশয়, খানা, পুকুর, গর্ত্ত, বা ডোবায় পচা জল জমিয়া স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে, সেগুলি ভরাট করিতে কিম্বা সংস্কার করিতে পারিবেন। জঙ্গল কাটাইয়া ইউনিয়নের এলাকাধীন স্থানসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে পারিবেন। উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া শ্মশান ঘাট বা গোরস্থান নির্ম্মাণ করাইতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি করাইবার জন্য ইউনিয়ন ঐ সকল সম্পত্তির মালিক-

দিগের উপরে নোটিশ জারি করিতে পারিবেন। মোটের উপর ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের হাতে আধুনিক মিউনিসিপালিটীর অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বোর্ডের কার্য্য সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটিলে, কিম্বা গ্রামবাসীদের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবেন। এই সঙ্গে যদি গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়, গ্রামবাসীরা যদি সরকারের সদুদ্দেশ্য বুঝিয়া ইউনিয়নের কার্য্যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ইউনিয়নসমূহের কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে, এবং গ্রামগুলির নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতে পারে। নচেৎ, গ্রামবাসীরা, এই সকল ব্যবস্থা যে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দরকার তাহা বুঝিতে না পারিয়া এগুলিকে জুলুম মনে করিতে, এবং পদে পদে ইউনিয়নের কার্য্যে বাধা স্থাপন করিতে পারে। যাক্, এ সকল ত হইল; কিন্তু যত্র তত্র পাট পচাইয়া গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করা এবং পানীয় ও অন্যরূপে ব্যবহার্য্য জল দূষিত করা নিবারণ করিবার কোন ব্যবস্থা ত দেখিতে পাইতেছি না। সেটাও খুব দরকারী বিষয় যে!

গ্রাম্য স্বাস্থ্য ও গবর্ণমেণ্ট।—

কয়েক দিন হইল কলিকাতার লাট প্রাসাদে বাঙ্গলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহের প্রতিনিধিগণের একটা কনফারেন্স হইয়াছিল। লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর এই সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সভার কার্য্যারম্ভ হইলে তিনি একটা উদ্বোধন বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি অন্যান্য কথার সঙ্গে, গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহের প্রতিনিধিগণকে বুঝাইয়া দেন। লাট বাহাদুরকে গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহকে কি কি কাজ করিতে হইবে, লাট সাহেব তাহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির প্রতিনিধিগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহকে পরামর্শ দিবার এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ লোক চাই। লোকগুলিকে শীঘ্রই নিযুক্ত করিয়া কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই সকল লোক কিরূপে সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে? এত স্যানিটারী অফিসার ত এদেশে নাই! কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান লাট বাহাদুর কোন কাজই অসম্পূর্ণ রাখিতে জানেন না; এবং তিনি আটঘাট না বাঁধিয়া কোন কাজেই হাত দেন না, দেখিতেছি। বাঙ্গালার পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই প্রথমেই যে এইরূপ কতকগুলি কর্ম্মচারীর দরকার হইবে, তাহা বুঝিয়াই তিনিও আগে হইতেই সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। গত বৎসরেই ৭২ জন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটকে স্যানিটারী সায়েন্স শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহারা ডাক্তার বেণ্টলীর তত্ত্বাবধানে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার পর তাঁহারা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা অব পাবলিক হেল্‌থ্ নামক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে জেলা বোর্ডগুলির অবশ্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হইবেই। গবর্ণমেণ্ট সেই খরচের কিয়দংশ আপাততঃ দিবেন; পরে সামান্য পরিমাণে কর আদায় করিয়া এই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও পল্লীর স্বাস্থ্য

লেখক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক।

বিশেষ বিশেষ পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা দ্বারা লোকের চলাচলের যে বিশেষ সুবিধা হইতেছে তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা অনেক অসুবিধাও হইতেছে; বিশেষ, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য অনেক স্থানেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে; কারণ, পল্লীগ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যে রাস্তা তৈয়ারী হয়, তাহা উহার দুই পার্শ্বদেশ হইতে মাটী কাটিয়া তৈয়ারী হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে বরাবর খাত (ditch) তৈয়ারী হইয়া যায়। ঐ সমস্ত খাতে বর্ষার বা বৃষ্টির জল জমিয়া, তাহাতে গাছের পাতা কিম্বা পানা প্রভৃতি পচিয়া ঐ বদ্ধ জল দুর্গন্ধযুক্ত করিয়া তোলে এবং উহা হইতে মশকেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা তৈয়ারী হইবার পূর্ব্বে যে গ্রাম্য রাস্তা থাকে, তাহা সাধারণতঃ নীচু থাকায় বর্ষার জলে সমস্ত গ্রামটি প্রতি বৎসর ধুইয়া যাইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় না, এবং অধিক দিনের বদ্ধ জলও আটকাইয়া থাকিতে পারে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা অধিক উঁচু হওয়ায় এ সুবিধা থাকে না। বর্ষার জল গ্রামের মধ্যে চলাচলের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে স্থানে স্থানে নীচু রাখিয়া সেই সমস্ত স্থানে সেতু তৈয়ারী করিয়া দিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় এরূপ সেতু যে মোটেই নাই, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু আবশ্যক অনুযায়ী উহাদের সংখ্যা কম। সম্ভবতঃ খরচাধিক্যের জন্যই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় আবশ্যক অনুযায়ী সেতু নির্ম্মিত না হইয়া যে সমস্ত স্থানে জল চলাচলের পথ পড়ে তাহাও মাটী দিয়া ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা পল্লীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে খারাপ হইয়া পড়ে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তারা এ বিষয়ে লক্ষ্য করিলে পল্লীবাসী বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। চলাচলের রাস্তা খারাপ থাকিয়াও যদি গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তাহা অপেক্ষা চলাচলের রাস্তা ভাল থাকিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য খারাপ থাকা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তাদের নিকট এজন্য প্রতীকার প্রার্থী হইয়াও বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। তাহার কারণ যাহারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এই সমস্ত রাস্তার কণ্ট্রাক্ট (চুক্তি) লয়, তাহারা বেশী লাভের আশায় জল চলাচলের পক্ষে খরচাধিক্যের জন্য সেতু তৈয়ারী না করিয়া বরাবর মাটী দিয়া ভর্ত্তি করিয়া দেয় এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তারা ও উক্ত কণ্ট্রাক্টরদের কার্য্য যে কারণেই হউক ভাল করিয়া সকল সময় বুঝিয়া লন না।

পল্লীগ্রামে যে সমস্ত স্থানে পানীয় জলের নিতান্ত অভাব সেই সমস্ত স্থানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে মাঝে মাঝে ২।৪টী কূপ তৈয়ারী হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা দ্বারাও পল্লীবাসীদের বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। কারণ, গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে যখন পল্লীর খাল বিল শুকাইয়া যায় তখন এই সমস্ত কূপের জলও উহাদের গভীরতার অল্পতাহেতু বারিশূন্য হইয়া পড়ে। কাজেই পল্লীবাসীকে এই সমস্ত কূপ থাকিতেও বাধ্য হইয়া মরা নদীর স্রোতহীন পঙ্কিল জল বা অযত্নে রক্ষিত পচা ডোবার পচা জলই পান করিতে হয়; ইহার ফলে কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সহজেই আসিয়া দেখা দেয়। এই কারণেই পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ ফাল্গুন, চৈত্র মাসে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। যদি কণ্ট্রাক্টর মহাশয়েরা বেশী লাভের আশায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কূপগুলির গভীরতা অল্প না করেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তারা এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, তবে গ্রীষ্মকালে খাল বিলের জল শুকাইয়া গেলেও এই সমস্ত কূপ

দিগের উপরে নোটিশ জারি করিতে পারিবেন। মোটের উপর ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের হাতে আধুনিক মিউনিসিপালিটীর অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বোর্ডের কার্য্য সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটিলে, কিম্বা গ্রামবাসীদের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবেন। এই সঙ্গে যদি গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হয়, গ্রামবাসীরা যদি সরকারের সদুদ্দেশ্য বুঝিয়া ইউনিয়নের কার্য্যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ইউনিয়নসমূহের কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে, এবং গ্রামগুলির নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতে পারে। নচেৎ, গ্রামবাসীরা, এই সকল ব্যবস্থা যে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দরকার তাহা বুঝিতে না পারিয়া এগুলিকে জুলুম মনে করিতে, এবং পদে পদে ইউনিয়নের কার্য্যে বাধা স্থাপন করিতে পারে। যাক্, এ সকল ত হইল; কিন্তু যত্র তত্র পাট পচাইয়া গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করা এবং পানীয় ও অন্যরূপে ব্যবহার্য্য জল দূষিত করা নিবারণ করিবার কোন ব্যবস্থা ত দেখিতে পাইতেছি না। সেটাও খুব দরকারী বিষয় যে!

গ্রাম্য স্বাস্থ্য ও গবর্ণমেণ্ট।—

কয়েক দিন হইল কলিকাতার লাট প্রাসাদে বাঙ্গলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহের প্রতিনিধিগণের একটা কনফারেন্স হইয়াছিল। লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর এই সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সভার কার্য্যারম্ভ হইলে তিনি একটা উদ্বোধন বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি অন্যান্য কথার সঙ্গে, গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহের প্রতিনিধিগণকে বুঝাইয়া দেন। লাট বাহাদুরকে গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই অত্যান্ত আনন্দিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহকে কি কি কাজ করিতে হইবে, লাট সাহেব তাহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির প্রতিনিধিগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহকে পরামর্শ দিবার এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ লোক চাই। লোকগুলিকে শীঘ্রই নিযুক্ত করিয়া কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই সকল লোক কিরূপে সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে? এত স্যানিটারী অফিসার ত এদেশে নাই! কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান লাট বাহাদুর কোন কাজই অসম্পূর্ণ রাখিতে জানেন না; এবং তিনি আটঘাট না বাঁধিয়া কোন কাজেই হাত দেন না, দেখিতেছি। বাঙ্গালার পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই প্রথমেই যে এইরূপ কতকগুলি কর্ম্মচারীর দরকার হইবে, তাহা বুঝিয়াই তিনিও আগে হইতেই সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। গত বৎসরেই ৭২ জন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটকে স্যানিটারী সায়েন্স শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহারা ডাক্তার বেণ্টলীর তত্ত্বাবধানে এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার পর তাঁহারা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা অব পাবলিক হেল্‌থ্ নামক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে জেলা বোর্ডগুলির অবশ্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হইবেই। গবর্ণমেণ্ট সেই খরচের কিয়দংশ আপাততঃ দিবেন; পরে সামান্য পরিমাণে কর আদায় করিয়া এই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও পল্লীর স্বাস্থ্য

লেখক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক।

বিশেষ বিশেষ পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা দ্বারা লোকের চলাচলের যে বিশেষ সুবিধা হইতেছে তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা অনেক অসুবিধাও হইতেছে; বিশেষ, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য অনেক স্থানেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে; কারণ, পল্লীগ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যে রাস্তা তৈয়ারী হয়, তাহা উহার দুই পার্শ্বদেশ হইতে মাটী কাটিয়া তৈয়ারী হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে বরাবর খাত (ditch) তৈয়ারী হইয়া যায়। ঐ সমস্ত খাতে বর্ষার বা বৃষ্টির জল জমিয়া, তাহাতে গাছের পাতা কিম্বা পানা প্রভৃতি পচিয়া ঐ বদ্ধ জল দুর্গন্ধযুক্ত করিয়া তোলে এবং উহা হইতে মশকেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা তৈয়ারী হইবার পূর্ব্বে যে গ্রাম্য রাস্তা থাকে, তাহা সাধারণতঃ নীচু থাকায় বর্ষার জলে সমস্ত গ্রামটি প্রতি বৎসর ধুইয়া যাইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় না, এবং অধিক দিনের বদ্ধ জলও আটকাইয়া থাকিতে পারে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা অধিক উঁচু হওয়ায় এ সুবিধা থাকে না। বর্ষার জল গ্রামের মধ্যে চলাচলের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে স্থানে স্থানে নীচু রাখিয়া সেই সমস্ত স্থানে সেতু তৈয়ারী করিয়া দিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় এরূপ সেতু যে মোটেই নাই, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু আবশ্যক অনুযায়ী উহাদের সংখ্যা কম। সম্ভবতঃ খরচাধিক্যের জন্যই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় আবশ্যক অনুযায়ী সেতু নির্ম্মিত না হইয়া যে সমস্ত স্থানে জল চলাচলের পথ পড়ে তাহাও মাটী দিয়া ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা পল্লীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে খারাপ হইয়া পড়ে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তারা এ বিষয়ে লক্ষ্য করিলে পল্লীবাসী বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। চলাচলের রাস্তা খারাপ থাকিয়াও যদি গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তাহা অপেক্ষা চলাচলের রাস্তা ভাল থাকিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য খারাপ থাকা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তাদের নিকট এজন্য প্রতীকার প্রার্থী হইয়াও বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। তাহার কারণ যাহারা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এই সমস্ত রাস্তার কণ্ট্রাক্ট (চুক্তি) লয়, তাহারা বেশী লাভের আশায় জল চলাচলের পক্ষে খরচাধিক্যের জন্য সেতু তৈয়ারী না করিয়া বরাবর মাটী দিয়া ভর্ত্তি করিয়া দেয় এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তারি ও উক্ত কণ্ট্রাক্টরদের কার্য্য যে কারণেই হউক ভাল করিয়া সকল সময় বুঝিয়া লন না।

পল্লীগ্রামে যে সমস্ত স্থানে পানীয় জলের নিতান্ত অভাব সেই সমস্ত স্থানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে মাঝে মাঝে ২।৪টী কূপ তৈয়ারী হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা দ্বারাও পল্লীবাসীদের বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। কারণ, গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে যখন পল্লীর খাল বিল শুকাইয়া যায় তখন এই সমস্ত কূপের জলও উহাদের গভীরতার অল্পতাহেতু বারিশূন্য হইয়া পড়ে। কাজেই পল্লীবাসীকে এই সমস্ত কূপ থাকিতেও বাধ্য হইয়া মরা নদীর স্রোতহীন পঙ্কিল জল বা অযত্নে রক্ষিত পচা ডোবার পচা জলই পান করিতে হয়; ইহার ফলে কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সহজেই আসিয়া দেখা দেয়। এই কারণেই পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ ফাল্গুন, চৈত্র মাসে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। যদি কণ্ট্রাক্টর মহাশয়েরা বেশী লাভের আশায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কূপগুলির গভীরতা অল্প না করেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তারা এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, তবে গ্রীষ্মকালে খাল বিলের জল শুকাইয়া গেলেও এই সমস্ত কূপ

অধিক গভীরতা হেতু একেবারে বারিশূন্য হইবে না; কিছু জল থাকিবে। তাহাতে পানীয় জলের অভাব অনেকটা দূরীভূত হইবে এবং পল্লীবাসীকে পচা ডোবা ও মরা নদী প্রভৃতির পঙ্কিল জল পান করিয়া ম্যালেরিয়া কলেরা গ্রস্ত হইতে হইবে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তারা এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে পল্লীবাসীর যথার্থ উপকার হইতে পারে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের টাকাপয়সাও ব্যয় হয়; কিন্তু কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয় না এবং তাহাতে গ্রামবাসীর উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে।

আমরা উপরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত নাগরপুর গ্রামের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটা রাস্তা আছে, ঐ রাস্তার জন্য গ্রামে ৩।৪টি জল চলাচলের পথ মাটি দিয়া ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে গ্রামের স্বাস্থ্য অধিকতর খারাপ হইয়াছে। যদি ঐ জল চলাচলের পথগুলি মাটি দিয়া ভর্ত্তি না করিয়া উহার উপর সেতু তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে জল চলাচলের সুবিধা থাকায় গ্রামের স্বাস্থ্য অধিকতর খারাপ হইতে পারিত না। আমরা এ সম্বন্ধে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতের বাতুলাগার।

ভারতের বাতুলাগারসমূহে রোগীর সংখ্যা যেন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে রোগের পরিমাণ বৃদ্ধি, কিম্বা বেশী পরিমাণ লোকের বাতুলাগারে আশ্রয় গ্রহণ, এই দুইটী factorএর কোনটি যে বাতুলাগারে রোগীর সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়, ঐ দুইটী কারণের মধ্যে ঠিক কি কারণে বাতুলাগারে প্রতি বৎসর লোক-সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহা নির্ণীত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, দেশে উন্মাদ রোগের প্রভাব কতখানি এবং কি কারণে লোকে পাগল হইয়া যায়, তাহা স্থির করিতে পারা যাইবে; এবং তাহার প্রতিকারের উপায়ও নির্ণীত হইতে পারিবে।

ভারতের বাতুলাগারে রোগীর সংখ্যা যে ক্রমশঃ বাড়িতেছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ, দেখিতেছি, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাতুলাগারে প্রবেশ ও পুনঃ-প্রবেশ করিয়াছিল, এমন রোগীর সংখ্যা ছিল ১৭১৩; ১৯০৪-১৯০৮ এই পাঁচ বৎসরের গড় পরিমাণ ১৬৯৩; ১৯০৯ অব্দের সংখ্যা ১৭০৮; ১৯১০ অব্দের ১৬৪৮; ১৯১১—১৭৯৭; ১৯১২—১৯৯০; ১৯১৩—২৩২৭; ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড় পরিমাণ ১৮৯৬; ১৯১৪—২০৮৩; ১৯১৫—২৩৬৯; ১৯১৬—২৫২৯; এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা ২৬১৭।

১৯১৭ অব্দে ভারতীয় বাতুলাগারসমূহে সমাগত ২৬১৭ জন রোগীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২২৫২ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৬৫। এই সকল রোগীর মধ্যে কৃষক শ্রমজীবী, ভিক্ষুক, কপর্দ্দকহীন, চাকর, বাকর, সৈনিক, শিক্ষক, ছাত্র, লেখক, ব্যবসায়ী, দোকানদার ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক আছে। ইহারা রোগের প্রকৃতি Mania, Melancholia, Dementia ও অন্যান্য ধরণের উন্মত্ততা। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি রোগ কৌলিক; কেহ কেহ মানসিক অস্থিরতা ও মানসিক শ্রমাধিক্যবশতঃ রোগাক্রান্ত হইয়াছিল; কাহারও পীড়া Toxic; কাহারও বা অন্য প্রকার। রোগীদের মধ্যে খৃষ্টান (ইউরোপীয়ান, ইউরেসিয়ান ও অন্যান্য শ্রেণীর), হিন্দু, মুসলমান এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিল।

ইহা গেল বৎসরের মধ্যে আগত রোগীর বিবরণ; কিন্তু ইহা মোট সংখ্যা নহে। সেটা প্রাদেশিক হিসাবেই দিতেছি। বৎসরের প্রথম দিনে বঙ্গদেশের বাতুলাগারসমূহে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্ত্রী-পুরুষে ১০৫১ জন রোগী ছিল; আর বৎসরের মধ্যে আসিয়াছিল ২৯১ জন; সুতরাং মোট ১৩৪২ জন বাতুলাগারে চিকিৎসিত হইয়াছিল। ঐরূপ মান্দ্রাজে যথাক্রমে ৮২৫, ৩০০, ১১২৫; বোম্বায়ে ১৩১২, ৬৩৫, ১৯৪৭; যুক্তপ্রদেশ ১৪৫১, ৪৪৯, ১৯০০; বিহার ও উড়িষ্যা ৩০২, ৮৯,৩৯১; পাঞ্জাব ৮১২, ৪১৫, ১২২৭; ব্রহ্মদেশ ৭০৬, ২২৭, ৯৩৩; মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৩৬২, ৯৭, ৪৫৯; আসাম ৩৪৩, ১১৬, ৪৫৯। অতএব সমগ্র ভারতবর্ষ (বৃটিশ) ৭১৬৬, ২৬১৭, ৯৭৮৩। এই সকল রোগীর মধ্যে পুরুষ ৭৯২৯ এবং স্ত্রীলোক ১৮৫৪ জন। তাহা হইলে, উন্মাদ রোগের সংখ্যা হিসাবে ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে বোম্বাই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান, এবং তাহার পরই যুক্তপ্রদেশের স্থান। তবে প্রদেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে হয়ত অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারে।

প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উন্মাদের সংখ্যা ১৯১৭ অব্দে এইরূপ ছিল,—

	ম্যানিয়া			মেলাঙ্কোলিয়া			ডিমেনসিয়া			ইডিয়সী			এপিলেপ্টিক			অন্যান্য		
প্রদেশ	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পু	স্ত্রী	মোট	পু	স্ত্রী	মোট	পু	স্ত্রী	মোট	পু	স্ত্রী	মোট	পু	স্ত্রী	মোট
বঙ্গদেশ	৩১৩	৯৭	৪১০	২১৪	৩১	২৪৫	৯০	৩৭	১৩০	৫২	১৮	৭০	৩০	২	৩২	৪১০	৩৮	৪৪৮
মান্দ্রাজ	৩১৫	১০২	৪১৭	১২৩	২৫	১৪৮	১৫০	৫৯	২০৯	৩৯	৮	৪৭	৫২	১৮	৭০	২০৩	৩১	২৩৪
বোম্বাই	৬৮২	২২৫	৯০৭	২৮৪	৪৯	৩৩৩	১৮৫	৫৬	২৪১	৮০	১৮	৯৮	৪৮	১২	৬০	২৮৩	২৫	৩০৮
যুক্তপ্রদেশ	৫০৯	১৮৩	৬৯২	৯৮	২২	১২০	২১৯	৬৩	২৮২	১০৭	৩৬	১৪৩	১৩১	২৮	১৫৯	৪৬৪	৪০	৫০৪
বিহার ও উড়িষ্যা	১১৯	৩২	১৫১	৬২	৫	৬৭	২৯	৩	৩২	৮	১	৯	১৪	৪	১৮	১০৯	৬	১১৫
পঞ্জাব	২৬৭	৯৬	৩৬৩	১৭০	৩৭	২০৭	১৪০	২২	১৬২	৫৭	২৬	৮৩	৯৩	২৩	১১৬	২৭২	২৪	২৯৬
ব্রহ্মদেশ	২৫৬	৮২	৩৩৮	১৯০	২৩	২১৩	৯৬	২২	১১৮	৫২	১০	৬২	২০	৬	২৬	১৫৮	১৮	১৭৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২০০	৬০	২৬০	৬৩	১০	৭৩	২৬	৭	৩৩	১৯	৮	২৭	২২	৫	২৭	৩১	৮	৩৯
আসাম	১২৫	৬২	১৮৭	১৪৩	২০	১৬৩	১	...	১	৫	১	৬	১৭	৫	২২	৭৮	২	৮০
বৃটিশ ভারতে মোট	২৭৮৬	৯৩৯	৩৭২৫	১৩৪৭	২২২	১৫৬৯	৯৩৯	২৬৯	১২০৮	৪১৯	১২৬	৫৪৫	৪২৭	১০৩	৫৩০	২০০৮	১৯১	২১৯৯

কোন শ্রেণীর উন্মাদের সংখ্যা কত, তাহার তালিকা দিলাম; এইবার কি কি কারণে উন্মাদ রোগ হয়, তাহার একটু আলোচনা করিব।

(ক) বংশানুক্রম। পাগলামি যাহাদের বংশগত, তাহাদের রোগের লক্ষণ এইরূপ; (১) মস্তিষ্কবিকৃতি; (২) মূর্চ্ছা; (৩) স্নায়বিক পীড়া, (৪) খামখেয়ালি ভাব; (৫) মদ্যপানজনিত জ্ঞানশূন্যতা। এই সকল লক্ষণের প্রথমটির সংখ্যা খুব বেশী—১২৪।

(খ) অব্যবস্থিতচিত্ততা। এইরূপ পাগলামী নিম্নলিখিত লক্ষণগুলিতে পরিস্ফুট—(১) দুর্নীতি-পরায়ণতা; (২) মানসিক বিকৃতি; (৩) খামখেয়ালী ভাব; (৪) পূর্ব্ববর্ত্তী আক্রমণের জের। এই শেষোক্ত শ্রেণীর রোগীর সংখ্যা ১২৩।

(গ) কোন কোন ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের বিকাশের অভাব, যথা, (১) স্বাদ-গন্ধ অনুভবের ক্ষমতাহীনতা; (২) বধিরতা; (৩) দৃষ্টিশক্তিক্ষীণতা। প্রথম শ্রেণীর রোগী আদৌ নাই। অপর দুই শ্রেণীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩ ও ৪।

(ঘ) সাময়িক উন্মাদনা। (১) স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন, বা বয়ঃসন্ধিজ। (২) ঋতুপরিবর্ত্তনের ফল; (৩) বার্দ্ধক্য-জনিত (ভীমরতি)।

(ঙ) সন্তান-প্রজননকালীন উন্মাদনা। (১)

গর্ভাবস্থা; (২) সন্তান প্রসবের পরবর্ত্তী কালীন; (৩) স্তন্য দিয়া সন্তান পালনের সময় বরাবর।

(চ) অতিরিক্ত মানসিক শ্রমজনিত। (১) আকস্মিক; (২) দীর্ঘকালস্থায়ী। এই দুই শ্রেণীর উন্মাদের সংখ্যা কিছ বেশী; যথাক্রমে ১০২ ও ২৯৩।

(ছ) দেহ ঘটিত। (১) শৈশবকালে রীতিমত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বা অল্পতা; এই শ্রেণীর রোগী এবার একটীও ছিল না। (২) দারিদ্র্য খাদ্যাভাব; (৩) অতিশ্রম, (৪) অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয় সেবা। ইহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮, ৫৮ ও ১০। এইগুলি নিবার্য্য ব্যাধি। এই শ্রেণীর উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সমাজের পক্ষে কলঙ্কর। যাহাতে এইরূপ উন্মাদ রোগীর সংখ্যা হ্রাস পায়, তাহার ব্যবস্থা করা সমাজের কর্ত্তব্য।

(জ) বিষজনিত (toscic)। এই দফাটির একটু বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। আলোচনার সুবিধার জন্য ১৯১৩ অব্দ হইতে ১৯১৭ অব্দ পর্য্যন্ত নেশাখোর ও বিষজনিত পাগলের একটী তালিকা আমরা নিম্নে দিতেছি—

উপকরণ	১৯১৩	১৯১৪	১৯১৫	১৯১৬	১৯১৭
মদ্যাদি	৯৭	৯৯	১০২	১১৭	৭৬
অহিফেন ও মর্ফিয়া	১১	৯	১৯	১৩	১৪
কোকেন	১	৬	৫	২	২
গাঁজা, চরস ভাঙ	২৭৩	২৯৩	৩৫০	৩২৫	৩০৯
জ্বর	৮১	৬৩	৭৫	৭২	৭০
যক্ষ্ম	৯	১৮	১৩	৫	
সিফিলিস (সংক্রামিত)	৩২	২৮	২৩	২৭	১
সিফিলিস (সহজাত)	১	৪	...	১	...
প্লেগ	৪	৩	...	৩	১
অন্যান্য শ্রেণীর	১৮	১৬	২৩	১৬	১

এই কয়েকটীর মধ্যে প্রথম চারিটী দফার উন্মা রোগ সম্পূর্ণরূপে নিবার্য্য; অন্ততঃ, হওয়াই উচিত। কি দুঃখের বিষয়, ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। উন্মা রোগীদিগের দ্বারা যে সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হ আমাদের মনে হয়, তাহা প্রধানতঃ নেশাখোর পাগলে দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। এই তালিকার মধ্যে নেশাখো পাগলের অঙ্কের ঘরে শূন্য দেখিলেই অত্যন্ত সুখী হই পারিতাম। কিন্তু এমন শুভদিন যে কখনও আসি যেদিন নেশাখোর পাগলের সংখ্যা একটীও তালিকা মধ্যে থাকিবে না,—ইহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় না আচ্ছা, গাঁজাখোর, চরসখোর, সিদ্ধিখোর পাগলে সংখ্যা এত বেশী কেন? সরকার বাহাদুর কি এ সকল নেশার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় সংযত করিয়া এ শ্রেণীর পাগলের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিবেন না?

আরও কয়েক শ্রেণীর পাগল আছে। সেগু কোন না কোন রোগ বা আকস্মিক দুর্ঘটনা ফল এই জন্য সেগুলির আর বিশেষ ভাবে আলোচনা প্রয়োজন দেখিতেছি না। অতএব এ যাত্রা এই খানে ক্ষান্ত হইলাম।

স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ।

কিরূপে স্বাস্থ্যানুমোদিত স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে মার্লবরোনিবাসী ডাক্তার ফারগাস কয়েকটি অতি সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বহুদর্শী চিকিৎসক; বিশেষতঃ, স্কুল-গৃহে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা, পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার মতামত নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান। তিনি বলেন,—

যে ভূমির উপর স্কুল-গৃহ নির্ম্মিত হইবে, সেই ভূমি খুব সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচন করিতে হইবে। নিম্ন বা আর্দ্র ভূমি যত্নসহকারে বর্জ্জন করিতে হইবে। ভূমি অল্প ঢালু হইবে; কিন্তু পিছনে যেন খুব উচ্চ ভূমি না থাকে। কিছু উচ্চ মালভূমি স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। স্কুল-গৃহের জমির প্রকৃতি কিরূপ তাহা দেখাও খুব দরকার। জমি যদি বেলে মাটীর হয়, শীঘ্র জল শোষণ করিয়া লইতে পারে, এবং বৃষ্টির পর শীঘ্রই শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে সেই জমিই খুব উত্তম। নিকটে কোথাও জল না জমিয়া থাকে; কারণ এরূপ জলে প্রায়ই নানা আবর্জ্জনা পড়িয়া পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়। স্কুল-গৃহ যে জমির উপর নির্ম্মিত হইবে, তাহা এঁটেল মাটী হইলে বৃষ্টির জলে তাহা কর্দ্দমে পরিণত হয়। এই কাদা শীঘ্র শুকাইতে চায় না; ফলে, ভূমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্দ্র থাকে। এরূপ ভূমি স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এরূপ ভূমিতে স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করা ত উচিত নহেই; এমন কি, স্কুলের কাছাকাছিও এরূপ জমি থাকা ভাল নয়।

ভিত্তি।

স্কুল-গৃহের ভিত্তি এমন ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যাহাতে উহা মাটী হইতে রস শুষিয়া লইয়া ভিজা, নরম না থাকে। ভিত্তি নির্ম্মাণ করিবার সময়েই পয়ঃপ্রণালীর স্থান রাখা আবশ্যক। ইহাতে শুধুই যে পরে অনেক বাজে খরচ ও পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে, তাহা নহে; ভিত্তি নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ড্রেনের ব্যবস্থা করিয়া লইলে ড্রেনটি যেমন উত্তম হইবে, তাহার তদ্রূপ আরও অনেক সুবিধা আছে। অতএব বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ড্রেনের সম্পূর্ণ নক্সা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। ড্রেন দিয়া বৃষ্টির ও নোংরা জল বাহির হইয়া কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া যাওয়া চাই। ভিত্তির এবং স্কুল-বাড়ীর দেওয়ালগুলি যথাসাধ্য নিরেট এবং পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য। তাগাড় মাখিবার জন্য যে জল ব্যবহৃত হইবে, তাহা পচা পুকুরের পচা আবর্জ্জনা মিশ্রিত জল না হয়; উহা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হইলেই ভাল হয়। দেওয়ালের গাঁথুনীর ভিতর তিন ইঞ্চি চওড়া বায়ুর অবস্থিতির স্থান রাখিলে দেওয়ালগুলি এবং বাড়ীখানি শুকনা খটখটে থাকিবে; এবং শীতকালেও বেশ গরম থাকিবে। চুণ শুরকী ভাল হইলে, সেগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত ও মাখা হইলে উহা যেমন শুকনা হয়, তেমনি শীঘ্র জল শোষণ করে না। চুণ শুরকীর এই গুণটি ইট-পাথরের অপেক্ষা অনেক বেশী। বাড়ী খুব বড় করা ভাল নয়। স্কুল বা কলেজ খুব বড় হইলে, বাড়ীগুলি কয়েকটি ব্লকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নির্ম্মিত হইলে, এবং মাঝে মাঝে কিছু কিছু খোলা জমি থাকিলে ভালই হয়। একটানা প্রকাণ্ড বাড়ীর অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড ব্লক অনেক ভাল; ইহাতে নানা দিকে অনেক সুবিধা।

স্কুল গৃহের জানালা।

ঘরের জানালাগুলি এমন ভাবে এমন জায়গায় বসাইতে হইবে, যেন, ঘরে বসিয়া বসিয়া যে কাজ করা হইবে—যথা, পড়া বা লেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদি—সেই কাজগুলির উপর যথেষ্ট আলো আসিয়া পড়িতে পারে। বায়ু চলাচলের জন্য, জানালাগুলি ছাদের যতটা কাছে হইবে, তত বেশী সুবিধা হইবে।

সাধারণতঃ বাসগৃহে এবং বিশেষ ভাবে স্কুলগৃহে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকে অনেক রকমে মাথা খাটাইয়াছেন; কিন্তু ফল বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। একটু বিবেচনা করিয়া, মোটামুটি রকমে ঘরের দরজা জানালা এমন ভাবে বসাইতে হইবে, যেন, বায়ু প্রবাহিত হইবার সময় সমস্ত ঘরের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে পারে; কোথাও কোন কোণে কিম্বা দেওয়ালের ধারে কিম্বা কড়ির নিচে বায়ু আবদ্ধ হইয়া থাকিতে না পারে। স্বাভাবিক ভাবে বায়ু প্রবাহ ঘরের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইবার অসুবিধা ঘটিলে, কৃত্রিম উপায়েও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নলের সাহায্যে ঘরের সর্ব্বত্র বায়ু সঞ্চালন করা যাইতে পারে।

শীত প্রধান দেশে, এবং আমাদের দেশে দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি শীত প্রধান স্থানে স্কুলগৃহে অগ্নি রাখার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই অগ্নি অক্সিজেন বায়ু খাইয়া ফেলিয়া যে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস উৎপাদন করিবে, তাহা যেন ঘরের বায়ুকে দূষিত করিতে না পারে, এমন উপায়ও অবলম্বন করিতে হয়। আমাদের দেশের সমতলভূমি স্বভাবতঃই বেশ গরম; সুতরাং এখানে অগ্নি রক্ষার কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক নহে।

জলের সংস্থান।

স্কুলগৃহে জলের সংস্থান খুব ভাল রকম থাকা চাই। সমস্ত ঘর, দালান, উঠান, ড্রেন প্রত্যহ ধৌত করানো আবশ্যক। কিন্তু এই বিষয়টিতে আমাদের স্কুল কলেজ সমূহের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অমনোযোগিতা দেখা যায়। স্কুল কলেজে বেতনভোগী মেথর থাকিতে পারে, এবং সে প্রত্যহ সমস্ত স্কুল, বাটী ঘর, প্রভৃতি ঝাঁট দিতে পারে; কিন্তু ধৌত করিবার ব্যবস্থা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের গৃহস্থ ঘরে অধিকাংশ বসত বাটীতেই প্রত্যহ সমস্ত ঘর এবং বাড়ী ধৌত করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু স্কুলে সে রকম ব্যবস্থা রাখা কেহ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু স্কুল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ফারগাস এইটী অত্যন্ত দরকারী জিনিস বলিয়া মনে করেন। তিনি বলিয়াছেন, "The water supply of a school is a matter of the utmost importance, there should be no limit to the supply, whether for domestic or for other uses, such as flushing drains and supply of water-closets."

এই কলিকাতা সহরে এত স্কুল কলেজ রহিয়াছে, কিন্তু এখানে স্কুল কলেজের বাড়ীঘর ধৌত করিবার কোন ব্যবস্থা কোথাও আছে কি? ডাক্তার ফার্গাস পরামর্শ দিতেছেন যে, ড্রেন এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্কুলগুলি যেন সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হয়; উহাদিগকে যেন অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে না হয়—"It is always better for a school to have its water supply, and if possible its system of drainage, independent of every other authority." তাহা হইলে, স্কুলে যথেষ্ট জলের ব্যবহারে কেহ বাধা দিতে পারে না।

স্কুলের ড্রেনগুলিতে যেন বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকে; সেখানে যেন sewer gas জমিতে না পারে। ড্রেন ও প্রত্যহ রীতিমত প্রচুর জল দিয়া ধৌত করিতে হইবেই, অধিকন্তু, ড্রেনসমূহে ঘন ঘন বিশোধক ঔষধ (disinfectants) প্রয়োগ করিতে হইবে।

শত্রু নয়, মিত্র।

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল নীতি এই যে, সামান্য সর্দ্দি হইতে আরম্ভ করিয়া যক্ষ্মা, প্লেগ, বসন্ত, বিসূচিকা, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সমস্ত ছোট বড় রোগের উৎপত্তির কারণ এক এক শ্রেণীর জীবাণু বা বীজাণু। এই জীবাণুদিগকে ধ্বংস করিতে পারিলেই রোগ আরাম করিতে পারা যায়; এবং চিকিৎসার দ্বারা, ঔষধাদির প্রয়োগ করিয়া জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করিয়াই রোগীকে নিরাময় করা হইয়া থাকে। কিন্তু Health Culture নামক একখানি স্বাস্থ্য বিষয়ক সাময়িক পত্রে শ্রীযুক্ত Amy W. Eggleston সম্প্রতি জীবাণুগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার প্রবন্ধটির সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। তিনি বলিতেছেন,—

জীবাণুগণ রোগোৎপত্তির কারণ,—এই মতটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই আমরা জীবাণুদিগকে আমাদের ভীষণতম শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেহ যদি চক্ষু বুজিয়া জীবাণুগণের ধ্যান করেন, তবে অবিলম্বে তাঁহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে অতি ভীষণ রাক্ষসতুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি পৃথিবীময় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে থাকিবে; এবং কাহাকে কখন আক্রমণ করিতে পারিবে তাহার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইবে। যদি আমাদের মনে হয় যে কোন সুযোগে ইহাদের দুই একটী আমাদের দেহে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, অমনি আমরা তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিব, এবং আমাদের ভাণ্ডারে, চিকিৎসকগণের চেষ্টায় ও গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত এবং ঔষধ-প্রস্তুতকারকগণের যত্নে ও পরিশ্রমে প্রস্তুত, যত কিছু অস্ত্র শস্ত্র মজুত আছে, তাহাদের সাহায্যে ঐ সকল জীবাণুকে বধ করিবার চেষ্টা করিব। কাহারও সংক্রামক পীড়া হইলে আমরা যথাসাধ্য সাবধানতা সহকারে ঐ ব্যক্তিকে বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এমন কি, grippe, সর্দ্দি বা গলায় ঘা যুক্ত ব্যক্তিগণের নিকটস্থ হওয়া আমরা নিরাপদ বলিয়া মনে করি না।

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এই সকল জীবাণু আমাদের শত্রু ত নয়ই, প্রকৃত পক্ষে বরং তাহারা আমাদের পরম মিত্র। তাহারা আমাদের বন্ধু নিশ্চয়ই; এবং যদিও, যতক্ষণ তাহারা আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ তাহাদের সান্নিধ্য আমাদের পক্ষে প্রীতিকর নহে, তথাপি, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহারা একবার আমাদের দেহে প্রবেশ করিলে, ভবিষ্যতে তাহার ফল ভাল হইবেই। বাল্য কালে কোন অন্যায় কাজ করিলে আমরা যখন দণ্ড ভোগ করি, তখন তাহা আমাদের ভাল লাগে না বটে, কিন্তু শৈশবে অন্যায় করিয়া শাস্তি ভোগ না করিলে পরিণত বয়সে আমাদের দশা কি হইত, বলুন দেখি?

বস্তুতঃ, আমাদের এই দেহরূপ ঘরে জীবাণুগণ মেথর বা ঝাড়ুদারের কাজ করে। মেথররা যখন ময়লা পরিষ্কার করে, বা ঝাড়ুদাররা যখন ঝাঁট দেয়, তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদের একটু অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু ময়লা যদি একেবারেই পরিষ্কার না করা হয়, অথবা ঝাঁট দিয়া আবর্জ্জনা দূর করা যদি বন্ধ থাকে, তবে তাহাতে আরও কত বেশী অসুবিধা ও ক্ষতির সম্ভাবনা ভাবিয়া দেখুন দেখি!

কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলিতেছি। কৌলিক রোগই বলুন, অথবা সাময়িক ব্যাধিই বলুন,—পীড়ার অর্থ আর কিছুই নয়,—আমাদের রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত আবর্জ্জনা জমিয়া থাকার ফল। স্বাভাবিক নিয়মেই রক্ত মধ্যে এই সকল আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়;

এবং রক্তে আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইলে তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে এই আবর্জ্জনা কোন আকারে প্রকাশ পাইবে,—যক্ষ্মার আকারে, না টাইফয়েড জ্বরের আকারে, না অন্য কোন রোগের আকারে—তাহা প্রধানতঃ বংশানুক্রম বা কৌলিকতা অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়।

রক্তের মধ্যে যেমন আবর্জ্জনা জমে, তেমনি সেগুলা বাহির হইয়া যাইবার স্বাভাবিক নিয়ম, প্রণালী, পথ প্রভৃতিও আছে। কিন্তু কোন কারণে যখন রক্তের মধ্যে এইরূপ বিষাক্ত আবর্জ্জনা এত বেশী পরিমাণে জমিয়া যায় যে, সেগুলা বহির্গমনের পথগুলিকে বিকৃত না করিয়া স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইতে পারে না, তখনই জীবাণুগুলি আমাদের দেহস্থ হইয়া আমাদের বন্ধুর কাজ করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ ঐ সকল আবর্জ্জনা খাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ঔষধাদির প্রয়োগ দ্বারা এই সকল জীবাণুকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। আচ্ছা, শরীরে যে আবর্জ্জনা জমিয়াছে, জীবাণুরা সে খবর পায় কিরূপে? যেমন করিয়াই হউক, পায়। একটা ঘোড়া মরিয়া গেলে, তুমি সেটা মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আইস। তুমি মনে করিবে, ঘোড়ার মৃতদেহ ঐখানে পড়িয়া পচিতে থাকিবে; কারণ, তুমি জান, মাঠের যেখানে তুমি ঘোড়াটা ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছ, তাহার চারিদিকে এক ক্রোশের মধ্যেও একটীও কাক, কি শকুনী কি চীল প্রভৃতি এমন মাংসাশী কোন পক্ষী নাই, যে আসিয়া ঐ মরা ঘোড়ার মাংস খাইতে পারে; কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই তুমি দেখিতে পাইবে, আকাশমণ্ডল মেঘের মত অন্ধকার করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে ঐ শ্রেণীর মাংসভুক্ পক্ষী আসিয়া মহানন্দে ভোজ লাগাইয়া দিবে। ঠিক এইরূপেই, তুমি যদি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে অবহেলা করিয়া তোমার রক্ত মধ্যে আবর্জ্জনা সঞ্চয় করিয়া রাখ, তাহা হইলে যেখান হইতেই হউক, জীবাণুগুলি তাহাদের খাদ্যের সন্ধান পাইবে, এবং আসিয়া খাইতে আরম্ভ করিবে। তোমার এমন সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ তাহারা কখনই উপেক্ষা করিবে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী অনুসারে যে রোগীর চিকিৎসা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাকে উপবাসের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া হয় না, প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে, স্নান করিতে এবং গাত্র মর্দ্দন করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, সে খুব উৎকট রকমের পীড়িত, অত্যন্ত ক্ষীণ, রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও, চিকিৎসার ফলে সে খুব দ্রুতগতি সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবে, তাহার দেহ ও মন পরিষ্কার হইয়া যাইবে, এবং অচির-ভবিষ্যতে অন্য কোনরূপ পীড়া তাহার হইবে না।

যখনই আমরা জীবাণুগুলিকে মারিয়া ফেলিতে, জ্বর কমাইতে, এবং রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দিয়া সবল করিতে চেষ্টা করি, তখনই জানিবে, আমরা প্রকৃতির আমাদের সুস্থ রাখিবার পক্ষে তাহারা শুভ সংকল্প সাধনে বাধা দিতে চাহিতেছি। অবশ্য প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীতেও রোগী নিরাময় হয় বটে, কিন্তু স্বভাবসঙ্গত চিকিৎসা-প্রণালীতে রোগী যেরূপ সত্বর এবং যেরূপ উৎকৃষ্টভাবে আরোগ্য লাভ করে, বর্ত্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীতে তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। এ কথা প্রায়ই শুনা যায় যে, অমুক রোগের ফলে ঐ লোকটির এইরূপ অঙ্গ-বৈকল্য ঘটিয়াছে; অর্থাৎ হয় ত কেহ গ্রিপ্ রোগে ভুগিয়াছিল বলিয়া তাহার হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; কিম্বা হয় ত কেহ স্কার্লেট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া এখন কালা হইয়া পড়িয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত তাহা কথা নয়।—কোন একটী আনুষঙ্গিক কুফলের দায়িত্ব তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রোগের ঘাড়ে চাপানো ঠিক নয়। বরং ঐ রোগের চিকিৎসা প্রণালীই ঐ পরবর্ত্তী কুফলের (after effects) জন্য দায়ী।

আমরা প্রায় নিত্য স্নান করিয়া থাকি, এবং শরীরের বাহিরের দিকটা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের দেহের ভিতর যে ময়লা বোঝাই হইয়া রহিয়াছে, তাহার কি? আমাদের দেহটি একটী বিষ-উৎপাদক যন্ত্রমাত্র। যে লোক তাহার দেহের মধ্যে উৎপন্ন এই বিষ যত শীঘ্র এবং যত সহজ উপায়ে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে, সেই ব্যক্তিই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ততটা ভাগ্যবান।

পাপের পরিণাম মৃত্যু। আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপানুষ্ঠান করি, তবে তাহার শাস্তি ভোগ করিবার জন্যও আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা যদি আমাদের বন্ধু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুদিগকে আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের এই দেহঘরকে পরিষ্কার করিতে না দিই, তাহা হইলে আমাদিগকে আরও অনেক বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

আমার বিশ্বাস, এই কথাটি সকলেই বুঝেন যে, এই সকল প্রাণী—জীবাণু—সর্ব্বদাই আমাদের চারিদিকে অবস্থিতি করিতেছে;—আমরা জাগ্রতই থাকি, আর নিদ্রিতই থাকি—আমরা যে বায়ু হইতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি, সেই বায়ুতেও ইহারা রহিয়াছে। দরিদ্রের মত, ইহারা কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়া হইতে চাহে না। পক্ষান্তরে, আমরাও ইহাদের অভাব সহ্য করিতে পারি না, এবং করিতে চাহিও না। আইনের বিধি লঙ্ঘন না করিলে, আইন হইতে কাহারও কোন আশঙ্কা নাই। জীবাণুদিগকে সুযোগ না দিলে তাহারা তাহাদের অস্তিত্ব আমাদিগকে জানাইতে ব্যস্ত নহে। তাহাদের ভুরি ভোজের আয়োজন করিয়া দাও; তার পর তাহাদিগকে আহ্বান না করিলেও—রবাহূত হইয়াও তাহারা আসিয়া হাজির হইবে, এবং মহা আনন্দে ভোজে নিযুক্ত হইবে। কিন্তু, তাহাদিগকে যদি খাইতে না দাও, তবে তাহারা তোমার কাছে ঘেঁসিবে না,—অন্যত্র আহারের সন্ধানে যাইবে।

বিশুদ্ধ বায়ুতে গভীরভাবে নিশ্বাস গ্রহণ, মাঝামাঝি ভাবে পরিশুদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ (আকণ্ঠ ভোজন নহে), এবং সৎ-চিন্তা—এই সকল অতি সরল সহজ নিয়ম। এইগুলি পালন করিয়া চলিলে জীবাণুভীতি হইতে কোন আশঙ্কা উদ্বেগ ঘটিবে না। তুমি যদি সতর্ক না থাক, তাহা হইলে,—তোমাকে অসতর্ক পাইলেই জীবাণুরা আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। অতএব জীবাণুরা আসিয়া যাহাতে তোমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে অভ্যাস কর; দেখিবে, জীবাণু তোমাকে একটুও বিচলিত, বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত করিতে পারিবে না। যদিই বা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সে তোমাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায়, তবে উপবাস দিয়া তাহাকে শুকাইয়া মার,—অন্য কোনরূপে তাহার সহিত লড়াই করিবার প্রয়োজন নাই। মনে রাখিও, সে তোমাকে আহত করিলেও বেশী ক্ষতি করিতে পারিবে না। দোষ তোমারই; সাজাও তোমাকেই লইতে হইবে। আইন-লঙ্ঘনকারীরাই দণ্ডিত হইয়া থাকে। অতএব স্বাস্থ্যের আইন লঙ্ঘন করিব না—ইহাই তোমার মূলমন্ত্র হউক।

কচি ছেলেদের খাবার।

লেখক—শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস।

দিনকালের এমনই মহিমা, যে, কচি ছেলেদের খাবার কি হওয়া উচিত, আর কি হওয় উচিত নয়, এই কথার আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ, মায়েদের স্তনে দুগ্ধের এমনই অভাব হইয়াছে যে, এখন সেই অভাব কি করিয়া দূর করা যায়, সেইটাই ভাবনার কথা হইয়া পড়িয়াছে। এখনো অনেক বালক জন্মে, যাহারা মাতৃস্তন্য ছাড়িয়াই ভাত ধরে—গো-দুধ, গর্দ্দভী-দুধ বা বিলাতি ফুড খাইবার দুর্ভাগ্য যাহাদের হয় না।

পশ্চিমবাসিনী হিন্দুস্থানী রমণীদের ও বাঙ্গালার পল্লীবাসিনী রমণীদের স্তনে এখনো দুধ যথেষ্ট আছে—নাই কেবল সহরবাসিনী অন্তঃপুরচারিণীদের। যাঁহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন এবং ভগবানের উন্মুক্ত আকাশ ও বাতাস উপভোগ করিতে পান, যাঁহাদিগের শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট হয় এবং মাতৃত্বের গৌরব যাঁহাদিগের হৃদয় জুড়িয়া আছে, তাঁহাদিগের স্তনে দুগ্ধের অভাব হয় না। সহরের ষোলআনা কৃত্রিমতার মধ্যে বাস করিয়া, নিত্য বাসি খাদ্য খাইয়া, রুদ্ধ স্থানের দূষিত বায়ু সেবন করিয়া, অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ ও নিত্য কোষ্ঠ-শুদ্ধি ভোগ করিয়া সহরের রমণীরা যেন বিষদিগ্ধ জীবন যাপন করেন—সহরের রমণীরা আওতায় বাঁচিয়া থাকেন মাত্র। সে দেহে স্বাস্থ্যের লক্ষণ কোথা হইতে হইবে? গড়ের মাঠে বা পর্দ্দাপার্কে হাওয়া খাওয়া সকলের ভাগ্যে না ঘটিলেও, নিজ নিজ বাড়ীর ছাদে রীতিমত ভাবে হাওয়া খাওয়া, এবং তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, অর্থাৎ ঘরের মধ্যে সদা সর্ব্বদাই হাওয়া খেলিতে দেওয়া, বিশেষতঃ রাত্রিতে,—এরূপ করার আবশ্যকতাই তাঁহাদিগকে বোঝান ভার। তাঁহারা "হাঁড়ি-হেঁসেল" নতুবা "নাটক-নভেলে" মসগুল; তাঁহারা হয় গাড়ী মুদিয়া হাওয়া খান, নতুবা রান্নাঘরের কয়লার ধোঁয়া খান।

আজ মাতৃ স্তন্যের অভাব হওয়ায়, জন্ম হইতেই শিশুকে গো দুগ্ধ, গর্দ্দভী দুগ্ধ, ছাগী দুগ্ধ, বিলাতি টিনে করা গাঢ় দুগ্ধ বা ফুড খাওয়াইয়া জীবিত রাখিতে হইতেছে। এই সকল গুলির সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলিব।

গর্দ্দভী দুগ্ধ অত্যন্ত পাতলা বা নিরেস; কাজেই যাহাদের অন্য কোনও রকম দুধ পরিপাক হয় না, সেই শিশুগণকে কিছুদিনের জন্য গর্দ্দভী দুগ্ধ খাওয়াইয়া রাখা হয়। বরাবর (অর্থাৎ ছয় বা আট মাস কাল বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত শিশুর দন্তোদ্গম না হয়) গর্দ্দভী দুগ্ধ পান করাইয়া শিশুকে মানুষ করিতে হইলে সে শিশু মানুষ ছাড়া আর কিছু হইয়া উঠে—দুর্ব্বল, অন্তঃসারশূন্য, রুগ্ন বা রোগ-প্রবণ।

ছাগী দুগ্ধের গুণ অনেক। ছাগী দুগ্ধে স্নেহাংশ কিছু কম থাকিলেও, ইহা পুষ্টিকর। গোদুগ্ধের ছানা পেটে যাইয়া, ইহা বড় বড় দলার আকার ধারণ করে না—কাজেই উহা সুপাচ্য না হইলেও, দুষ্পাচ্য নহে। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার কথা এই যে, ছাগীকে গৃহে পালন করা যায়, ছাগীর আহারের বন্দোবস্ত গৃহস্থ নিজের হাতে করিতে পারেন এবং ছাগীর স্বাস্থ্যের জন্য যাহা যাহা করা প্রয়োজন, সে সকলই স্বল্প ব্যয়ে গৃহস্থ দ্বারা সাধিত হইতে পারে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাগীর খাদ্য ও স্বাস্থ্যের উপরে উহার দুগ্ধের দোষ গুণ যোল আনা নির্ভর করে। যেমন ভাল খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শারীরিক ব্যায়াম বা পরিশ্রম না করিলে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, গো, ছাগী প্রভৃতি অন্য গৃহপালিত জীবের পক্ষেও সেই ব্যবস্থা। দিবা রাত্র সাঁতে সেঁতে যায়গায় বা ঘরের কোণে মলমূত্র মাখিয়া ছাগী গরুকে রাখিলে, তাহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, তাহারা ক্ষয়কাশ ব্যারাম হইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে, যেমন অতি সহজেই গরুর ক্ষয়কাশ ব্যারাম ধরে, ছাগীর ক্ষয়কাশ এক রকম হয় না বলিলেই হয়—এই হিসাবে ছাগী দুগ্ধ পান করা আরো নিরাপদ। কিন্তু ক্ষয়কাশ না হইলেও ছাগীর অপর সকল ব্যারামই হয়—সেই ছাগীর দুগ্ধ পান করিয়া শিশুরও স্বাস্থ্য মন্দ হয়।

কথা, গৃহে ছাগী বা গরু পুষিলে, মাতৃজ্ঞানে গৃহিণী বা গৃহস্বামী তাহার যথেষ্ট ও যথার্থ সেবা না করিতে পারিলে, সে ছাগী বা গো দুগ্ধ পান করায় কুফল ফলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

গো দুগ্ধই বঙ্গদেশে প্রচলিত দুগ্ধ। কিন্তু, আজ গোজাতির যেরূপ অধঃপতন হইয়াছে, গো সেবার ও গোচারণ মাঠের যেরূপ অভাব হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে গো হত্যার যেরূপ বৃদ্ধি হইয়া ছ, বৃষোৎসর্গের যে হারে লোপ ঘটিতেছে—তাহাতে গো দুগ্ধ ভাল থাকে কেমন করিয়া? গরুর সেবা করিব না, গোজাতির উন্নতি সাধন করিব না, যাবতীয় উৎসৃষ্ট বৃষকে সরকারী ময়লা গাড়ীতে যুড়িয়া দিব—অথচ "বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ চাই" বলিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিব—এ বিসদৃশ দৃশ্য এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশেই দেখা যায়। একদিকে বিলাতী শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়া গো জাতিকে নির্ম্মূল হইতে দিতেছি, অপর দিকে "আঁতের টানে" দুগ্ধের জন্য হাহাকার করিতেছি! সাংখ্যের পুরুষের মত দেশের সকল ব্যবসায় সকল ব্যবস্থাই লুপ্ত হইতে দিতেছি, আজ তাই দেশের অবস্থা এই। যে সকল গোয়ালা গো দুগ্ধ বিক্রয় করে, তাহাদিগের হৃদয় নাই, তাহাদিগের কাণ্ডা-কাণ্ড জ্ঞান নাই; কাজেই, সুস্থ বা রুগ্ন, সকল প্রকার গাভীরই দুধ, ফুকা দেওয়া দুধ, মাটা তোলা ও বাসি দুধ—যে সে পুকুরের জল, বাতাসা, খড়ি প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া গৃহস্থের গৃহে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে! আর আমরা সেই দুগ্ধ পান করিয়া নানা রকমের উদরের পীড়ায় ভুগিতেছি। সুধুই কি তাই! এই দুগ্ধের সঙ্গে সাঁগু, বার্লি, শঠির পালো বা জল না মিশাইলে, আমাদের শিশুরা উহা পরিপাক করিতে পারে না! অশ্বত্থামার পিটুলিগোলা যে ইহা অপেক্ষা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর! যদি গৃহে গো-পালন করিয়া, স্বয়ং সেই গরুর যথার্থ সেবা করিয়া, গো-দুগ্ধ নিজ নিজ শিশুকে একটু সাইট্রেট অব সোডা (আউন্স পিছু ২ গ্রেণ হিসাবে) সংযোগে খাওয়ান, তাহার এক ফল; আর বাজারে যে সে তথা-কথিত গোদুগ্ধে সাগু মিশাইয়া খাওয়ানর স্বতন্ত্র ফল।

কাঁচা দুগ্ধ সেবনের ব্যবস্থা এ দেশে নাই—কিন্তু কাঁচা দুগ্ধই পরম উপকারী। যদি যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে গরুর পালান পরিষ্কার করিয়া স্বহস্তে দুগ্ধ দোহন করিয়া কাঁচা, টাটকা দুগ্ধ সেবন করান যায়, তাহা হইলে সেটি পরম উপকারী হইয়া থাকে।

দুগ্ধের দিক ছাড়িয়া দিলে, সাগু, বার্লি, শঠির পালো প্রভৃতির ব্যবহারের কথা আসিয়া পড়ে। কিন্তু শুধু সাগু, বার্লী খাওইয়া, ছেলেদের জীবিত রাখা সম্ভবপর নয়। কাজেই, সুধু সাগু বার্লী খাওয়ানর কথা বলিয়া লাভ নাই। সুধু এই টুকুই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, যে শিশুর উদরে খাঁটি বা জল মিশ্রিত গোদুগ্ধ সহ্য হয় না, তাহার পক্ষে, দুধের সঙ্গে বার্লী প্রভৃতি মিশাইলে দুগ্ধ সহজ-পাচ্য হয়। সুধু খানিকটা জলের পরিবর্ত্তে, সাগু প্রভৃতি মিশাইলে, দুগ্ধ পরিপাকে সহায়তা করে, দুগ্ধের পুষ্টির মাত্রা কিছু বাড়িয়া যায়। কিন্তু, দুধে জল বা সাগু না মিশাইয়া, সুধু সাইট্রেট অব সোডা মিশাইলে, ফল আরো ভাল হয়।

বর্ত্তমান কালে, বিলাতী আমদানী দুগ্ধ বা ফুড খাওয়ানোর প্রথা খুব বেশী বাড়িয়া চলিতেছে। এ বৃদ্ধির কারণ তিনটি; প্রথমতঃ সকল চিকিৎসক দূরদর্শী ও চিন্তাশীল নহেন; চিকিৎসকের পক্ষে সেটা অত্যন্ত অগৌরবের কথা। কোন্ ফুডে কি আছে, কি না আছে, তাহার সন্ধান না লইয়া, উহাদের সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভার লইয়া, বিবেচনাহীন মূঢ়ের মত অনেক চিকিৎসক নিঃসঙ্কোচে ফুড খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, এই দুর্ভাগ্য, রোগ ও জরা-প্রপীড়িত দেশে, রোগের ও জরার অনুপাতে, যাহারা কখনো কোনরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রানুশীলন করে নাই এমন উপদেষ্টা, হিতার্থী ও চিকিৎসা-বিদ্যাদৃপ্ত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী; সেই সকল "সবজান্তা" লোকের অযাচিত পরামর্শ-বাহুল্যেই ফুডের প্রচলন-বাহুল্য ঘটিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিলাতী বিজ্ঞাপনের চটকেই অনেক গৃহস্থ মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এই সকল কারণে ফুডের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিলাতী যতরকমের দুগ্ধ আসে, তাহারা চারি প্রকারের; প্রথমতঃ, এক দফা চিনি মিশ্রিত, আর এক দফা চিনি মিশ্রিত নহে; দ্বিতীয়তঃ, একদফা মাটা তোলা, আর একদফা মাটাতোলা নহে। সাধারণে, এমন কি এদেশের শিক্ষিত লোকেরাও একথা সকলে জানেন কি? তাঁহারা বিলাতী দুধ ত বিলাতী দুধই জানেন, তাহাদিগের জাতি গোষ্ঠির খবর রাখেন না। মাটাতোলা নয় এমন দুধ যদি শর্করা মিশ্রিত না হয়, তবে, সেই দুধ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করা চলে—তাও বরাবরের জন্য নহে, কালে ভদ্রে, দরকারে অদরকারে ব্যবহার করিতে হয়। অপর তিনজাতীয় দুধ ব্যবহারে ষোল আনা কুফল ফলে। সেগুলিকে আইনানুসারে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা উচিত।

"ফুড" নামধেয় বিলাতী গুঁড়া খাদ্যগুলির সম্বন্ধে এদেশে আরো বেশী অজ্ঞতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, সেগুলির উপাদান কি, তাহা কয়জনে জানেন? বাসি ছোলার ছাতু বা গমের গুঁড়া ও দুধ একত্র মিশাইলে যাহা হয়, ধরিতে গেলে ঐ ফুড্ মাত্রেই তাহাই। দ্বিতীয়তঃ, সেগুলির প্রকার-ভেদ কত তাহা কতজনে জানিবার চেষ্টা করেন? মোটামুটি ভাবে ধরিলে, সেগুলি তিন শ্রেণীর যথা, (১) যে খাদ্য পরিপাক করিতে হয় না, পরিপাক করা অবস্থাতেই বিক্রীত হয়। এই জাতীয় খাদ্য সংখ্যায় খুব অল্প; তন্মধ্যে বেঞ্জার্স ফুড এদেশে সুপরিচিত। (২) যে খাদ্যে শ্বেতসার (starch) শর্করায় পরিবর্ত্তিত (dextrose) হইয়া গিয়াছে; এবং (৩) যে খাদ্যে আস্ত শ্বেতসার বর্ত্তমান আছে। আমি কোনও ফুড বিশেষের নাম দিলাম না। তবে গৃহস্থের এই তিনটি শ্রেণী বিভাগ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য; এবং সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শিশুদিগকে শ্বেতসার না খাওয়ানই ভাল। সাগু, বার্লি, প্রভৃতি শ্বেতসারের দৃষ্টান্ত। তবে বহু জন্ম জন্মান্তরাবধি বাঙ্গালী শ্বেতসার (ভাত) খায় বলিয়া বোধ হয় বাঙ্গালীর ছেলের পেটে সাগু বার্লি সহ্য হয়। কিন্তু সাগু, বার্লি, শঠি সহ্য হয় বলিয়া, বাসি শ্বেতসার-বহুল বিলাতী ফুড কি দুঃখে খাওয়াইব? যাহাদের পেটে সাগু বার্লি মিশ্রিত দুধ সহ্য হয় না, তাহাদিগকেই ফুড খাওয়াইবার প্রয়োজন হয়। তবে কেন সে রকম স্থলে শ্বেতসার-বহুল ফুড খাওয়াইব? দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে ঐরূপ শ্বেতসার-বহুল খাদ্য না খাওয়ানই ভাল।

বিলাতী দুধ বা ফুড খাওয়ানর গুণ ঃ—(১) ঐগুলি দেখিতে সুদৃশ্য, উহাদের বিজ্ঞাপনগুলি বড়ই মনোহর এবং উহাদিগের ব্যবহারে গৃহস্থের শ্রম-লাঘব হয়। (২) পথে, ঘাটে, রেলে ষ্টীমারে যাতায়াতের সময়ে, বাজারের দুধের অপেক্ষা ঐগুলি বহু অংশে নিরাপদ খাদ্য। (৩) ব্যারামের সময়ে, অথবা অপর অসময়ে (যখন দুধ থাকে না, যেমন, ভোরে কচি ছেলেকে খাওয়াইবার জন্য) ঐ খাদ্য বড়ই উপযোগী। (৪) ঐ খাদ্য খাওয়াইলে ছেলেরা দেখি হৃষ্টপুষ্ট হয়—অর্থাৎ তাহাদের গায়ে চর্ব্বি লাগে (মাংস লাগে না)।

বিলাতী ফুড বা দুধ খাওয়ানর দোষ ঃ—ঐ খাদ্য যদি রীতিমত বা কিছু কালের জন্য একটানা খাওয়ান যায় তবে (১) ছেলেরা অন্তঃসার-শূন্য ও রোগ প্রবণ হয়। তাহাদিগের গায়ে মাংস বা রক্ত ভাল বাড়ে না। (২) স্কার্ভি নামক এক রকমের পীড়া দেখা দেয়,—তাহাতে দাঁত পানসে হয়, কষায় কথায় রক্তস্রাব হয়।

এখন সকল কথাই বুঝিলাম—কিন্তু কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য—(১) মা জননীগণকে মাতৃত্বের গুরুতম দায়িত্ব অনুভব করিয়া, সংসারের আবর্জ্জনা না খাইয়া, "রমণীকে ভাল খাইতে নাই" এই মারাত্মক ভ্রম ভুলিয়া, নিজ নিজ শরীরের যত্ন করিতে হইবে। রমণীকেও ব্যায়াম করিতে হইবে, মুক্ত বায়ু সেবন করিতে হইবে। তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে তবে বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্য ভাল হইবে। (২) গরুকে মাতৃ ও গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে পূজা ও স্বহস্তে সেবা করিতে হইবে। অভাবে ছাগীকে তাহাই করিতে হইবে। এদেশের পুরুষগণকে দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব ও শিশুতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। ঘরে ঘরে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ঐ সকল বিষয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। শুধু রাজনীতি অথবা বক্তৃতা লইয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের আজ তিনটি বড় কায বাকী আছে—লোকদের বাঁচিতে দাও (রোগ নিবারণ), খাইতে দাও ও সুশিক্ষিত হইতে দাও।

দারিদ্র্যই রোগের কারণ।

লেখক—শ্রী বিমলেন্দু মিত্র।

কিছুদিন পূর্ব্বে সরকার বাহাদুর ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, দেশময় উহার ব্যাপ্তি এবং উহা দমনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য এক বৈঠক (Malarial Conference) বসাইয়াছিলেন। সেই বৈঠক যে মন্তব্য (report) প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রথমেই লিখিত হইয়াছিল যে, "ম্যালেরিয়া অনাহারের নামান্তর মাত্র" (Malaria is an Euphemism for starvation)। এই মন্তব্য যে শুধু ম্যালেরিয়ার পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা নহে; অল্প বিস্তর পরিমাণে সকল রোগের সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া যেমন প্রধানতঃ অনাচার বা কদাচার হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অধিকাংশ রোগই ঐ প্রকারে উৎপন্ন হয়। একটু সহজ-শরীরতত্ত্বের আলোচনা করিলে এ বিষয় সহজেই উপলব্ধ হইবে। আমাদের খাদ্যের সারাংশ হইতে রক্ত সৃষ্ট হয়। রক্তই আমাদের শরীরের প্রধান বস্তু। ইহা দ্বারাই আমাদের শরীর-যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে ও আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। রক্তই যদি আমাদের দেহের সারাংশ হয়, তবে রক্তের ভাল মন্দের উপরেই আমাদের শরীরের, তথা সমগ্র জীবনের ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে। বীজাণু দ্বারাই রোগ সৃষ্ট হয়, আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের এইরূপ মত। এই বীজাণু-সকল বাতাসের সহিত, জলের সহিত ও অন্যান্য নানা প্রকারে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। যদিও ঐ বীজাণু সকল আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে, তথাপি আমরা যে সকল সময়েই পীড়িত হইতেছি তাহা নহে। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল রোগের বীজাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিলেই, আমাদের শরীরে একরূপ ক্রিয়া হয়; অর্থাৎ আমাদের রক্তস্থিত বীজাণুর সহিত ঐ সকল আগন্তুক রোগের বীজাণুর একটা লড়াই হয়। পাহারাওয়ালা এবং চোর ডাকাতের মধ্যে যেরূপ লড়াই হয়, ইহাও প্রায় সেইরূপ লড়াই। এই লড়াইতে যে জয়ী হয়, সে-ই তাহার প্রভাব বিস্তার করে। যদি আমাদের রক্তস্থ বীজাণু জয়লাভ করিতে পারে, তবেই আমাদের মঙ্গল; কারণ, তাহা হইলে ঐ সকল আক্রমণকারী রোগের বীজাণু পরাভূত হইয়া পলায়ন করে, বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর তাহা না হইয়া যদি আমাদের রক্তস্থ বীজাণু সকল পরাজিত হয়, তবেই আমাদের বিশেষ অমঙ্গল। তাহা হইলে শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক আমাদের দেহদুর্গ অধিকৃত হয় এবং আমরা পীড়িত হইয়া পড়ি।

আমাদের রক্তের সহিত স্বাস্থ্যের যখন এরূপ সম্বন্ধ, তখন রক্তের উন্নতি সাধন করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের রক্ত যদি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হয়, তবে সহজে কোনও রোগই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সর্ব্বদাই ইহার উদাহরণ দেখিতে পাই। একই স্থানে ও একই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া একজনের অসুখ হইতে দেখা যায়, অপরে হয় তো বেশ নীরোগ থাকে। উপরি উক্ত কারণ ভিন্ন এরূপ হইতে পারে না। এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহার রক্ত দুষ্ট ও নিস্তেজ হইয়াছিল, সে রোগাক্রান্ত হইল; এবং বিশুদ্ধ ও সতেজ রক্তশালী ব্যক্তি নীরোগ রহিল। রোগের আক্রমণ ও দস্যু তস্করের আক্রমণ একই প্রকারের। যাহার প্রহরী সতর্ক ও সবল এবং দরজা জানালা খুব মজবুত, তাহার ঘরে সহজে চোর প্রবেশ করিতে পারে না। আর যাহার প্রহরী দুর্ব্বল ও অবসন্ন এবং দরজা জানালা জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্ন, তাহার ঘরে সহজেই চোর প্রবেশ করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে খাদ্যের সারাংশ হইতে আমাদের রক্ত প্রস্তুত হয়, সুতরাং খাদ্যের উপরেই আমাদের রক্তের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে। আমাদের আহার্য্য ভাল ও পুষ্টিকর হইলে, আমাদের রক্তও বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হইবে; আর তৎপরিবর্ত্তে আমাদের আহার্য্য যদি অপ্রচুর বা কদর্য্য হয়, তবে আমাদের রক্তও নিকৃষ্ট ও নিস্তেজ হইবে। ভাল আহার্য্যের সংস্থান করা অর্থের উপর নির্ভর করে। পয়সার জোর না থাকিলে, লোকে সুপেয় সুভোজ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। রসনার তৃপ্তিকর পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে সকলেরই ইচ্ছা করে, কিন্তু বিনা ব্যয়ে তাহা তো সম্ভব হইতে পারে না। যদি রোজই কোনও বিবাহে বা অন্য কোনও উৎসবে নিমন্ত্রণ থাকে, তবে অবশ্য বিনা ব্যয়ে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য জুটিতে পারে। কিন্তু এরূপ বারমেসে নিমন্ত্রণ কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? বস্তুতঃ, কাহারও এরূপ হইতে পারে না। নিজে অর্থ ব্যয় না করিলে ভাল খাওয়া হইতে পারে না। এখানে অর্থের কথা আসিতেছে। ভাল খাইতে হইলে আমাদের অধিক উপার্জ্জনের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশ অতিশয় দরিদ্র, প্রত্যেক লোকের দৈনিক আয় অন্যান্য দেশের লোকের অপেক্ষা অনেক কম। এই দরিদ্রতাবশতঃই আমাদের দেশের লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় না। সম্পূর্ণ অনাহার করিলেই যে শুধু আমাদের শরীর কৃশ হয়, ও রক্তের অবনতি ঘটে তাহা নহে। কদর্য্য দ্রব্য আহার বা অপ্রচুর আহার করিলেও আমাদের সেইরূপ হয়। যে কোনও উপায়ে উদর পূর্ণ করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে আহার করা হয় না। তাহাতে সাময়িকভাবে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে শরীরের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় না। ক্ষুধার সময় উদর পুরিয়া জল পান করিলে বা গাছের পাতা বা ঘাস সিদ্ধ করিয়া খাইলে, আমাদের ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না এবং সেরূপভাবে লোকে অধিক দিন বাঁচিতে পারে না। যাঁহারা একেবারে রাস্তার ভিখারী নন, যাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তাঁহারা যদিও একেবারে উপবাস করেন না, তথাপি আজকাল তাঁহারা যেরূপ আহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের আংশিক উপবাস নিশ্চয়ই হয়। সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করাই প্রকৃত আহার করা। আজকাল কয়জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সেরূপ আহার করিতে পারেন? অকৃত্রিম ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করাও আজকাল বিশেষ কঠিন। বাজার যে ভ্যাজালে পরিপূর্ণ। সব জিনিসেই ভ্যাজাল। বাজারে আর সত্য নাই; চারিদিকেই মিথ্যা ও কৃত্রিমতা। বাজারে যাহাকে সরিষার তৈল বলিতেছি তাহাতে কতটুকু সরিষা আছে, বা আদৌ আছে কি না, তাহা বলা বড় কঠিন। যাহাকে গব্য ঘৃত বলিতেছি, তাহাতে গাভী অপেক্ষা কুকুর, বিড়াল ও সর্প প্রভৃতি প্রাণীর সম্বন্ধই বেশী। এই ত বাজারের অবস্থা। এই সকল দ্রব্য আহার করিয়া আমাদের কিরূপে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে?

আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্ত্তন হওয়াতে পুষ্টিকর খাদ্যের অনেক অভাব ঘটিয়াছে। এখন আমরা সহরে বাস করিতেছি, এখন আমরা সহুরে বাবু; বেশ দালান কোটায় বাস করি, ফিট্‌ফাট্ হইয়া থাকি, হ্যাট কোট পরিয়া অফিসে যাই, ঝি চাকরে বাজার করে ও রাধুনি বামণে রাঁধে, এই ত আমাদের সাধারণ বর্ত্তমান জীবনযাত্রার নমুনা! বাজারের বর্ণনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, রাধুনি বামণের ব্যাপার তো সকলেই হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছেন। সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বকালের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। তখন অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করিতেন এবং সকলেরই কিছু কিছু জমি ছিল। তাহাতে পরিবারের উপযুক্ত সকল রকম ফসল উৎপন্ন হইত। সুতরাং বাজারের কৃত্রিম দ্রব্য ব্যবহারের তাঁহাদের প্রয়োজন হইত না। তাঁহাদের তখন সেই মায়ের ক্ষেতের মোটা চালে ও মার বাগানের কলার পাতে বেশ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

তাহাতে তাঁহারা নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইয়া সংসারে সুখে বাস করিতে পারিতেন। যাহা হউক এখন আর সে চিন্তায় আমাদের লাভ নাই। সে অতীত ইতিহাস অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, সে দৃশ্যপটের উপরে কালের যবনিকা পতিত হইয়াছে। এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ভাবিতে হইবে, এবং কিসে ইহার উন্নতি করা যায় সেই চিন্তা করিতে হইবে।

দারিদ্র্যই যখন রোগের প্রধান কারণ, তখন এই দারিদ্র্য দূর করিতে পারিলেই দেশের রোগ সকল দূর হইবে এবং দেশে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। পূর্ব্ববঙ্গে যে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে শত সহস্র লোক একেবারে অসহায় ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সে অঞ্চলে ভীষণ দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়াছে। নানাবিধ পীড়া ও মহামারী এই দারিদ্র্যের চিরসহচর। সুতরাং সেই সকল স্থানে পীড়ারও ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যেখানে দারিদ্র্য সেইখানেই পীড়া। আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে না পারিলে আর স্বাস্থ্য লাভের উপায় নাই। পুষ্টিকর খাদ্যের উপরে স্বাস্থ্য নির্ভর করে এবং পুষ্টিকর খাদ্য অর্থের উপরে নির্ভর করে। সুতরাং অর্থাগমের চেষ্টাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। অর্থের জন্য আমরা এত দিন যে সঙ্কীর্ণ পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তাহার পরিণাম এখন বেশ উপলব্ধ হইয়াছে। সে পথও পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেখানে সফলতাও লাভ হয় না। সুতরাং অর্থের জন্য আমাদের নূতন পথে গমন করিতে হইবে। যাঁহারা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বনজঙ্গল কাটিয়া, সে পথ পরিষ্কার করিতেছেন তাঁহারা দেশবাসী সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। ব্যবসা বাণিজ্যের পথে না গেলে দেশে উপযুক্ত পরিমাণে ধনাগম হইতে পারে না। আজ সে পথ অনেকটা উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে, দারিদ্র্য দূর হইবে, এবং দেশে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে।

কদলীর উপকারিতা।

কদলীর পরিচয় অনাবশ্যক। ভারতবাসীর, এমন কি জগতের লোকের নিকট কলা অতি পরিচিত বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া ডারউইন সাহেব মহোদয়ের মতে মনুষ্যগণের আদি পুরুষদিগের চাইতে সাধারণ মানুষ এই কলার সহিত সুপরিচিত হইলেও ইহার একটা অনন্যচিন্ততা নাই। এই সর্ব্বত্র সুপরিচিত বস্তুটীর বহু গুণ ক্রিয়া, প্রকারভেদ বিভিন্ন সমাজে নব নব রূপে পরিচিত। তাহার মধ্যে ইহার ফুল, মূল, ফল, কন্দ বাঙ্গালী জাতির যত পরিচিত অন্য জাতির তত নহে। এই কারণেই ইহার পৃথক পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু দেখিয়াছি বাঙ্গালায় এক শ্রেণীর খাঁটি "জাহাজিগোরা" আছেন, তাঁহারা বিলাতী ওকের পাতা হইতে ক্যাক্‌টাস ঘাসের পাতা পর্য্যন্ত চিনেন; কিন্তু বাঙ্গালার কলার মোচা, থোড়, এঁঠে, খোলা, পাতা, এমন কি মোহনবাঁশী, জিনকলা, দয়াকলা, ঝামাকলা চিনেন না। তাঁহাদের জন্য আজ আমাকে কলার কিছু পরিচয় লিখিতে হইল।

এই শ্রেণীর নরজীবগুলি চিনিবার মধ্যে মর্ত্তমান, শবরী—কাঁচকলা আর বড় জোর কাবুলে কলা কিম্বা বীচিযুক্ত জিনকলা চিনেন। মোচাকে কলার ফুল—থোলাকে পটে বলিয়াই জানেন। যাহা হউক কলার ঔষধীয় গুণ লিখিবার অগ্রে ইহার অন্যাংশের গুণ কিছু লিখিব। ইহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পরিচয়।—সংস্কৃত অভিধান মতে কলা ওষধি শ্রেণীর উদ্ভিদ। কেন না ফল পাকিলে ইহার গাছ মরিয়া যায়। এই অতি পরিচিত বস্তুটির বহুরূপ শ্রেণীভেদ আছে। বঙ্গের সর্ব্বত্র ইহার চারি শ্রেণীর প্রচলন আছে। মর্ত্তমান, দয়া, জিন আর কাঁচা অবস্থায় বা তরকারীর জন্য ব্যবহৃত আকার। ইহা বাদে কলা বহু ভাবে বহু নামে অভিজ্ঞগণের নিকট পরিচিত।

শবরী।—ইহা পাকা অবস্থায় ব্যবহার্য্য দ্রব্য। কাঁচাকালে অব্যবহার্য্য। পাকিলে উৎকৃষ্ট মনঃপুত গন্ধ হরিদ্রাবর্ণ ও মিষ্ট অম্লস্বাদযুক্ত উপাদেয় দ্রব্য হয়। ইহাকে স্থান বিশেষে মর্ত্তমান বা কাটালি কলা কহে। এই জাতীয় কলার মধ্যে "চাঁপাকলা" নামে যে উৎকৃষ্ট মুখরোচক ক্ষুদ্রাকার পাতলা ছোবাযুক্ত কলা দৃষ্ট হয় উহা স্থানবিশেষে "কাঠালকুশি" নামেও পরিচিত আছে। এই শ্রেণীর কলা চন্দননগর ফরাসডাঙ্গা অঞ্চলে অধিক জন্মে।

বহু সৌখিন বাবু আজকাল সখের বাগানে কাবুল দেশজাত কলা আর মালব দেশীয় কলার পত্তন করিয়াছেন। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নাম মোহনবাঁশী রামকলা, কাব্লেকলা, চিনিটোপা, সোমদানা হারুশোকা ইত্যাদি। পূর্ব্ববঙ্গে কিন্তু এই জাতীয় কলার প্রতিপত্তি অধিক নহে। তথায় দয়াকলা, ঝামাকলা (বহুবীচিযুক্ত) শবরী কলা, জিন বা লম্বির কলা—(ইহাকে ঠটে কলাও কহে) অধিক। তবে স্থানে স্থানে চিনিটোপা নামে একরূপ বড় বড় কলা আছে। তাহা পাকিলে ছোবা হরিদ্রাক্ত হয় না, প্রত্যুত মলিন সবুজ হইয়া যায়। দয়া নামে কলাই এই অঞ্চলের প্রধান, সহজপ্রাপ্য খাদ্য।

খুলনা জেলায় আর পুরাতন যশোহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার প্রচলন অধিক। কাঁচা অবস্থায় তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা মোটা, মিষ্ট, স্নিগ্ধ এবং অল্প বীচিযুক্ত দ্রব্য। দক্ষিণ বঙ্গের ভদ্র গৃহীগণ পরিহাসচ্ছলে বলিয়া থাকেন যে দয়াকলা বাদায় গিয়া তরকারী হইয়াছে। বস্তুতঃ, সুন্দরবন হইতে আরম্ভ করিয়া যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল এবং পাবনার দক্ষিণাং কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বাংশ, আর চব্বিশ পরগণার পূর্ব্বদক্ষি অংশে এই কলা দরিদ্র গৃহস্থ আর মধ্যশ্রেণীর হিন্দুবিধ গণের প্রধান তরকারী। ইহার চচ্চরি, ডাল্না, সি করা তৈল লবণ দেওয়া খাদ্য পুষ্টিকারক এ মুখরোচক। এই দয়াকলার পাতাই ভোজনের প্রধা সহায়।

বাল্যকালে আমরা গুরুমহাশয়ের নিকট এই দয়া ঝামা কলার পাতায় লিখিয়া লেখা অভ্যাস করিয়াছি তখন "চিলতে" লিখিতে পারিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছা হওয়া যাইত। চিলতে আর মোটা তুলটে (হরিদ্রাবর্ণে কাগজে) আজ্ঞাকারী পোষ্য শ্রী"—সেবকাধমসেবক—এ মহামহিম লিখিতে পারিলে বাঙ্গালি বি-এ পাশ হই গ্রাজুয়েট হইত। ইহারাই বড় বড় জমিদারীর ম্যানেজা আর কারবারের মুচ্ছুদ্দি হইত। বস্তুতঃ কলার ন্যা নিত্য উপকারী উদ্ভিদ বাঙ্গালীর অতি অল্পই আছে ইহার ফল, মূল, পাতা, ডাঁটা, খোলা. বাসনা বা গু পাতা সমস্তই বঙ্গ গৃহীর গৃহস্থালীর প্রধান সহায়।

ঝামাকলা অতি বীচিভরা ঐ জন্য মানুষের খা মধ্যে প্রিয় নহে। ইহার পাতা, মোচা, থোড় খো ইত্যাদি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ফলগুলি গো-জাতি খাদ্য মধ্যে বিকিয়ে যায়।

জিনকলা।—ইহার অপর নাম ঠটে বা লম্বির ক গোপিকলা ইত্যাদি। ইহা অল্প বীচিযুক্ত দেবপূজা নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য। ইহা সর্ব্বত্র সুলভ—আবাদে তারতম্যে ছোট বড় প্রকার ভেদ হইয়া থাকে ; আস্বাদ মন্দ নহে। ভালরূপ পুষ্ট না হইলে খাইবার পক্ষে সুবিধা হয় না। অনেক রসিক পুরুষ জিনকলা ভা না হইলে বলিয়া থাকেন যে "আরে দূর! যে কলা এনেছ ইহা কেবল ঠাকুর পূজায় লাগে। খাইতে ভাল নহে।" এই কলা ফলনে অধিক হয়।

কাঁচাকলা।—ইহা তরকারি গাইবার শ্রেষ্ঠ উপাদান ত্রিপুরা শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাকে কুড়োকাঠালি ডিঙ্গামাণিক পান্তরঁস বগুনা প্রভৃতি নামে অভিহি করে। অযোধ্যা কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লোকে পাকা কাঁচকলা খাইতে বড় তুষ্ট। ইহারা অন্যরূপ কলা প্রায় দেখে নাই। হিন্দুস্থানীরা কলার ব্যবহার অতি কম জানে। এই আর্য্যাবর্ত্তের মাটির এমনি গুণ যে এদেশে অন্যরূপ কলা সহসা জন্মান কঠিন। কাশীতে বড় বড় বাঙ্গালীরা বাগানে নানারূপ কলার আবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। গোন্দলপাড়ার জমিদার অবিনাশ বাবু ফরাসডাঙ্গা হইতে গাড়ীতে মাটী আনিয়া মর্ত্তমান কলার বোগ লাগাইয়াছিলেন। প্রথম বারের কলা মাটির গুণে দেশের ন্যায় হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে ছোট, তৃতীয় বারে অতি ছোট, চতুর্থ বারে এই দেশের কাঁচাকলা হইয়া গেল। আবার হাসির কথা যে, এই দেশের কাঁচাকলা আর বাঙ্গালার কাঁচা কলার পার্থক্য যথেষ্ট।

মোহনবাঁশী।—ইহা বিদেশী দ্রব্য। ইহার অপর নাম কানাইবাঁশী। পেশয়ার কাশ্মীর এবং পশ্চিম ভারত হইতে এই কলা আসিয়া বঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা খাইতে অম্লমধুর। এই শ্রেণীর কলার সাধারণ নিয়ম এই যে ইহার বাকলা বড় পাতলা এবং পাকিলে কাল হইয়া যায়।

অতঃপর কলার ঔষধীয় গুণের আলোচনা করিব। কারণ স্বাস্থ্য সমাচার পত্র কৃষিতত্ত্বের আলোচনার কাগজ নহে। এই কারণে কলার উৎপত্তির বিষয়, আবাদ, রোপণ, উৎকর্ষ অপকর্ষ ইত্যাদির আলোচনা করিয়া পাঠক সম্পাদক উভয়কে বিরক্ত করা উচিত নহে। সুতরাং পূর্ব্বাবধি যেরূপ ভাবে দ্রব্যগুণের আলোচনা করিয়াছি, তাহাই অতঃপর করিব।

ক্রিয়া।—কলার প্রতি অংশের গুণ পৃথক। এই জন্য ইহার ক্রিয়া পৃথক ভাবে লিখিত হইল। কলার সাধারণ গুণ—স্নিগ্ধ পোষক সঙ্কোচক শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। আবার বায়ুনাশক, ধারক। ছোবা বা বাকলার গুণ আবরক দাহক, রক্ত-রোধক সঙ্কোচক অম্লনাশক। মোচার গুণ—মেধা ও পুষ্টিজনক, কান্তি-বর্দ্ধক, রক্ত-রোধক। গুরুপাক, কষায় এবং বীর্য্য-বর্দ্ধক। ভেগোর গুণ—অম্ল-নাশক, ক্ষারগুণশালী। রক্ত-রোধক অত্যধিক সঙ্কোচক। আবার পাতার গুণ শুষ্ক আর তাজা ভেদে দুই প্রকার। তাজা পাতা আবরক ক্ষারগুণশালী সুতরাং অম্লনাশক আর বায়ু-সঞ্চালক। শুষ্ক পাতা দাহক অত্যধিক ক্ষারগুণশালী এবং ক্ষত আরোগ্যকারক। খোলার গুণ অম্লনাশক রক্তরোধক বমননিবারক, আক্ষেপনিবারক, হিক্কানাশক, সঙ্কোচক ও তাপহারক। থোড়ের গুণ স্নিগ্ধ, রক্তরোধক, শ্লেষ্মা-জনক, সারক, বমননিবারক, ক্ষুৎকারক।

এতগুলি গুণ এক কলার প্রত্যেক অংশ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং আহার আর ব্যাধিবিনাশ করিতে গৃহীর নিকট ইহা অতি উপাদেয়। এই কলার জেলা বিশেষে বহু প্রকার-ভেদ আছে। শ্রীহট্ট জেলায় কমলার ন্যায় কলাও অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য। ভারতের শাস্ত্রে শ্রীহট্ট জেলার বহু খ্যাতি আছে। এই জেলায় কলার এঁটেকে 'থুব্ড়ী' বলে। স্থানে স্থানে গেপিরাঙ্গাও কহে। থোড়কে 'বুগোল" বলে। ডিঙ্গামাণিক নামে এক প্রকার অতি বৃহদাকার মুখরোচক কলা এই দেশ-বাসীর নিত্য খাদ্য। ইহার দুই তিনটি কলা খাইলে সম্পূর্ণ উদর পূর্ণ হয়। জিন বা লম্বির কলা এই জেলায় গোপিকলা নামে পরিচিত। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে চন্দন-নগর অংশে কলার আবাদ অধিক।

ভাষাভেদে নাম।—সংস্কৃত কদলী ; বাঙ্গালা কেলা হিন্দিতে কেলা বা কেরা। মারহাটে কদলু ; কর্ণাটে কদলিনী তৈলঙ্গে কেল্ল চেছু। ফারসিতে কলকোমা। ইংরেজী প্লানটেন ; ল্যাটিন পায়নাপোল।

আময়িক প্রয়োগ।—কলা বহু পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। বিশেষরূপে লিখিতে হইলে ইহার প্রতি অংশের উল্লেখ করিতে হয়। এই জন্য কোন রোগে কলার কোন অংশ ব্যবহৃত হয় তাহার উল্লেখ করিব। আমাশয় পীড়ায় পেট আঁটিয়া ধরিলে এবং অধিক আমাশয় দাস্ত হইতে থাকিলে পাকা কলা আর সরু চিঁড়া ঘোলের সঙ্গে খাইলে আহার ঔষধ দুই হয়। কোন কোন অভিজ্ঞ লোকে আবার ইহার সহিত কাটমল্লিকা ফুলের শিকড়

সিকি তোলা বাটিয়া খাইতে পরামর্শ দেন। বস্তুতঃ আমদোষ নিবারণে কলার শক্তি যথেষ্ট। সাধারণের বিশ্বাস যে কলা খাইলে ক্রিমি হয়। এই জন্য বহু লোকে কলা খাইতে নারাজ। বিশেষ বালক-বালিকাগণকে কলা খাইতে দেওয়া হয় না। প্রকৃত কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। কলা গুরুপাক দ্রব্য এই জন্য যাহাদের পরিপাক শক্তি কম তাহারা কলা অধিক খাওয়া জন্য অপরিপাক দোষে ক্রিমি জন্মাইয়া লইয়া থাকেন। তাই বলিয়া কলায় ক্রিমি জন্মে এই ধারণা উচিত নহে। কলার ন্যায় পুষ্টিকারক দ্রব্য দ্বিতীয় আছে বলিয়া বিশ্বাস নাই। একমাত্র কলা খাইয়া জীবনধারণ করা যায়। তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র দৌর্ব্বল্য আসে না।

কলার পোষক গুণ জন্যই প্রচলিত "বেনানাফুড" প্রস্তুত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে এমন দুই একটি তাজা ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা ১০।১২টি মর্ত্তমান কলা আর অর্দ্ধপোঁয়া গব্য ঘৃত একত্র খাইয়া ১৪।১৫ ক্রোশ পায়ে হাঁটিয়া যজমান বাড়ী গিয়া ক্রিয়া করিয়া থাকেন।

ঘৃত সহ কলা অতি গুরুপাক হয়; কিন্তু অত্যধিক বলকারী এবং পোষক। বহু পল্লীকামিনী কলার সরবত খাইয়া স্নিগ্ধতা অনুভব করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে কলার সরবৎ অতি স্নিগ্ধ পানীয়। শ্লেষ্মা বর্দ্ধন দোষ ভিন্ন কলার অপর কোন মানবশরীর বিনাশের দোষ নাই। কলা খাইয়া লবণ খাইতে যাঁহারা পরামর্শ দেন তাঁহারা ভাবেন ক্রিমিদোষ উহাতে বিনষ্ট হইবে। প্রকৃত কিন্তু তাহা নহে। লবণ জাতীয় ক্ষার পদার্থে কলার জেলেটিন অংশ (লালীঅংশ) অতি সহজে পৃথক্ হইয়া পাকস্থলীর অম্লরস সহ পরিপাক হইয়া শর্করা তন্তুতে পরিণত হয়। শরীর তদ্দ্বারা স্নিগ্ধ এবং কান্তিশালী হইয়া বলযুক্ত হয়।

বৈজ্ঞানিক মত।—কোন কোন প্রাচীন শরীর-বিদ্যাবিৎ দ্রব্যগুণতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মতে কলা না কি ফুসফুসের বায়ুকোষগুলির মুখ অবরুদ্ধ করে; তাই রক্ত সঞ্চারণকালীন কোষসমূহ উৎকৃষ্টভাবে স্পন্দিত হইতে পারে না বলিয়া রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি ফুলিয়া বা বিস্তৃত হইয়া শ্লেষ্মাবৃদ্ধি করে। আমরা কিন্তু এই যুক্তির মৌলিকতা অদ্যাপি বুঝিতে পারি নাই। মোটের উপর কথা এই যে, কলার মিষ্টভাগ পাকস্থলীর ডেকষ্ট্রীন সহ মিলিত হইয়া শোণিত প্রবাহ মধ্যে উষ্মা অর্থাৎ তেজ ধাতুকে (অক্সিজেনাংশ) বৃদ্ধি করে তাই শরীরস্থ তড়িতকণার সংমিশ্রণে রক্তের শ্বেতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইহাকেই শ্লেষ্মাবৃদ্ধি বা শরীর নরম কহে। কলার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মাত্র এই স্থানে ব্যাধিনাশক গুণগুলির উল্লেখ করা হইল।

যেস্থানে অত্যধিক রস-রুক্ষতা জন্য কাটবমি উপস্থিত হয় এবং শরীর জ্বালা করিতে থাকে তথায় কলার সরবৎ উপকারী পানীয়।

একটা মর্ত্তমান
এক ছটাক চিনি
এক বড়ী কর্পূর
২ রতি পাকা তেঁতুল, ½ সের জল

ধীরে ধীরে পান করিলে সাধারণ হিক্কা বমি এবং উদ্গার ও পেটের উগ্রতা নিবারিত হয়। এই মিশ্র সহ তেঁতুল বাদ দিয়া ½ পোয়া ঘোল মিশাইলে আমাশয় উদারময় পীড়ায় বায়ু জন্য উৎপাতে ব্যবহার করা যায়। মস্তকের শিরা উত্তেজিত হইয়া মাথা ধরা ঘটিলে কলা আর রক্তচন্দন একত্রে কপালে লাগাইলে মাথা ধরা আরোগ্য পক্ষে যথেষ্ট উপকার আছে। এই সঙ্গে সামান্য পরিমাণ কর্পূর মিশাইলে আরও ভাল। উদারময়গ্রস্ত রোগীর পক্ষে কাঁচকলা উপকারী পথ্য। পাকা কলার নস্য গ্রহণ করিলে মস্তকের উষ্ণতা আর শরীর গ্লানির শান্তি হয়। কাচা কলার গুড়া বা কাথ তুলসী পত্র রসসহ পিঁপুল চূর্ণ যোগে খাইলে অপাক জন্য পেটের বায়ুজনিত গড়গড় কারী শান্তি হয়। মোটের উপর, কলা পাকা কাঁচা যাহাই হউক, আমজ পীড়ায় আহার ঔষধ দুই হয়।

আগুণে পুড়িয়া গেলে পাকা কলা চটকাইয়া লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়। কলার শরবৎ খাইলে শরীর শীতল এবং দাস্ত পরিষ্কার হয়।

নিম্নলিখিত ভাবে সরবৎ প্রস্তুত করিলে উপাদেয় হয়, যথা :—

১। পাকা মর্ত্তমান ২টি
ছোলমনেবুর রস ½ তোলা
কাগজি বা পাতিলেবুর রস ২ তোলা
চিনি ১ ছটাক জল অর্দ্ধ সের।

২। মর্ত্তমান ২টি, দুটি পাকা কমলার রস
চিনি ২ ছটাক
কেলেজিরা ভাজা গুড়া বা বাটা ৩ রতি

লবণ	½ তোলা
দধি	১ পোয়া
জল	½ সের

৩। কলা ২টি ভিনেগার ½ আউন্স কাঁচা জিরা বাটা ১ তোলা পাকা আমের রস ½ পোয়া লবণ ১ তোলা ঘোল বা দধি ১ পোয়া জল ½ সের অতি উৎকৃষ্ট পানীয়।

৪। কাঁচাকলার গুড়া	১ ছটাক
আটা বা ময়দা	১ ছটাক
চিনি	২ ছটাক
জল	১ পোয়া

মিশাইয়া ইচ্ছা মত অম্লমধুর করিয়া লইয়া অবলেহ প্রস্তুত করিলে উদরাময় এবং আমাশয় পীড়িত রোগীর উত্তম পথ্য প্রস্তুত হয়। ইহা লঘুপাক এবং বলকারক। আবার কাঁচকলা ডুম্বর জালিবেগুণ পটোল বেতের ডগা বা জনি নিম পত্র দিয়া ঝোল পাক করিয়া বালির সহ মিশাইয়া খাইলে গৃহিণী রোগীর পীড়া শান্তির উৎকৃষ্ট পথ্য হয়।

কলার খোলার রস সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কামড়ান মাত্রেই তাগা বান্ধিয়া কলার খোলার রস ½ পোয়া আর ১ তোলা তুলসী পত্রের রস রোগীকে খাইতে দিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা দেশীয় রোজাগণ এবং মালবৈদ্যগণ সর্প দংশিত রোগী আরোগ্য করিয়া থাকে। আবার হিক্কা পীড়া কলার খোলা, ডেগো, এঁঠে, থোড়, ইহার যে কোনটি হউক ১ তোলা পরিমাণ রস একটুকু মধুর সহ খাইলে শান্তি হয়। একজন জমীদারের অর্দ্ধ ইংরেজী জানা ম্যানেজার মদ খাইয়া হিক্কা পীড়ায় আক্রান্ত হন। দিনে রাত্রে ৫০।৬০ বার হিক্কা উঠিয়া বাবুকে অস্থির করিয়া তুলিত। বাবু কবিরাজী এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রায় ৬০।৭০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বাবু কিন্তু কু অভ্যাসের ফল যথেষ্ট ভোগ করিতে থাকেন। একদিন একটি বৈষ্ণবী ভিক্ষা করিতে আসিয়া বাবুকে ২ তোলা দয়াকলার এঁঠের রস ৩০ ফোটা মধু আর ১ রতি কর্পূর সহ খাইতে দিয়া তাহার ২০।২৫ দিনের পীড়া আরোগ্য করিয়া দেয়। আহার করিতে বসিয়া অনেকের সময় সময় একরূপ হিক্কা হয়; ইহা থোড়ের তরকারী দ্বারা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি।

পোড়া ঘায়ে নারিকেল তৈল কলার এঁঠের রস সহ ফ্যানাইয়া লাগাইলে ডাক্তারি "ক্যারোন অয়েল" হইতে উত্তম ঔষধ হয়।

বাইতি জাতীয় লোকে ঝিনুক শম্বুক পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদাই ঘরে কলার এঠেঁর রস প্রস্তুত রাখে। পুড়িলেই লাগাইয়া দেয়। মূত্রকৃচ্ছ রোগে এই দ্রব্য অতি শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ। বহু কবিরাজ ইহা ব্যবহার করেন।

এঁঠের রস	½ আউন্স
পাথর কুচির পাতার রস	১ ড্রাম

সোরা বা নাইট্রেড্ অব পটাশ ৫ রতি একত্রে খাইলে আবদ্ধ প্রস্রাব বাহির হয়; জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। বহু কলেরা রোগী এই উপায়ে হিষ্টিরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকেন। কলার খোলার রস ½ আউন্স আর চিনি ½ ছটাক শূন্য উদরে খাইলে অম্ল-জনিত অসুখ শান্তি হয়। ইহাতে কুণ্ড বায়ুদোষপর্য্যন্ত নিবারণ হয়। অনেকেই জানেন মোচা খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। বস্তুত মোচা কপি হইতে নিকৃষ্ট তরকারী নহে। এই দ্রব্যর অতি উৎকৃষ্ট হাপি নিবারণ শক্তি আছে। একটা যে কোন কলার মোচা লইয়া থেবড়াইয়া রস বাহির কর। যাহা বাহির হইবে তাহার সহিত ২

ফোঁটা আকন্দর আঠা মিলাইয়া ১ তোলা বাকস পত্রের রস সহ খাইতে দিলে ২০।২৫ মিনিট মধ্যে নিশ্চয় হাপি বন্ধ হইবে। দেখিয়াছি কাশীর এক স্বামীজি এই ঔষধ দ্বারা গরীব বহু রোগীকে তুষ্ট করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে যখন দেশে এত সাবান সোডার প্রচলন ছিল না তখন বাসনা অর্থাৎ কলার শুষ্ক পাতা পোড়াইয়া রাজা প্রজার বস্ত্র পরিষ্কার করিত। এই রজক শ্রেণীর দ্বারা নিম্নের ঔষধটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলা পাতার ছাই ১ তোলা তেতুলের গাছের ছাল পোড়া ছাই ১ তোলা ৩ রতি সৈন্ধব সহ বিকালে খাইলে অম্ল পীড়া আরোগ্য করে। বর্ত্তমানে যাহারা অম্ল জন্য বিকালে সোডা খাইয়া থাকেন, আমি তাহাদিগকে এই দ্রব্য খাইতে অনুরোধ করি। ইহা ব্যবহারে প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার আর অক্ষুধা নিবারণ হইবে। বলা বাহুল্য কলার বিষয় আর জানি না বা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। নব্য বঙ্গের বাবুগণ এই প্রবন্ধে তুষ্ট হইবেন কি?

পর্দ্দা কি যক্ষ্মার কারণ?

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর হেল্‌থ্ অফিসার মহাশয় সহরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাবের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া, হিন্দু-মুসলমান মহিলাগণের অবরোধ প্রথার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়াছেন। কথাটা কতদূর যুক্তিসহ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যেহেতু রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণীত না হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করা যায় না। কারণ নির্ণয়ে যদি ভুল হয়, তাহা হইলে প্রতিকারের জন্য অবলম্বিত উপায় ফলপ্রদ ত হয়ই না, বরং তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে: পক্ষান্তরে ভুল কারণের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে, প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের এবং ফলপ্রদ প্রতিকারের উপায় অবলম্বনেরও চেষ্টা হইতে পারে না। "কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে" শুনিয়াই কাকের পিছু পিছু ছোটা অপেক্ষা, যথাস্থানে কাণ আছে কি না, হাত দিয়া তাহা দেখাই সমীচীন।

পর্দ্দা প্রথাকে যক্ষ্মারোগের প্রকৃত কারণ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, সহরে বাস্তবিক পর্দ্দা প্রথা আছে—কিনা থাকিলে, কি পরিমাণে এবং কি ভাবে আছে, তাহার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার মহাশয় ইউরোপীয়ান, কাজেই কলিকাতার পক্ষে তিনি বিদেশী। কলিকাতার তিনি প্রবাসী মাত্র, স্থায়ী অধিবাসী নহেন। তিনি দুদিনের জন্য কর্ম্ম সূত্রে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন, কার্য্য শেষ হইলে, দুদিন পরে স্বদেশে চলিয়া যাইবেন। ধর্ম্মে এবং সমাজ সম্বন্ধে কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং দেশীয় অধিবাসীদের সামাজিক আবার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ নহে; শ্রুতি-স্মৃতির পর্য্যায়ভুক্ত।

আর আমরা পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী; আমাদের জন্ম হইয়াছে কলিকাতায় মৃত্যুও হয়ত কলিকাতাতেই হইবে। তাহার উপর আমরা হিন্দু সমাজভুক্ত। সুতরাং অন্ততঃ হিন্দু সমাজের মহিলাগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতার দাবী বোধ হয় করিতে পারি। সত্য কথা বলিতে কি, কলিকাতার খুব ধনী হিন্দুর ঘর ছাড়া, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর হইতে পর্দ্দা প্রথা অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই প্রায় উঠিয়া যাইতে যাইতে এতদিনে তাহার চরম পরিণতি ঘটিয়াছে। কিরূপে, তাহা দেখাইয়া দিতেছি।

এই কলিকাতা সহরের পত্তনের সময় হইতে কিছু দিন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যত দিন সহরে বাস করিবার স্থানের অনুপাতে লোক সংখ্যা কম ছিল, তত দিনকার অবস্থা যাহাই থাকুক, যে সময় হইতে বাস করিবার স্থানের অনুপাতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির মুখে চলিয়াছে, সেই সময় হইতে একটু একটু করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য হইতে পর্দ্দা প্রথাও উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে বেশী লোককে বাস করিতে হইলেই ঠিক মত আবরু বজায় রাখা যায় না, ইহা অতি সহজেই বুঝা যায়। তার পর, যে দিন হইতে কলিকাতার ভাড়াটে বাড়ীগুলিতে ক্যামিলী মেস বসিতে আরম্ভ হইল, অর্থাৎ এক বাড়ীতে পরস্পর সম্পর্কশূন্য বিভিন্ন জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন পরিবার বাস করিতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতে পর্দ্দা প্রথার আত্মকৃত্যও আরম্ভ হইল। আর, এখন ত কলিকাতায় এরূপ ফ্যামিলী মেসের সংখ্যাই করা যায় না। দুই চারিখানি ছাড়া সব ভাড়াটে বাড়ীই প্রায় ফ্যামিলী মেস। তার পর, সেদিনকার শান্তি প্রদর্শনীতে দেখা গেল, কলিকাতার মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে পর্দ্দা প্রথা আদৌ নাই। এই অবস্থাটি ঘটিতে অনেক বৎসর, লাগিয়াছে সন্দেহ নাই। সুতরাং, যেখানে পর্দ্দা প্রথার অস্তিত্বই নাই, সেখানে তাহাকে দোষী করা যায় কি করিয়া? মাথাই নাই তার মাথা ব্যথা। যাই হউক, আমরা দেখাইলাম, পর্দ্দা প্রথা থাইসিস রোগের বিচারালয়ে তাহার alibi উত্তমরূপে সপ্রমাণ করিয়াছে (অন্ততঃ হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে।) অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাগণের মধ্যেই বোধহয় থাইসিস রোগের পরিমাণ বেশী।

আসল কথা, পর্দ্দা প্রথাকে থাইসিস রোগের কারণ বলিয়া মনে করা ভুল হইতেছে; সেই জন্য প্রতিকারের প্রকৃত উপায়ও অবলম্বন করা হইতেছে না। কলিকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে বাস্তবিক পর্দ্দা প্রথা নাই। তবে যে মেয়েরা দলে দলে পথে ঘাটে বাহির হইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে পারেন না, তাহার কারণ অন্য কিছুই নয়,—তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়,—হাওয়া খাইতে বাহির হইবার তাঁহাদের অবসরই নাই।

হেল্‌থ্ অফিসার মহাশয় জোর গলায় বলিয়াছেন, পর্দ্দায় খাতিরে মেয়েদের অন্ধকার, স্যাঁত সেঁতে ঘরে বাস করিতে বাধ্য করা হয়। এ কথাও ঠিক নহে। পর্দ্দা প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও, এ কথা যুক্তিহীন। কারণ, গৃহস্থ ঘরে মেয়েরা যেখানে থাকে, পুরুষরাও সেই ঘরে বাস করে। তাহারা স্ত্রী পরিবার ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করে না, করিতে পারে না। বাস গৃহ সম্বন্ধে কোনরূপ পক্ষপাত বা মেয়েদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হয় না, হইবার যোই নাই। এ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের অবস্থাই সমান। তবে দিবসে কর্ম্মের সময়ে পুরুষদিগের কর্ম্মস্থান বাহিরে বলিয়া তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে হয়; আর মেয়েদের কর্ম্মস্থান ভিতরে বলিয়া তাহাদিগকে দিবানিশি একই ঘরের ভিতর থাকিয়া কাজ করিতে হয়। পর্দ্দা প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও, জোর করিয়া যদি তাহা তুলিয়া দেওয়া যায়। তাহা হইলেও, মেয়েদের অবস্থার কিছু মাত্র উন্নতি হইবে না; তখনও তাহাদিগকে চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের ভিতরে থাকিয়াই কাজ করিতে হইবে। বাহিরে গিয়া হাওয়া খাইয়া আসিবার তাহাদের অবসর কোথা? আর, অবসর থাকিলেও, বিশুদ্ধ হাওয়া তাহারা পাইবে কোথায়? গৃহ কর্ম্মের অবসরে মেয়েরা পথে ঘাটে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেও, এই ধূলি-ধূসরিত, কলের চিমনীর ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধময় ড্রেণের ভিতর, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। মোটা কথা, বাস গৃহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই মেয়েদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের অতিমাত্রায় প্রাদুর্ভাবের একমাত্র কারণ,—পর্দ্দা প্রথা তাহার কারণ নহে। পর্দ্দা যদি দোষী হইত, তাহা হইলে পল্লীগ্রামের মেয়েদের মধ্যেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইত। কলিকাতা হইতে যক্ষ্মা রোগ দূর করিতে হইলে সাধারণ ভাবে বাসগৃহের সংস্কার সাধন করিতে হইবে—পর্দ্দা প্রথা থাকুক আর যাউক, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না।

কলিকাতায় বসন্ত।

কলিকাতায় প্রত্যহ যে যে রোগে যত লোক মারা পড়ে, তাহার হিসাব রাখিতে রাখিতে বহু বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে স্থির হইয়াছে, কলিকাতায় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একবার করিয়া বসন্ত রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। এই পঞ্চম বর্ষটিকে কলিকাতায় বসন্ত রোগের (Leap Year) লীপ ইয়ার বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বর্ষটি সেইরূপ বসন্ত রোগের লীপ ইয়ার। এ বৎসর সহরে খুব বসন্ত হইতেছে, এবং বোধ হয় আরও কিছু দিন (অর্থাৎ সুবৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত) চলিবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসার মহাশয় সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া এই বিষয়ে সহরবাসীকে সতর্ক করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বসন্ত রোগের যেরূপ প্রকোপ দেখা গিয়াছিল, এ বৎসর তদপেক্ষা বেশী না হউক, তাহার সমান হইবার খুব সম্ভাবনা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ১০০০০ লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ২৫০০ লোকের মৃত্যু হয়। এই রোগ সংক্রামক, অর্থাৎ ছোঁয়াচে;—স্পর্শদোষে ইহা বিস্তৃত হয়। এবারও যদি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মত সহস্র সহস্র লোক বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে, হেলথ অফিসার মহাশয় বলিতেছেন, যাহারা ঐ সকল রোগাক্রান্ত লোকের সংস্পর্শে আসিবে, তাহাদের সংখ্যা ৫০০০০ হইতে ১০০০০০ হইতে পারে। যাহারা বসন্ত রোগীদের সংস্পর্শে আসিবে, তাহারা যে সকলেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবে, অবশ্য এমন কোন কথা নাই; তথাপি সাবধানের মার নাই। এই স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া চলা একেবারে অসম্ভব না হইলেও, খুবই যে কঠিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব বসন্ত রোগীদের সংস্পর্শে আসিয়াও যাহাতে বিপন্ন না হইতে হয়, এমন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইলে তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই ব্যবস্থাটি হচ্ছে টিকা লওয়া। বসন্ত রোগের টিকা লইয়া দেহকে কতকটা সুরক্ষিত করিতে পারা যায়; এবং যাঁহারা টিকা লইবেন, তাঁহারা বসন্ত রোগীদের সংস্পর্শে আসিলেও অনেকটা নিরাপদ থাকিতে পারিবেন। স্পর্শ দোষ এড়াইবার সম্ভাবনা যখন খুবই কঠিন, তখন টিকা লইয়া শরীরকে সুরক্ষিত করাই সমীচীন। সেই জন্য হেলথ অফিসার মহাশয় সহরবাসীকে পরামর্শ দিতেছেন যে, যাঁহারা বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে টিকা লন নাই, কিম্বা লইয়া থাকিলেও টিকা সফল হয় নাই, তাঁহাদের সকলেরই টিকা লওয়া উচিত। কলিকাতা কর্পোরেশন এই দুর্ব্বৎসরে সহরবাসী আপনার সাধারণের সুবিধার জন্য সকলকে বিনা মূল্যে টিকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই টিকা লইতে পারিবেন এবং সে জন্য কাহাকেও কিছু মাত্র অর্থব্যয় করিতে হইবে না।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | মাঘ, ১৩২৬ সাল | ১০ম সংখ্যা

আলোচনা

দলাদলির সুলক্ষণ।—

রাজনীতিক্ষেত্রে দলাদলি অনেকে সুলক্ষণ,—জীবনের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সকল সময়েই যে এ কথা ঠিক খাটে, তাহা বলা যায় না। দলাদলিকে তখনই সুলক্ষণ বলা যাইতে পারে, যখন দেখা যায়, প্রত্যেক দল দেশের কাজে, জনহিতে অপর দলকে হারাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশে নরম-গরম, ধীরপন্থী-উগ্রপন্থী, চরমপন্থী-মধ্যপন্থী—এই রকম দুই একটা দল গত ১০।১২ বৎসর ধরিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কিন্তু, এই দলাদলির ফলে দেশের হিতকর কাজ যে কতদূর অগ্রসর হইতেছিল, তাহা ভাল বুঝা যাইতেছিল না। এখন এ কথাটা একটু স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি নরম দলের একটা শাখা একটী অতি প্রয়োজনীয় দেশহিতকর কাজে হাত দিয়াছেন। বাঙ্গালা প্রদেশের দশম বার্ষিক কো-অপারেটিভ কনফারেন্সে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহাশয় সমবায়-প্রণালী অনুসারে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ নিবারণমূলক একটী প্রস্তাব রচনা করিয়া পাঠ করেন। কেবল প্রবন্ধ পাঠেই ইহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। নরম দলের শাখা—জাতীয় উদার সঙ্ঘ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে গ্রামবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটী বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছেন। যে সকল গ্রামের অধিবাসী নিজ নিজ গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে (টপফ্লাটে) উক্ত সঙ্ঘের সম্পাদকের নিকটে আবেদন করিলে, সঙ্ঘ এই কার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সঙ্ঘ এ বিষয়ে দক্ষ চিকিৎসকগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, এবং এরূপ চিকিৎসকগণকে মাসে ৪০ টাকা হিসাবে বেতন দিতে প্রস্তুত আছেন। এই কাজটি যে খুব ভাল তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। দেশের জনসাধারণ এখন গরম দলেরই একটু পক্ষপাতী। কিন্তু নরম দল যদি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনে সফলতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার পল্লীবাসীরা একেবারে তাঁহাদের গোলাম হইয়া পড়িবে। পল্লীবাসী জনসাধারণকে বাধ্য করিতে পারিলে যদি কোন ক্ষমতা লাভ করা যায়, তাহা হইলে নরম দল নিশ্চয়ই সেই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারিবেন। ইহা দেখিয়া গরম দল যদি আবার অন্য কোন অধিকতর দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এবং এইভাবে

জনহিতকর কার্য্যে উভয় দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে, এবং তাহার ফলে দেশের মঙ্গল হয়, তবেই দলাদলি সার্থক। আমরা প্রভাস বাবুর ইংরেজী "প্রবন্ধটির বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া বর্ত্তমান সংখ্যার স্বাস্থ্য" সমাচারে প্রকাশ করিতেছি।

শিশু-মৃত্যুর প্রতিকার ব্যবস্থা।—

ভারতের সর্ব্বত্রই শিশু-মৃত্যুর পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। তাহার প্রধান কারণ, শিশুদিগের যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যাভাব। ইহা ছাড়া অবশ্য দুই চারিটি অবান্তর কারণও আছে। সে যাহা হউক, আপাততঃ যুক্ত প্রদেশে শিশুদিগের প্রধান খাদ্য দুগ্ধের অভাবের প্রতিকারের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রস্তাব হইয়াছে যে, প্রধান প্রধান নগরে "মডেল ফার্ম্ম ও ডেয়ারী" স্থাপন করিতে হইবে। সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের বোর্ড অব ইগ্রিকালচারের (কৃষি বোর্ডের) একটী বৈঠকে সিভিল ভেটারীনারী ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐরূপ আদর্শ ফার্ম্ম (পশু-উৎপাদন ক্ষেত্র) এবং ডেয়ারী (দুগ্ধ দোহন ও দুগ্ধ জাত দ্রব্য উৎপাদন স্থান) স্থাপনের আবশ্যকতা উক্তরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হইয়াছে। সিভিল ভেটারীনারী ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর অলিভার যুক্তপ্রদেশের মিউনিসিপ্যাল বোর্ডসমূহ এবং অন্যান্য সভাসমিতিগুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষি বোর্ডের প্রস্তাব কি পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছেন? এই পশু উৎপাদন ক্ষেত্র ও ডেয়ারী স্থাপন কল্পে কেহ কোনরূপ সাহায্যের প্রার্থী হইলে কৃষি বোর্ড সকল রকম সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সিভিল ভেটারীনারী ডিপার্টমেণ্টের সংস্রবে যে মডেল ফার্ম্ম আছে, তাহার ম্যানেজার মহাশয় এ সকল ব্যাপারে খুব পাকা ও বহুদর্শী লোক। মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বা অন্যান্য সভা-সমিতি ফার্ম্ম ও ডেয়ারী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে উক্ত ম্যানেজারের নিকট হইতে পরামর্শ ও অন্যরূপ সাহায্য পাইতে পারেন। যুক্তপ্রদেশের মিউনিসিপ্যাল বোর্ড বা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড সকল যে খাঁটি দুগ্ধের অভাব দূর করিবার জন্য ফার্ম্ম ও ডেয়ারী স্থাপনের এমন সুযোগ ত্যাগ করিবেন না, স্বচ্ছন্দে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবল যুক্ত প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে চলিবে না; অন্যান্য প্রদেশেও সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। কারণ, শিশুমৃত্যু যেমন দেশব্যাপী, শিশুর খাদ্যাভাবও সেইরূপ সমস্ত ভারতব্যাপী। যুক্ত প্রদেশে তবু এখনও প্রচুর মহিষ পাওয়া যায়; কারণ মহিষের মাংস সাধারণতঃ খাদ্যরূপে খুব কমই ব্যবহৃত হয় বা আদৌ হয় না। কিন্তু গরুর মাংস প্রচুর পরিমাণে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, যে দেশে গো দুগ্ধই শিশুদিগের প্রধান খাদ্য, তথায় খাদ্যাভাবের পরিমাণ আরও বেশী। আমাদের বাঙ্গালা দেশে আবার গো-দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের একেবারেই অভাব। আর খাঁটি দুগ্ধের কথা থাক, সে দুঃখের কথা এখানে আর প্রয়োজন নাই। আমরা বিবেচনা করি, বাঙ্গালা দেশের সহর মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডসমূহ অবিলম্বে যুক্ত প্রদেশের এই সৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। শুভস্য শীঘ্রম্। এই শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র আরম্ভ হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

ম্যাট্রিকুলেশনে স্বাস্থ্য-নীতি।—

আমরা স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক পাঠিকাগণকে একটী শুভ সংবাদ দিবার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। এত দিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্যনীতি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর অন্যতম পাঠ্য বিষয় রূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কলিকাতা গেজেটে এই শুভ সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যনীতির সিলাবাসও (Syllabus) প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অন্য একটী প্রবন্ধে এই সিলাবাসের বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। স্কুল কলেজে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আমরা কত দিন ধরিয়া

আন্দোলন করিয়া আসিতেছি। সাধারণ সংবাদপত্রেও বোধ হয় এ সম্বন্ধে আন্দোলন কম হয় নাই। যে শিক্ষার উপর এবং যাহার বিস্তৃতির উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে, সেই আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রদত্ত স্কৌলিক ও কালেজীয় শিক্ষায় সাহিত্য আছে, ব্যাকরণ আছে, ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, বাঙ্গালা আছে, ইংরাজী আছে, সংস্কৃত, উর্দ্দু, পার্শী, আরবী আছে, গণিত আছে, জ্যোতিষ আছে,—ছিল না কেবল স্বাস্থ্যনীতি! যাহা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন,—সুস্থ দেহে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে শিক্ষালাভ না করিলে একদণ্ডও চলে না, সেই স্বাস্থ্যনীতিই এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল না! নিম্ন ও উচ্চপ্রাথমিক, মধ্যছাত্র-বৃত্তি এবং মাইনর পরীক্ষাতেও স্বাস্থ্যতত্ত্ব অন্যতম পাঠ্য-রূপে নির্দ্ধারিত আছে; তাহা দেখিয়াও, জানিয়া শুনিয়াও কেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এত দিন স্বাস্থ্যনীতি এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাক্, better late than never. ছাত্রবৃত্তিতে যদু বাবুর "শরীর পালন" ও রাধিকা বাবুর "স্বাস্থ্যরক্ষা" পাঠ করিয়া ছাত্রেরা কত যে উপকার পায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব পাঠ করিয়া নিজ নিজ শরীর সুস্থ রাখিতে এবং বাসগৃহ, গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হউন।

সমবায়-সমিতির সাহায্যে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন এবং ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ নিবারণ।

লেখক—মাননীয় শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই।

আমাদের বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে কিরূপ তাহা কোন বাঙ্গালীকে কিম্বা বাঙ্গালার সমস্যাভিজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীকে, দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস করা অনাবশ্যক। তবে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি আন্দাজ থাকিলেও, বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গোটাকতক সোজা কথা আপনাদের গোচর করিলে মন্দ হইবে না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে মৃত্যু-সংখ্যা প্রতি মিলিমিটারে ২৬·২ ছিল। ১৯১২ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড়ে বার্ষিক মৃত্যুর হার ছিল ৩০·২; সুতরাং ইহার সহিত তুলনায় ১৯১৭ অব্দের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছু ভাল ছিল বলিতে হইবে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, প্রতি মিলিমিটারে মৃত্যু সংখ্যা ২৬·২ হইলে স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। এই যে মৃত্যু সংখ্যা,—ইহা সমগ্র প্রদেশের হিসাব। সুতরাং পল্লী অঞ্চলের মৃত্যু সংখ্যা যে ইহার অপেক্ষা অধিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জ্বরে প্রতি মিলিমিটারে গড়ে ২০·৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আর ঐ বৎসর পর্য্যন্ত পাঞ্চবার্ষিক মৃত্যুর গড় বার্ষিক হার ছিল ২২·৮ ছিল। এ কথা সকলেই জানেন যে, এক জন করিয়া লোক মরে, তার সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচ জন রোগে কষ্ট পায়। ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থান সকলের পক্ষে এ কথাটি খুব সত্য। কত লোক জ্বরে কষ্ট পায় তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায়

না। তবে পল্লী অঞ্চলের সম্বন্ধে আমাদের যতটা অভিজ্ঞতা আছে, তাহার সাহায্যে আমরা বলিতে পারি যে, যদি জ্বরে একজন লোকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ৮।১০ জন লোক জ্বরে ভুগিতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তার পর সকলেই জানেন যে, অক্টোবর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ের মৃত্যু-সংখ্যা বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের অপেক্ষা অনেক বেশী। অতএব, ঐ কয় মাসে ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থানসমূহের অধিবাসীগণের অর্দ্ধাংশ বা তৃতীয়াংশ লোক ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া থাকে, ইহা খুব সাধারণ ঘটনা। কয়েক বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া লোকে যদিই বা কোনক্রমে বাঁচিয়া যায়, তথাপি, ম্যালেরিয়া তাহার দেহে নিজের স্মৃতিচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া যায়,—তাহার প্লীহা বড় হইয়া উঠে এবং তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়। ম্যালেরিয়া রোগ পুরাতন হইয়া দাঁড়াইলে লোকে যদিই কোন ক্রমে কয়েক বৎসর টিঁকিয়া থাকিতে পারে, তথাপি, তাহাকে কর্ম্মক্ষম মানুষ বলিয়া মনে করা যায় না। ম্যালেরিয়া রোগে ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটেই; অধিকন্তু, যে সমাজে ম্যালেরিয়া-পীড়িত লোকের সংখ্যা অধিক, সে সমাজের সাধারণ অবস্থাও অত্যন্ত আতঙ্কজনক হইয়া দাঁড়ায়। ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি অত্যন্ত অধিক হইলে, লোকের কর্ম্মক্ষমতা অতি মাত্রায় কমিয়া যায়। সমগ্র বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার দরুণ লোকে অকর্ম্মণ্য হওয়ায় সমাজের যে আর্থিক ক্ষতি হয়, টাকার অঙ্ক গণনায় সে ক্ষতির পরিমাণ অতি ভয়ানক। বাঙ্গলার কৃষক সম্প্রদায় মোটামুটি বৎসরে কত টাকা উপার্জ্জন করে, আমি একবার তাহার হিসাব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার ফলে আমি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কৃষক সম্প্রদায়ের বার্ষিক আয় ৫০ ক্রোর টাকা ধরিলে হিসাবটা নিতান্ত বেঠিক হইবে না। বাঙ্গালার কৃষকদের বর্ত্তমান বার্ষিক আয় যদি ৫০ ক্রোর টাকা ধরা যায়, তাহা হইলে, বাঙ্গালা-দেশ যদি ম্যালেরিয়াশূন্য হইত, তাহা হইলে কৃষকদের বার্ষিক আয় ১২০ ক্রোর টাকা যে নিশ্চয়ই হইত, ইহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়া সমগ্র বঙ্গদেশের জীবনী-শক্তির উপর কিরূপ কার্য্য করিতেছে; তাহার পরিচয় এই যে, বাঙ্গালী-জীবনের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ২৫ বৎসরের বেশী হইবে না। বাঙ্গালী-জীবনের এই গড়পড়তা আয়ুষ্কাল, ইহা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইল, তাহা হয় ত সহজে বুঝা যাইবে না; কিন্তু আর এক প্রকারে হিসাব করিলে, কথাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইতে পারে। সে হিসাবটা এই—বাঙ্গালার প্রতি এক লক্ষ পুরুষের মধ্যে ৭১০০০ জন লোকের ৩০ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়; আর প্রায় ৮৫০০০ লোক ৪০ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মারা যায়। আর প্রায় ৯৩০০০ লোক ৫০ বৎসর পার হইবার পূর্ব্বেই মারা পড়ে। (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারির প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যা পুস্তকের ২৮১ পৃষ্ঠা দেখুন।) বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা ত এই রকম। এরূপ ক্ষেত্রে, এমন ভাবে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য নিবার্য্য ব্যাধি-প্রপীড়িত আমাদের পক্ষে কোন বড় কাজ করিয়া উঠা সম্ভব কি? কি শিক্ষা বিষয়ে, কি বাণিজ্যোন্নতি-কল্পে, কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে জাতি-গঠন-মূলক কোন কাজে হাত দেওয়া সম্ভব কি? সে যাহা হউক, প্রবন্ধের আরম্ভে আমি প্রতিশ্রুত আছি যে, বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; কারণ বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। এখন সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বপ্রধান সমস্যা এই যে, ইহার প্রতিকারের উপায় কি? প্রশ্নটি যেমন ব্যবহারিক, সেইরূপ ব্যবহারিক ভাবেই ইহার সমাধান করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, দেশের দয়ালু লোকে একটু চেষ্টা করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, সমস্যাটি এমন বিরাট আকারের যে, গবর্ণমেণ্ট,—কেবল গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অপর কেহই ইহার সমাধান করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, দেশের লোকের দানশীলতায়, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের

চেষ্টায় এই সমস্যার সম্যক সমাধান সম্ভবপর নহে। সমগ্র দেশের লোকে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্য করিলে এবং দানশীল ব্যক্তিরা অথবা গবর্ণমেণ্ট সেই কার্য্যে সহায়তা করিলে, তবে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। অবশ্য, দাতব্য সভাসমিতির দ্বারা কিছু ফল যে ফলে না, এমন নহে। এবং এ কথাও সত্য যে, গবর্ণমেণ্টও কিছু ভাল কাজ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের সম্মুখে যে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, এখানে দয়া দাক্ষিণ্য, এবং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় যতটুকু কাজ হইতে পারে, তাহা যথেষ্ট নহে। কেবল বাঙ্গালার পল্লীসমূহের ৬৮ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত ভূমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত ৪২০০০০০০ লোকের জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথমে বদান্য ব্যক্তিদিগের কথাই ধরা যাউক। দান সাহায্যে লোকের কষ্ট কি পরিমাণে দূর হইতে পারে তাহা স্থির করিতে হইলে, কি পরিমাণে দান সংগৃহীত হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখা যাউক। ভারতীয় সমাজে তিন শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের নিকট হইতে এরূপ কার্য্যের জন্য দান পাওয়া যাইতে পারে। যথা, উন্নতিশীল জমিদার সম্প্রদায়, উন্নতিশীল বণিক সম্প্রদায়, এবং ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি যাঁহাদের পেশা তাঁহাদের মধ্যে উন্নতিশীল ব্যক্তিবর্গ। প্রথমে জমিদারের কথাই ধরা যাউক। এ ক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতে পাই? বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় জমিদারীর সংখ্যা ১৩৪০০০; ইহাদের মধ্যে কতক জমিদারীর জন্য রাজকর দিতে হয়, এবং কতক নিষ্কর। আর ইজারাদারের সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ। * বাঙ্গালার রাজস্বের (বাঙ্গালার সমগ্র প্রজা যে রাজকর দেয় সেই সমস্ত টাকার) পরিমাণ বার্ষিক ১২৷৷০ কোটী টাকা। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে মোট দিতে হয় ২৭৬০০০০০ টাকা। তাহা হইলে সকল শ্রেণীর জমিদারের (মায় ইজারাদারের) বার্ষিক আয় কিঞ্চিদধিক ৯ কোটি টাকা। এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে, রাজস্ব দিতে হয় এমন জমিদারী এবং ইজারা মহলের সংখ্যা কিছু কম ২৯ লক্ষ। সুতরাং একজন ভূস্বামীর গড় আয়,—চমকাইয়া উঠিবেন না!—বার্ষিক প্রায় ৩০টি টাকা মাত্র! ইহার ভিতর হইতে আমরা যদি রাজা মহারাজা-উপাধিধারী বড় বড় জমিদারের আয় বাদ দিই, তাহা হইলে জমিদার সম্প্রদায়ের গড়-পড়তা আয় আরও কম হইয়া দাঁড়ায়। এখানে কথা উঠিতে পারে যে, গড়-পড়তা আয়ের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই; আমরা কেবল ধনী জমিদারদের চাই। জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য ভোট দিবার অধিকার আছে এমন জমিদারের সংখ্যা তিন শত হইতে চারি শতের মধ্যে। কি পরিমাণ খাজনা এবং সেস্ দিলে ভোটার হওয়া যায়, তাহার নিয়মাবলিতে দেখা যায়, যে সকল জমিদারের বার্ষিক আয় ন্যূন পক্ষে ৮।৯ হাজার টাকা তাঁহারা ভোটার হইতে পারেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, বাঙ্গালা দেশে যে সকল জমিদারের বার্ষিক আয় ৮।৯ হাজার টাকা, তাঁহাদের সংখ্যা চারি শতেরও কম। সুতরাং বাঙ্গালার জমিদার সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে মোটা রকম অর্থ সাহায্য পাইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তার পর, ব্যবসায়ী, দোকানদার ও বণিক শ্রেণীর কথা। এই শ্রেণীর মধ্যে মাত্র ১২০০ লোক আয়কর দিয়া থাকেন; অর্থাৎ এই ১২০০ লোকের বার্ষিক আয় দশ হাজার বা ততোঽধিক টাকা। এই ১২০০ লোকের মধ্যেই, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, যাঁহাদের পেশা ওকালতী এবং ডাক্তারী, তাঁহাদেরও ধরা হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোককে নানা বাবদে অনেক খরচপত্র করিতে হয়। আর ইহাদের যে সংখ্যা উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, এদিক হইতেও মোটা রকম অর্থ-সাহায্য পাইবার ভরসা নাই। সর্ব্বশেষে, আমরা কেবল পেশাদার লোকদের কথার আলোচনা করিব। গত আদমসুমারির তালিকায় দেখা যায়, সমগ্র বঙ্গদেশে আইন ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল ৯৭৫০। রেভিনিউ এজেণ্ট,

* Report of the Land Revenue Administration of Bengal.

মোক্তার এবং কাজীদিগকেও এই তালিকার মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহাদের বাদ দিলে, অন্য শ্রেণীর আইন-ব্যবসায়ীর সংখ্যা আন্দাজ ৬৫০০ হইতে পারে। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এই সংখ্যার শতকরা ১০ জনের বেশী লোকের বার্ষিক আয় ন্যূনপক্ষে ৬.৭ হাজার টাকার বেশী নহে। সুতরাং আইন-ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতেও রীতিমত অর্থ-সাহায্য পাইবার আশা কোথায়? ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মেডিক্যাল য়্যাক্ট অনুসারে রেজিষ্ট্রি-কৃত চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মেডিক্যাল স্কুলের পাশ-করা ডাক্তার,—তাঁহারা মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট নহেন। সাধারণতঃ ডাক্তারদের আয় খুব বেশী নহে। এই ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের আয় কিছু বেশী বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা তেমনি খুব কম। উপরি লিখিত বিবরণগুলি হইতে যে-কেহ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সমগ্র সমৃদ্ধ ব্যক্তি যদি খুবই দানধর্ম্মী হ'ন, তাহা হইলেও, সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে অর্দ্ধ লক্ষ টাকার অধিক সংগ্রহ করা খুবই কঠিন হইবে। আর যে দেশের পরিমাণ ৬৮০০০ বর্গ মাইল এবং যে দেশের মফঃস্বলের লোক সংখ্যা ৪২০০০০০০, সে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা এমন কি, লক্ষ টাকাতেও বিশেষ কি সাহায্য হইতে পারে?

এইবার, এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে গবর্ণমেণ্ট কতটা সাহায্য করিতে পারেন তাহাই দেখা যাউক। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের হিসাবপত্র হইতে দেখা যায়, ১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপদেশে ৪ লক্ষ; এবং "চিকিৎসা" দফায় ২৩।০ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, পরোক্ষ ব্যয়ও কিছু কিছু ছিল, যাহা উপরি উক্ত দুই দফার কোনটিতেই ধরা হয় নাই। গত বৎসর গবর্ণমেণ্ট 'স্যানিটেসন' বাবদে আরও বেশী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বর্ষে গবর্ণমেণ্ট এই বাবদে গত বৎসর অপেক্ষাও অধিক অর্থব্যয় করিবেন। কিন্তু, এই স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমস্যাটি যেরূপ বিশাল, তাহার অনুপাতে এই কয়েক লক্ষ টাকায় কি হইবে? যাঁহারা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের খরচ আয় ব্যয়ের তালিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষা বাবদে কিছু বেশী পরিমাণ টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কত কঠিন। অতএব গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় যতই ভাল হউক না কেন, স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে খুব বিস্তৃত ভাবে নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে কাজ করিতে হইলে যত টাকা আবশ্যক, গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও তত টাকা ব্যয় করা সম্ভবপর নহে।

শুনিতে বিসদৃশ হইলেও কথাটা খুবই সত্য যে, কয়েকজন ধনীর পক্ষে যাহা এত কঠিন, এতবড় শক্তিশালী গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও যাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া এত দুঃসাধ্য, সেই কঠিন কাজও জনসাধারণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য; তবে অবশ্য প্রকৃত সমবায় প্রণালী অনুসারে কাজ করা দরকার। জনসাধারণ যদি সমবেতভাবে কাজ করে, এবং পরস্পরের চেষ্টায় সহায়তা করে, তাহারা সকলেই যদি চাকা চালাইয়া দিবার জন্য কাঁধ দেয়, সকলেই যদি নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে, যত অল্পই হউক, অর্থ সাহায্য করে, সকলেই যদি সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উৎসাহের সহিত কাজ করে, তাহা হইলে এই মহা সমস্যারও সমাধান হইতে পারে। সমবায় প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইলে অবশ্য কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু এই ত্যাগ স্বীকারের ফলে, অসীম উপকার পাওয়া যাইবে। তবে এই শুভ ফল লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে এবং গোড়ায় কেবল কাজ করিয়া যাইতে হইবে। তার পর যখন সুসময় আসিবে, এবং সে সময় যে আসিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তখন তাহাদের সমবেত চেষ্টার অপরিসীম সুফল দর্শনে লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইবে। সমবায় প্রণালীকে ভিত্তি স্বরূপ অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে, তাহার শক্তি কতখানি তাহা তোমরা দেখিতে পাইবে। তবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকলকে পরস্পরের মঙ্গল সাধনোদ্দেশ্যে সদ্ভাব-প্রণোদিত হইয়া কাজ করিতে হইবে, এবং ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, বর্ত্তমানে কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। কেমন

করিয়া তাহা হইবে, সে কথা এইবার আমি একটু বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি।

বাঙ্গালা দেশে, যে সকল গ্রামের লোক-সংখ্যা ২০০ হইতে ৫ হাজার, এমন ১৭৫৮ খানি গ্রাম আছে। এই ১৭৫৮ খানি গ্রামে মোট ৪৮৫৮২৯৯ জন লোক বাস করে। ইহারা ছাড়া, ১৬২টি নগর ও গ্রাম আছে যাহাদের মোট লোক সংখ্যা ১০৮৪৪২২। এই শেষোক্ত গ্রাম-নগরগুলির অনেকগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটী আছে, আবার, কতকগুলিতে নাই-ও। শেষোক্ত শ্রেণীর কিঞ্চিৎ অধিক দশ লক্ষ লোক যে সকল গ্রামে বাস করে, সেই সকল গ্রামে মিউনিসিপালিটী নাই। যে সকল গ্রামে ৫০০ হইতে ১০০০, কিম্বা ৫০০র কম লোক বাস করে, সেই সকল গ্রামের অপেক্ষা, যে সকল গ্রামের লোক-সংখ্যা ২ হইতে ১০ হাজার, সেই সকল গ্রামে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ভাল কাজ করা যাইতে পারে। ভাল কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এ কথা এই জন্য বলিতেছি যে, এরূপ গ্রামে বেশী পরিমাণে বুদ্ধিমান ও সাধারণ কার্য্যে উৎসাহশীল লোক পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু যে সকল গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা কম, সেরূপ গ্রামে ঐ ধরণের লোক স্বভাবতঃই বেশী পাওয়া যাইবে না। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, প্রথমে বড় বড় গ্রাম লইয়া কাজ আরম্ভ করাই সঙ্গত। আমার ইচ্ছা, এইরূপ বেশী লোকের বাস-গ্রামগুলির কয়েকটি বাছিয়া লইয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করি, এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপন করি। ধরুন একখানি গ্রামে ৫০০০ লোকের বাস। আমাদের উদ্দেশ্য রীতিমত প্রচার করিতে পারিলে, দুই এক বৎসরের মধ্যে এমন আন্দাজ দুই শত লোক পাওয়া যাইতে পারে, যাহারা চিকিৎসা কার্য্য এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ মূলক কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে যোগদান করিতে সম্মত হইতে পারে। গোড়ায় সম্ভবতঃ এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কমই হইবে। আমি বলি, এইরূপ প্রস্তাবিত কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলির সদস্যগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইলে ভাল হয়। মনে করুন, প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণ মাসে বার আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে থাকিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক চাঁদার পরিমাণ হইবে, ছয় আনা হইতে আট-আনা; আর তৃতীয় শ্রেণীর চাঁদার হার মাসিক তিন চারি আনার অধিক হইবে না। সদস্যগণের নিকট হইতে মাসে কি পরিমাণে চাঁদা আদায় হইতে পারে, তাহা স্থানীয় অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করিবে; অর্থাৎ স্থানীয় অবস্থার তারতম্য অনুসারে চাঁদার পরিমাণেরও কম বেশী হইতে পারে। তবে আমি ঐ যে তিন শ্রেণীর চাঁদার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিলাম, উহা কেবল আলোচনার সুবিধার জন্য। তার পর, আমার প্রস্তাব এই যে, প্রথম শ্রেণীর সদস্যগণের বাড়ীতে গিয়া সোসাইটীর ডাক্তাররা বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিবেন, এবং ইঁহারা ঔষধ কেনা দামে পাইবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্যরা ডাক্তারের বাড়ীতে বিনামূল্যে ব্যবস্থা পাইবেন। তবে তাঁহাদের কাহারও বাড়ীতে কঠিন পীড়া উপস্থিত হইলে, কিম্বা বাড়ীর পর্দ্দানশীন মহিলারা পীড়িত হইলে ডাক্তার তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াই চিকিৎসা করিবেন। তবে এই সুযোগের যাহাতে অপব্যবহার না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, পূর্ব্বোক্তরূপ কারণে ডাক্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্যগণের বাড়ীতে চিকিৎসার্থ গমন করিলে, তাঁহারা ডাক্তারকে প্রতি ভিজিটে ৩ কি ৪ আনা হিসাবে নামমাত্র ফী দিবেন। ঔষধ তাঁহারাও কেনা-দামে পাইবেন। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যগণের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্যগণের সকল সুবিধাই পাইবেন; তবে তাহা কেবল বৎসরের মধ্যে দুই-তিন মাস মাত্র,—সারা বৎসর নহে। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য পদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,—যে সকল লোক গ্রামে বাস করিতে পারেন না, বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে দূরে বাস করেন, অথচ, গ্রামের বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্নও করেন নাই, প্রধানতঃ তাঁহাদের

জন্যই তৃতীয় শ্রেণীর পদের সৃষ্টি। মাসিক চাঁদা ছাড়া, আমি বলি, সদস্যরা দুই কিস্তীতে ৩ কি ৪ টাকা প্রবেশিকা ফী প্রদান করিবেন। এই প্রবেশিকা ফী-টা সোসাইটীর মূলধন স্বরূপ গণ্য হইবে। তাহা হইলে, ভবিষ্যতে খরচ-খরচা বাদ সোসাইটীর যদি লাভ দাঁড়ায়, তবে সদস্যগণ ঐ লাভের অংশ পাইবেন। কিন্তু যদি সদস্যগণ তাঁহাদের দেয় মাসিক চাঁদা দিতে অপারগ হ'ন, তাহা হইলে, তাঁহাদের প্রবেশিকা ফী-টা ডিপজিটের কাজ করিবে, এবং উহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে ও তাঁহারা সদস্যপদের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন। উপরি উক্ত হিসাব হইতে আমার মনে হয়, দুই এক বৎসর নিয়মিত ভাবে আগ্রহের সহিত কাজ করিলে, মাসে ১৫০ কি ২০০ টাকা আয় নিশ্চয়ই হইতে পারিবে। গোড়ায় হয় ত আয় খুব কমই হইতে পারে, —মাসে ৫০ হইতে ৭৫ টাকার বেশী না হইতে পারে।

আমার প্রস্তাব এই যে, মোট আয়ের শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ একজন ডাক্তার, তাঁহার কম্পাউণ্ডার প্রভৃতির বেতন বাবদ ব্যয় করা উচিত; এবং শতকরা অপর একটা অংশ ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে ব্যয় করিয়া, বাকী ১০।১৫ টাকা অসময়ের জন্য সঞ্চয় করা, কিম্বা দৈবাৎ কোন অতিরিক্ত খরচ আসিয়া উপস্থিত হইলে সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করা, অথবা গৃহ-নির্ম্মাণার্থ জমাইয়া রাখা যাইতে পারিবে। যাঁহারা সোসাইটীর সদস্য নহেন, এমন লোকদিগের মধ্যে ডাক্তারকে চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইবার অধিকার দিতে হইবে; এবং যাঁহারা সদস্য নহেন, তাঁহারা ঔষধ কিনিতে চাহিলে তাঁহাদিগকে বাজার দরে ঔষধ সরবরাহ করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত উপায়ে সোসাইটীর নিশ্চয়ই কিছু লাভ হইতে পারিবে। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে যে শতকরা অংশটা স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইবে সেটার দ্বারা (ক) বাড়ীর, বাগানের বা পতিত ভূমির জঙ্গল আগাছা প্রভৃতি পরিষ্কার করা যাইতে পারিবে, এবং জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজটা যাহাতে আর্থিক হিসাবে সফল হয়, অর্থাৎ তদ্দ্বারা যাহাতে কিছু অর্থাগমের সুবিধা হয়, তদুদ্দেশ্যে ঐ সকল পরিষ্কার-করা ভূমিতে উপযুক্তরূপ কোন শস্যে চাষের বন্দোবস্ত করিতে হইবে; (খ) গ্রামের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা এবং পয়ঃপ্রণালী কার্য্যক্ষম অবস্থায় রক্ষা করা হইবে। (গ) অস্বাস্থ্যকর খানা, ডোবা প্রভৃতি ভরাট করাইতে হইবে; (ঘ) যতদিন না সকল ছোট পুকুর বা ডোবা ভরাট করিবার উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত হয়, ততদিন কেবল যে সকল ছোট পুকুর, নিম্নভূমি (যাহাতে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে) প্রভৃতিতে পাট পচানো হয়, সেইগুলির জল, পাট পচানোর কাজ শেষ হইয়া যাইবার পর, ছেঁচিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে কিম্বা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া উহাদের অনিষ্টকারিতা নিবারণ করিতে হইবে। (ঙ) চিকিৎসকগণ উপদেশ দিলে অব্যবহার্য্য পুকুরের জল রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে শোধন করিয়া লইয়া উহা ব্যবহার যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। (চ) টাকা লোকের ব্যবহারের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে, এবং কোন কেন্দ্রীয় স্থানে, যেমন ডিস্পেন্সারীতে, অথবা ডাক্তারের বাড়ীতে অপেক্ষাকৃত কম দামের ফিলটার বসাইতে হইবে। (ছ) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে,—কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় তাহা লোককে শিক্ষা দিতে হইবে। লোকে যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যাস করে এমন ভাবে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে। উপরে আমি যে সকল হিসাবের কথা বলিলাম, তাহাতে কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের কি কি কাজের জন্য শতকরা ঠিক কত টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম না; কারণ, উহা স্থানীয় অবস্থা, স্থানীয় লোকেদের কল্পনা এবং মনের গতির উপর নির্ভর করে; যেখানে যেরূপ অবস্থা তাহা বুঝিয়া ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে; সকল স্থলে একই নির্দ্দিষ্ট হারে খরচ করিলে চলিবে না। যে গ্রামে যদি আদৌ কোন উপযুক্ত চিকিৎসক না থাকে তবে বাহির হইতে চিকিৎসক আনয়ন করিতে হইবে

সেই গ্রামের জন্য (সেখানকার কো-অপারেটিভ সোসাইটীর মাসিক আয় আন্দাজ ১০০ টাকা ধরিয়া লইয়া) আমি প্রস্তাব করি যে, ডাক্তারের বেতন বাবদ শতকরা ৪৫ টাকা আলাদা করিয়া রাখা যাইতে পারে। এই ডাক্তার চিকিৎসা কার্য্য ছাড়া আরও একটী কার্য্য করিতে পারিবেন,—সোসাইটীর সেক্রেটারীর কাজও চালাইতে পারিবেন। তার পর ঐ গ্রামের কম্পাউণ্ডারের বেতন শতকরা ১০ টাকা ধরা যাইতে পারে। তিনি কম্পাউণ্ডারী ছাড়া, সোসাইটীর মোহরেরের কাজও চালাইয়া লইতে পারিবেন। সদস্যগণের নিকট হইতে ঔষধের যে দাম পাওয়া যাইবে, তাহাতে যদি ডিসপেন-সারীর খরচ না কুলাইতে পারা যায়, তবে অতিরিক্ত খরচটার জন্য শতকরা ৫ টাকা রাখা যাইতে পারিবে। অবশিষ্ট ৪০ টাকার ভিতর হইতে, ম্যালেরিয়া নিবারণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে ২৫ টাকা রাখিয়া বাকী ১৫ টাকা অসময়ের জন্য সঞ্চয়, সিংকিং ফাণ্ড ও বিল্‌ডিং ফাণ্ড বাবদে রাখা যাইতে পারে। আমি এরূপ ব্যবস্থা করারও পক্ষপাতী যে, কো-অপারেটিভ সোসাইটী দানশীল ভদ্রলোকগণের নিকট হইতে এককালীন দান, অথবা মাসিক নিয়মিত চাঁদা, কিম্বা গবর্ণমেণ্ট অথবা লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণের অধিকার পাইবেন। সদস্যগণের নিকট হইতে প্রবেশিকা ফী বাবদ হয় ত ৪০০ কি ৫০০ টাকা আদায়ের আশা করা যাইতে পারে। ঐ ৪।৫ শত টাকায় ছোট-খাট একটী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করা যাইতে পারিবে। কোন সোসাইটী যদি গোড়াতেই যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য না পায়, তবে সেই সোসাইটী ২।৩ শত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে; পরে সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঋণের টাকা ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করা যাইতে পারিবে। যতদিন না ঋণ পরিশোধ হইয়া উঠে, ততদিন শেষোক্ত শতকরা ১৫ টাকার ভিতর হইতে ঐ ঋণের টাকার সুদ দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যদি সদস্য সংখ্যা আশানুরূপ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া না যায়, তাহা হইলে ঋণের কতক অংশ সিংকিং ফাণ্ডের টাকা হইতে ধীরে ধীরে পরিশোধ করিতে পারা যাইবে। এরূপ স্থলে হয় ত স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যয় এবং ডাক্তারের বেতন কিছু কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

যে সকল গ্রামে উপযুক্ত ডাক্তার আছেন, সেই সকল গ্রামের সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব এই যে, স্থানীয় ডাক্তারকেই সোসাইটীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, মোট আয়ের শতকর ৩৫ টাকা ডাক্তারকে বেতন বলিয়া দিলেই চলিবে; কারণ, তথায় তাঁহার প্রাইভেট প্র্যাকটিসও বজায় থাকিবে। অবশ্য সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিস কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহাতে ডাক্তারের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। তিনি আয়ের একটা শতকরা অংশ পাইবেন; সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সোসাইটীর আয় বৃদ্ধি হইবে; কাজেই ডাক্তারের বেতনও বাড়িয়া যাইবে। এই সকল সোসাইটীর জন্য আমি কতকগুলি নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত করিয়াছি। যদি কেহ সোসাইটী স্থাপনে উৎসাহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আনন্দের সহিত ঐ সকল খসড়া নিয়মাবলীর নকল দিতে প্রস্তুত আছি। এই নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া, স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় উহাদের সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

এই প্রবন্ধের গোড়াতেই আমি বলিয়াছি যে, আমি প্রথমে লোকবহুল গ্রামগুলিতেই কার্য্য আরম্ভ করিতে চাই; এবং ইহাও বলিয়াছি যে, সমগ্র বঙ্গের ৪২০০০০০০ পল্লীবাসীর মধ্যে ঐরূপ গ্রামের লোক সংখ্যা ৬০০০০০০। এই সকল গ্রামে যখন কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটী দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তাহার কার্য্যক্ষেত্র নিকটকর্ত্তী অল্প লোকের দ্বারা অধ্যুসিত গ্রামগুলিতে বিস্তৃত করা কঠিন হইবে না। তাহা হইলে, এই প্রণালীতে সমগ্র বঙ্গদেশময় কো-অপারেটিভ সোসাইটী-সমূহের জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। যাঁহারা যথার্থই এই সমস্যার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত, যাঁহারা বস্তুতঃ ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বচক্ষে

এইরূপ কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলির কার্য্য প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটী, সুখচর, সোদপুর প্রভৃতি গ্রামে সোসাইটীর কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। এই সকল সোসইটীর উৎপত্তি প্রধানতঃ রায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের আগ্রহে ও জনহিতৈষণার ফলে ঘটিয়াছে। এই সকল সোসাইটীর কার্য্যপ্রণালী হইতে জানিতে পারা যায় যে, এইরূপ সোসাইটীর কাজ উত্তমরূপে চলিতে পারে। নিজ বাস গ্রামের প্রতি যাঁহার কিছুমাত্র মায়া মমতা আছে, যাঁহারা গ্রামের মঙ্গল ইচ্ছা করেন, যাঁহারা গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে চাহেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে এইরূপ সোসাইটী স্থাপন করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন।

এই স্কীমের একটী বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সাধারণতঃ লোকের মনে জনগণের মঙ্গলেচ্ছা বর্ত্তমান থাকিতে পারে; সাধারণের কাজ করিবার জন্য তাঁহারা খুব ইচ্ছুক থাকিতে পারেন; অথচ, কেবলমাত্র স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপনের মত দূরদৃষ্টি তাঁহাদের না থাকিতে পারে। কিন্তু আমি আশা করি, যে, এই সোজা কথাটা সকলেই বুঝিবেন যে, সামান্য ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারা কম সুবিধার কথা নহে; অনেক লোকেই এইরূপ ব্যবস্থার উপকারিতার কথা বুঝিতে পারিবেন। আর, যাঁহারা চিকিৎসার এইরূপ সুব্যবস্থার উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন, ক্রমে তাঁহাদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন হইবে না। এমন কি, তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সুচিকিৎসার ব্যবস্থার অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক। স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ, রোগ নিবারণ; অতএব কো অপারেটিভ সোসাইটীগুলির কার্য্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, রোগ সকল নিবার্য্য; এবং যদি সমবেত ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা-মূলক কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, দেখা যাইবে, উহা সুচিকিৎসার ব্যবস্থার অপে অধিকতর ফলপ্রদ ও সন্তোষজনক।

ভদ্রমহোদয়গণ, কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপনে স্কীমটির সম্বন্ধে মোটামুটি সকল কথা আমি আপনাদিগ বুঝাইয়া দিলাম। এখন আমার প্রার্থনা এই যে আপনারা আরও একটু ধৈর্য্যসহকারে আমার শ্রবণ করুন,—এই স্কীমের পরিচালন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিলে তাহা হইতে অপ্রত্যক্ষভাবে সকল শুভ ফল হইতে উৎপন্ন পারে, আমি এইবা সেইগুলির বিচার করিয়া দেখিব। প্রথমেই এক উপকার এই আশা করা যায় যে, গরীব লোকদে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটু বিস্তৃত ভাবেই হইবে। এ গরীব লোকদের চিকিৎসকদের কার্য্যক্ষেত্রও বি হইয়া পড়িবে। অল্পবিত্ত মধ্যশ্রেণীর লোকদের অ সমস্যা এখন বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়া য়াছে। পূর্ব্বো উপায়ে চিকিৎসকদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে, এ অন্নসমস্যার কিয়ৎ পরিমাণে সমাধান হইতে পারিবে এই শ্রেণীর কতক লোক জনবহুল কেরাণীগিরি বা এর অন্যান্য কার্য্যক্ষেত্রে—যেখানে লোক সংখ্যার আধিক্য বশতঃ নূতন লোকের আমদানী আর বাঞ্ছনীয় নহে— অন্ন সংস্থানের চেষ্টা না করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিখি আরম্ভ করিবেন, এবং এই নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবে করিয়া তিনি সমাজের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও যথে উপকার করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান কালে বঙ্গদে মোটে ৩০০০ রেজিষ্ট্রীভুক্ত চিকিৎসক আছেন। এ সকল চিকিৎসকের অধিকাংশই মিউনিসিপ্যাল সহরে বাস করেন। আর, ঐ সকল মিউনিসিপ্যাল নগরে লোক সংখ্যা (সমগ্র পল্লীভূমির ৪৫০০০০০০ লোকে মধ্যে) ৩০০০০০০। আমি যদি অনুমান করি যে ঐ ৩০০০ চিকিৎসকের মধ্যে ২০০০ লোক মিউনিসিপ্যা সীমার মধ্যে থাকিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইয়া থাকে তাহা হইলে, প্রকৃত অবস্থা হইতে আমার অনুমা বোধ হয় বেশী দূরে গিয়া পড়িবে না। অতএব আমরা দেখিতেছি, মফস্বলের ৪২০০০০০০ লোকের চিকিৎ

কার্য্যের জন্য মাত্র ১০০০ পাশ-করা ডাক্তার আছেন। ইয়োরোপীয় দেশসমূহে প্রতি হাজার কি ১২০০ লোকের জন্য এক একজন চিকিৎসক আছেন। অবশ্য ইয়োরোপীয় দেশগুলি বাঙ্গালা দেশের অপেক্ষা অনেক বেশী ধনী তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু বঙ্গদেশ ইয়োরোপের যে কোন দেশের অপেক্ষা বহুগুণে অস্বাস্থ্যকর। উপরে উল্লিখিত অঙ্কগুলি হইতে আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বঙ্গদেশের মফস্বলগুলিতে পাশ-করা ডাক্তারের অভাব কত বেশী। আমাদের দেশের লোকের আপেক্ষিক দারিদ্র্য এবং ইয়োরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় আমাদের দেশের অধিকতর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া, আমরা যদি প্রতি তিন হাজার অধিবাসীর জন্য একজন মাত্র ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে চাই, তাহা হইলেও কেবল বঙ্গের পল্লীসমূহের জন্যই ১৪০০০ ডাক্তার চাই। তন্মধ্যে উপরের হিসাব অনুসারে মফস্বলে এখন ১০০০ ডাক্তার আছেন; সুতরাং এখনও আমাদের আরও ১৩০০০ ডাক্তারের অভাব রহিয়াছে।

অপর একটা পরোক্ষ উপকার এই হইবে যে, মফস্বলে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের কিছু কিছু আমদানী হইবে। আপাততঃ বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম-সমূহে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ১৩০০০ এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তির সংখ্যা ৮০ কি ৯০ হাজার। গ্র্যাজুয়েটেরা এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা যুবকেরা প্রায়ই কোন মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় বাস করিয়া কোন না কোন রকমে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থানুসন্ধান করেন। এবং প্রায়ই কোনরূপ লেখাপড়ার কাজ বা কেরাণীগিরি জুটাইয়া লইয়া থাকেন। ইহার ফলে স্বভাবতঃ তাঁহাদের অবলম্বিত জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রে লোক-বাহুল্য ঘটিয়া থাকে; এই জন্য অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মধ্যম শ্রেণীর লোকের পক্ষে জীবিকা অর্জ্জন করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ইহার আর একটা অর্থ এই যে, যে পল্লীগ্রাম জাতীয় ধন উৎপাদনের মূল ক্ষেত্র, যেখানে জাতির মেরুদণ্ড বাস করে, যেখানে জাতীয় উন্নতির সকল মূল উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, সেই পল্লীভূমিই সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকশূন্য হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার পল্লীভূমিতে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী লোকদিগের জন্য জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই এখন বাঙ্গালার প্রধান প্রয়োজন। গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়াইতে না পারিলে লোকসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন, কৃষির উন্নতি সাধন, শিক্ষার বিস্তৃতি সাধন, লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন—এইরূপ কোন কাজই সম্ভবপর হইবে না। বহু পরিমাণে ডাক্তার আনিয়া গ্রামসমূহে বাস করাইতে পারিলে, কেবল যে সমাজের একটা প্রয়োজন সাধিত হইবে, তাহা নহে; এই উপায়ে গ্রাম অঞ্চলে অনেক চলনসই গোছের শিক্ষিত ও চতুর লোকের অন্নসংস্থানও করা হইবে। এই শ্রেণীর লোক গ্রামে গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, বাঙ্গালার অনেক সমস্যার সমাধানে প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করিবে। আবার এ কথাও সকলে জানেন যে, বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা দেশের অল্পবিত্ত মধ্যম শ্রেণীর লোকদের অন্ন-সমস্যা একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্য সকল উপকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল এই উপকারটিও বড় সামান্য নহে।

আমি এইবার আপনাদিগকে অপর একটা বিষয়ের কথা বলিতে চাহি। মনে করুন সৌভাগ্য ক্রমে আমরা তিন চারি বৎসরের মধ্যে ৩০০ কি ৪০০ সোসাইটী স্থাপন করিতে সমর্থ হইলাম। তাহা হইলে আমরা স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিব। যে সকল ডাক্তারের হাতে এই সমস্ত সোসাইটীর ভার থাকিবে, তাঁহাদের দ্বারা যদি প্লীহা-পীড়িত লোকদের সংখ্যা গণনা করিতে পারা যায়, রোগসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারা যায়, এবং অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে, সেই সকল সংগৃহীত বিবরণ স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে এবং

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উন্নতি প্রয়াসী ব্যক্তিগণের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় সংবাদ হইবে বলুন দেখি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই উপায়ে, অতি অল্প ব্যয়ে, যে সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে, তাহার মূল্য এত বেশী হইবে যে, তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে স্যানিটারী ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যকারিতা শক্তি খুব বাড়িয়া যাইবে। এই সকল কো-অপারেটিভ সোসাইটীর সৃষ্টির ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান প্রচারে এতখানি সুবিধা হইবে যে, এই প্রদেশে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রচারের প্রকৃত উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই স্কীমের পরোক্ষ মঙ্গলসমূহের মধ্যে পরবর্ত্তী বিষয়টি এই যে, এইরূপ সোসাইটীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কো-অপারেটিভ আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধিকল্পে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবেন। বর্ত্তমান কালে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্য কৃষকগণকে ঋণদান। এই প্রশ্নটি ভদ্রলোকদিগের অপেক্ষা কৃষকদিগেরই অধিকতর প্রয়োজনীয়। অবশ্য এক্ষেত্রেও ভদ্রলোক কর্ম্মীর একেবারে অভাব নাই। ইঁহারা কৃষকদের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছায় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; অথবা তাঁহারা বড় গোছের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট। এইরূপে কতক ভদ্রলোক বর্ত্তমান কালেই কো-অপারেটিভ আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষিঋণের সহিত ভদ্রলোক অপেক্ষা কৃষকদিগেরই ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। তবে আমি যে ধরণের সোসাইটীর কথা বলিতেছি, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রাম্য কৃষকদিগের ন্যায় গ্রাম্য ভদ্রলোকেরাও কো-অপারেটিভ আন্দোলনের সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবেন। অতএব ইহা আশা করা স্বাভাবিক যে, এই সকল সোসাইটীর বিস্তৃতি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ এবং সাধারণ ভাবে শিক্ষিত মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহের কার্য্য পরিচালনে বিস্তৃতভাবে এবং কার্য্যগত ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। অপিচ, তাঁহারা এই সাধারণ কার্য্যে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া শিক্ষা করিবেন; কারণ, ইহার সহিত এমন একটী সুমহৎ এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, যাহা ভদ্রলোক ও কৃষক এই দুই সম্প্রদায়েরই পক্ষে সমান ভাবে আবশ্যক। কারণ, এই সকল সোসাইটীর অধি কাংশেরই ভদ্রলোক এবং কৃষক এই দুই শ্রেণীরই সভ্য যে থাকিবে, তাহাতে আমার একটুও সন্দেহ নাই। এই সকল সোসাইটী ভদ্রলোকদিগকে কৃষকশ্রেণীর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনে সহায়তা করিবে; এবং এতদ্দ্বারা ভদ্র সম্প্রদায় ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সহানুভূতি স্থাপিত হইবে। আমাদের প্রদেশটির উন্নতি সাধনে ভদ্র ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব সবিশেষ ফলপ্রদ হইবে।

কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপনের আর একটি পরোক্ষ কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় উপকার এই হইবে যে, লোকে একটী মহৎ শিক্ষা পাইবে; সে শিক্ষাটি—কার্য্যগত স্বায়ত্তশাসন। দেশের লোকের দ্বারা দেশের লোকের কাজ কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে, সে মহৎ শিক্ষা কো-অপারেটিভ সোসাইটী হইতে পাওয়া যাইবে। এইরূপ ধরণের কার্য্য হাতে-হেতেরে সম্পাদন করিয়া কৃতকার্য্য হইলে পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিখা করা যাইবে; এবং কেবল মাত্র সেই শিক্ষার দ্বারা দায়িত্বমূলক শাসন-সংক্রান্ত কঠোর প্রশ্ন সমূহের সমাধান হইতে পারিবে। সুতরাং আমি বলিতে পারি যে এইরূপ কার্য্যই স্বায়ত্ত-শাসনরূপ প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভিত্তি। আমরা ভারতবাসীরা এখন এই অট্টালিকা গঠন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহার বিপদ এবং তাহার বাধা বিঘ্ন সকলকে মানিতে চাই না,—বরং অগ্রাহ্য করিতে তৎপর।

সর্ব্বশেষে, এই সোসাইটী লোককে আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দিবে। বহু সংখ্যক সামান্য ব্যক্তির সমবায়ে সদ্ভাবে কার্য্য করার ফলে জাতির অতি গুরুতর প্রয়োজনীয় ও কঠিন প্রশ্ন সকলেরও যে সমাধান করা

পারা যায়, কো অপারেটিভ সোসাইটী সকল তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিবে। এই সকল প্রশ্নের নির্দ্দেশ আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের গোড়াতেই করিয়া রাখিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে এই সমস্যাগুলি গবর্ণমেণ্ট এবং ধনী সম্প্রদায়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। বহুলোকের সাধারণ মঙ্গলের জন্য কি ভাবে কাজ করিতে হয়, তাহাও ইহা হইতে শেখা যাইবে। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে আর একটা কথাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। স্কুলের প্রত্যেক হিন্দু ছাত্র—যে রামায়ণ পড়িয়াছে,—সে এই কথাটি জানে। কথাটী আর কিছুই নয়—অতি ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট কিন্তু সংখ্যায় অগণ্য বহু সংখ্যক কাঠবিড়াল লঙ্কায় সেতু নির্ম্মাণকালে রামচন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিল। আমার শ্রোতৃমণ্ডলী প্রধানতঃ হিন্দু; রামায়ণের এই উপদেশটি যে কি তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। আমি আপনাদিগকে কেবল এই অনুরোধটি করিতেছি যে, আপনারা এই উপদেশটির মধ্যে কি সত্য নিহিত আছে নিজেরাই পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার উপযুক্ত শক্তি না থাকিলে কোন স্থায়ী এবং মহৎ কার্য্যই সম্পাদন করা যায় না। কার্য্য সাধনের পথে বাধা থাকিবেই, এবং হয় ত অনেক বাধাবিঘ্নই থাকিতে পারে। এমন দুঃসময় আসিতে পারে, যাহার সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিতে হইবে; এমন সময় আসিতে পারে, যখন কর্ম্মীরা নিজেদের পরাজিত বলিয়া বোধ করিতে পারেন; যে দিনে তাঁহাদের মনে এমন আশঙ্কা জন্মিতে পারে যে, তাঁহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সম্পাদন করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত।

এমন দিনে একটু আশার বাণী হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে পারে। চিত্রের উজ্জ্বল দিকটা—সফলতার স্বপ্ন—সর্ব্বদাই মনকে উৎসাহিত করিতে পারে। এই জন্য আমি সাহস করিয়া আপনাদের সম্মুখে একটী সুখের স্বপ্ন মেলিয়া ধরিতেছি। আপাততঃ উহা স্বপ্ন মাত্র,—স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, স্বপ্ন যে স্বপ্ন মাত্র, উহা যে বাস্তব কিছু নয়, এ কথা আমার অপেক্ষা আর কেহই ভালরূপ জানেন না। কিন্তু, সময়ে সময়ে এমন স্বপ্ন দেখা যায়, যাহা পরিণামে আমাদিগকে জয়যুক্ত করে। আর ভাবী সফলতার স্বপ্ন যদি অবহেলা বা ঘৃণার বিষয় না হয়, তাহা হইলে আমি সেই স্বপ্ন আপনাদের চক্ষের সামনে ধরিয়া দিতে চাই। সে স্বপ্ন আর কিছুই নয়—তাহা ম্যালেরিয়াশূন্য, নিবার্য্য ব্যাধিশূন্য বঙ্গদেশ। সে স্বপ্ন,—স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি এবং বলসম্পন্ন বঙ্গদেশ। সেই বঙ্গদেশ, যাহা বাঙ্গালীরা নিজেরাই বৃটিশ সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ভদ্রলোকদের সাহায্যে, সহযোগিতায় ও সদিচ্ছা বলে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। এই স্বপ্ন আমার চক্ষের সমক্ষে যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমি তাহা আপনাদের কাছে বর্ণনা করিতে পারি। আমি দেখিতেছি বর্দ্ধমান বিভাগ—প্রাচীন বঙ্গের রাঢ় প্রদেশ তাহাদের পূর্ব্বকালের সর্ব্বজন বিদিত স্বাস্থ্য সম্পদ ফিরাইয়া পাইয়াছে। পূর্ব্বকালের রাঢ় প্রদেশের গ্রাম গুলিতে দৃঢ়কায় উন্নত-দেহ যে অসংখ্য লোক বাস করিত, এখনকার গ্রামগুলিও সেইরূপ লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি, যে যশোহর ও নদীয়া জেলা এক সময়ে পশ্চিম বাঙ্গালার শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, সেই জেলায় এখন আর ম্যালেরিয়া নাই,—সেখানে এখন সহাস্য বদন লোকগুলি সুখে বাস করিতেছে। আমি দেখিতেছি, পূর্ব্ববঙ্গ—প্রাচীন বাঙ্গালায় যাহা বঙ্গ প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই পূর্ব্ববঙ্গ সময় থাকিতে জাগ্রত হইয়াছে; এবং বহু বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গে যে রোগ শোক নিত্য লাগিয়াই থাকিত. পূর্ব্ববঙ্গও সেই রোগের আতঙ্কের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আমি আমার চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি, বারেন্দ্র ভূমি কিছু দিন রাঢ়দেশের সহিত স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিয়াছে; এবং পূর্ব্বকালে বারেন্দ্র ভূমি যে ন্যায় সঙ্গত গৌরবে সুবিখ্যাত ছিল, তাহার কিছু কিছু আবার ফিরাইয়া পাইয়াছে। আমি দেখিতেছি, কলিকাতায় একটী সেণ্ট্রাল সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে, বঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত অসংখ্য সোসাইটীর সহিত

তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সোসাইটী চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, এবং এত অল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ করিতেছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান সকল ধারণা উল্টাইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি, একদল সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এবং উৎসাহী বৈজ্ঞানিক হেড কোয়ার্টারে থাকিয়া অত্যন্ত যত্ন সহকারে কাজ করিতেছেন। এই সকল লোকে এত উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, কাজ করিতে করিতে তাঁহারা হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন; তথাপি তাঁহারা অদম্য উৎসাহে কাজ করিয়া পরিণামে, যে সকল সমস্যা খুব প্রসিদ্ধ ও বড় লোকদের বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে সেই স্বাস্থ্য ও রিলিফ সংক্রান্ত সকল জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সেণ্ট্রাল সোসাইটীর সদস্যগণ পৃথিবীতে নূতন নূতন কল্পনা এমন উন্নত ধরণে এবং এত বেশী প্রচার করিতে থাকিবেন যে, ভারতীয়—ইয়োরোপীয় এবং দেশীয়—চিকিৎসকগণের এবং বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীগণের নাম জগতের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ইতিহাসে সম্মানিত নাম বলিয়া গণ্য হইবে। আমি আমার সম্মুখে আরও দেখিতেছি, লোক সকল সর্ব্বসাধারণের শত্রু ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথম সম্মিলিত হইয়া,—একতা, এবং সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার সুবিধা উপলব্ধি করিতেছে, এবং জাতীয় উন্নতিমূলক অন্যান্য কার্য্যে ও শিক্ষায় সম্পূর্ণ সুফল অনুভব করিতেছে। আমি দেখিতেছি বঙ্গদেশ সেই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়া কৃষি বিভাগেও উন্নতি করিতে আরম্ভ করিতেছে —এখন যেখানে একটী মাত্র শস্যের চাষ হইতেছে সেখানে বৎসরে দুই প্রকার শস্যের চাষ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, ধনজনে সমৃদ্ধ, বলশালী, একতাসম্পন্ন বঙ্গদেশ অতঃপর আর্থিক, স্বাস্থ্যনীতিক এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন সমূহের সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, গুজরাট, খান্দেশ ও বেরারে তূলার গাঁট বাঁধিবার যতগুলা কল আছে, একমাত্র বঙ্গদেশে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক পাটের গাঁট বাঁধিবার কল সংস্থাপিত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, বঙ্গদেশ জল নিকাশ সমস্যার সমাধান করিয়াছে, জলপথ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে যাহা অচিন্তনীয় এমন ভাবে শনৈঃ শনৈঃ শিল্পোন্নতি সাধন করিতেছে। তারপর, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে আমি দেখিতেছি, বঙ্গদেশের গ্রামের লোকের সংখ্যা ৫০০, এখন প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে; যে গ্রামের লোক সংখ্যা ২০০০ এমন প্রত্যেক গ্রামে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আর প্রত্যেক বিভাগে এক একটী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং সেই ডিভিসনের লোকেরা ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ করিয়া লোক সমাজে শিক্ষার বিস্তৃতি এবং সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছে। সংক্ষেপে বঙ্গদেশের অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, বঙ্গদেশ নিজের প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য নিজেরাই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে, নিজেরাই নিজেদের সকল অভাব মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই দেশ এখন সঙ্ঘ স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সেই সঙ্ঘ তাহার বিভিন্ন অংশকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়াছে যে, সকল অংশই অপর অংশ গুলির প্রয়োজন ও অভাব পূরণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। আমি এইখানেই যবনিকা পাত করিব; কারণ, ইহা আপাততঃ স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু ইহা স্বপ্ন হইলেও, ইহাকে বাস্তবে পরিণতঃ করা আপনাদের সাধ্যায়ত্ত।

পল্লী-স্বাস্থ্য।

আমাদের মফস্বলের সংবাদপত্রগুলি দেশের দর্পণ স্বরূপ। "God made the country, man made the town." ঈশ্বর দেশ (অর্থাৎ পল্লীগ্রাম) সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মানুষ গড়িয়াছে নগর। পল্লীভূমি প্রকৃতির লীলা নিকেতন; নগর কৃত্রিমতার, বিলাসিতার রঙ্গভূমি। নগরবাসী অধিকাংশ লোকই নগরে প্রবাসী মাত্র; দেশের প্রকৃত অধিবাসীরা পল্লীবাসী। সুতরাং পল্লীগ্রামই প্রকৃতপক্ষে দেশ। সেই পল্লীভূমির পরিচয় মফস্বলের সংবাদপত্র হইতেই যা কিছু পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা কখন কিরূপ থাকে, স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক পাঠিকাগণের তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক; এবং তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যকও বটে। মফস্বলের সংবাদপত্রগুলি হইতে, আমরা দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থার যতটুকু পরিচয় পাইব, তাহা প্রতি মাসেই স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইয়া রখিবার চেষ্টা করিব। কখন কোন্ স্থানের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ থাকে, কখন কোথায় কি কারণে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তৃতি ঘটে, কখন কোথায় কাহার কিরূপ চেষ্টায় স্বাস্থ্যোন্নতি সাধিত হয়, তাহা যে কোন মাসের স্বাস্থ্য-সমাচার খুলিলেই পাঠকেরা যাহাতে জানিতে পারেন, আমরা যথাসাধ্য তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। মোটের উপর, স্বাস্থ্য-সমাচারে দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা নখ-দর্পণ স্বরূপ বিরাজ করে ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। তবে ইহাতে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইব তাহা শ্রীভগবানই বলিতে পারেন।

সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া স্বাস্থ্য-সমাচারের প্রচার। আমাদের এই নূতন উদ্যমে স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক-পাঠিকাগণের কিছু সুবিধা হইতে পারিবে এইরূপ আশা করি। কারণ, স্বাস্থ্য-সমাচারের সহায়তায় এক স্থানের পাঠকেরা স্বচ্ছন্দে অন্য স্থানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ সহজেই অবগত হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। কোন না কোন রোগ কোন না কোন সময়ে কোন না কোন স্থানে প্রবল ভাবে বর্ত্তমান আছেই আছে। অন্যান্য কারণেও দেশের অবস্থা সর্ব্বদা না হউক অধিকাংশ সময়েই খারাপ থাকে।

এ বৎসর কলিকাতায় বসন্তরোগের কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। মফস্বলেও ইহার প্রভাব বড় অল্প নহে। খুলনা জেলার সাপ্তাহিক "খুলনা" খুলনা সহরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ দিতেছেন,—

সদর মিউনিসিপালিটী হইতে বসন্তরোগীর ওয়ার্ড স্বরূপ ব্যবহার জন্য সহরের পশ্চিমাংশে যশোহর রোডের উপর একটী পাকা বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এ বৎসর সর্ব্বত্রই বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। শিশুদের মধ্যে হাম রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

কিন্তু এ সুখ নিরবচ্ছিন্ন নহে; কারণ, পরের সপ্তাহেই "খুলনা" লিখিতেছেন,—

কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ ভাবে উক্ত রোগাক্রান্ত কয়েকটি রোগীকে সহরের মধ্যস্থান দিয়া ঐ বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে তাহা বিশেষ আপত্তিজনক। একখানা মাচার উপর মশারী খাটাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে বটে। কিন্তু সে মশারী খানির নানা স্থানে ছিন্ন। উহা দ্বারা রোগীর শরীর হইতে বিষ লইয়া মশক, মাছি প্রভৃতি অনায়াসে যে কোন পথিকের শরীরের উপর পড়িতে পারে।

এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্র এখনও এরূপ উদারতা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তার সাক্ষী—

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অধীনস্থ ডাক্তারখানাসমূহের কোন ডাক্তার ছুটী লইলে তাহাকে রিলিফ করিবার জন্য একজন মুসলমান ডাক্তার ব্যতীত হিন্দু ডাক্তার নাই এবং অনেক হিন্দু প্রধান স্থানে মুসলমান ডাক্তার প্রেরণের বিরুদ্ধে অনেক মহাল হইতে বিশেষ আপত্তি হইতে পারে।

তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সোসাইটী চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, এবং এত অল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ করিতেছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান সকল ধারণা উল্টাইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি, একদল সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এবং উৎসাহী বৈজ্ঞানিক হেড কোয়ার্টারে থাকিয়া অত্যন্ত যত্ন সহকারে কাজ করিতেছেন। এই সকল লোকে এত উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, কাজ করিতে করিতে তাঁহারা হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন; তথাপি তাঁহারা অদম্য উৎসাহে কাজ করিয়া পরিণামে, যে সকল সমস্যা খুব প্রসিদ্ধ ও বড় লোকদের বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে সেই স্বাস্থ্য ও রিলিফ সংক্রান্ত সকল জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সেণ্ট্রাল সোসাইটীর সদস্যগণ পৃথিবীতে নূতন নূতন কল্পনা এমন উন্নত ধরণে এবং এত বেশী প্রচার করিতে থাকিবেন যে, ভারতীয়—ইয়োরোপীয় এবং দেশীয়—চিকিৎসকগণের এবং বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীগণের নাম জগতের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ইতিহাসে সম্মানিত নাম বলিয়া গণ্য হইবে। আমি আমার সম্মুখে আরও দেখিতেছি, লোক সকল সর্ব্বসাধারণের শত্রু ম্যালেরিয়ার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথম সম্মিলিত হইয়া,—একতা, এবং সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার সুবিধা উপলব্ধি করিতেছে, এবং জাতীয় উন্নতিমূলক অন্যান্য কার্য্যে ও শিক্ষায় সম্পূর্ণ সুফল অনুভব করিতেছে। আমি দেখিতেছি বঙ্গদেশ সেই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়া কৃষি বিভাগেও উন্নতি করিতে আরম্ভ করিতেছে —এখন যেখানে একটী মাত্র শস্যের চাষ হইতেছে সেখানে বৎসরে দুই প্রকার শস্যের চাষ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, ধনজনে সমৃদ্ধ, বলশালী, একতাসম্পন্ন বঙ্গদেশ অতঃপর আর্থিক, স্বাস্থ্যনীতিক এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন সমূহের সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, গুজরাট, খান্দেশ ও বেরারে তূলার গাঁট বাঁধিবার যতগুলা কল আছে, একমাত্র বঙ্গদেশে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক পাটের গাঁট বাঁধিবার কল সংস্থাপিত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, বঙ্গদেশ জল নিকাশ সমস্যার সমাধান করিয়াছে, জলপথ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে যাহা অচিন্তনীয় এমন ভাবে শনৈঃ শনৈঃ শিল্পোন্নতি সাধন করিতেছে। তারপর, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে আমি দেখিতেছি, বঙ্গদেশের গ্রামের লোকের সংখ্যা ৫০০, এখন প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে; যে গ্রামের লোক সংখ্যা ২০০০ এমন প্রত্যেক গ্রামে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আর প্রত্যেক বিভাগে এক একটী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং সেই ডিভিসনের লোকেরা ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ করিয়া লোক সমাজে শিক্ষার বিস্তৃতি এবং সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছে। সংক্ষেপে বঙ্গদেশের অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, বঙ্গদেশ নিজের প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য নিজেরাই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে, নিজেরাই নিজেদের সকল অভাব মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই দেশ এখন সঙ্ঘ স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সেই সঙ্ঘ তাহার বিভিন্ন অংশকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়াছে যে, সকল অংশই অপর অংশগুলির প্রয়োজন ও অভাব পূরণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। আমি এইখানেই যবনিকা পাত করিব, কারণ, ইহা আপাততঃ স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু ইহা স্বপ্ন হইলেও, ইহাকে বাস্তবে পরিণতঃ করা আপনাদের সাধ্যায়ত্ত।

পল্লী-স্বাস্থ্য।

আমাদের মফস্বলের সংবাদপত্রগুলি দেশের দর্পণ স্বরূপ। "God made the country, man made the town." ঈশ্বর দেশ (অর্থাৎ পল্লীগ্রাম) সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মানুষ গড়িয়াছে নগর। পল্লীভূমি প্রকৃতির লীলা নিকেতন; নগর কৃত্রিমতার, বিলাসিতার রঙ্গভূমি। নগরবাসী অধিকাংশ লোকই নগরে প্রবাসী মাত্র; দেশের প্রকৃত অধিবাসীরা পল্লীবাসী। সুতরাং পল্লীগ্রামই প্রকৃতপক্ষে দেশ। সেই পল্লীভূমির পরিচয় মফস্বলের সংবাদপত্র হইতেই যা কিছু পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা কখন কিরূপ থাকে, স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক পাঠিকাগণের তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক; এবং তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যকও বটে। মফস্বলের সংবাদপত্রগুলি হইতে, আমরা দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থার যতটুকু পরিচয় পাইব, তাহা প্রতি মাসেই স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইয়া রখিবার চেষ্টা করিব। কখন কোন্ স্থানের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ থাকে, কখন কোথায় কি কারণে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তৃতি ঘটে, কখন কোথায় কাহার কিরূপ চেষ্টায় স্বাস্থ্যোন্নতি সাধিত হয়, তাহা যে কোন মাসের স্বাস্থ্য-সমাচার খুলিলেই পাঠকেরা যাহাতে জানিতে পারেন, আমরা যথাসাধ্য তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। মোটের উপর, স্বাস্থ্য-সমাচারে দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা নখ-দর্পণ স্বরূপ বিরাজ করে ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। তবে ইহাতে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইব তাহা শ্রীভগবানই বলিতে পারেন।

সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া স্বাস্থ্য-সমাচারের প্রচার। আমাদের এই নূতন উদ্যমে স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক-পাঠিকাগণের কিছু সুবিধা হইতে পারিবে এইরূপ আশা করি। কারণ, স্বাস্থ্য-সমাচারের সহায়তায় এক স্থানের পাঠকেরা স্বচ্ছন্দে অন্য স্থানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবাদ সহজেই অবগত হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। কোন না কোন রোগ কোন না কোন সময়ে কোন না কোন স্থানে প্রবল ভাবে বর্ত্তমান আছেই আছে। অন্যান্য কারণেও দেশের অবস্থা সর্ব্বদা না হউক অধিকাংশ সময়েই খারাপ থাকে।

এ বৎসর কলিকাতায় বসন্তরোগের কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। মফস্বলেও ইহার প্রভাব বড় অল্প নহে। খুলনা জেলার সাপ্তাহিক "খুলনা" খুলনা সহরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ দিতেছেন,—

সদর মিউনিসিপালিটী হইতে বসন্তরোগীর ওয়ার্ড স্বরূপ ব্যবহার জন্য সহরের পশ্চিমাংশে যশোহর রোডের উপর একটী পাকা বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। এ বৎসর সর্ব্বত্রই বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। শিশুদের মধ্যে হাম রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

কিন্তু এ সুখ নিরবচ্ছিন্ন নহে; কারণ, পরের সপ্তাহেই "খুলনা" লিখিতেছেন,—

কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ ভাবে উক্ত রোগাক্রান্ত কয়েকটি রোগীকে সহরের মধ্যস্থান দিয়া ঐ বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে তাহা বিশেষ আপত্তিজনক। একখানা মাচার উপর মশারী খাটাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে বটে। কিন্তু সে মশারী খানির নানা স্থানে ছিন্ন। উহা দ্বারা রোগীর শরীর হইতে বিষ লইয়া মশক, মাছি প্রভৃতি অনায়াসে যে কোন পথিকের শরীরের উপর পড়িতে পারে।

এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্র এখনও এরূপ উদারতা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তার সাক্ষী—

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের অধীনস্থ ডাক্তারখানাসমূহের কোন ডাক্তার ছুটী লইলে তাহাকে রিলিফ করিবার জন্য একজন মুসলমান ডাক্তার ব্যতীত হিন্দু ডাক্তার নাই এবং অনেক হিন্দু প্রধান স্থানে মুসলমান ডাক্তার প্রেরণের বিরুদ্ধে অনেক মহাল হইতে বিশেষ আপত্তি হইতে পারে।

সেনহাটী ডিসপেনসারির হিন্দু ডাক্তার দুই মাসের ছুটির প্রার্থনা করিলে উহা মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও তিনি যাইতে পারিলেন না। যেহেতু মুসলমান রিলিফিং ডাক্তারকে প্রেরণের হুকুম হওয়া মাত্র গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে উক্ত ডিসপেনসারির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন মহাশয় আপত্তি জানাইলেন।—'খুলনা'।

তবে হিন্দু প্রধান গ্রামে মুসলমান ডাক্তারের সম্বন্ধে একটা ন্যায়সঙ্গত আপত্তি থাকা অসম্ভব নহে। হিন্দু পুরুষদের পক্ষে মুসলমান ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে আপত্তি করা উচিত না হইলেও, যদি হিন্দু পুরাঙ্গনাদের দিক হইতে আপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত বলিয়া মানিতেই হইবে।

কেবল খুলনায় নহে অন্যান্য স্থানেও বসন্ত রোগ দেখা দিতেছে। মেদিনীপুর—কাঁথির "নীহার" সংবাদ দিতেছেন,—

বসন্তের প্রাদুর্ভাব—এতদঞ্চলের সহর ও মফস্বলে বহুস্থানে বসন্তের প্রাদুর্ভাব ক্রমেই সংক্রামিত হইতেছে। অনেকে উহাতে আক্রান্ত হইতেছে।

এবং সকলকে টিকা লইবার পরামর্শ দিতেছেন।

সংক্রামক ব্যাধিতে সময়ে সময়ে অনেক লোক মারা পড়ে। কিন্তু সকল স্থলে এই লোকক্ষয়ের জন্য রোগকে দায়ী করা ঠিক নহে। অনেক স্থলেই এরূপ মৃত্যু আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। একটু চেষ্টা করিলে, পূর্ব্বাহ্নে একটু সাবধান হইলে যেখানে সংক্রামক রোগ নিবারণ করা যায়, সেখানে ঐ সতর্কতার অভাবে যদি লোক মরে, তবে তাহাকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কি বলিতে পারি? একটা দৃষ্টান্ত দেখুন,—

গঙ্গাসাগর মেলা—গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থ সাগর দ্বীপে এবার পৌষ সংক্রান্তির মেলা সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই জানুয়ারী এই তিন দিন তথায় মেলা বসিয়াছিল। মেলা স্থলে এবার ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির তেমন প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় নাই। জন কয়েক মাত্র ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের এবং কাঁথি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কতকগুলি সেবক মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া পীড়িত ও আর্ত্ত ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গত বৎসর মেলায় ওলাউঠার ভীষণ আক্রমণে যাত্রীদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। এবার মেলায় যাহাতে কাহারও কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য সহৃদয় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ও স্যানিটারী কমিশনার, সিভিল সার্জ্জন ও ডিষ্ট্রি[ক্ট] ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণের পরামর্শ মতে ২৪ পরগণা জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক সর্ব্ববিষয়ের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মেলায় স্বাস্থ্য, শান্তি ও শৃঙ্খলাদি রক্ষার জন্য তথায় অস্থায়ী ভাবে হাসপাতাল, থানা, বিচারালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং যাত্রী সাধারণের সুবিধার জন্য শৌচাগার, রিজার্ভ পুষ্করিণী প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল। খাদ্য-পরিদর্শক উপস্থিত থাকিয়া মেলায় পচা অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিয়াছিলেন।

আমরা অবগত হইলাম, এ বৎসর মেলায় এই সকল সুব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০০৲ টাকার স্থলে ১৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল এবং এই অতিরিক্ত ব্যয় ভার বহনের জন্য যাত্রী ও দোকানদারগণের নিকট হইতে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণ মাশুল আদায় করা হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে ৵০ আনা করিয়া কর লওয়া হইত, এ বৎসর তৎস্থলে যাত্রী প্রতি ।০ আনা করিয়া কর লওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক দোকানদারের নিকট হইতেও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণ কর আদায় করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর মেলায় যাত্রী সংখ্যা অনেক কম হইয়াছিল। শেষ দিন মেলা হইতে সকলকে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। মেলায় এবার কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। অতি পূর্ব্বে এই মেলায় যাত্রী প্রতি দুই পয়সা করিয়া কর লওয়া হইত, এখন ক্রমে বাড়িয়া উহা ।০ আনা দাঁড়াইল। এবার এই চারি আনা করিয়া কর দিতে গরীব দুঃখী যাত্রীদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল।—নীহার (কাঁথি)।

কিন্তু এ কষ্ট নগন্য, এ জন্য দুঃখ করা উচিত নহে। অর্থাভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে যত লোক মরিতে পারিত, সে ক্ষতির সহিত তুলনায় এই চারি আনা কি তেমন বেশী বলা যায়?

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ কাঁথির সহযোগী "নীহার" "দেশের অভাব অভিযোগ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দিয়াছেন,—

অন্নবস্ত্রের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগের প্রকোপ প্রবলতর বাড়িতেছে। মেদিনীপুর জেলায় ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠায় যত লোকক্ষয় হয়, এমন আর কোন রোগে হয় না। তার উপর বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা ত আছেই। পল্লীগ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে অধিকাংশ লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড অনেক সময় ডাক্তার প্রেরণ করিয়া থাকেন, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা নিতান্ত কম। উপযুক্ত পথ্যের অভাব—উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব—এ দেশের অধিবাসীগণকে অকালে মৃত্যুমুখে আনয়ন করে। পল্লীস্বাস্থ্যের দুরবস্থা ত আছেই। এবার সর্ব্বত্র ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইবে। তাহাতে পল্লী-স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া খুব সম্ভব। তাহা হইলেও প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন করিয়া চিকিৎসক ও একটী ঔষধালয় থাকা খুব প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে ও সাধারণের সহায়তায় যাহাতে ইহার ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয় প্রাদেশিক সমিতি মনোযোগী হইবেন আশা করি।

সহযোগী মেদিনীপুর জেলার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বঙ্গের সমস্ত জেলার না হউক, অধিকাংশ জেলার অবস্থা এইরূপ। হাঁড়ির একটি ভাত টিপিলেই সমস্ত ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা জানা যায়। এই এক মেদিনীপুর জেলার স্বাস্থ্যের বিবরণ হইতে, অন্যান্য জেলারও স্বাস্থ্যের অবস্থা জানা গেল।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে মেডিক্যাল ও স্যানিটেসন সব-কমিটি মন্দ কাজ করিতেছেন না। হুগলীর জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে—

১। মেডিক্যাল ও স্যানিটেশন সাব-কমিটি কর্ত্তৃক প্রত্যেকের ২৫ টাকা মাহিনা হিসাবে এই জেলার গ্রামসমূহে চিকিৎসার জন্য ১৫ জন 'রেজিষ্টার্ড' ডাক্তার নিযুক্ত হইবে। আরামবাগের অন্তর্গত মালয়পুর, মায়াপুর, বনগাঁই এবং সদরের ধনিয়াথালি ও মহীপারপুরে ৫ জন নিযুক্ত হইয়াছে; আরও দশ জনের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

২। আরামবাগ সাব-ডিভিসনাল অফিসারকে জানান হইয়াছে যে গোঘাট থানায় কামারপুর গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় কল্পে অন্ততঃ ২৫০০০ টাকা চাঁদা তুলিতে হইবে। ঐ নব প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয়ের ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, চাকর প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য একটী পাকা বাড়ী তৈয়ার করিতে হইবে, এবং তাহাতে বার্ষিক খরচ হইবে প্রায় ২০০০ টাকা। তজ্জন্য এই টাকা প্রয়োজন।

৩। বিলদোরা চিকিৎসালয়ের আবেদন অনুযায়ী টেবিল, আলমারি প্রভৃতি আসবাব তাহাতে দেওয়া হইবে।—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

জেলা বোর্ডের ন্যায় মিউনিসিপ্যালিটিও কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন নহেন—

বসন্ত—চুঁচুড়া সহরে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডভুক্ত চৌমাথা ও মাধবীতলা অঞ্চলে কয়েক দিবস যাবৎ বসন্ত রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব

হইয়াছে, তাহাতে অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারীগণের কার্য্যকারিতা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য।

বসন্ত রোগ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সহযোগী ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী লিখিয়াছেন,—

বসন্তের প্রকোপ।—ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার বহু স্থান হইতে আমরা বসন্তের প্রকোপ সংবাদ পাইয়াছি। সাবধান! উচ্ছে বসন্তের প্রতিষেধক, এবং মায়ের কৃপা এই রোগের একমাত্র মহৌষধ

সাধারণের জন্য কেহ কোন অনুষ্ঠান করিলে মনে বড় আনন্দ হয়, এবং সে আনন্দ একা ভোগ করিতে ইচ্ছা হয় না। সহযোগী হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন,—

রাজসাহী টাউনে কয়েক বৎসর হইল সাধারণের চাঁদায় একটি আদর্শ গোশালা স্থাপিত হইয়াছে। সহরের রেশমপটির রেশম ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী মহাজন শ্রীযুক্ত নগেন দাস ফুলচাঁদ বাবু এক কালিন ৫১২৲ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন এবং মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে এ পর্য্যন্ত সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি গোশালার গরুর খোরাকি আউড় খরিদ করিবার জন্য ১০০৲ টাকা, খইল খরিদ করিবার জন্য ৩০৲ টাকা এক কালীন দিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে শিশুদিগের খাদ্যের যেরূপ অভাব তাহাতে, শিশুদিগের খাদ্য সংস্থানের জন্য গোজাতির যিনি উন্নতির চেষ্টা করিবেন, তিনি যিনিই হউন না কেন, আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু যে সংখ্যা হিন্দু রঞ্জিকা হইতে উপরের সংবাদটি সংকলিত হইল, সেই সংখ্যাতেই একটী দুঃখের সংবাদ আছে;—

গোদাগাড়ীর মদের ডিপো হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ৩০৯৮ ইংরাজী গ্যালন দেশী মদ বিক্রয় হইয়াছে।

ঐ সপ্তাহের হিন্দুরঞ্জিকায় রাজসাহী জেলার জন্ম মৃত্যু ও লোক-সংখ্যা এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা এইরূপ ছিল,—

গত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সদর ব্যতীত মফস্বল পল্লীতে সর্ব্বসমেত লোক সংখ্যা ১৪৫৭১৮১ জন, তন্মধ্যে ৭৪২১৪৯ পুরুষ ৭১৫০৩২ জন স্ত্রীলোক। এবং ৩২৬৭ জনের জন্ম রেজিষ্টার্ড হইয়াছে, ১৭৪০ জনের জন্ম রেজিষ্টার্ড হয় নাই। তন্মধ্যে ৩৬ জন কলেরায় ৩২ জন বসন্ত রোগে ৩৫০৫ জন জ্বরে ৪ জন আমাশয়ে ৭ জন শ্বাসবদ্ধে মারা গিয়াছে ১১৭ জন আত্মহত্যা করিয়াছে ৩৬২ জন অন্যান্য কারণে মরিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৪০৫৪ মারা গিয়াছে; তন্মধ্যে ২০৫৩ পুরুষ ২০০১ জন স্ত্রী। গত বৎসর ৪০৩৯ জন মারা গিয়াছিল; তন্মধ্যে ২১৭১ জন পুরুষ ১৮৬৮ জন স্ত্রীলোক ছিল।

বসন্তরোগ এবার কোথায় না আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? রামপুরহাটের সহযোগী "রাঢ়-দীপিকা" লিখিতেছেন,—

রামপুরহাট সহরে বসন্ত রোগের বিস্তার যাহাতে না হয় তজ্জন্য রামপুরহাট ইউনিয়ান কমিটী সুবন্দোবস্ত করিতেছেন। হানিজনক খাদ্য দ্রব্য মৎস্য মাংস দুধ যাহাতে বিক্রয় না হয় তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

কেবল বসন্ত নয়, ওলাউঠা রোগও এই সময় মফস্বলের নানা স্থানে প্রবল ভাবে প্রকট হইয়া থাকে। কাঁথির সহযোগী "নীহার" সংবাদ দিতেছেন,—

ওলাউঠার ব্যাপকতা—কাঁথি মহকুমার অনেক স্থলে কিছুদিন হইল ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এখনও উহার বিরাম হয় নাই। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এ ব্যাধি সংক্রামিত হইতেছে। কাঁথি, বাহিরী, খেজুরী, হেঁড়্যা, ভগবানপুর, বাসুদেব ও রামনগর থানার অনেক পল্লীতে এই ব্যাধিতে অনেকের মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পল্লীগ্রামে চিকিৎসকের একান্ত অভাব। মেদিনীপুর জেলাবোর্ড এখন মফঃস্বলে ওলাউঠা রোগীদের চিকিৎসার জন্য দুই একজন ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ওলাউঠার যেরূপ ব্যাপক ভাবে প্রাদুর্ভাব চলিয়াছে, তাহাতে এখন দরিদ্র পল্লীবাসীদের চিকিৎসার জন্য আরও দুই চারি জন চিকিৎসক প্রেরণ করা একান্ত আবশ্যক।

ইহার উপর বসন্ত ত আছেই। তাহা ছাড়া ইন-ফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব কিরূপ তাহাও দেখুন,—

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও বসন্ত—কেবল এক এই ওলাউঠা নহে, বসন্তও অনেক স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে উহাতে লোকে মারা যাইতেছে। খেজুরী ও রামনগর থানার অনেক পল্লীতে বসন্তের খুব প্রাদুর্ভাব চলিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার ভীষণ আক্রমণে একবার এগরা, পটাশপুর ও ভগবানপুর অঞ্চলের বহু লোকে মারা গিয়াছে। অন্যান্য স্থলের মৃত্যু সংখ্যাও কম নহে। এখনও অনেক স্থলে লোকে উহাতে আক্রান্ত হইতেছে এবং মারাও যাইতেছে। একে ত অভাবের দারুণ পীড়নে দরিদ্র পল্লীবাসীরা জর্জ্জরিত, তার পর এই সংক্রামক ব্যাধি-পীড়নে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে।

কাঁথির ত এই অবস্থা। বিক্রমপুরেও এই তিন ব্যাধি এক সঙ্গে একই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া তত্রত্য লোকদিগকে নিজেদের বিক্রমপুরে কি ভাবে পাঠাইতেছে তাহাও দেখাইয়া দিতেছি। সহযোগী "ঢাকাপ্রকাশ" লিখিয়াছেন,—

বিক্রমপুরে বসন্তের প্রকোপ—

বিক্রমপুরের সংবাদে প্রকাশ লৌহজঙ্গে ও শ্রীনগর থানার অনেক গ্রামেই বসন্তের ভীষণ প্রকোপ পরিলক্ষিত হইতেছে। বিগত ৭ই আশ্বিনের ঝড়ের সময় হইতে এই দুই থানার উপর বিধাতা যেন বিরূপ হইয়াছেন। গত দুই বৎসরের দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন বহু লোক অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে দিন যাপন করিতেছে; তাহার উপর ৭ই আশ্বিনের ঝড়ে অনেকেরই মাথা রাখিবার স্থান নাই, তার পর আশ্বিনের শেষ ভাগ হইতে ঐ দুই থানার বিভিন্ন গ্রামে ওলাউঠা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। সম্প্রতি আবার 'বসন্ত' রোগ দেখা দিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় ঢাকা-জিলা-বোর্ড এ সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়াও ঐ দুই থানার জন্য কোনই প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছেন না।

মফস্বলের যে কোন সংবাদপত্রের যে কোন সংখ্যা খুলিতেছি, তাহাতেই দেখিতেছি, স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রীতিকর নহে। "ত্রিপুরা হিতৈষীর" নীলামী ইস্তাহার হিমালয় ঠেলিয়া কোন রকমে সংবাদ-স্তম্ভে পৌছিয়াছে দেখিলাম,—

আবহাওয়া—সহরে কয়েকদিন পূর্ব্বে যে ভীষণ কলেরা দিয়াছিল তাহার প্রকোপ অনেকটা কমিয়াছে। সহরের চতুর্দ্দিকে কোন কোন স্থানে নাকি বসন্তরোগ দেখা দিয়াছে। এখন পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

সহরের স্বাস্থ্য।

মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মত চারিদিকের অবস্থার কঁর অবস্থার মধ্যেও একটু আধটু স্বাস্থ্যের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। রামপুরহাটের "রাঢ় দীপিকা" হইতে সঙ্কলিত নিম্নলিখিত সংবাদটি সেইরূপ একটী ওয়েসিস—

রামপুরহাটের স্বাস্থ্য আজ কয়েক মাস হইতে মন্দ নয়। জ্বর জ্বালা মধ্যে মধ্যে হইতেছে; তবে তত বেশী নহে। এক মাত্র শিশু বসন্তরোগে মারা যাওয়ার পর আর কোন বসন্তরোগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শীতে স্বাস্থ্য-রক্ষা।

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।

শীতকাল স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্যান্য কাল অপেক্ষা অতি উত্তম। বিশেষতঃ শ্রমজীবীর পক্ষে বড়ই সুখের কাল। বিশ্বরাজ্য পালন জন্য প্রকৃতিদেবীর যখন যে ভাবে যে অবস্থা ধারণ করা আবশ্যক, বিশ্বপতি তাহার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীস্থ প্রাণীপুঞ্জের ও উদ্ভিদাদির বর্দ্ধন ও রক্ষণ জন্য গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতির সহিত পৃথিবীর গতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, জল, বায়ু ও তাপের পরিমাণ ষড় ঋতুতে বিভাগ করিয়া, যখন যেটীর যে ভাবে প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া নিয়ত প্রাণী-গণের স্বাস্থ্য-সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আমরা অন্ধ জীব, করুণাময়ের এ করুণা অনুভব করিতে না পারিয়া, প্রকৃতি দত্ত ব্যবস্থা পালন ও রক্ষণ না করিয়া, স্বাস্থ্য-সুখ হারাইয়া ক্রমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। হায়! কত দিনে আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হইবে, কত দিনে আমরা আমাদের অমূল্য স্বাস্থ্য-ধন রক্ষার জন্য বিধি-ব্যবস্থা পালন করিতে শিখিয়া আমাদের নষ্ট স্বাস্থ্য-সুখ পুনরুদ্ধার করিব?

শীতকালের বায়ু অধিক শীতল, এ জন্য আয়তনে কম। গ্রীষ্মকালে, যে পরিমাণ বায়ু যে পরিমাণ স্থানে অবস্থান করে, শীতকালে বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া সেই পরিমাণ স্থানে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক থাকে। এ জন্য গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালের বায়ুতে অম্লজান অধিক থাকে। এই অম্লজানাধিক্য জন্যই গ্রীষ্মকালের বায়ু অপেক্ষা শীতকালের বায়ু ভারি। শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প অত্যন্ত কম, এ জন্য শীতকালের বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক।

শীতকালের বায়ুতে অধিক অম্লজান থাকাতে শীতকালে দেহের তাপ শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হয়। সে জন্য আমরা শীত বোধ করি। এবং এই জন্যই দেহের তাপ রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় বলিয়া, প্রাকৃতিক নিয়মে এই সময়ে ক্ষুধা অধিক হয় ও পরিপাক ভাল হয়। সেই জন্যই শীতকালে খাদ্য ও বস্ত্রের অধিক প্রয়োজন হয়।

শীতকালে বায়ুর শীতলতা হেতু গাত্রচর্ম্ম শীতে সঙ্কুচিত হয়, চর্ম্মের দিকে রক্তের চলাচল কম হয়। সে জন্য চর্ম্মের ক্রিয়াও অল্প হয়। এবং ঘর্ম্ম না হওয়ায়, রক্ত ভালরূপ পরিষ্কার হইতে পারে না। শরীরস্থ অধিক রক্ত যকৃৎ, প্লীহা, মস্তিষ্ক, অন্ত্র, পাকস্থলী, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতিতে সঞ্চিত হয়। চর্ম্ম ভালরূপে কার্য্য করিতে না পারায়, যকৃত, শ্বাসযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রকে চর্ম্মের কার্য্যের হানি জন্য, অধিক কার্য্য করিতে হয়, এ জন্য তাহারাও সহজে দুর্ব্বল ও পীড়িত হয়। তজ্জন্যই শীতকালে, সর্দ্দি, কাশী, পেটের পীড়া, ও প্রস্রাবাধিক্য হয়। এবং চর্ম্মের ক্রিয়া সুচারুরূপে না হওয়ায় চর্ম্মরোগ পাচড়া ও চুলকনা প্রভৃতি রোগ জন্মে। জিহ্বা, ওষ্ঠ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে ঘা হয়। এই সকল কারণেই শীতকালে বৃদ্ধ ও পুরাতন রোগে পীড়িত ও বালকের অধিক মৃত্যু হয়।

এই সময়ে সকল স্থানের জল বিশেষতঃ কূপ জল অত্যধিক শীতল হয় এবং সেই জল ব্যবহার করিয়া অনেকে হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। শীতকালে কূপের জল গরম। কারণ বায়ুর শৈত্য অত নিম্নে সম্যকরূপে প্রবাহিত হইতে পারে না। কূপের জল উঠাইলেই গরম বোধ হয়; কিন্তু কিছুক্ষণ বাহিরে রাখিলেই অধিক শীতল হইয়া থাকে। শীতকালে হঠাৎ ঠাণ্ডা জল ব্যবহার দ্বারা অনেক অনিষ্ট হয়। মুখগহ্বর সর্ব্বদাই গরম থাকে, সে জন্য হঠাৎ ঠাণ্ডা জল মুখে দিলে, দন্ত শিরা পীড়িত হইয়া দাঁত কনকন করে। এতদ্ব্যতীত ঠাণ্ডা জলে হঠাৎ অবগাহন করিলে, সর্দ্দী, কাশী, জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়া জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প অত্যন্ত কম থাকে, এজন্য শীতকালের বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক। বায়ুর স্থির ভাবে থাকা অপেক্ষা, প্রবাহিত থাকা অবস্থায় শুষ্ককারিতা গুণ অধিক প্রকাশ পায়; এজন্য যাহারা এই কালে প্রবাহিত বায়ুতে অধিকক্ষণ অবস্থান করে তাহাদের অনাবৃত দেহের অংশ সকল শুষ্ক হইয়া যায়। মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠই সর্ব্বদা অনাবৃত থাকে,—এ জন্য ঐ সকল স্থানে হঠাৎ শুষ্ক বায়ু লাগাতে ফাটিয়া যায়।

বায়ু যত শীতল হয় ততই উহার জলীয় ভাগ শিশির হইয়া পতিত হয় এবং ততই উহা জলীয় বাষ্প ধারণে অক্ষম হওয়াতে অধিক শুষ্ক হয়; এজন্য রাত্রি ও প্রাতে বায়ু অধিক শুষ্ক হয়। ঐ সময় প্রবাহিত বায়ুতে অবস্থান করিলে, মুখ-মণ্ডল, চর্ম্ম ও ওষ্ঠ ফাটিয়া যায়।

চর্ম্মে ক্লেদ সঞ্চিত হইলে, উহার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়; সুতরাং ঐ সকল চর্ম্ম সহজে ফাটিয়া যায়। যে যে স্থানের চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা কম, যথা—পদতল, করতল, ও ওষ্ঠ, সেই সকল স্থান শুষ্ক হইলে যথাবশ্যক সঙ্কুচিত হইতে পারে না। এজন্য অনাবৃত ও অপরিষ্কার থাকিলে সহজে ফাটিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, কোন কোন ব্যক্তির ঐ সকল স্থানের স্থিতিস্থাপকতা কম বলিয়া তাহাদের ঐ সকল স্থান অধিক ফাটে।

শীতকালে যাহাদের গাত্রবস্ত্র ও ডাল খাদ্যের সংস্থান নাই, তাহাদের পক্ষে এই কাল বড়ই কষ্টজনক। কিন্তু ঐরূপ দরিদ্র সকলকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন। শরীরাভ্যন্তরেও সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়া রাখিয়াছেন। বাহ্যিক অগ্নি যেমন ইন্ধন দিয়া নাড়িয়া দিলে জ্বলিয়া থাকে, আভ্যন্তরিক অগ্নিও খাদ্যরূপ ইন্ধন ও পরিশ্রমরূপ নাড়াচাড়ায় জ্বলিয়া দেহের তাপ উৎপাদন করিয়া শীতে দেহরক্ষা করিয়া থাকে। শীতকালে যাঁহারা পরিমিত শ্রম করেন তাঁহাদের শীত অত্যন্ত কম হয়। সেই-জন্যই দরিদ্র শ্রমজীবী গরম বস্ত্র ব্যতীত ও অল্প বস্ত্রে রাত্রে সুখে নিদ্রা যায়। শীতে চর্ম্ম সঙ্কুচিত হয়; এই জন্য চর্ম্মের দিকে রক্ত চলাচল কম হয়। কিন্তু পরিশ্রম করিলে, চর্ম্মের দিকে রক্ত চলাচল অধিক হয় বলিয়া, চর্ম্মের সঙ্কোচন কম হইয়া শীত কম হয়। সুতরাং কি ধনী কি দরিদ্র প্রত্যেকেই শীতকালে যথাসাধ্য ও পরিমিত-শারীরিক পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

শরীরে তৈল মর্দ্দন শীত নিবারণের অন্য এক উপায়। তৈলদ্বারা শরীরের চর্ম্ম সকল বায়ুর আর্দ্রতার জন্য সহজে শুষ্ক হইতে পারে না। চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা গুণ বৃদ্ধি হয়; সেজন্য সহজে শীত বোধ হয় না। সেজন্য শীতকালে সর্ব্ব শরীরে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য।

দেহে উত্তাপ উৎপাদনের প্রধান বস্তু খাদ্য। যে সকল খাদ্যের দ্বারা দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় শীতকালে সেই সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চাউল, গম, এরারুট প্রভৃতি খাদ্যের শ্বেতসার পাক রসের সহিত মিলিত হইয়া চিনি প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত চিনি, গুড়, মধু প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য আহারে দেহের তাপ উৎপাদন করে। এজন্য ঐ সকল দ্রব্য শীতকালের উপযোগী খাদ্য। এই সকল খাদ্য ব্যতীত তৈলাক্ত খাদ্য, তৈল, ঘৃত, মেদ প্রভৃতির খাদ্য, দেহের যেরূপ তাপ উৎপাদন কার্য্যে উপযোগী, অন্য কোন খাদ্যই তদ্রূপ নহে। শীতকালে ঐ জাতীয় খাদ্য অধিক আহার করিলে, শীত কম হয় ও সহজে সর্দ্দি কাশী প্রভৃতি হইতে পারে না। এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের বীজ সহজে দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না; এবং হইলেও তৈলাক্ত খাদ্যে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই কডলিভার অয়েল ও নারিকেল তৈল প্রভৃতি তৈলাক্ত ঔষধ ঐ রোগের উত্তম ঔষধ।

বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও পীড়িত ব্যক্তির তাপ উৎপাদন ক্রিয়া অত্যন্ত কম এবং তাহারা তৈলাক্ত পদার্থ ও শ্বেতসার ঘটিত খাদ্য সহজে পরিপাক করিতে সক্ষম নহে। সেজন্য শীতকালে উহাদের জন্য বলকারক লঘুপাক পথ্য ও পর্য্যাপ্ত শীতবস্ত্র প্রয়োজন। নতুবা ঐ সকল ব্যক্তি শীত ভোগ করিলে নিশ্চয়ই পীড়িত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যাহার যেরূপ ক্ষমতা তিনি সেইরূপ বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। কাপড়, কম্বল, তুলা, লেপ, কাঁথা, ফ্লানেল, কাশ্মীরি বনাত, বালাপোষ, তুলা-ভরা পিরান শীতকালের উপযোগী বস্ত্র।

শীতকালের রাত্রে কি প্রাতে কদাচ শীত ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। আলগা গায়ে ঐ সকল সময় কদাচ বাহির হওয়া উচিত নহে। ইহাতে অজ্ঞাতসারে সাংঘাতিক পীড়ার বীজ দেহের মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে।

অত্যন্ত শীতল জল হঠাৎ দাঁতে লাগান ও শীতল জলে অবগাহন করা নিতান্ত অন্যায়। ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা মুখ ধৌত ও স্নান করা কর্ত্তব্য। ভাল কূপজল এ সময় উপযোগী।

শীতকালে মদ্যপান করা একেবারেই উচিত নহে। মদ্যে শরীর কদাচ উষ্ণ হয় না বরং রক্ত শীতল করিয়া অপকার দর্শায়।

শীতকালে যে সকল স্থান সহজে ফাটিয়া যায় ঐ সকল স্থান আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। এবং প্রবাহিত বায়ুতে আলগা গায়ে কদাচ গমন করিবে না। সর্ব্ব শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। ফাটা স্থানে ঘৃত, মাখন, মোম, তিল ও নারিকেল তৈল গ্লিসারিণ প্রভৃতি অবস্থা মত লাগাইলে ভাল থাকে।

হিন্দুস্থানী মতে বসন্ত-চিকিৎসা।

লেখক—ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্য বিনোদ।

জীবজীবনের প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের বা স্বাস্থ্য-বিপ্লবতার নাম ব্যাধি। এই ব্যাধি দুই প্রকার। শারীরিক আর মানসিক। এই উভয় প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাপেক্ষ্য। একের উন্নতি অবনতিতে অপরের উন্নতি অবনতি সূচিত হয়। মনের অসুখে শরীর পীড়িত হয়; আবার শরীর পীড়িত হইলে মন পীড়িত হয়। এই মহাসত্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসঙ্গত। তবে আপাততঃ সাধারণ হিসাবে শারীরিক অসুস্থতাই ব্যাধি সংজ্ঞায় অভিহিত।

দেশীয় বিদেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি শারীরিক ব্যাধি বিনাশেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানসিক ব্যাধি-আরোগ্যকর নিয়ম বা পদ্ধতি চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচ্য হইলেও, সাধারণতঃ শরীর রক্ষার উপযোগী ব্যাধি নিবারণ এবং ব্যাধির আক্রমণ নিবারণ ক্রিয়া পার্শ্চাত্য আর দেশীয় উভয় চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকাংশ আলোচিত। এই কারণে বর্ত্তমান চিকিৎসক মণ্ডলী, শরীর বিদ্যানুশীলনে আর দ্রব্য শক্তির বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় শরীর সুস্থ করিতে যে সমস্ত উপায় এবং শিক্ষার আবশ্যক, তাহাই লইয়া স্বস্বচিন্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন বা করিতেছেন।

শরীরি জীবের স্বাস্থ্য সংরক্ষা করণার্থ প্রচলিত আর অপ্রচলিত ব্যাধি নামক জীবদেহের প্রাকৃতিক বৈপরীত্য-গুলির বিনাশজনিত কার্য্যগুলিকে দূরে রাখিবার জন্য যে সমস্ত উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারই নিরাময় এবং আগন্তুক শারীরিক বিঘ্ন অনুপস্থিতির উপায় নির্দ্ধারণকে স্বাস্থ্যসংরক্ষা নামে অভিহিত করা যায়।

আবহমান কাল হইতে সভ্য অসভ্য উভয় শ্রেণীর মানব-সঙ্ঘের মধ্যে অল্পাধিক যাহা চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা বিজ্ঞানসঙ্গত হউক আর না হউক, জীব তাহাতে গতিচক্রের নিশ্চয়ই একটী সুব্যবস্থা ইহা কাহারো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সকল প্রচলিত জীবধ্বংসকারী ব্যাধি বা স্বাস্থ্য বিনাশক ব্যাধি মানব সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে আপাত দৃশ্যে কলেরা, প্লেগ, জ্বর, উপদংশ আর বসন্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই সকল ব্যাধিগুলির উৎপাত নিবারণ জন্য প্রাচ্য আর প্রতীচ্য দেশে পূর্ব্বাপর বহুবিধ দ্রব্য শক্তি এবং অন্য বিধ উপায় প্রচলিত আছে এবং হইতেছে।

ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যাহা বিজ্ঞানসঙ্গতভাবে বিধিবদ্ধ আছে তাহা ব্যতীতও এই মহাদেশের প্রদেশ বিশেষে উপরোক্ত ব্যাধিগুলির একটা সাধারণ প্রচলিত চিকিৎসা আছে। উহাকে একেবারে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কেন না যে পদ্ধতি দ্বারা ব্যাধির উপদ্রব নিবারিত হয় তাহাই বিজ্ঞান। বিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিত বিজ্ঞান এই বিজ্ঞান উড়াইতে প্রস্তুত নহে।

প্রাদেশিক চিকিৎসা প্রণালীর কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আর তাহার অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতিপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। হিন্দুস্থানী মতে বসন্ত চিকিৎসা আর মহীশূরী মহিলা "লক্ষ্মীবাইর" শিশু চিকিৎসা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই জন্য অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বঙ্গদেশে এক সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী মুহ্যমান ছিল। তখন বাঙ্গালার প্রায় পৌনে পোনর আনা লোক "পাতের কবিরাজ" দ্বারা চিকিৎসা করাইত। অর্থাৎ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য গোছের ব্যক্তিগণ কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে চিকিৎসা বিষয়ক ধারা গুলি জানিয়া একখানি সেই পুরাতন কালের তুলট কাগজে লিখিয়া রাখিয়া দিত। লিখিত পুঁথির সাহায্যে রোগ আরোগ্যকর নিয়ম দ্বারা যাহারা কার্য্য করিত, তাহাদিগকে পাতের কবিরাজ বলা হইত। আবার বহু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী নারী "পাতামুঠা বা মুষ্টিযোগ" নামধেয় প্রক্রিয়া দ্বারা সাধারণতঃ গর্ভিণী আর শিশু চিকিৎসা করিতেন। বলিতে কি, বাল্যজীবনে এমন দুই একটী প্রতিপত্তিশালী কবিরাজ দেখিয়াছি, এবং তাহা দ্বারা বহুবার চিকিৎসিত হইয়াছি যে, তিনি আদৌ জীবনে কালি কলম একত্র করেন নাই। আর এরূপ ২।১টি স্ত্রী কবিরাজ দেখিয়াছি যে, তাঁহারা উৎকট "পিউরপারল ফিবার" বা সূতিকা জ্বর এবং প্রসব জন্য ভীষণ "ফিট এবং সেপটিসিমা, শিশুর ব্যাধি পূর্ণ আরাম করিয়াছেন। তবে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে ২।৪ জন শাস্ত্রজ্ঞ অভিজ্ঞ সংস্কৃতবিদ কবিরাজও ছিলেন। কিন্তু তুলনায় তাহাও কম—বড় অল্প প্রতিপত্তিশালী।

বঙ্গের এই সময়কে সুদিন কুদিন কি বলিব তাহা অভিজ্ঞগণ বুঝিয়া লইবেন। আমার বক্তব্য এই যে তৎকালে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এত ভীষগ্‌রত্ন, কবীন্দ্র, কবিচন্দ্র, ভীষকাচার্য্য এবং নব্য এম, ডি, এম বি, ছিল না। তৎকালের আদম সুমারিতে (Census) কিন্তু বাঙ্গালার মৃত্যু সংখ্যা কম ছিল। যাঁহারা বলেন ম্যালেরিয়া বঙ্গভূমিকে উৎসন্ন করিল—তাঁহারা সত্যবাদী ব টন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা কদাচার কু-অনুকরণ, ফ্যাসান আর উৎকট বিলাসিতার দ্বারা বঙ্গদেশ ধ্বংসের পথে চলিল। দেশহিতৈষিগণ ইহা একবার অনুধাবন করিবেন। শুধু মশা মারিয়া, ডোবা খন্দক বুজাইয়া বঙ্গের মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস করা যাইবে না। কলেরা, বসন্ত কিন্তু বঙ্গে বহু দিনই আধিপত্য করিতেছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অপর প্রদেশের অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল—তথাপি পুণ্যভূমি ভারত তেত্রিশ কোটি লোকের প্রসূতি।

আমি পূর্ণ বুঝিয়াছি যে জীব-ধ্বংসকারী ব্যাধি আরোগ্য করিতে যে শক্তির এবং শিক্ষার আবশ্যকতা তাহা পূর্ব্বে বর্ত্তমান হইতে ন্যূন ছিল না। তবে যে এক কাল আর এ এক কাল। কোন সময়ে কার্য্য স্থলে আমি অযোধ্যা প্রদেশে কিছুকাল বাস করিয়াছি দেখিয়াছি তথায় বর্ত্তমান উন্নত ধরণের কি আয়ুর্ব্বেদীয় কি ডাক্তারি কোন চিকিৎসাই বিশেষ প্রচলিত হয় নাই অথচ কিন্তু এক আউধ প্রদেশেই দেড় কোটী লোকের বাস। অধিবাসীগণ সবল, সুস্থ এবং স্ফূর্ত্তিশালী। এখনও অযোধ্যায় বার্লী কাহাকে বলে তাহা কেহ জানে না। কুইনাইন, সোডা, ক্যাসটার অয়েল, সাগু ইত্যাদি বহু লোকে চিনে না। টিংচার আইডিনকে চিনচার তৈল এসিডকে তেজাব—খেজাব বলে। ব্যাধি হইলে "গোদান আর মুক্কে দাউল আর চাউল" মিশাইয়া খেচরি ব্যবহৃত হয়। ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। আবার হইলেও দুই এক মাত্রা দ্বারা আশাতীত কার্য্য হয়। প্রায়ই "কাড়া" অর্থাৎ যে কোন একটা পাচন খাইতে হইল।

শুনিয়া হয়তো বাঙ্গলার লোকে বিস্মিত হইয়া হাসিয়া উঠিবেন ডবল নিউমোনিয়া হইলে গোদান আর সরযূ স্নান করিয়া আরোগ্য হয় বা মরিয়া যায়। এই প্রদেশে বসন্ত ব্যাধির প্রকোপ অধিক। এই জন্য এই অঞ্চলে বহু হিন্দু মুসলমান দেশীয় ধরণে এই ব্যাধি চিকিৎসা করেন। রামলক্ষ্মণজী এইরূপ একজন নামজাদা বসন্ত চিকিৎসক। আর রামধারী নাম্নী একটী সরযুপায়ী ব্রাহ্মণ কুমারী প্রতিপত্তিশালিনী "মাতা আছানি" অর্থাৎ শীতলা দেবীর সেবিকা এবং আরোগ্যকারিণী। আমি ঘটনাসূত্রে উভয় স্ত্রীপুরুষ কবিরাজের সুপরিচিত তাহাদের নিকট এই সাংঘাতিক ব্যাধির যে চিকিৎসা পদ্ধতি দেখিয়াছিলাম, ইচ্ছা করিয়া তাহা হিন্দুস্থানী ভাবে শিক্ষা করিয়া বহুস্থানে ব্যবহার করিয়াছি ও কৃতকার্য্য হইয়াছি।

অদ্য সেই জন্য বঙ্গ ভাষার একমাত্র স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা স্বাস্থ্য সমাচারে তাহাই বঙ্গীয় ভাবে প্রবন্ধাকারে লিখিলাম। আশা করি আমার সোণার বাঙ্গলার ভ্রাতা ভগ্নীগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন। প্রবাসী হইয়াও মাতৃমূর্ত্তি আর ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহ বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এই হিন্দুস্থানী বসন্ত চিকিৎসা লিখিব বলিয়া ভূমিকা একটু বিস্তৃত হইয়াছে। ভরসা করি তাহা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

বৈদজী রামলক্ষ্মণ একদিন একটী আহির বালিকার উৎকট বসন্ত আরোগ্য করেন। আমি তথায় বিশেষ কারণে উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম বৈদজী রোগিণীকে দেখিয়াই নিম্নলিখিত ধৌত দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য এসময় বালিকার জ্বর ছিল না। পীড়িকাগুলি সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া একটা মেয়ে দুইটি হইয়াছিল। গাত্রে তখনও উৎকট বেদনা ছিল। ছটফটি, দাহ, পিপাসা সমস্তই বিদ্যমান ছিল। ধৌত এই যথা—

নিমছাল ছাতেন ছাল বাশক পত্র মুথা বয়েড়া গুলঞ্চ কণ্টিকারী ক্ষেত পাপড়া, আমলকী পটল পত্র সমস্ত দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া আড়াই সের জল সহ সিদ্ধ করিয়া এক সের থাকিতে নামাইবে; তদ্বারা গাত্র ধৌত করাইবে। ইহার পর ১ পোয়া তিল তৈল, করলা পাতার রস ৪ তোলা ঘর্ষিত রুদ্রাক্ষ ১ তোলা হরিদ্রাচূর্ণ বা রস আড়াই তোলা মিশাইয়া গাত্রে মাখিতে দিবে। পীড়িকাগুলি পাকিয়া উঠিলে উপরের ধৌত না দিয়া করলার রস ও হরিদ্রার রস সহ নিম তৈল এবং "মেউড়ি" অর্থাৎ নিষিদার রস মিশাইয়া ধুইয়া দিবে। কিম্বা ১ তোলা সোহাগার খই (সোহাগা অগ্নিতে পোড়াইয়া ঝাড়িয়া লইবে)। অর্দ্ধসের গরম জলে মিশাইয়া খাঁটি নিম তৈল ½ পোয়া গুড়ঞ্চ রস এক ছটাক মিশাইবে। উহা জালি কদলী পত্র বা তাজা ভেরেণ্ডা পত্রে মাখিয়া পীড়িকগুলি ঢাকিয়া দিবে। কিম্বা তুলা দ্বারা ২।৪ দণ্ড অন্তর লাগাইবে।

আবার স্নান বিশেষে অর্থাৎ দানাগুলি পাকিয়া ছিড়িয়া যাইতে থাকিলে এবং জ্বর থাকিয়া যন্ত্রণা উপস্থিত করিলে নিম্নের ব্যবস্থা অনুযায়ী চলিতে হয়। যথা—

চিরচিড়ের শিকড় ১ তোলা
বালার পাতার গুড়া ১ তোলা শিমুলের আঁঠা ১ তোলা
হরিদ্রা ১ তোলা করলা পাতার গুড়া ১ তোলা

লইয়া বাবলার আঠা দিয়া ৩০টি বড়ি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে আর সন্ধ্যায় দুই বড়ি আমলকী রস সহ খাইতে দিবে। ইহাতে পাকিবার আশঙ্কা থাকিবে না; অতি সহজে দানাগুলি মিলিয়া যাইবে। আবশ্যক হইলে অর্থাৎ পীড়িকাগুলিতে বেদনা বেশী থাকিলে শিমুলের আঠা আর সফেদা একত্রে মিশাইয়া মাখিতে দিবে। যদি ক্ষত গভীর হয় এবং দাগ হইবার ভয় থাকে অথবা দানাগুলি কালো হইবার ন্যায় হয় তবে নিম্নের ধৌত এবং মলম ব্যবহার করিবে।

সোহাগার খই ১ ছটাক
মাখন ২ ছটাক নারিকেল বাটা ১ ছটাক

অথবা এই সঙ্গে গাতিডাবের নেওয়া ½ পোয়া রুদ্রাক্ষ ঘষা ২ তোলা মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিবে। আবার নিম্নের ধৌতটিকেও বৈদজী ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা—

তেতুল পত্র ½ পোয়া জয়ন্তি পত্র ½ পোয়া
করবী পত্র ½ পোয়া করলা পত্র ½ পোয়া

জল দু সের শেষ এক সের। ইহার সহিত এক ছটাক সোহাগার খই আর ডাবনারিকেল অভাবে ঝুনা নারিকেল জল এক পোয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ধুইতে হইবে। বলা বাহুল্য যে এই ধৌত দ্বারা দাগগুলি ধুইয়া উপরে মলম লাগাইলে দাগ গুলি অতি শীঘ্র মিলিয়া যায়।

দুঃখের কথা যে পূর্ব্বে এই ঔষধ শিখি নাই বা অভিনব ডাক্তারী ঔষধ জানি নাই। তাই আমার মুখে বসন্ত দাগ রহিয়া গিয়াছে।

আহির বালিকার জ্বর আর দাহ অধিক ছিল। এই পীড়ার নিয়ম এই যে বসন্ত উত্তমরূপ উঠিলে প্রায়ই জ্বর ও দাহ থাকে না তবে স্থানে স্থানে কিন্তু থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় নিম্নের মিশ্র খাইতে দিতে হয়।

ভাড়ভাড় বা শিয়াল কাটার মূল	।০ ছটাক
হরিতকী	।০ ছটাক
আমলকী	।০ ছটাক
বয়েড়া	।০ ছটাক

জল ।২ সের শেষ অর্দ্ধসের। ইহার ।০ ছটাক সহ হরিদ্রা রস ½ তোলা (বা গুড়া ½ তোলা) করলার পত্র রস ১ তোলা মিশাইয়া দিনে রাত্রে ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার খাইতে হয়। ইহার সহিত যদি কাশী উদারময় উপদ্রব থাকে তবে উক্ত মিশ্র ২ দুইবার দিয়া নিম্নের ব্যবস্থা-নুযায়ী চলিতে হয়।

রুদ্রাক্ষচূর্ণ	১০ রতি	জয়ন্তিপত্র চূর্ণ	৫ রতি
মরিচ চূর্ণ	২ রতি	পিপুল চূর্ণ	২ রতি
হরিদ্রা চূর্ণ	৫ রতি	করলাপত্র চূর্ণ	৫ রতি

মধু দিয়া ৫টি বড়ি প্রস্তুত করিবে। এই বড়ি বাকস পত্র রস সহ দিনে রাত্রে তিনবার খাইতে দিবে। কোন কোন রোগীতে অধিক দাস্ত হয় আর গলা বেদনা বুক বেদনা থাকে। তথায় শিয়াল কাঁটার মূলচূর্ণ ২ রতি পাথর কুচির পত্র বাটা ২॥ রতি মৌরি চূর্ণ ২ রতি হিং ১ রতি সুটের গুড় ১ রতি শিমূলের আঠা ২ রতি বাবলার আঠার সঙ্গে ৪টি বড়ি প্রস্তুত করিবে। এক রতি প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর আতপ চাউল ধৌত জলসহ খাইতে দিবে। মেন্দি পাতা এবং জাতিফুলের পাতা বাটিয়া শিমুলের আঠা সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিবে এবং তুল দ্বারা গলার ভিতর লাগাইবে।

যদি কোন রোগীতে রক্ত পাত উপদ্রব থাকে তবে অনন্ত মূল চূর্ণ ২ রতি দুর্ব্বার রস ।১ ছটাক অপরাজিতা পাতার রস ১০ ফোঁটা ২।১ বার খাইতে দিলে কার্য্যসিদ্ধ হইবে।

তাহার পথ্য দিবার ব্যবস্থা ইহা হিন্দুস্থানে আর বাঙ্গালায় পূর্ণ পৃথক। শুষ্ক খাদ্যভোজি "ভেইয়ার জল আর রসযুক্ত খাদ্যভোজী বাবুগণ খাদ্য পানীয় সম্বন্ধে বড় পৃথক প্রকৃতি। বিশেষ এই "করতা হ্যায় যাতা হ্যায়" ভ্রাতাদিগের দেশের বায়ু পর্য্যন্ত রুক্ষ। বাঙ্গালার বাতাস জল ভরা। সুতরাং এই হিন্দুস্থানের লোকে যাহা পরিপাক করিতে পারে বঙ্গের লোকে তাহা পারে না। এই জন্য এই অঞ্চলে সাধারণতঃ ব্যাধি হইলেই "মুঙ্কে দাউল আর চাউল" পথ্য হয়। বাঙ্গালীর সেই স্থানে বার্লি সাবু পথ্য। এই প্রবন্ধ বাঙ্গালীর জন্য লিখিত। সুতরাং বসন্ত পীড়িত বাঙ্গালীর প্রথম পথ্য বার্লি সাগু দ্বিতীয় চিড়ের কাথ তৃতীয় চাউলের গুড়া ১ পোয়া আর মেথি ১ তোলা সিদ্ধ করিয়া ভাত বা "যাউ" খাইতে দিবে। সাবধান এ সময়ে লবণ কি সৈন্ধব দিবে না সামান্য মাজা চিনি মিশাইয়া খাইতে দিবে। পরে সরু চাউলের ভাত কলমি শাকের ঝোল পলতার ঝোল দিয়া দুই এক দিন পরে দুগ্ধ ভাত এবং চিনি ব্যবহার করিবে। ফল দিতে হইলে নিচু, পেঁপে, আঙ্গুর, বেদানা মিষ্ট ডালিম, কেশুর তরমুজ, জলশূন্য ডাবের সার ব্যবহার করা যায়। পিপাসায় ডাবের জল দুই এক ঘণ্টা বাতাসে রাখিয়া অল্প মিষ্ট সহ ব্যবহার চলে। কিন্তু শতমূলীর রস মিশ্রিত শীতল জলের তুল্য পানীয় এই পীড়ায় দ্বিতীয় নাই। বর্ত্তমান কালের নিত্য ব্যবহার্য্য বরফ, লেমেনেট, সোডা এই ব্যধিতে উপাদেয়। আবশ্যক হইলে মিছরীর জল ব্যবহার করা যায়। বস্তুতঃ শর্করা দ্রব্যটি এই ব্যাধির প্রতিষেধক। পাশ্চাত্য বুধ মণ্ডলীও ইহা স্বীকার করেন। বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য মৎস্য মাংস এই ব্যাধিতে অন্ততঃ ২০।২৫ দিন বন্ধ রাখা অতীব আবশ্যক। বিশেষ এই পীড়া যদি ব্যাপক হইলে একমাস দেড় মাস মাছ মাংস দিবে না।

এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র গল্প বাধ্য হইয়া লিখিতে হইল। একটী বড় আতুরে কায়স্থ বালকের বসন্ত হইয়াছিল। আক্রমণ তত বেশি নহে। দেশীয় প্রথায় আরোগ্য হয়। অন্ন পথ্য দিয়াই একদিন পরে মৌরলা মাছের ঝোল আর জালি শাকের ডাটা দিয়া তাহার জেদের জন্য আহার দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্য আসিয়া আতুর গোপালকে আবার আক্রমণ করিল। এইবারে তাহার এরূপ উৎকট বসন্ত হইল যে ২ দিনের মধ্যে তাহার শরীর পচিয়া উঠিল। শেষে ১০।১২ দিন ভোগিয়া গোপাল অন্ধ হইয়া আর বধির হইয়া জীবন পাইলেন। এই স্থানে তাহার চিকিৎসক এবং গ্রাম্য পণ্ডিত মহাশয়ের ধ্রুববিশ্বাস যে মাছ খাইয়া তাহার পুনরাক্রমণ ঘটিয় ছিল। পল্লীগ্রামের হিন্দু গৃহিণীগণ বসন্ত পীড়ার প্রকাশ পাইলে বাড়িতে পূর্য্যন্ত মৎস্য আনিতে দেন না। ইহা অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম।

বস্তুতঃ এই উৎকট ব্যাধি হইলে হিন্দুমতে সাবিত্রী ভাবে আহার বিহার করা উৎকৃষ্ট যুক্তি। বহুস্থানে মাতৃ শুশ্রূষা আর দেবীভক্তি দ্বারা এই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে। শীতলা বিগ্রহের চরণামৃত আর ধুনার ধূম পেঁপে কলমী খাদ্য দ্বারা এই কাশীতে ১৩২১ সালে সেই ভীষণ বসন্ত মড়ক সময়ে বহু ব্যক্তিকে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। জানি না ইহা ভগবানের কি অনুগ্রহ। যাহা হউক এই "হিন্দুস্থানী মতে বসন্ত চিকিৎসা দ্বারা আমার সুজলা সুফলা মাতৃ-ভূমির সামান্য উপকার হইলে জীবন সার্থক বুঝিব।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২৬ সাল | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

মজুরদিগের স্বাস্থ্য :—

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে নানাবিধ কল কারখানা অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। আজকাল প্রত্যেক সহরেই অল্প বিস্তর কল স্থাপিত হইতেছে। এই কল কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মজুর শ্রেণীর উৎপত্তি। ইহারাই পারদর্শীগণের নির্দ্দেশ অনুসারে কল পরিচালন করে। সম্প্রতি কলওয়াল ও মজুরদিগের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি চলিতেছে। সে অনেক কথা। আমরা স্বাস্থ্য-সমাচারে সেই বিষয়ের অবতারণা করিতে চাহি না; তবে মজুরগণও মানুষ, তাহাদের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করা সকলের কর্ত্তব্য। যে কোনও কারখানার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে মজুরগণের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী দেখা যায়। ছোট ছোট খোপের মধ্যে অনেক ব্যক্তি, স্ত্রী ও পুরুষ একত্র বাস করে। একজন লোকের বাসের জন্য যতটা স্থান প্রয়োজন ততটা তাহারা পায় না। কাজেই নানাবিধ ব্যাধি সহজেই ইহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। অনেক সংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ এক জায়গায় বাস করে, এই জন্য তাহাদের মধ্যে চরিত্র-দোষও দেখা যায়। বস্তীর মধ্যে স্বাস্থ্য বিধানের কোনও বন্দোবস্তই নাই। সকলেই যেখানে সেখানে মল পরিত্যাগ করে। ঘরের চারিধারে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত। কাজেই কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি একবার বস্তীর মধ্যে প্রবেশ করিলে সহজেই বিস্তৃতি লাভ করে। হতভাগ্য মজুরগণ সারাদিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া অপরাহ্নে মদ্যপানে মত্ত হয়। কারণ দরিদ্রতা হেতু ইহারা পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পারে না। পরিশ্রম করিতে করিতে সহজেই ক্লান্ত হইয়া যায়। এবং সেই ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের মনে হয় কলের মালিকগণের এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত। অল্প টাকা খরচ করিলেই ইহাদিগের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। উহাদের জন্য ডাক্তার নিযুক্ত হওয়া উচিত। প্রতিদিন সকালে ডাক্তার একবার করিয়া বস্তীসকল পরিদর্শন করিয়া আসিবেন। উহাদের

বাসস্থানের চারিদিকে যেন ময়লা ও আবর্জ্জনা জমিতে না পারে তজ্জন্য মেথর ও মালী নিযুক্ত করা দরকার। অজ্ঞতাই আমাদের অনেক দুঃখের কারণ। আমরা না জানিয়া অনেক অন্যায় কার্য্য করি; কিন্তু মজুরগণের মধ্যে শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তদ্দ্বারা তাহারা সহজেই সাধারণ বিষয় মোটামুটি জানিতে পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিলে তাহারা ঐ সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পারে এবং এই শিক্ষার দ্বারা মজুরগণ গৃহশিল্প, সমবায় প্রভৃতি বিষয়ে সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বাস্তবিক যাহারা নিজের রক্ত দ্বারা কলওয়ালাগণের ধনাগমের উপায় করিতেছে তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত। না করাই ধর্ম্মবিগর্হিত।

বর্দ্ধমানে মেডিক্যাল কলেজ ঃ—

বর্দ্ধমান নগরে শ্যামসায়র দীঘির তীরে সত্য সত্যই একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইতে চলিল। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে একটী প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল রহিয়াছে; সেই জন্য নূতন মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের পক্ষে বর্দ্ধমানই উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এই জমি দান করিয়াছেন। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আধুনিক মেডিক্যাল স্কুলের উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম এখানে থাকিবে। তা' ছাড়া, ১০০টি ছাত্রের বাসোপযোগী একটী হোষ্টেলও থাকিবে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের ইচ্ছা এই যে, বিদ্যালয়টির নাম "রোণাল্ডশে মেডিক্যাল স্কুল" হয়। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা, বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহাশয়ের নামে বেলগাছিয়ায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং বর্দ্ধমানের এই মেডিক্যাল স্কুলটির নাম রোণাল্ডশে মেডিক্যাল স্কুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

লর্ড রোণাল্ডশের উক্তি ঃ—

বর্দ্ধমান মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন, "At this time of day there are no two opinions as to the need of a large number of medical practitioners for the people of this presidency." অর্থাৎ বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর অধিবাসীদের জন্য যে বহু সংখ্যক চিকিৎসক চাই, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। আমরাও অনেক দিন ধরিয়া এই কথা বলিয়া আসিতেছি; দেশের লোকেও চিকিৎসকের অভাব দূর করিবার জন্য তার স্বরে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে। গত মাসে স্বাস্থ্য-সমাচারে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়া রাখিয়াছেন যে, বাঙ্গলায় মফস্বলের জন্য অন্ততঃ ১৪০০০ চিকিৎসক চাই! তন্মধ্যে এখন ১০০০ মাত্র আছে। বাকী ১৩০০০ চিকিৎসক গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই অভাব দূর করিবার জন্য বর্দ্ধমান মেডিক্যাল স্কুল একটী মাত্র সূচনা। বাঙ্গলার অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে এইরূপ আরও কয়েকটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইলে তবে এই বিষম অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারিবে। লাট বাহাদুরও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে, চিকিৎসাবিদ্যা বাঙ্গালা ভাষায় কিম্বা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে, এইরূপ যে একটী কথা তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমরা কোন মত প্রকাশ করিতে চাই না। আমাদের প্রধান বক্তব্য, যিনি রোগ আরাম করিতে পারিবেন, পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিবেন, আমরা তাঁহাকেই সাদরে গ্রহণ করিব; তা' তিনি বাঙ্গলায় শিক্ষা লাভ করুন বা ইংরেজীতে শিক্ষা লাভ করুন, তাহাতে কিছু মাত্র আসে যায় না। ইঁদুর ধরা লইয়া কথা; তা কাজে

বিড়াল হইলেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এ বিষয়ে লাট বাহাদুরের উক্তি আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। তিনি এই সকল মফস্বলের মেডিক্যাল স্কুল হইতে সবএসিষ্ট্যাণ্ট শ্রেণীর চিকিৎসক প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কাজেই ইহাদিগকে ইংরেজী ভাষাতেই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস ইহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; যেহেতু ইংরেজী উচ্চ শিক্ষার বিস্তৃতি যে ভাবে হইতেছে, তাহাতে এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রাভাব হইবে না বলিয়াই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে লাট বাহাদুর একটী আশার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের এই স্কুলটিই বাঙ্গালার মফস্বলে একমাত্র মেডিক্যাল স্কুল হইবে না; প্রধান প্রধান নগরে আরও অনেকগুলি এই শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। অতএব দেশবাসী আশ্বস্ত হউন।

শিশুমৃত্যু ও তাহার কারণ

আজকাল অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখেই শুনা যাইতেছে যে আমরা দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। দেশের চারিদিকের অবস্থা দেখিলে ইহার অনুভূতি হয়। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী মহা উল্লাসে দেশের সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি মহামারীর কাল কবলেও সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রতিদিন নিপতিত হইতেছে। যাহারা বাঁচিয়া রহিতেছে তাহারাও হীন, রুগ্ন, দুর্ব্বল ও পুরুষত্বহীন। এই সমস্ত আধি ব্যাধির হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আর একটি কারণেও যে আমাদের জাতীয় জীবনী শক্তি দ্রুত গতিতে হ্রাস পাইতেছে সেই বিষয়ে অল্প লোকেই চিন্তা করিতেছেন।

শিশুমৃত্যু দেশে এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৬ বৎসর আগে কলিকাতায় শতকরা পঞ্চাশটি শিশু এক বৎসরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিত। আজকাল শতকরা পঁচিশটি শিশু জন্মিবার পর পৃথিবীর আলো দেখিয়াই আবার চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করে। প্রতি বৎসর এখন কলিকাতায় পাঁচ হাজার শিশু মারা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত এক হাজার শিশু মৃত ভূমিষ্ঠ হয়। সমস্ত বাংলা দেশের হিসাব লইলে দেখা যায় যে প্রতি বৎসর তিন লক্ষ ছেলে জন্মিবার এক বৎসর মধ্যেই জীবন বিসর্জ্জন করে? প্রতি বৎসর এই বঙ্গ দেশেই সাড়ে পাঁচ লক্ষ গর্ভপাত হয়। এইরূপে হিসাব করিলে দেখা যায় যে দশ লক্ষ শিশু সন্তান জন্মগ্রহণের পর এক বৎসরের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করে।

এই প্রকার শিশু মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় না কাঁপিয়া উঠে। শিশুগণই ত দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল। ইহারা মানুষ হইয়া দেশের, দশের ও সমাজের উন্নতি করিবে এই আমাদের ভরসা। কিন্তু অনেক স্থলে আমাদের অবহেলায় লক্ষ লক্ষ সন্তান অকালে কাল কবলে নিপতিত হইতেছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই দিকে কাহারও বিশেষ চিন্তা নাই। আমরা যে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ইহা কাহারও ভাবিবার অবসর হইতেছে না। পিতামাতাও মনে করেন সন্তানের জন্ম দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল; সপ্ত পুরুষের স্বর্গের সোপান প্রস্তুত হইল। একদিকে শিশু মরিতেছে ও অপর দিকে শিশু জন্মিতেছে, কিন্তু কেহই দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন না যে আমরা কোন দিকে অগ্রসর হইতেছি।

এই শিশু মৃত্যু লইয়া পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই মহা আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ডেও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কম ছিল না। তাহারা গত যুদ্ধের সময় ইহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছে। কারণ সৈনিক সংগ্রহের চেষ্টার সময় দেখা গিয়াছে যে অনেক লোকই অকর্ম্মণ্য। তথাকার পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে যে সমস্ত সন্তান জন্মিবার পর কোনও প্রকারে মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় তাহারা উপযুক্ত শুশ্রূষা ও খাদ্যের অভাবে রুগ্ন ও হীনবীর্য্য হয়। আবার রুগ্ন ও অপরিণত বয়স্ক পিতা মাতা দ্বারা সেই সমস্ত সন্তান উৎপন্ন হয় বলিয়াও তাহারা শারীরিক দুর্ব্বল হয়। গর্ভাবস্থায় প্রসূতি উপযুক্ত সেবা ও পুষ্টিকর আহার না পাইলে সবল ও সতেজ শিশু প্রসব করিতে পারে না। শিশুকে সুস্থ ও সবল করিতে হইলে প্রধানতঃ তিনটি বিষয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যেন অপরিণত বয়স্ক বালক বা বালিকা দ্বারা শিশু উৎপন্ন না হয়। তাহার উপায় বাল্য বিবাহ প্রচলন বন্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে প্রসূতি গর্ভাবস্থায় কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে পারে যাহাতে উদরস্থ সন্তানের কোনও বিঘ্ন না হয়। ও তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে যেন সন্তান প্রসবের পর শিশুর উপযুক্ত সেবা ও খাদ্যের বন্দোবস্ত করা হয়। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ রোগের কারণ ও ঔষধ উভয়ই নির্দ্দেশ করিয়া তৎপ্রতিবিধানে সচেষ্ট হইয়াছেন। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির জন্য ধাত্রীর বন্দোবস্ত আছে। প্রসবের পরও চিকিৎসকের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু এদেশে এখনও এই বিষয়ে কেহ মনোযোগ দিতেছেন না। আমাদের দেশে শিশুরক্ষা সম্বন্ধে ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস প্রবাসী পত্রিকায় দুইটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। কারণ আমাদের মনে হয় নিজেরা চেষ্টা করিলে শিশু মৃত্যুর কিছু প্রতিবিধান করিতে পারি। শ্রীযুক্ত সুন্দরী বাবু লিখিতেছেন :—

"কলিকাতায় ছেলের জন্ম হলে সাত দিনের ভিতর না লেখালে, আর মারা গেলে সেই দিনই না লেখালে শাস্তি হয়। তাই বছর বছর কত ছেলে জন্মায়, কত ছেলে কি কি রোগে মারা যায়, সে-সবের সঠিক খবর পাওয়া যায়। কলিকাতার স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার যাঁর উপর, তাঁকে বলে হেল্‌থ অফিসার। তিনি ফি বছর একখানা বিবরণী লেখেন। ১৯১৭ সালে যে বিবরণী লিখেছেন, তাই থেকে জানা যায় সে বছরে প্রায় পাঁচ হাজার ছেলে জন্মের এক বছরের ভিতরেই মারা গিয়েছে। তার ভিতর প্রায় ১৭০০ (সতের শ) ছেলের মৃত্যু জন্মের সাত দিনের ভিতরেই। এই সতের শ ছেলের ভিতর প্রায় ১৩০০ (তের শ) দুর্ব্বলতা আর অপূরন্ত দোষে মারা গিয়েছে। জন্ম হবামাত্রই এমন কোন রোগ হয় না যাতে দুর্ব্বল হয়ে শিশু মারা যায়। জন্মের আগে কোন কারণে মায়েরই শরীর দুর্ব্বল হয়েছিল, সেই দুর্ব্বল মায়ের ছেলে আর কেমন করে সবল হবে? সরকারী ডাক্তারেরা বলেন পাঁচটি কারণে ছেলেরা দুর্ব্বল ও অপূরন্ত হয় :—(১) অতি অল্প বয়সে যে মেয়ে মা হতে যায় তার ছেলে পুরো মাস পর্য্যন্ত পেটে থাকে না, থাক্‌লেও ক্ষীণজীবী হয়। (২) মেয়েরা রাতদিন ঘরের ভিতর বন্ধ থাকে বলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়, এইজন্য তাদের ছেলে ক্ষীণজীবী হয়। (৩) খারাপ অপরিষ্কার জায়গায় থাকে বলে মেয়েদের নানারকম রোগ হয়, তাই তাদের ছেলে দুর্ব্বল হয়। (৪) দরিদ্র মেয়েরা ভাল খেতে পায় না, তাই তাদের ছেলে ক্ষীণজীবী। (৫) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগও দুর্ব্বলতার কারণ।

(১) অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়া বন্ধ কর্‌বার উপায় না করলে অল্পবয়সে ছেলে হওয়াও বন্ধ করা যায় না। আমাদের সমাজপতিদের একথা মনে করে রাখা দরকার যে, আমাদের পঞ্চম বেদ আয়ুর্ব্বেদ বল্‌ছেন, যোল বছরের কম বয়সের মায়ের ছেলে পেটে থাকলেই বিপদগ্রস্ত হয়। সুশ্রুত-সংহিতার মতে ছেলের বাপ হতে হলে বয়স পঁচিশ বৎসর হওয়া চাই। অবশ্য ১৩।১৪ বছরের মেয়ের ছেলে অনেক বেঁচেও থাকে। তবে শাস্ত্রকারেরা যে ঐ রকম বলেছেন, সে কেবল সাবধান করে দেবার জন্য। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর যদি স্ত্রীলোকের গর্ভ ধারণের শেষ সময় বলে ধরা যায়, আর তের বছর থেকে আরম্ভ করে সাঁয়ত্রিশ বছর ধরে যদি সন্তান প্রসব করতে থাকে, তবে তার স্বাস্থ্যই বা ভাল থাকবে কেন? তাছাড়া, একেবারে ছেলেমানুষ পোয়াতি হলে, এ অবস্থায় কি রকম থাকতে হয় তার কিছুই জানে না; লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নানা রকম অত্যাচার করে গর্ভের অনিষ্ট করে।

(২) ঘরের ভিতর রাত দিন বন্ধ থাকলে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এত বলা সত্ত্বেও ত দেশ থেকে পর্‌দা তুলে দেওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। যতদূর সম্ভব পোয়াতিকে খোলা বাতাসে রাখা উচিত। গর্ভ অবস্থাতেই বাতাসের দরকার বেশী। আমরা যা খাই তা হজম হয়ে রক্ত হয়। শরীরের ভিতরে যে-সব ময়লা জন্মায় সে-সব রক্তে গিয়ে মেশে। আমাদের বুকের দুধারে কামারের হাপরের মতন যে দুটি ফুস্‌ফুস্ আছে তার ভিতর ঐ অপরিষ্কার রক্ত যায়, নাকের ভিতর দিয়ে ফুস্‌ফুসে হাওয়া গিয়ে ঐ রক্ত পরিষ্কার করে। সেই পরিষ্কার রক্ত সমস্ত শরীরে চলাচল করে, তাইতে পুষ্টি হয় নিউমোনিয়া বা অন্য কারণে যদি ফুস্‌ফুসে হাওয়া ঢুক্‌তে না পায়, ডাক্তারেরা অক্সিজেন্ গ্যাস্ ভিতরে ঢুকিয়ে রোগীকে বাঁচান্। স্বাভাবিক অবস্থায় বাতাসের এত প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায়, যে ছোট মানুষটি পেটের ভিতর বসে আছেন, তিনি ত অষ্টপ্রহরই মায়ের পরিষ্কার রক্ত নাভি দিয়ে চুষে খাচ্চেন, আবার তাঁর দেহের যত ময়লা সেই নাভি দিয়ে বের করে মায়ের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্চেন। সুতরাং এই অবস্থায় অনেক বেশী পরিষ্কার বাতাস মায়ের চাই। কিন্তু আমাদের পোয়াতিদের জন্য কি-রকম বাতাসের ব্যবস্থা? যে ঘরে পোয়াতি থাকে, আরও যদি দুএকটি ছেলেপিলে থাকে, পাছে একটু ঠাণ্ডা লাগে সেই জন্য আষ্টে সন্ধি বন্ধ করে সেই ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়। জানালা-দরজা বন্ধ করেও তৃপ্তি হয় না। শার্সি পর্য্যন্ত এঁটে দেওয়া হয়। এদের রকম সকম দেখে সময়ে সময়ে মনে হয় বাঙ্গালী ঘরের শার্সিগুলি ভেঙ্গে দেবার একটা আইন করলে ঠিক হয়। এই রকম ঘরের বাতাসের কি অবস্থা হয়? একটা ঘর বন্ধ করে তার ভিতর কয়লা পোড়ালে যা হয়, এতে প্রায় সেই রকমই হয়। রক্তের ভিতর কয়লা আছে; শ্বাস-প্রশ্বাসের তাপে সেই কয়লা পুড়ে অপরিষ্কার গ্যাস জন্মায়; সেই গ্যাস্ নাক দিয়ে বেরিয়ে ঘরের বাতাসে মিশে যায়। বাইরের বাতাস যদি ঘরে ঢোকে, তবে ত ঘরের বাতাস পরিষ্কার হয়? ঘরের বন্ধ হাওয়ায় ক্রমশঃ শরীরে ময়লা গ্যাস্ জম্‌তে থাকে, পোয়াতি এবং আর সকলে সেই ময়লায় ভর্ত্তি হাওয়াই খেতে থাকে। এতে পোয়াতির স্বাস্থ্য কেমন করে ভাল থাক্‌তে পারে? তখন বদহজম, মাথাধরা প্রভৃতি নানা কারণে কষ্ট পায়, আর শরীর দুর্ব্বল হতে থাকে। পাড়াগাঁয়ে তবু মেয়েরা এ-বাড়ী ও-বাড়ী করে বেড়ায়, সহরে মেয়েরা ইলেক্‌ট্রিক বা টানা-পাখার বাতাস খেয়েই সন্তুষ্ট। বড় বড় বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যায় বাবুদের বৈঠকখানাতেই যেন পবনদেবের প্রতি ভক্তির মাত্রাটা খুব আছে, কিন্তু যত বাড়ীর ভিতর যাওয়া যায়, ততই মনে হয়, পবনের স্পর্শে মেয়েদের কোন প্রকার ক্ষতি হবে বাবুদের এই ধারণা।

(৩) ঘরের চারিধারে ময়লা থাকলে, নর্দ্দামা সব বুজে গেলে নানা রকম রোগ হতে পারে, সে কথা সকলেই জানেন। যেখানে-সেখানে জঞ্জাল জড় করে রেখে মশামাছির বাসা করে দেওয়া হয়। যেখানে জল জমা হয়, সেখানেও মশার বৃদ্ধি। আজকাল সকলেই জানেন এক প্রকার মশা থেকে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি। মাছি থেকে ওলাউঠা ও যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়ে।

(৪) গর্ভাবস্থায় খাওয়া-দাওয়ার ভাল ব্যবস্থার কর্ত্ত দরকার তা ভাল্‌ করে বুঝ্‌তে হলে পেটে ছেলে কত শীঘ্র বাড়্‌তে থাকে আর সেই পরিমাণে মায়ের রক্ত টান্‌তে

থাকে তা জান্‌তে হয়। প্রথম দিনের শিশু যত বড়, এক মাসে তার দশহাজার গুণ বড় হয়; দ্বিতীয় মাসে তার ওজন একশ (১০০) গুণের বেশি, চতুর্থ মাসে ছয়শ (৬০০) গুণ, আর পুরো দশমাসে ত সেই এক বিন্দু থেকে আড়াই সের তিন সের হয়। তা হলেই বোঝ ছেলে কত শীঘ্র বেড়ে ওঠে। ছেলে যত বড় হয় ততই ত মায়ের রক্ত বেশি টেনে খায়। ভাল খেতে না পেয়ে পোয়াতির শরীরে রক্ত ক্রমশঃ কম্‌তে থাকে, আর বদ্ধ হাওয়ায় থেকে আরও রক্তহীন হয়ে ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়। পোয়াতির এই সময় দুধ ও টাট্‌কা ফল খাওয়া বিশেষ দরকার! কিন্তু দুধ ও ফল কজন খেতে পায়? এর উপায় কি? দরিদ্রকে ত আর কেউ ধনী করে দিতে পারে না? তবু উপায় আছে। আমেরিকা ও বিলাতের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিলে স্থানে স্থানে দুধের ভাণ্ডার খুলেছে। সেই ভাণ্ডারে গেলে গরীব পোয়াতি ও ছেলেরা বিনা-মূল্যে দুধ পায়। মধ্যবিত্ত গরীব ভদ্রলোকদেরও অল্প মূল্যে দুধ পাবার ব্যবস্থা আছে। এই উপায়ে সে দেশের ছেলে-মড়ক অনেক কমে গিয়েছে।

(৫) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগেও পোয়াতি দুর্ব্বল হয়। সাধারণের একটা সংস্কার আছে যে, গর্ভাবস্থায় ঔষধ খাওয়ালে গর্ভ নষ্ট হয়। কোন কোন চিকিৎসকও প্রসব-বেদনা আস্‌বার ভয়ে কুইনাইন দেন না। কিন্তু যে ভয়ে কুইনাইন না দিয়ে রোগীকে ভোগান হয়, ম্যালেরিয়া বিষের দরুন সেই অনিষ্টই যে হয় অর্থাৎ গর্ভপাত হয়, আর পোয়াতিকে নিয়েও যম টানাটানি করে। জ্বর যদিও বা কমে, ঘুষঘুষে জ্বর হয়ে পোয়াতি রক্তহীন হয়। ক্রমশঃ হাত পা মুখ চোখ ফোলে, পরে মারাও যায়। যাদের ম্যালেরিয়ার কোন চিকিৎসা হয় না, আর দুধ টাট্‌কা ফল প্রভৃতি ভাল খাবার জোটে না, তাদের ঐ অবস্থা হয়। এই রকম চিকিৎসার অভাবে কত পোয়াতির মৃত্যু হয়, কত গর্ভ নষ্ট হয়, তা কে বল্‌তে পারে? কুইনাইন সম্বন্ধে আর-এক আপত্তি হতে পারে, পোয়াতির এমনিই প্রায় বমি হয়, তাহার ওপর কুইনাইন খেলে বমি আরও বৃদ্ধি হবে। কিন্তু আজকাল ছুঁচ ফুটিয়ে কুইনাইন ব্যবহার করা হয়, খেতে হয় না। সতর্ক... চিকিৎসা কর্‌লে গর্ভেরও কোন অনিষ্ট হয় না।

থাবারের দোষে কি জলের দোষে অনেক ... পোয়াতিদের পেটের অসুখ হয়, কিছুতেই সারে ... কবিরাজেরা স্যুতিকা বলে চিকিৎসা করে কবে... মানেন। শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হতে থাকে, রক্ত ... যায়, চোখ মুখ শাদা হয়ে আসে; হাত পা মুখ ... ফোলে। ভাল চিকিৎসা না করালে ঢাকী সুদ্ধ বিস... দিতে হয়। তাই বলি দেশের ম্যালেরিয়া যাতে ... হয়, দোকানের খাবার যাতে টাট্‌কা থাকে, খাবার ... যাতে শুদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে যদি সকলে দৃষ্টি রা... তা হলে পোয়াতি ও ছেলের মড়ক অনেক কমে যায়...

শিশু মৃত্যুর প্রথম কারণ নির্দ্দেশ করিতে যা... সুন্দরী বাবু লিখিয়াছেন যে অতি অল্প বয়সে "যে মে... মা হতে চায় তার ছেলে পুরো মাস পর্য্যন্ত পেটে ... না, থাক্‌লেও ক্ষীণজীবী হয়।" ইহার সহিত আ... ইহাও বলিতে চাই যে দুর্ব্বল, রুগ্ন, ক্ষীণবীর্য্য ও নি... পিতামাতার সন্তান কখনও সতেজ, সবল ও বীর্য্য... হইতে পারে না। ছেলে হয় তো বহুমূত্র বা যক্ষারো... ভুগিতেছে, চিকিৎসক বলিতেছেন যে ... দীর্ঘ দিন বাঁচিবে না; কিন্তু মা বাপ ছেলের বি... দিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন,—নচেৎ বংশ ... হয় না। যে প্রকারেই হউক পূর্ব্ব পুরুষকে না... হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ছেলের বিবাহ হই... কিন্তু তাহার সন্তান মায়ের কোলে চক্ষু মেলি... চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। ইহা কিছুমাত্র অতির... নহে। বঙ্গের ঘরে ঘরে এই বিষাদ চিত্র সর্ব্ব... অঙ্কিত হইতেছে। তারপর বাপ-মা দরিদ্র; দুইবে... পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কিন্তু বৎসর বৎ... সন্তানের জন্ম দিতেছে। শিশুও উপযুক্ত আহার্য্য ... পায় না। কাজেই অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত ... আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা রুগ্ন ও অকর্ম্ম... হইয়া সমাজের বোঝা বৃদ্ধি করে। এই প্রকারে স... উৎপাদন করিয়া লাভ কি? যে ব্যক্তি সন্তানের ভর...

...পোষণ করিতে পারে না তাহার সন্তান জন্মাইবার ...অধিকার নাই। রুগ্ন, দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য শিশু দ্বারা ...সমাজের উপকার না হইয়া বরং ক্ষতি হয়। কোনও ...আইন করিয়া দুর্ব্বল, রুগ্ন ও দরিদ্র স্ত্রীলোককে ...বন্ধ্যা করিয়া দিলেও বোধ হয় সমাজের উপকার ...হইতে পারে।

শিশুমৃত্যুর আর এক প্রধান কারণ বাল্য বিবাহ। ...কন্যা অষ্টম বর্ষ অতিক্রম না করিতেই পিতামাতা গৌরী ...দানের ফলের জন্য উৎগ্রীব হইয়া উঠেন। ছেলের বয়স ...কুড়ি বাইশ বৎসর হইলেই পিতা কন্যা অন্বেষণে বাহির হন। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে তাহার ফল সন্তানের পক্ষে বিষময় হয়। কারণ তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিলে নিজের স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা সন্তান প্রতিপালন করিতে পারে না। নিজেও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়। শিশুকে বাজার হইতে কৌটা দুগ্ধ খাওয়াইয়া বাঁচাইতে হয়। কাজেই শিশু চির রুগ্নই হয়। এই সমস্ত বিষয়ে সকলের বিশেষরূপে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এবং শিশুগণকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আন্দোলনও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বসন্তে আত্মরক্ষা

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।

মানুষের যত প্রকার পীড়া হয় তার মধ্যে বসন্ত ...একটি ভয়ানক পীড়া। আমাদের দেশে ধর্ম্মবিশ্বাসী ...লোক মাত্রই শীতলাদেবীর পূজা দিয়া বসন্ত পীড়ার হস্ত ...হইতে মুক্ত হইল মনে করে। পূজা দিবার পরেও যদি ...তাহারো এই পীড়া হয় তবে সেটা তাহার দুর্ভাগ্যের ...দোষ দিয়া থাকে। কিন্তু দেশ হইতে ক্রমেই সে বিশ্বাস ...দূরীভূত হইতেছে এবং বসন্ত রোগ সকল সময় সকল ...দেশে বিস্তৃতভাবে আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিতেছে। ...বিশেষতঃ বহু জনাকীর্ণ কলিকাতায় এই রোগের প্রাবল্য ...হেতু তথা হইতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে স্মৃতরাং ...ইহার প্রতিকারের যে সকল উপায় আছে তাহাই ...স্থলে আলোচনা করা যাইতে পারে।

বসন্ত রোগের বিষ কোন প্রকারে মানুষের দেহে ...প্রবেশ করিলেই তাহার বসন্ত হয়। এই বিষ বায়ুর ...সহিত মিলিত হইয়া নিশ্বাসের সঙ্গে রক্তের সহিত মিলিত ...হইতে পারে। মাছি ও মশা দ্বারা এই রোগ অন্য দেহে ...চালিত হয়।

...এই পীড়ার প্রতিষেধক কোন ঔষধ নাই বলিলেই চলে। কখন কাহার এই রোগ হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে সাধারণতঃ শীত ঋতুতেই ইহা হইতে দেখা যায় এবং একস্থানে বহু লোকের হইয়া থাকে। এই পীড়া হইলে, তবে তাহার নানাপ্রকার চিকিৎসা হয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে নাপিত মালাকার প্রভৃতি জাতির মধ্যে কেহ কেহ এই পীড়ায় পূজা মন্ত্র ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করিয়া বংশানুক্রমে এই ব্যবসা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। কি ইতর কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত এই পীড়া হইলে কেহই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য আহ্বান করে না। ঐ সকল বিষয়ক চিকিৎসকই ঝাড়া ফোঁকা দ্বারা চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে এই পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাঙ্গালা টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। কাহারও এই পীড়া হইলে গ্রাম শুদ্ধ লোকে শীতলা পূজা দিত এবং নাপিত কি মালাকার জাতীয় চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তির বসন্ত হইতে পুঁজ লইয়া স্চ দ্বারা গ্রাম

শুদ্ধ লোকের টীকা দিত। কারণ গ্রামে এক জনের টীকা দিলে তাহাতে যে বসন্ত হয় তাহা সংক্রামক হইতে পারে। দ্বিতীয় ঐ প্রকার টীকা দেওয়ায় যে বসন্ত হয় তাহা অনেক স্থলে ভয়ানকরূপে হইয়া থাকে। তাহাতে অনেকের প্রাণ নষ্টও হইত।

১৭৮৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ইহার কোন সদুপায় কেহ স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়া জানা যায়। দুগ্ধে দধি বীজ দিলে সেই দুগ্ধ দধি হইয়া যায়; তাহার মধ্যে পুনঃ পুনঃ দধি মিশ্রিত করিলে তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হয় না; তাহা দধিই থাকিয়া যায়। সেইরূপ মনুষ্য রক্তে বসন্ত বীজ প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহার রক্ত দধির ন্যায় বিশেষ প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহাতে আর বসন্ত বীজ প্রবেশ করিতে পারে না। মনুষ্য এই তত্ত্ব অবগত হইয়াই টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মনুষ্য দেহ হইতে বীজ লইয়া টীকা দিলে তাহার অনেক কুফল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

গো-বসন্ত—

গাভীর দুধের বোঁটায় এক প্রকার বসন্তের দানা উঠিয়া বসন্ত রোগ হয় ও দুগ্ধ দোহন কালে তাহার বীজ হাতে লাগিয়া কিম্বা কোন প্রকার গায়ে লাগিয়া মনুষ্যের দেহ মধ্যে সেই বিষ প্রবেশ করিলে সেই ব্যক্তির আর বসন্ত রোগ হয় না এই প্রকার একটী প্রবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল।

১৭৬৮ খৃঃ ব্রিষ্টল নগরের নিকট সেলস্‌বরীর কোন অস্ত্র চিকিৎসকের শিষ্য 'জেনার' নামক এক ব্যক্তি এই প্রবাদ অবগত হইয়া তদ্ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এবং এই গো-বীজ লইয়া মনুষ্য রক্তে প্রবেশ করাইয়া দেখিতে পান যে তাহাতে ঐ ব্যক্তির আর বসন্ত রোগ হয় ন ও বাঙ্গালা টীকার ন্যায় কুফল উৎপন্ন হয় না। তখন তিনি এই পরীক্ষার বিবরণ জন সাধারণে প্রকাশ করিয়া এই বীজ হইতে টীকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এই সময়ের পর হইতেই গোবীজে টীকা দেওয়ার সুবিধা, কার্য্যকারিতা ও নিরাপদতা জন্য উহা পৃথিবীতে বিস্তীর্ণভাবে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ সঙ্গে বাঙ্গলা টীকা দেওয়া রহিত হইয়া যায়। আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্য নিস্ত হস্তে গ্রহণ করিয়া সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে সর্ব্ব সাধারণের টীকা দিবার বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই বীজের একজনের টীকা দিয়া তাহার পরিপক্ক বীজ হইতে অন্য দেহে প্রবেশ করাইবার নিয়ম ছিল। এখানে ভেসেলিন সকল ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ বীজ সকলের দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এবং ক্রমে ক্রমে টিকাদার নিযুক্ত হইয়া শীতকালে টীকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু টীকাদারগণের অসাবধানতা হেতু অনেক স্থলে টীকা কার্যকরী হয় না, অথবা কুফল উৎপন্ন করিয়া থাকে সে জন্য কি প্রকারে এই টীকা গ্রহণ করিতে হয় এই বিষয় সর্ব্ব সাধারণের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য বোধে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

টিকা দেওয়ার সময় তিনটী বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ টিকা গৃহীতার স্বাস্থ্য; দ্বিতীয়তঃ বীজের অবস্থা; তৃতীয়তঃ বীজের যথাযথ প্রয়োগ।

স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে অতি শৈশব অবস্থাতেই টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর এক কি দেড় মাস বয়সের মধেই টীকা দেওয়া উচিত। যে সকল শিশু দুর্ব্বল তাহাদের তৃতীয় কি চতুর্থ মাস বয়সে টীকা দেওয়া উচিত। সাত আট মাস বয়সে শিশুর দাঁত উঠিবার সময় শিশুর স্বাস্থ্য নানা প্রকারে খারাপ হয়; ঐ সময় টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। শিশুর জ্বর, পেটের পীড়া ইত্যাদি তরুণ পীড়া এবং গাত্রে কোন প্রকার চর্ম্ম রোগ থাকিলে সে অবস্থায় টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া সকল অবস্থাতেই টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে বীজে টীকা দেওয়া হইবে তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে কোন দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে ও তাহা বিশুদ্ধ ভাবে গ্রহণ করা ও রক্ষা করা হইয়াছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। কোন লোকের টীকা হইতে যদ্যপি বীজ লওয়া হয় তবে সেই ব্যক্তি সুস্থ কিনা ও উপদংশ বিষ দ্বারা আক্রান্ত কিনা দেখা কর্ত্তব্য। টীকা হইতে বীজ লইতে হইলে টীকার দানায় বীজ প্রস্তুত হইবা-মাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। টীকার চারিদিকে লাল চক্রাকার দাগ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা টীকার পরেই ঐ রসপূর্ণ দানা হইতে বীজ লইবার উত্তম সময়। শিশুর টীকা হইতেই উত্তম বীজ পাওয়া যায়। মসৃণ মোটা চর্ম্মবিশিষ্ট শ্যামবর্ণ শিশুর দেহ হইতে অতি উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া যায়। টীকা হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, সুস্থকায় ব্যক্তির টীকার দানার উপরে ছেদ করিয়া অস্ত্র দ্বারা চাপিয়া বীজ লওয়া কর্ত্তব্য। ঐ বীজের সহিত যেন রক্ত মিশ্রিত না হয়।

তীক্ষ্ণ অস্ত্র বীজযুক্ত করিয়া স্কন্ধের বাহিরের দিকে বাহুর উপর যে মাংস উচ্চ হইয়া থাকে তাহার নিম্ন অংশে বাহুর উপর টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। বাম হস্তে বাহু সটান করিয়া ধরিয়া চর্ম্মের উপত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেদ করিয়া বীজযুক্ত করতঃ বাম হস্ত ছাড়িয়া দিলে, চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা গুণে বীজ ঐ স্থানে থাকিয়া যায়। অধিক রক্ত পাত হইলে বীজ ধুইয়া যাইতে পারে; নতুবা টীকা প্রায় বিফল হয় না।

টীকা দেওয়ার পর দুই এক দিন কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় দিবসের শেষে অথবা তৃতীয় দিবসে মশার কামড়ের ন্যায় একটী লাল দানা উঠে। পঞ্চম কি ষষ্ঠ দিবসে স্পষ্ট মুক্তার দানার মত রসপূর্ণ হয়। ঐ দানা মধ্যস্থল বাটীর মত নিম্ন ও চারি ধার উচ্চ হয়। অষ্টম দিবসে ঐ অবস্থা সুস্পষ্ট ও উচ্চ হয় এবং ঐ দানার চারিদিকে গোলাকার একটী লাল দাগ দেখা যায়। ইহার চারিধার ফুলিয়া উঠে। এই সময় গা গরম হয়, অস্থিরতা হয়, অজীর্ণ পেটের পীড়া হইতে পারে। নবম দিবসে সকলের গাত্র স্ফীত হয়। দশম দিবসে ঐ প্রকার লাল দাগ কম হইতে আরম্ভ হয়

এবং ইহার মধ্যের রস ঘন হইয়া ১৪।১৫ দিনে কটা বর্ণের চটা জন্মে। ঐ চটা শুকাইয়া কাল হইয়া যায় এবং ২০ হইতে ২৫ দিনে পড়িয়া যায়। এই চটা পড়িয়া গেলে একটী স্থায়ী দাগ হয়। এই দাগ গোলাকার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ও গর্ত্তযুক্ত। ইহাই টীকার সফলতার লক্ষণ। টীকার নবম অথবা দশম দিনে কাহারও গায় এক প্রকার দাগ দেখা যায় এবং প্রায় এক সপ্তাহ মধ্যে তাহা সারিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী টীকায় প্রায় তুল্যক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। বাল্যকাল অপেক্ষা যৌবনকালে টীকার যাতনা ও মন্দ উপসর্গ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

টীকা দিবার পর ২।৩ দিন স্নান করা উচিত নহে। এবং মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করা অনুচিত। কেহ কেহ দুগ্ধ খাইতেও নিষেধ করেন। টীকা উঠার উপক্রম হইতেই ঠাণ্ডা জলের পটি বা ছিটা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে বেদনা ও জ্বালা কম হয়।

একবার টিকা দিলে আজীবন 'বসন্ত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং হইলেও মৃদুভাবে হয়। এক্ষণে অনেকে বলেন দশ বৎসর পর পুনরায় টীকা লওয়া কর্ত্তব্য। টীকা ভাল রূপ না হইলেও পুনয়ায় টীকা লওয়া কর্ত্তব্য।

বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে তিক্ত রস বিশেষতঃ করলা তরকারী সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে ছিম বেগুন তরকারী অধিক খেলে বসন্ত রোগ জন্মে। এই সময় অধিক শীত ও অধিক উষ্ণ হইতে শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বসন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সংস্রবে যতদূর সম্ভব যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। বাড়ীতে কাহারও এই রোগ হইলে, তাহাকে একটি স্বতন্ত্র ঘরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া মাত্র একজন শুশ্রূষাকারী থাকা উচিত। শুশ্রূষাকারীর হস্তাদি উত্তম রূপে সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া তবে আহারাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রোগীর বস্ত্রাদি ক্ষার বা সোডা দ্বারা উত্তম রূপে সিদ্ধ করিয়া ধৌত করা কর্ত্তব্য।

বসন্তের প্রাদুর্ভাব কালে জ্বর ও গায়ের বেদনা হইলেই বুঝিতে হইবে সে ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। তখন হইতেই সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে মশার কামড়ের ন্যায় গায়ে মুখে দেখা যায়। তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত পোড়া মাটি উত্তম রূপে গুড়া করিয়া গায়ে মাখিলে শীঘ্র কমিয়া যায় ও গুরুতর হইয়া পচন হইবার ভয় থাকে না। এবং দুবেলা কন্টিকারীর শিকর গোলমরিচ সহিত সেবন করাইলে উপসর্গ কম হয় ও শীঘ্র সারিয়া যায়।

বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে তাম্র ও হরীতকী ধারণ করা উচিত। কন্টিকারীর শিকড় ও গোলমরিচ মিশ্রিত বটিকা ও শিমুল বীজের শাঁস গুড় দ্বারা সেবন এই রোগের প্রতিষেধক। এই ব্যবস্থায় রোগ বিস্তৃতি লাভ করে না তাহা পরীক্ষিত।

পান।

লেখক—ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র রায়।

পানের সংস্কৃত নাম তাম্বূল। ইহা এক প্রকার লতার পত্র। উক্ত লতাকে "পান লাহ" বা "পান লতা" কহে। এই লতা পত্রের নামেই পরিচিত। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত লতার নাম "তাম্বূলবল্লী", "নাগিনী" এবং "নাগবল্লরী"। ইহার ডাক্তারী নাম "পাইপার বিটল" (Piper Bettle)। পানকে হিন্দুস্থানে "পান" তৈলাঙ্গে "তাম্লপাকু", তামিলে "বোট্টিলী" ও বোম্বাই প্রদেশে "নাগবেল" কহে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম "বিটেল" (Betel)।

পানের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। পূজায় পার্ব্বণে, উৎসবে বৈঠকে, ঔষধে আহারে আমাদের সর্ব্বদা পানের প্রয়োজন। বঙ্গের হিন্দুমুসলমান সমভাবে ইহার উপাসক। এই পানের সম্পর্কে পানাধার গঠন শিল্প ভারতে বিচিত্রভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দুই প্রকার পানের উল্লেখ আছে। যথা কৃষ্ণ তাম্বূল (কাল পান) এবং শ্বেত তাম্বূল (শ্বেত পান বা ছাঁচি পান)। বর্ণ হিসাবে এ কথা সত্য হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অনুসন্ধান করিয়া এত বিভিন্ন প্রকারের পান আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সে গুলির বর্ণনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব।

পানের লতা কতক বরজে পালন করিয়া ও কতক গাছের গায়ে উঠাইয়া পান সংগৃহীত হয়। উচ্চ ভূমি পান চাষের উপযুক্ত স্থান। কৃষ্ণবর্ণ, ঝুরো ও জান্তব সারযুক্ত ভূমির পানই সতেজ, সুস্বাদু এবং উপকারী। "বিনা চাষে পান"—প্রবাদটী কতক অংশে সত্য। একবার বরজ করিয়া ফেলিতে পারিলে ১০ হইতে ৩০ বৎসর পান পাওয়া যাইতে পারে। আষাঢ়ের চারা হইতে আশ্বিনে এবং আশ্বিনের চারা হইতে জ্যৈষ্ঠে উৎকৃষ্ট পান পাওয়া যায়। মাসে ২বার পাতা তোলা যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছ হইতে ৩।৪টী পাতা প্রতিবারে পাওয়া যায়। বর্ষায় ৫।৬।৭টী পর্য্যন্ত। এক বিঘা জমিতে ২৫ হইতে ৩২ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পানের গুণ নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

"তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্।
বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু॥
বল্যং শ্লেষ্মাস্য দৌর্গন্ধ্য মল বাত শ্রমাপহম্।
নক্তান্ধ্য শমনং কামদীপনং ক্ষত রোপণম্॥

অর্থাৎ পান বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য্য কষায়-তিক্ত-কটু-রস, সরক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারগুণ রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক, কামোদ্দীপক ও ক্ষত রোপক।

নব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে পান উষ্ণ আগ্নেয়, বায়ুনাশক, কফনিঃসারক ও পচন নিবারক। সরসপত্র বা পত্রের রস বাহ্য প্রয়োগে স্থানিক মৃদু উত্তেজিত এবং চর্ব্বণ করিলে লালা নিঃসারণ ক্রিয়া প্রকাশ করে। পান চুয়াইলে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, উহাকে বিটেল অয়েল (Betel oil) কহে। উহার ১ বিন্দু তৈল ৪টী পানের রসের সমগুণবিশিষ্ট। সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি কফ সম্বন্ধীয় রোগে এই তৈল অত্যন্ত উপকারী। ২।১ বিন্দু মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর জল সহ খাইতে দেওয়া যায়। শ্লেষ্মাজনিত বক্ষঃ বেদনায় এবং নানাবিধ পৈশিক বাতে উক্ত তৈল অত্যন্ত উপকারী। এই তৈল একক বা সমপরিমিত সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ বেদনা স্থানে মর্দ্দন করিতে হয়। নানাবিধ ক্ষতেও এই তৈলের উপকার অসীম! ক্ষত ধৌত-করণানন্তর সমপরিমিত নারিকেল তৈলের সহিত বিটেল অয়েল মিশ্রিত করতঃ ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণ ক্ষতে ৩।৪টী পান থেঁতলাইয়া ঈষৎ উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে অত্যন্ত উপকার হয়। ডিপথিরিয়া রোগে পানের তৈলের ধূম অত্যন্ত উপকারী। শ্লেষ্মা জনিত ও অন্যান্য মুখ ক্ষতে একটু অধিক মাত্রায় খদির সংযুক্ত পান চর্ব্বণে অত্যন্ত উপকার হয়। কোন স্থান ফুলিলে বা মচকাইয়া গেলে পানে চুণ লেপন করতঃ উষ্ণ করিয়া ঐ স্থানে লাগাইয়া দিবে। ফোড়া, বাঘী ও ব্রণ উঠিবার সময়ও এই উপায় অবলম্বনীয়। ইহাতে বেদনা হ্রাস এবং ফোড়া বাঘী ইত্যাদি সত্বর বসিয়া যায়।

শিরঃপীড়ায় পান ৩।৪ ভাঁজ করিয়া পরে আগুনে তাতাইয়া কপালপার্শ্বে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে সত্বর শিরঃপীড়ার শান্তি হয়। অক্ষি-ঝিল্লি প্রদাহে ও কর্ণ-শূল রোগে পানের রস গরম করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করা যায়। কাস ও শ্বাস-কষ্ট রোগে এবং অর্কাইটিশ হইলে পানে ভেরিষার তৈল মাখাইয়া তপ্ত করিয়া স্থানিক

প্রয়োগ ফলপ্রদ। শিশুদের সর্দ্দিজ্বরে পান ছেঁচিয়া তাহার রস আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যায়। পানের নানা প্রকার গুণ দর্শন করিয়া অস্মদ্দেশের কবিরাজেরা অনেক ঔষধে পানের রস অনুপান দিয়া থাকেন। রাতকানা রোগে পানের গুণ আয়ুর্ব্বেদে স্বীকৃত হইয়াছে। পানের রস বিন্দুমাত্রায় চক্ষু মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়। অনেকে বেদনা স্থানে টিংচার আইওডিন্, একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা প্রভৃতি ঔষধ লাগাইয়া তথায় পান সেকিয়া বসাইয়া দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে অনুমতি করেন। ইন্-জেক্‌শান স্থানে টিংচার আইয়োডিন্ মালিস করিয়া তদুপরি পান গরম করতঃ বসাইয়া দিয়া পরে তুলা দ্বারা ব্যাণ্ডেজ করিলে আর ফুলিবার বা পাকিবার আশঙ্কা থাকে না। কুইনিন্ সেবনের পর ২।৩টী পানের বোঁটা উত্তমরূপে চিবাইয়া মুখ ধৌত করিলে মুখের বিকৃত আস্বাদ মোটেই থাকে না।

অজীর্ণ ও উদরাধ্মান রোগে যোয়ান ও কর্পূর সহ পান সেবনে সমধিক উপকার হয়। গলা খুস্‌খুসি কাসিতে শুঁট, লবঙ্গ বা জ্যৈষ্ঠমধু সহ পান খাইলে কাশীর বেগ অনেক কম হইয়া যায়। কাহারও দন্ত পচিতে (Carries tooth) আরম্ভ হইলে পান খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। পানের রসে দন্তের পচন নিবারিত হয়। মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে পানের গুণ অসীম। যাহাদের কোষ্ঠ কাঠিন্য স্বাভাবিক (Habitual Constipation) তাহাদের পক্ষে আহারান্তে পান সেবন উপকারী। নেরিন্‌জাইটিস্ ও গলক্ষতে চূণের সহিত পানের রস গরম করতঃ গলার উপর বার বার প্রলেপ দিলে উপকার হয়। গ্রন্থি বিবর্দ্ধনেও ঐরূপ স্থানিক প্রয়োগ করিতে হয়। বালকদিগের ক্যাটার রোগে পানের রস আভ্যন্তরিক প্রয়োগে উপকারী। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে পানের বোঁটায় নারিকেল তৈল বা গ্লিসরিণ মর্দ্দন করতঃ গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইলে সত্বর বাহ্যে হইয়া যায়। স্কার্ভি রোগে পানের রস অত্যন্ত উপকারী।

আমরা আহারান্তে পান খাইয়া থাকি, এ প্রথাটী উত্তম। পান সেবনে মুখ হইতে ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধ

বিদূরিত হয়। তাহা ভিন্ন পান চিবাইলে অধিক পরিমাণে লালা নিঃসরণ হয়; ঐ লালা ভুক্তদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাকের সহায়তা করে। পান সেবনান্তেও মুখ ধৌত করা উচিত। নতুবা পানের অবশিষ্ট অংশ যাহা মুখমধ্যে রহিয়া যায়, তাহা পচিয়া দুর্গন্ধ উৎপাদন করে। পানের কুচি দন্ত মধ্যে রহিয়া গেলে, দাঁতের গোড়া ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া যায়। সুপারি, চূণ ও খদির পান সেবনের সহজ উপাদান। তাহা ভিন্ন পানের সহিত চূয়া, গরম মশলা এবং সেন্‌সেন্ প্রভৃতি পেটেণ্ট গন্ধ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চূণ ও খদির অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে অপকারের আশঙ্কা নাই। অনেকে সুপারি অধিক মাত্রায়ও খাইয়া থাকেন। যদিও সুপারির কৃমিনাশক গুণ আছে, অধিক মাত্রায় সেবনে পেটের অসুখ জন্মিতে পারে। আবার কাঁচা সুপারি সেবনে কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়াও অসম্ভব নহে। তাহা ভিন্ন সুপারির এক প্রকার মাদকতা শক্তি আছে। অনেক সময় সেই ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া কষ্টকর হইয়া উঠে। গরম মশলা প্রভৃতিতে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয় সত্য, কিন্তু অনেক সময় পেট গরম করে। এ গুলির ব্যবহার কম করাই ভাল। অনেকে অধিক পরিমাণে পান খাইয়া থাকেন। এটী ভারী অন্যায়। অধিক পরিমাণে পান চিবাইলে দন্ত অতি সত্বর নষ্ট হইয়া যায়, ক্ষুধা কমিয়া যায়। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া জুটে। অতএব অকারণ অধিক পান খাওয়া সঙ্গত নহে।

আয়ুর্ব্বেদে অধিক পরিমাণে পান সেবনের অপকারিতা এবং কোন কোন স্থানে পান নিষিদ্ধ তাহারও উল্লেখ আছে। আবশ্যক বোধে আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তাম্বূলাত্যুপযোগাৎস্যাৎ শোষঃ পিত্তা নিলাশ্রিতঃ।
দেহ দৃক্ কেশ দন্তাগ্নি শ্রোত্রবর্ণ বলক্ষয়ঃ ॥"

অধিক পরিমাণে পান খাইলে শোষস্ত পিত্ত এবং বায়ু কুপিত এবং শরীর, চক্ষু, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রোত্র, বর্ণ ও বলের ক্ষয় হইয়া থাকে।

"তাম্বূলমহিতং প্রোক্তং শরীরে রুক্ষ দুর্ব্বলে।
জরাস্য শোষ পিত্তাস্রমদ মূর্চ্ছাক্ষি রোগিষু ॥"

জ্বর, মুখশোষ, রক্তপিত্ত, মদ, মূর্চ্ছা ও নেত্র রোগী এবং রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে তাম্বূল সেবন নিষিদ্ধ।

পল্লীস্বাস্থ্য

মফস্বলের অনেক স্থলেই এখনও বসন্তের প্রকোপ প্রবল ভাবে বর্ত্তমান। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশিত "বঙ্গরত্ন" লিখিয়াছেন ঃ—

বসন্ত।—এবার শীতে বসন্ত দেখা দিয়াছে; সুতরাং বসন্তের সময় যে কি বিপদ ঘটিবে কে বলিতে পারে। এখনও ইনফ্লুয়েঞ্জার ও ম্যালেরিয়ার বিরাম হয় নাই; সুতরাং স্বাস্থ্য এখানে ভাল যাইতেছে না।

এখানে বসন্তের দুই লেপ্টেন্যাণ্ট আগে হইতেই আসর জমকাইয়া বসিয়া আছে। তার পর ঐ "বঙ্গরত্ন" অপর এক সংখ্যায় সংবাদ দিয়াছেন,—একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর, বসন্তের সঙ্গে কলেরা আছেন ঃ—

কলেরা ও বসন্ত।— চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামে ও আলমডাঙ্গার অধীন কয়েক স্থানে কলেরা ও বসন্ত পীড়ার সংবাদ আমরা পাইতেছি। অতএব চুয়াডাঙ্গার সহরবাসীগণের এই সময় বিশুদ্ধ বারি ব্যবহার করিয়া সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য মনে করি।

কর্ত্তব্য ত বটেই; কিন্তু বিশুদ্ধ বারি কোথা? এই শীতের শেষে অবিশুদ্ধ বারিই এখন অনেক স্থানে দুর্লভ। এখন হইতে মফস্বল সংবাদপত্রে মফস্বলের অধিবাসীদের পত্রে জলকষ্টজনিত আর্ত্তনাদ ক্রমাগতই শুনিতে পাওয়া যাইবে। "ঢাকা প্রকাশ" ত ইহার মধ্যেই নমুনা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "ঢাকা প্রকাশে"র একজন পত্র-প্রেরকের মুখেই শুনুন ঃ—

ঢাকা জিলার সদর মহকুমাধীন কালিয়াকৈর থানার অন্তর্গত ঢোল সমুদ্র, মোটের চালা, কুটামণি, গোদার চালা, কাঞ্চনপুর চান্দের চালা, হবুয়ার চালা প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীগণ আজ প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ জলের অভাবে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। উক্ত গ্রামসমূহের মধ্যে ৩।৪টী পুষ্করিণী আছে। প্রত্যেকটিই এরূপ দল দামে পরিপূর্ণ যে, গোমহিষাদি তাহাদের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে। বর্ষাকালে উহাদের মধ্যে যে পরিমাণ জল পাওয়া যায় তদ্দ্বারা অতিকষ্টে গৃহপালিত পশু পক্ষীর তৃষ্ণা নিবারণ হয়। কিন্তু উক্ত পুষ্করিণীর জল মানুষের পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য; কারণ তাহা নিতান্ত অপরিষ্কার এবং দাম পচিয়া নিতান্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া যায়। ম্যালেরিয়া ঐ সকল গ্রাম সমূহের নিত্য সহচর এবং তথায় কলেরার প্রাদুর্ভাবও কম নয়। বিগত ১৩২৫ সালেই উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাবে উক্ত রোগগ্রস্ত হইয়া শতাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অধিকাংশ গ্রামবাসী রোগের কষ্টে ও ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে উদ্যত। দেখা যাইতেছে যে, গ্রামগুলি শীঘ্রই অরণ্যে পরিণত হইবে। গ্রামবাসীগণ ডিঃ বোর্ডের নিকট এই অভিযোগ জানাইয়াছে, তাহার ফলে ডিঃ-বোর্ড ওভারসীয়ার তথায় আসিয়া স্থানটি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তথায় যে একটী উত্তম পুষ্করিণীর নিতান্ত দরকার তাহাও তিনি সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি জায়গা জরিপও করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আজ দুই বৎসরেরও অধিক অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহাদের আর কোনই সাড়া শব্দ নাই! অতএব সবিনয় প্রার্থনা, সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট এই হতভাগ্য গ্রামবাসীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের এই অভাব-অভিযোগাদি পূরণ করতঃ সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

বিনয়াবনত—

যাক্। এখন বসন্তের খবরটাই ভাল করিয়া লউন। খুলনা জেলায় বসন্তের প্রভাবের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় গত মাসেই দিয়াছি। এবার আরও একটু "খুলনা" হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম ঃ—

বসন্ত রোগ এই জেলার সহরে ও মফঃস্বলে ক্রমশই ছড়াইয়া পড়িতেছে। টীকা দেওয়ার সুবন্দোবস্ত সহরেই নাই—মফঃস্বলের কথা দূরে থাকুক। এখন লোকে টীকা দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু টীকাদার নাই। হয়ত বা বীজও থাকে না। সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের রীতিমত গঠন ব্যতীত এই সকল অসুবিধা দূর হইবার নহে।

ও দিকে বনগ্রামের সহযোগী "পল্লীবার্ত্তা" আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন ঃ—

বনগ্রাম টাউনে জনৈক কোচম্যান বসন্তরোগে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। এই রোগ যাহাতে বিস্তৃত না হইতে পারে, তৎ প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

রাজসাহীর সহযোগিনী "হিন্দুরঞ্জিকা" হইতে গতবারে বসন্তের সম্বন্ধে একটু একটু খবর দিয়াছিলাম। এবারও সহযোগিনী বসন্ত-সংবাদ পত্রস্থ করিয়াছেন,—

নওগাঁর এলাকায় অনেক গ্রামে বসন্ত আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে পীড়িত হইয়াও হাট বাজারে ঘুরিতেছে। ইহাদের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক।

ফরিদপুরের সহযোগী "সঞ্জয়ের" ২৩শে মাঘ সংখ্যায় একমাত্র সংবাদ ঃ—

ফরিদপুরে বসন্ত।—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ফরিদপুর সহরে বসন্তরোগের আবির্ভাব হইয়াছে। মাঘ মাসে শীত প্রবল থাকে। এবার শীতের পরিবর্ত্তে বেশ গরম পড়িয়াছে। আজ কয়েক দিন বৃষ্টিপাত দেখা যাইতেছে। ইহাতে শস্যের উপকার হইবে এবং রোগও প্রশমিত হইবে; কিন্তু বসন্ত যখন প্রবেশ করিয়াছে, তখন ইহার আক্রমণ যে একেবারেই নিষ্ফল হইবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না। গোয়ালচামটের আঙ্গিনায় বসন্তরোগীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সাধক জগদ্বন্ধু বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়াছেন। ঐ আঙ্গিনায় পূর্ব্বেই একজনের মৃত্যু ও একজন আক্রান্ত হইয়াছে। অবস্থা প্রকৃতই আশঙ্কাজনক। সুতরাং কেহ আঙ্গিনায় যাইতে না পারে এবং আঙ্গিনা হইতে কেহ সহরে না আসিতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ একটা আদর্শ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়াছি, কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু উহা তেমন কার্য্যকরী হয় নাই, আমাদের বিশ্বাস। এ সংবাদ যদি সত্য হয় তবে রোগ যে ছড়াইয়া পড়িবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রেল-ষ্টীমার-যাত্রীর প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। বসন্ত আক্রমণ না করে এজন্য টীকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু রোগ যাহাতে বিস্তৃত হইতে না পারে, তৎপ্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া কায করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বেই এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি।

বসন্তের প্রসঙ্গে আরও অনেক আনুষঙ্গিক ব্যাপার

আছে। তাহার মধ্যে একটা কাঁথির সহযোগী "নীহার" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

বসন্তের টীকা— এতদঞ্চলের নানাস্থানে কিছুদিন হইল বসন্তের প্রাদুর্ভাব চলিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহাতে লোকে মারাও যাইতেছে। টীকা লওয়াই বসন্তের আক্রমণ নিবারণের একটী প্রধান উপায়। কিন্তু এতদঞ্চলে যাহাদিগকে টীকা লইতে হয়, তাহাদের জন প্রতি টীকাদারকে দুই আনা করিয়া ফি প্রদান করিবার নিয়ম প্রচলিত থাকায়, এখন ইহাতে অনেক গরীব দুঃখী লোকে নিজেদের বালক বালিকাদিগকে টীকা করাইয়া লইবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থাভাবে তাহারা আর তাহা করাইয়া লইতে পারিতেছে না। আমরা সংবাদ পাইতেছি যে, টীকাদারেরা এজন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অনেক বালক বালিকাকেই টীকা দিতে পারিতেছেন না।

অনেক দিন ধরিয়া ধান চাউল ও কাপড় চোপড়াদি আহার্য্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য[illegible]কল অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য থাকায় সাধারণের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কষ্টকর হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহাদের বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্য রহিয়াছে, কিন্তু রোজগারের লোক বেশী নাই, এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে তাহাদের যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এইরূপে কোন বাড়ীতে যদি ৩।৪টী বালক বালিকা থাকে অথচ গৃহস্বামী একাকেই প্রত্যহ তাহার শ্রমার্জ্জিত অর্থে সংসার চালাইতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে এককালে এতগুলি পয়সা দিয়া তিন চারটী বালক বালিকাকে টীকা করাইয়া লওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ যদি কলিকাতার ন্যায় এতদঞ্চলেও বসন্তের এই ভীষণ সংক্রামকতার সময় সকলকে বিনামূল্যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে সাধারণের একটী মহৎ উপকার হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ এ সময় তথায় সকলকে বিনামূল্যে টীকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বিগত ১৩২১ সালে এতদঞ্চলে যখন বসন্তের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সময় আমরা সাধারণকে বিনামূল্যে টীকা দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করায় কাঁথি ইউনিয়ন কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষ তখন সকলকে বিনামূল্যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। এবৎসরও বসন্তের এই সংক্রামকতার সময় যাহাতে এতদঞ্চলের সর্ব্বত্র বিনামূল্যে টীকা দিবার ব্যবস্থা হইতে পারে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য আমরা আমাদের জেলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটির কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

সহযোগীর দাবী খুবই ন্যায়সঙ্গত। আমরা সহ[illegible]যোগীর সমর্থন করিতে বাধ্য হইলাম। এমন অসময়ে যদি প্রজা রক্ষার জন্য বিনামূল্যে টীকা দেওয়ার ব্যব[illegible] না হয়, তাহা হইলে দাতব্য ব্যবস্থার প্রয়োজন [illegible] কোনকালেই দেখা যায় না। সংক্রামক রোগের সম[illegible] দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা বা রোগ নিবারণের দাত[illegible] ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উপকারের অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের উপকার বেশী। কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে যাহার ঘর পোড়ে তাহার ত ক্ষতি হয়ই; অধিক[illegible] অগ্নি বিস্তৃত হইয়া অপরেরও ঘর পোড়াইতে পারে। সুতরাং কাহারও ঘরে আগুন লাগিলে পাড়াপ্রতি[illegible] বাসীকে ছুটিয়া আসিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করি[illegible] হয়। ইহাতে কেবল দহ্যমান গৃহের অধিকারী[illegible] উপকার করা হয় না, আত্মরক্ষারও ব্যবস্থা ক[illegible] হয়। বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারীর সম্বন্ধেও [illegible] ব্যবস্থা খুবই খাটে। বিপৎকালে বিপদ হইতে [illegible] কোন উপায়েই হউক উদ্ধার পাইবার চেষ্টা ক[illegible] কর্ত্তব্য; সে সময়ে অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হই[illegible] বিপদুদ্ধারের কার্য্যেই লাগিয়া থাকিতে হয়; এ সম[illegible] বিচার-বিতর্কের সময় নয়।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় বসন্ত ত আছেই, তাহার উপর ইনফ্লুয়েঞ্জার অনুগ্রহও কম [illegible] সহযোগী "নীহারের" মুখেই শুনুন ঃ—

ইনফ্লুয়েঞ্জার ভীষণ প্রাদুর্ভাব—পটাশপুর ও ভগবানপুর থানা[illegible] বহু স্থানে অনেকদিন হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভীষণ আক্রমণে বহুলো[illegible] মারা যাইতেছে। আজও সে অঞ্চলে উহার প্রাদুর্ভাব কমে না[illegible] আমাদের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, উক্ত দুই থানার অন্ত[illegible] পালপাড়া, রামবসান, তোটানালা, বিভীষণপুর ও বারুই[illegible] প্রভৃতি গ্রামে এখন ইনফ্লুয়েঞ্জার এমন সংক্রামক প্রাদুর্ভাব[illegible] চলিয়াছে যে, অধিকাংশ স্থলেই লোকের ঘরশুদ্ধ সকল [illegible] উহাতে শয্যাগত থাকায় তাহাদের কষ্টের এক শেষ হইতেছে[illegible] রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অনেকেই নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইয়া ৪।৫ দিনে[illegible] মধ্যে মারা যাইতেছে। পটাশপুর থানার এক রামবসন গ্রা[illegible] ইতিমধ্যে এই ব্যাধিতে প্রায় ৩৫ জন লোক কালগ্রাসে পতি[illegible] হইয়াছে। মফঃস্বলে সুচিকিৎসকের একান্তই অভাব। [illegible] ইনফ্লুয়েঞ্জার এই ভীষণ ব্যাপকতার সময়ে অচিকিৎসায়ই অনে[illegible] মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। এ অঞ্চলে আমরা রোগপ্রপীড়িত হতভাগ্য পল্লীবাসীদের চিকিৎসার জন্য রোগাক্রান্ত পল্লীতে জেলা-বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে দুই একজন ডাক্তার প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

দেশের লোকের সুখের সীমা নাই। রোগ শোক ত আছেই; তাহার উপর আবার ভেজালের বিষম উৎপাত;—যেন গোদের উপর বিষফোড়া! তাহাও আবার অগ্নিমূল্যে! শ্রীহট্টের "সুরমা" আমাদিগকে এই সুখের সুসংবাদটি দিয়াছেন,—

ভেজাল তৈল।

[illegible] গ্রামে বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈলের একান্ত অভাব। এদিকে অখাদ্য ভেজাল তৈলই ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মণ হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। [illegible] তাহার বিষময় ফলে অনেক পরিবারেই বিষম উদরাময় দেখা [illegible]য়াছে। এদিকে কর্ত্তৃপক্ষের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রযোজন। [illegible] না হইলে ওলাদেবীর আগমন অবশ্যম্ভাবী হইবে। তাই [illegible] থাকিতে এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে [illegible] হইল।

ভেজাল তৈল ব্যবহার করিয়া লোকে উদরাময়ে [illegible]তেছে। তাহার উপর আবার জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। সুরমা বলিতেছেন,—

জ্বরের উপদ্রব।

[illegible] গ্রামে জ্বরের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। গত বারের ন্যায় [illegible] ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা না দিলেই হয়। শীতের প্রকোপও মন্দ [illegible] নাই।

আবার চিকিৎসার ব্যবস্থা কেমন, তাহাও শুনিয়া [illegible],—

[illegible] বানিয়াচঙ্গের সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধের অভাব [illegible]মাত্রায় বিরাজমান, এমন কি ভাল ও মূল্যবান ঔষধ একরূপ [illegible] নাই বলিলেও চলে। প্রায় চল্লিশ সহস্র লোকের অধূষিত এই [illegible] গ্রামের ডাক্তারখানায় এরূপ ঔষধাদির অভাব বড়ই দুঃখ[illegible] ভাবনার বিষয় সন্দেহ নাই। এদিকে কর্ত্তৃপক্ষের আশু সকরুণ-[illegible] একান্ত প্রার্থনীয়।

"সুরমার" সংবাদে আরও একটু বৈচিত্র্য আছে। [illegible]টুকুও লক্ষ্য করিবার যোগ্য,—

[illegible] মৌলবী বাজার মহকুমায় পল্লীগ্রাম সকলের গলদ যে কত, [illegible] বলিয়া শেষ করিবার নহে। এই মহকুমার অধিকাংশ পল্লীতেই রাস্তা ঘাট পানীয় জল এবং চিকিৎসার কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই—

সহযোগিনী "হিন্দুরঞ্জিকা" মধ্যে মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে বেশ একটু চমকিত করিতেছেন,—

১৯১৮ সালে রাজসাহী জেলায় এক বৎসরের কম বয়স্ক ৬৪৬৫ জন বালক ও ৫৮১২ জন বালিকার মৃত্যু হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর জেলায় বসন্তের প্রাদুর্ভাবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু বসন্ত এ জেলার একমাত্র মারাত্মক ব্যাধি নহে। সহযোগী "বঙ্গরত্ন" বলিতেছেন,—

কলেরা।—কৃষ্ণনগর থানার অধীন জঙ্গিপুর গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়া অনেকগুলি লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। অতঃপর পাবতি দে পাড়া গ্রামেও কিছু কিছু কলেরা দেখা দিয়াছে। গ্রামবাসীদের এবার সবদিকেই বিপদ উপস্থিত। এ সময়ে বিশুদ্ধ বারি ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নাই।

এতক্ষণ আমরা কেবল দুঃখের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করিলাম। কিন্তু কেহ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করে, ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। এ ক্ষেত্রেও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও যেমন ক্ষণপ্রভার আলোক দেখা দেয়, পল্লীস্বাস্থ্যের ঘোর নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যেও সেইরূপ একটু আধটু আশার ক্ষীণালোক দেখা যাইতেছে। সহযোগী "খুলনা" লিখিয়াছেন,—

খুলনা ও যশোহরের অধিবাসী মাত্রই শুনিয়া সুখী হইবেন যে শীঘ্রই ভৈরব নদের সংস্কার আরম্ভ হইবে। যশোহর ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয় সম্প্রতি বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ার অনরেবেল মিঃ কাষ্টালির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিয়া আসিয়াছেন এবং সাধারণের নিকট বিজ্ঞাপন করিবার সম্মতি পাইয়াছেন যে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উক্ত কার্য্যের জরিপ আরম্ভ হইয়াছে এবং প্লান ও এষ্টিমেট প্রস্তুত হইয়া ছয় মাসের মধ্যেই কার্য্যারম্ভ হইবে। ভৈরবের সংস্কার হইলে এতদঞ্চলের কৃষি ও স্বাস্থ্যের যে কি উন্নতি হইবে তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। তবে এই কার্য্যের জন্য বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা লর্ড রোনাল্ডসে যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন এবং ভৈরব কুলের অধিবাসী মাত্রই দিবরাত্র তাহাকে ধন্য ধন্য করিবে সে কথা নিশ্চিত।

কেবল "খুলনা" নহে, মেদিনীপুরের সহযোগী "মেদিনীপুর হিতৈষীও" আমাদিগকে নিরাশ করেন নাই ;—

রামনগর দাতব্য চিকিৎসালয় —আজ প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব সদাশয় কলেক্টার মিষ্টার ব্রাডলিবার্ট মহোদয়ের ঐকান্তিক যত্নে "রামনগর দাতব্য চিকিৎসালয়টি" স্থাপিত হইয়াছে। এতদঞ্চলে উপযুক্ত ডাক্তার কবিরাজের অভাব প্রযুক্ত কত লোক চিকিৎসার অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই ভীষণ অভাব দূরীকরণার্থ সহৃদয় কলেক্টার মহোদয় যে মহাউপকার করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য রামনগরবাসীগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমান দাতব্য চিকিৎসালয় দ্বারা সাধারণের অণুমাত্র উপকার হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি উহার প্রতি জনসাধারণের অণুমাত্র বিশ্বাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ লোক এই অবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বরং অকাল-মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করে, তবু ও ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় না কেন? ডাক্তার মহাশয় স্বীয় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হইয়া রোগ যন্ত্রণাক্লিষ্ট দীনদুঃখীগণের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হউন, ইহাই কামনা।

সহযোগী "রাঢ়দীপিকা" একটী সদনুষ্ঠানের কথা প্রকাশ করিয়াছেন,—

সৎকর্ম্ম।মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জের স্বর্গীয় জমীদার ছত্রপৎ সিং এর পুণ্যশীলা পত্নী শ্রীমতী কালিদাসী দেবী রামপুরহাট দাতব্য ঔষধালয়ের সাহায্য কল্পে তাঁহার ষ্টেটের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন ঘোষ বি, এল, মহাশয়ের মারফতে এককালীন দান ১০০৲ টাকা এবং প্রতিশ্রুত মাসিক চাঁদা গত দুই মাসের ২৲ হিসাবে ৪৲ টাকা দিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দানশীলা মহিলাকে এবং জনহিতকর কর্ম্মে উদ্যমশীলা মণি বাবুকে অন্তরের অন্তস্তল হইতে শত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আশার সঙ্গে সঙ্গে একটু অনাবিল আনন্দের আস্বাদ গ্রহণেও আমরা স্বাস্থ্য সমাচারের পাঠক পাঠিকাগণকে বঞ্চিত করিব না। যখন দেখি, একের দুঃখে অপরের চক্ষে সহানুভূতির স্রোত বহিতে থাকে তখন আনন্দিত না হইয়া কি থাকিতে পারা যায়? যখন দেখি, দেশের একস্থানে বেদনা উপস্থিত হইলে অন্যস্থানে সাড়া পড়ে, তখন বাস্তবিকই আশা হয় যে আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার নহে; সেখানে আশার আলোকও আছে। গত আশ্বিনের ঝড়ে যে সকল স্থান নিপীড়িত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের ঝটিকা-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ ভারতের নানা স্থান হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, বুভুক্ষুকে খাদ্যদান, গৃহহীনের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে শত দিক হইতে শত শত হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল। ঝটিকা ও বন্যার অন্যতম অবশ্যম্ভাবী কুফল মহামারী প্রতিকার কল্পেও চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা, ঔষধ ও পথ্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপ ঝটিকাপীড়িত কোন স্থানের চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ "ঢাকা প্রকাশে" প্রকাশিত হইয়াছে,—

গত ৭ই আশ্বিনের ঘোরতর সাইক্লোনের দরুণ বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোক—কেহ পীড়িত এবং কেহ প্রাণে নষ্ট হইয়াছে। যাহারা পীড়িত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ লোকই দুর্ভিক্ষ পীড়িত এবং নিরন্ন! লোকদের এসব দুরবস্থার সংবাদ জানিয়া কলিকাতার সুবিজ্ঞ ডাক্তার মাননীয় লেফ্‌টিন্যাণ্ট কর্ণেল এস, পি সর্ব্বাধিকারী এবং ডি, এন, মৈত্র মহোদয়গণ সাধারণের পীড়ার প্রতিকারের জন্য বাবু সারদাকান্ত সেন বাবু বসন্তকুমার মৌলিক নামক ২ জন "সবএসিষ্টেণ্ট ডাক্তারদিগকে লোহজং থানার অধীনে গ্রাম উয়ারী পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রায় আড়াই মাস কাল পর্য্যন্ত ক্যাম্পে থাকিয়া চর তারপাশা, ভাটীনচিরা, কমরপুর, চর পাড়া, কাউরপারা, চর ইছাপাশা, চর মাওয়া, সাহাবাজ প্রভৃতি চর সমূহে এবং যশলদিয়া, কান্দিপাড়া, মেদিনীমাওয়া, কুমারভোগ, মৌছা, বাজপুর, শিমুলিয়া; রাণীগাঙ্গ কোরহাটী, চর ভওয়ার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে কলেরা ৭৪ ম্যালেরিয়া ৯১, ইন্‌ফুয়েঞ্জা ২১১, রক্ত আমাশয় ৪১৩, আমাশয় এবং অন্যান্য ২৯৫ মোট ২১৫২ জন রোগী উক্ত ডাক্তার মহোদয়গণ সুচিকিৎসাতে কালের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। যদি এ দুঃসময়ে কলিকাতা হইতে ঔষধাদিসহ ডাক্তারদিগকে না পাঠাইতেন, তাহা হইলে উক্ত রোগীদিগের অধিকাংশ লোক যে অনশনে এবং অচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিত তাহার বিন্দু সংশয় ছিল না। ঐ মহোদয়গণ শুধু ডাক্তার পাঠাইয়াই এমত নহে, উহাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঔষধ এবং আবশ্যক পথ্যও দিয়াছিলেন। যে রোগীর যে পথ্য ব্যবস্থা ডাক্তারদ্বয় দিয়াছেন। যে সব রোগীদের পথ্য প্রস্তুতকারী ছিল না তাহাদের এবং অশিক্ষিত রোগীদিগের যাহাদের

পথ্য প্রস্তুত করার লোক ছিল না। তাহাদের পথ্য উক্ত ডাক্তারদ্বয় নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ডাক্তার বাবুদের সুচিকিৎসায় এবং সদ্ব্যবহারে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। উক্ত সর্ব্বাধিকারী ও মৈত্র মহাশয় উক্ত গ্রাম সমূহে অনশনে মুমূর্ষ অবস্থায় পতিত এবং বাস্তব্যের ঘর ভিন্ন গ্রীষ্ম ও হিমের কষ্টদায়ক লোকদিগের বাস্তব্যের সুবিধার জন্য ঘর প্রস্তুত করাইয়া তাহাদিগকে আপাততঃ প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করাইয়াছেন। ভগবানের নিকট কায়মনবাক্যে প্রার্থনা এই, উক্ত ডাক্তার মহোদয়গণ এবং তাহাদের সেবক দীর্ঘজীবী হইয়া সাধারণের হিতকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া জীবনের ভাবী সময় সাধারণের হিতকার্য্যে লিপ্ত থাকেন।

শ্রীরাসবিহারী দত্ত

ভারতে জননেন্দ্রিয়ের পীড়া।

ভারতবাসীদের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের পীড়াধিক্য সবিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বিলাত প্রভৃতি দেশেও এই পীড়ার প্রভাব কম নয়। তবে সে সকল দেশে সংবাদপত্রসমূহের আন্দোলনের ফলে, চিকিৎসকগণের চেষ্টায় প্রতিকারের রীতিমত ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু এ দেশে সে রকম চেষ্টা কি পরিমাণে হইতেছে, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল দেখিলাম, সে দিন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন মাননীয় সদস্য উক্ত সভায় এই প্রশ্নটির উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে যে বোম্বাই অঞ্চলে এই পীড়ার প্রভাব কমাইবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি এবং হইয়া থাকিলে কিরূপ ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা জানা যাইতেছে না। ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা যেমনই হউক, আপাততঃ কোন প্রদেশে এই রোগের প্রভাব কতদূর আমরা তাহাই পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতেছি।

ভারতবর্ষে যে সকল সাধারণ (সরকারী ও বেসরকারী) হাসপাতাল আছে, যেখানে রোগ ও রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহার যে সরকারী বিবরণ ১৯১৯ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পাবলিক হেল্‌থ রিপোর্ট হইতেই আমরা এই বিবরণটি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। তাহা ছাড়া যে সকল প্রাইভেট প্র্যাকটীশনারের নিকটে এই সকল রোগী চিকিৎসিত হইতে আসে, কিম্বা যাহারা লজ্জাবশতঃ গোপনে পেটেণ্ট ঔষধের সহায়তা গ্রহণ করে, তাহাদের কোন বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। এমন কি আমরা তাহার অনুমানও করিতে পারি না।

প্রথমে বঙ্গদেশের কথা ধরিব। বাঙ্গালা দেশের (কলিকাতা বাদে) হাসপাতালসমূহে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯৫ জন গণোরিয়া রোগী চিকিৎসিত হইতে আসে; তন্মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়। ১৯১৪ অব্দে রোগীর সংখ্যা ২৩১ ও মৃত্যু সংখ্যা ১ ছিল। এইরূপে ১৯১৫, ১৯১৬ ও ১৯১৭ অব্দে যথাক্রমে ২৪৪, ২৭০ ও ৩৬২ জন গণোরিয়া রোগী হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৯১৭ অব্দে ২ জন ও ১৯১৬ অব্দে ১ জন মারা গিয়াছিল।

ঐ ৫ বৎসরে বঙ্গদেশের (কলিকাতা বাদে) হাসপাতালসমূহে সিফিলিস রোগীর (প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী) সংখ্যা যথাক্রমে ৮৯৮, ৮০৬, ৭৯৮, ৮৮৭ ও ৯৬১ জন ছিল। আর ঐ রোগে মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে ২৫, ১৪, ১৩, ২২ ও ১১।

এইবার খাস কলিকাতার অবস্থা শুনুন। ১৯১৩ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে কলিকাতার হাসপাতালসমূহে যথাক্রমে ৩৮৪, ৫২৪, ৩৫১, ৫৭৭ ও ৬০২ জন গণোরিয়া রোগী চিকিৎসার্থ আগমন করে। ইহাদের

মধ্যে ১৯১৩ অব্দে কাহারও মৃত্যু হয় নাই। বাকী চারি বৎসরে যথা ৪, ৪, ১ ও ২ জন গণোরিয়া রোগী মারা গিয়াছিল। কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ঐ পাঁচ বৎসরে যথাক্রমে ৪৫৪, ৪ ৬, ৪৩৮, ১০১৭ ও ১২২৫ জন সিফিলিস রোগী চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে ৬, ৯, ১৬, ৪৪ ও ২৪।

১৯১৩-১৭ এই পাঁচ বৎসরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর হাসপাতালসমূহে গণোরিয়া রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯১৪, ৮৯১, ৯৯৬, ৮৮৮ ও ১০২৩; এবং মৃত্যু সংখ্যা ৬, ৬, ৩, ২ ও ২। ঐ কয় বৎসরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর হাসপাতালগুলিতে সিফিলিটিক রোগী এবং মৃত্যু সংখ্যা এইরূপ হইয়াছিল,—৩২৩৩ ও ৪৫; ৩৫৬৯ ও ৫৯; ৩২১১ ও ৪৬; ৩০৩৯ ও ৩৯; ৩২৩৫ ও ৪৭।

আর মান্দ্রাজ সহরে গণোরিয়া রোগী যথাক্রমে ২৭২, ৩২৪, ৩৭৯, ৩৭২ ও ৩৩১। তন্মধ্যে ১৯১৩ অব্দে ৩ জন মারা যায়। ১৯১৪ অব্দে একজনও মরে নাই। বাকী তিন বৎসর যথাক্রমে ২, ৪ ও ১ জন মরিয়াছিল। মান্দ্রাজ সহরে সিফিলিটিক রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যু সংখ্যা ছিল,—৫৭৩ ও ৬; ৬১৮ ও ১২; ১৪৬ ও ১০; ৪৩২ ও ১৬; ৩৭০ ও ৪।

অতঃপর বোম্বাই। বোম্বাই নগর বাদে কেবল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ১৯১৩-১৭ পাঁচ বৎসরে গণোরিয়া রোগীর সংখ্যা ৩১২, ৩০৯, ৩০৬, ৩৩১ ও ২৬৫; আর বোম্বাই নগরে ১৫৫, ৯৭, ৮৯, ৭৯ ও ১১৪। ঐরূপ, সিফিলিটিক রোগীর সংখ্যা বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৩৬৫; ১৪৯২, ১৩৯৫, ১৩৪১ ও ১৩০৯; এবং বোম্বাই সহরে ৫৩১, ৪২৪, ৪৬৬, ৪৯২ ও ৩৯৮। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে গণোরিয়া রোগে ১৯১৩ অব্দে ১ জন, ১৯১৫ অব্দে ১ জন, ১৯১৬ অব্দে ২ জন ও ১৯১৭ অব্দে ১ জন মরে। আর সহরে ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে প্রতি বৎসর ১ জন করিয়া মরে ও ১৯১৭ অব্দে ৫ জন মরে। সিফিলিটিক রোগে মৃত্যু সংখ্যা প্রেসিডেন্সীতে ২৪, ৪৩, ২৭, ২৯ ও [illegible] এবং সহরে ২৬, ২৬, ১৯, ২৭ ও ১৮।

ভারতের তিনটি প্রধান প্রেসিডেন্সীর অবস্থা এইরূপ [illegible] অন্যান্য প্রদেশে প্রধান নগর ও প্রদেশের হিসাব স্বতন্ত্র [illegible] করিয়া দেখান হয় নাই। আর আমরা প্রধান তি[illegible] প্রদেশের বিবরণ একটু বিস্তৃতভাবে দিলাম বটে, কি[illegible] সকল প্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ দিতে হইলে পু[illegible] বাড়িয়া যায়। সেই জন্য আমরা সংক্ষেপে অন্যা[illegible] প্রদেশের কেবল ১৯১৭ অব্দের হিসাব দিতেছি।

১৯১৭ অব্দে যুক্ত প্রদেশে গণোরিয়া রোগী [illegible] এবং মৃত্যু সংখ্যা ৪; আর সিফিলিটিক রোগী ও মৃত্যু সংখ্যা ১৮৬৭ ও ২৭। ঐ বৎসর বিহার ও উড়ি[illegible] প্রদেশে গণোরিয়া ও সিফিলিটিক রোগীর সংখ্যা ২০[illegible] ১২১০; পঞ্জাবে ৩০৭ ও ৮১৮; দিল্লী ২৪ ও ২৪[illegible] ব্রহ্মদেশ ১২৬২ ও ৩৫৩৫; মধ্য প্রদেশ ও বেরার [illegible] ও ৪২০; আসাম ১০৯ ও ৩৩৫। অন্যান্য প্রদেশে[illegible] সংখ্যা খুবই কম।

এই যে হিসাব দিলাম, এগুলি in-door patie[illegible] অর্থাৎ যে সকল রোগী হাসপাতালে শয্যা আশ্রয় করি[illegible] বাস করিয়াছিল তাহাদের হিসাব। কিন্তু ইহা স[illegible] হিসাব নহে। ইহা ছাড়া যাহারা হাসপাতালে থা[illegible] করিতে আসে নাই,—কেবল ব্যবস্থা ও ঔষধ লই[illegible] গিয়াছিল, সেই out door patientsএর হিসাব আলা[illegible] হিসাব করিতে হইলে ইহাদিগকে বাদ দেওয়া চলে না[illegible] তবে প্রবন্ধ-কলেবর অযথা দীর্ঘ না করিয়া আমরা কেবল [illegible] ১৯১৭ অব্দের হিসাব দিয়াই নিরস্ত হইব। ১৯১৭ অব্দে [illegible] out-door গণোরিয়া ও সিফিলিস রোগীর সংখ্যা বে[illegible] প্রেসিডেন্সীতে যথাক্রমে, ২৪৬৭৯ ও ১৮৬৭৮; কলিকাতা[illegible] সহরে ৬৭৭৯ ও ৯৩৪১; মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ৩৯[illegible] ও ৪৮৫১৭; মান্দ্রাজ সহরে ২৬২০ ও ২৯৭২; বোম্বাই[illegible] প্রেসিডেন্সীতে ৯৯৭৬ ও ১৯০৮৬; বোম্বাই নগরে ১৮[illegible] ও ৬৮০৯; যুক্তপ্রদেশে ২৬১৭২ ও ৩৭৮৯৭; বিহার ও [illegible] উড়িষ্যায় ১৫৬৩৩ ও ২৩৩১৪; পঞ্জাব ৬৪৪০ ও [illegible] ১০১৬৬; দিল্লী ১৪৫১ ও ২১২১; ব্রহ্মদেশ ১৭৩৫[illegible]

[illegible]১৯১২৯; মধ্য প্রদেশ ও বেরার ১২৩৪ ও ১৫৩৩; [illegible]আসামে ৫০০১ ও ২৪৭৭; প্রভৃতি।

অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষের হাসপাতালসমূহে ১৯১৭ অব্দে indoor গণোরিয়া রোগী ৫৩১৪ এবং সিফিলিস রোগী ১৬৩০৭ জন, আর outdoor গণোরিয়া রোগী [illegible]১৬৬৪৭৫ ও সিফিলিস রোগী ২০৯৪০৬ জন ছিল। [illegible] এই হিসাবটি Sate Public, Local Fund, and Private Aided Hospitals and Dispensaries of British Indiaর হিসাব। ইহা ছাড়া আর এক [illegible] শ্রেণীর হাসপাতাল আছে। সে গুলির নাম State Special and Railway Hospitals and Dispensaries in British India। এ গুলির ১৯১৭ অব্দের কেবল মোট হিসাব দিব। ১৯১৭ অব্দে সমগ্র ভারতীয় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর হাসপাতালসমূহে indoor [illegible] outdoor গণোরিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ১১৬০১ [illegible] এবং সিফিলিস রোগীর সংখ্যা ছিল ১১৭৯৮। আর [illegible] বেসরকারী হাসপাতালে ছিল যথাক্রমে ২৮১৪৩ ও [illegible]৮২৯।

এই পর্য্যন্ত ত কেবল কাগজে-কলমে হিসাব পাওয়া [illegible]। তার পর হিসাবের বাহিরে এইরূপ রোগীর সংখ্যা [illegible], তাহা কেহ অনুমান করিতে পারেন কি? আমরা [illegible] পারিলাম না। যাহাদের হিসাব পাওয়া যায় না, সেই [illegible] রোগীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। [illegible] শ্রেণীর, যাহারা সাহস করিয়া প্রাইভেট প্র্যাকটি[illegible]দের কাছে চিকিৎসিত হইতে যায়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর, যাহারা লজ্জাবশতঃ গোপনে পেটেণ্ট ঔষধের [illegible] লয়। সংবাদপত্রে এই ধরণের রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপনের বাহুল্য দেখিয়া মনে হয়, যাহারা পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করে, তাহাদের সংখ্যা কম ত নয়ই, বরং [illegible] বেশী বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। তাহা [illegible] দেশের অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ তাহা ভাবিয়া দেখুন।

এই গণোরিয়া ও সিফিলিস রোগ যে কেবল ব্যক্তি[illegible]ভাবে অনিষ্টকর তাহা নহে। ইহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। নৈতিক ক্ষতির কথা ধরিব না; শুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহাতে সমগ্র জাতির জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। গণোরিয়া ও সিফিলিস রোগ যাহার হয়, কেবল তাহাকে কষ্ট দিয়া, তাহারই ক্ষতি করিয়া নিরস্ত হয় না। ইহা বংশানুক্রমে বহু পুরুষ পর্য্যন্ত আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। আমাদের দেশে যে সকল শিশু অকালে অর্থাৎ ১ হইতে ৫ বৎসর বয়সের মধ্যে, বিশেষতঃ এক বৎসরের কম বয়সে মারা যায়, তাহাদের অধিকাংশের মৃত্যু তাহাদের জনক জননীর দোষে ঘটিয়া থাকে। জনকজননীর অসংযমের ফলে স্বর্গের ফুলগুলি অকালে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। নিরপরাধ শিশুরা জনকজননীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে। এই সকল শিশুর মৃত্যু সামাজিক নরহত্যা। ভারতবর্ষ দিন দিন এইরূপ ইচ্ছাকৃত নরহত্যা পাপে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। ধরিত্রী দেবী আর কতকাল এই সকল পাপের ভার বহন করিতে পারিবেন? কুশিক্ষার, অসৎ আদর্শের, ফলে দেশের নৈতিক অবস্থা দিন দিন যেরূপ হীন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আর বৎসর কতক বাদে বোধ হয় এই শ্রেণীর রোগীর সংখ্যা গণনা করিতে হইলে পাটীগণিতের প্রচলিত সংখ্যা গুলিতে আর কুলাইয়া উঠিবে না। এখন উপায় কি? আর ত নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। ইহার প্রতিকারের জন্য কেবল সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। সমাজ রক্ষার্থ সামাজিক ভাবেও ইহার প্রতিকারের পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। আহারে বিহারে সংযম অভ্যাস না করিলে এ রোগের হাত হইতে নিস্তার পাইবার আর কোনও উপায় দেখা যায় না। ইতর, ভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলকেই ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতে হইবে। নচেৎ নিস্তার নাই—সমাজ রক্ষা করা দায় হইবে।

পাশ্চাত্য দেশের সমাজ হইতে এই কুৎসিত রোগ দূর করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা হইতেছে, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এদেশে ইহার প্রভাব কিরূপ, যাহার যতটা হিসাব পাইলাম, দেখাইয়া দিলাম।

বস্তুতঃ জননেন্দ্রিয়ের পীড়ার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে রয়েল কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিশনও যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়, এদেশেও এই পীড়ার প্রভাব পাশ্চাত্য দেশসমূহ অপেক্ষা কম নহে। অতএব এই রোগসকল কিরূপে উৎপন্ন বা সংক্রামিত হয় এবং তাহা নিবারণ করিবারই বা উপায় কি তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। প্রথমে আমরা সিফিলিসের কথা বলিব।

প্রায় পনর আনা স্থলে এই রোগ স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্মিলনের ফলে একের দেহ হইতে অপরের দেহে,—পীড়িত ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থকায় ব্যক্তির দেহে সঞ্চালিত বা সংক্রামিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সিফিলিস পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। কোন সুস্থকায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ স্ত্রী বা পুরুষের সহিত মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেবল যে যৌন-সম্মিলনের ফলেই এই রোগ সংক্রামিত হয়, তাহা নহে। সিফিলিটিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, যথা, তোয়ালে, ক্ষুর, সাবান প্রভৃতির সাহায্যেও এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। সেই জন্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিজেরই সাবধান হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া অপরে রোগাক্রান্ত না হয়। রোগীকে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। নচেৎ সেই ব্যক্তির দ্বারা তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সিফিলিস রোগ সঞ্চালিত হইতে পারে। স্বামী যদি সিফিলিস রোগাক্রান্ত হয়, তবে সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ না করিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে, কেবল যে তাহার স্ত্রীরই এই রোগ হইবে তাহা নহে,—তাহার সন্তান-সন্ততি এমন কি তাহার পৌত্র-পৌত্রাদিরও এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। পিতা-মাতার সিফিলিস রোগ থাকিলে, তাহা সন্তানের পক্ষে প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। পিতার, বা মাতার অথবা উভয়ের সিফিলিস রোগ থাকিলে, তাহাদের মিলন-জাত সন্তান যদি গর্ভে অবস্থিতি কালে এই রোগগ্রস্ত হয় তাহা হইলে, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে, অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই এই দাঁড়ায় যে, গণোককাস মূত্রনালীর সম্মুখ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর যদিই বা কোন শিশু কোন রকমে মৃত্যুর হাত এড়াইয়া যায়, তাহা হইলেও সে দিন দিন শুকাইয়া যায়; অথবা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তাহারা মস্তিষ্কের বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না; সে অন্ধ বা বধির হইতে পারে; কিম্বা তাহার অপর কোনরূপ অঙ্গবৈকল্য ঘটিতে পারে। আর কোন কারণে না হউক, অন্ততঃ কেবল এই নিরীহ স্ত্রী ও শিশুসন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্যও, সিফিলিস রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক।

রয়েল কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে, গণোরিয়া রোগের প্রাবল্য ইয়োরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক। গণোরিয়া ব্যাধি গণোককা স(Gonococcus) নামক এক প্রকার জীবাণুজাত। গণোককাস প্রথমে পুরুষের মূত্রনালী আক্রমণ করে। রোগের প্রথম অবস্থায়, প্রস্রাবকালে প্রদাহ উপস্থিত হয়, জ্বর বোধ হয়, এবং মূত্রনালী পুঁয বহির্গত হয়। এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক মূত্রনালী পথে পুঁয বহির্গত হইলেই তাহাকে গণোরিয়া রোগ বলিয়া স্থির করা সকল ক্ষেত্রে সঙ্গত নহে,—অন্য কারণেও পুঁয বহির্গত হইতে পারে। যাহাদের অনিচ্ছায় লালার ন্যায় সূত্রবৎ পদার্থ পতিত হইয়া থাকে। দেখিয়া ঐ সকল লোক মনে করে যে, তাহারা গণোরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তখন তাহারা ভীত হইয়া পেটেণ্ট ঔষধ বা গুপ্ত ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করে। গণোরিয়া রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইলে স্ত্রীসহবাসে সাহ থাকে না। গণোরিয়া রোগ সাধারণতঃ দুশ্চরিত্র ও গণোরিয়া রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গ হইতে উৎপন্ন হয়। যখন রোগী নিজদেহে গণোরিয়ার লক্ষণ লক্ষ্য করে, তখন সে প্রথমে তাহার অনভিজ্ঞ বন্ধুজনের পরামর্শ গ্রহণ করে। এবং নিজেই নিজের চিকিৎসা প্রবৃত্ত হয়; অর্থাৎ কোন পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভ করে, অথবা কোন হাতুড়ের ঔষধ ইন্‌জেক্ট করে। গোড়াতেই এইরূপ injection চিকিৎসা আরম্ভ করায় সে গণোরিয়া রোগগ্রস্তাও হইয়া পড়িল।

ক্রমে তাহার গর্ভের পূর্ণ পরিণতে হইল, এবং যথাসময়ে একটী সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু তৎপরে একদিন অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই শিশুর চক্ষু দুইটী ফুলিয়া উঠিল, এবং কাঁচা মাংসের রসের ন্যায় রক্তবর্ণ পদার্থ বাহির হইতে লাগিল। শিশুর এই রোগকে Ophthalmia Neonatorum বলে। ইহার ফলে জগৎ একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য হইতে বঞ্চিত হইল। এই সকল অন্ধ পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিয়া থাকে মাত্র। অন্ধ ব্যক্তিদিগের তালিকা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর তাবৎ অন্ধগণের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের অন্ধত্ব এই রোগ হইতে উৎপন্ন।

তার পর জননীর অবস্থা। তাহার জ্বর হয়, এবং তাহার দেহ বিষাক্ত হইয়া উঠে। তাহাকে দেড় মাসেরও অধিক কাল আঁতুড় ঘরে থাকিতে হয়। তার পর যদিই সে কোনক্রমে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলেও সে চিররুগ্না হইয়া পড়ে। তাহার আর সন্তান হয় না। গণোককাস জীবাণু তাহার জননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ উপস্থিত করে; তাহার ফলে Fallopian Tubesএর পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং এই পথে স্ত্রীডিম্ব গর্ভকোষে আগমন করিতে পারে না। কাজেই তাহার আর ছেলেপুলেও হয় না।

পাঠকগণ, আমরা আপনাদের সমক্ষে যে ছবিখানি ধরিয়া দিলাম, তাহা কল্পনা নেত্রে নিরীক্ষণ করুন। যৌবনের অবিমৃষ্যকারিতা, মুহূর্ত্তের হৃদয়দৌর্ব্বল্যের ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে কতই না কষ্ট পাইতে হয়। এই কষ্ট কেবল যে যুবককেই ভোগ করিতে হয় তাহা নহে, তাহার স্ত্রী ও সন্তানগুলিও তাহার কষ্টের অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। পাপের ফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু একের পাপের জন্য অন্যে কেন দায়ী হইতে যাইবে? স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্ত্রীকে, পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুত্রকন্যাগণকে করিতে হইবে কেন? বিশেষতঃ যখন তাহার প্রতিকারের উপায় রহিয়াছে! এই কারণেই আমরা পুনঃ পুনঃ আমাদের পাঠকবর্গকে জননেন্দ্রিয়ের

পীড়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। জননেন্দ্রিয়ের পীড়ার প্রতিষেধ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা একটা জাতীয় সমস্যা। সামাজিক সংস্কারের খাতিরে—বিশেষতঃ যে সমাজ এ বিষয়ে একেবারেই নির্ব্বিকার—ইহাতে অবহেলা করা উচিত নহে।

"যতদিনের ইতিহাস পাওয়া যায়, ততদিন হইতেই সমাজে অবাধ, অনিয়মিত যৌন-সম্মিলন প্রচলিত। মনুষ্যের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে না পারিলে—এবং মানব-স্বভাবের কোন কালে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যাইবে, এমন আশাও করিতে পারি না,—ঐরূপ অনিয়মিত যৌন সম্মিলন চলিতে থাকিবে। সামাজিক পাপ দমনের চেষ্টার কোনই ত্রুটি হইতেছে না। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া সামাজিক পাপ সভ্যতার অঙ্গে কালিমা লিপ্ত করিয়া দিতেছে। এই সামাজিক পাপের সহিত সিফিলিস রোগ দমন সংক্রান্ত প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে।" সামাজিক পাপ দমনের দুইটি মাত্র উপায় খোলা আছে। একটী ব্যক্তিগত; অপরটি শাসন সম্পর্কীয়। আমরা কেবল ব্যক্তিগত উপায়টির কথারই আলোচনা করিব।

"ব্যক্তিগত পবিত্রতা,—ব্রহ্মচর্য্য—এই পীড়া দমনের একমাত্র প্রতিষেধক উপায়। চিকিৎসক আমরা,—আমরা এইরূপ পরামর্শ দিতে বাধ্য। সংযম খুব কঠোর ব্যবস্থা বটে (কাহারও কাহারও পক্ষে অন্যের অপেক্ষা অধিক কষ্টকর); কিন্তু তাহা একেবারে অসহ্য নহে। সেই জন্য, যুবক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই সংযম ব্রত অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। সেণ্টপলের কথায় বলিতে পারা যায়, ইন্দ্রিয় লালসার পীড়নে কষ্ট পাওয়ার অপেক্ষা বিবাহ করা শ্রেয়ঃ; কিন্তু যে ক্ষেত্রে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুবিধা নাই, সে ক্ষেত্রে কাম দেবের মন্দিরেই যে যুবকগণকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে এমন কি কথা আছে। কাম-তৃপ্ত ছাড়া, আরও অনেক উপায় আছে, যেখানে যুবকেরা তাহাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা দমন করিতে পারে। আমরা এইরূপ অন্ততঃ পাঁচটি উপায় দেখাইয়া দিতে পারি। তন্মধ্যে অন্ততঃ দুইটী সকলেই স্বচ্ছন্দে অবলম্বন করিতে পারে। পুনার্য্য যখন এই বিষয়ে চিকিৎসক রণ্ডিবিলিসের পরামর্শ লইতে গিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে এই দুইটী উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। যে দুইটী উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রবল ইচ্ছা দমন করিতে পারা যায়, সেই দুইটী উপায়—শরীর ও মনের কঠোর পরিশ্রম। আলস্য অতি মাত্রায় ইন্দ্রিয় উত্তেজক। সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে যুবকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইন্দ্রিয় দমন করিবার পক্ষে কর্ম্ম ও পরিশ্রম অতি সুন্দর উপায়। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা জীব মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক,—এবং অন্যায়ও নহে। কিন্তু সভ্যতার ব্যবস্থায় সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত উপায় সুলভ নহে।"*

জননেন্দ্রিয়ের পীড়া দমনের এই শেষোক্ত উপায় বৃটিশ সেনাদলে বিলক্ষণ সুফল প্রসব করিয়াছে। নানারকম ক্রীড়াকৌতুক এবং সেনাগণের ব্যবহারের জন্য পুস্তকাগার ও পাঠাগার, ক্লাব প্রভৃতির প্রবর্ত্তনের দ্বারা সৈনিকগণের চিত্তকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ঘটিত পীড়ার পরিমাণ হাজারকরা ৩০০ হইতে ৫০এ নামিয়া আসিয়াছে। শ্রমজীবিগণের জন্য ক্লাব স্থাপন করিয়া তথায় সুখাদ্যের ব্যবস্থা করিলে, মাঠে খেলাধূলার ব্যবস্থা করিলে, অবসর কাল স্বচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদে কাটাইবার ব্যবস্থা করিলে, এই শ্রেণীর লোকের মন আর বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে না,—যাহাতে জননেন্দ্রিয়ঘটিত পীড়া হইতে পারে এমন কাজে তাহাদের মন যাইবে না। আবার অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে, সুরা বিক্রয় রহিত করিয়া দিলে, অন্ততঃ, সুরা বিক্রয় করিবার পক্ষে বাধা বিঘ্ন স্থাপন করিয়া তাহার বিক্রয় সংযত করিয়া দিলেও এই রোগের প্রভাব কমিয়া

* Osler's Principles and Practice of Medicine

যাইতে পারে। সুরার সহিত কাম প্রবৃত্তির যে কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা কে না জানেন? তা'ছাড়া, কেহ যদি সংযম অবলম্বনের সঙ্কল্প করে, তাহা হইলেও, সে যদি মদ্যপ হয়, তবে তাহার পক্ষে ঐ সৎ সঙ্কল্প রক্ষা করিয়া চলা কঠিন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে জননেন্দ্রিয়ের পীড়ার প্রতিষেধক ঔষধ আছে। ক্যালোমেল অয়েণ্টমেণ্ট তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। অধ্যাপক মেকনিকফ এই ঔষধ আবিষ্কার করিবার পর, এবং এই আবিষ্ক্রিয়ার বিবরণ সাধারণেও প্রকাশিত হইবার পর, জননেন্দ্রিয়ঘটিত রোগের প্রতিষেধক চিকিৎসা ব্যাপারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ল্যানোলাইনের সহিত শতকরা ৩৩ অংশ ক্যালোমেল মিশ্রিত করিয়া অধ্যাপক মেকনিকফ এই ঔষধ প্রস্তুত করেন। তিনি এই ঔষধের গুণ নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একজাতীয় বানরের দেহে সিফিলিস রোগের বীজাণুর টীকা দিলেন। পরে ঐ টীকার মুখে ঔষধটি ঘষিয়া দিলেন। টীকা দিবার এক ঘণ্টা পরে তিনি দেখিলেন, গরমীর ঘা আর বাড়িতে পারিল না। আবার, ঐ একই বীজাণু লইয়া অপর একটী বানরের গায়ে টীকা দেওয়া হইল; ফলে, ঐ বানরের গায়ে যথা সময়ে গরমীর ঘা পরিণতি লাভ করিল। মানুষের দেহেও এই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অনেক অনুসন্ধানে জানা গেল একটী চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের ছাত্রের কোন পুরুষে কেহ কখনও সিফিলিস রোগে ভুগে নাই। তাহার দেহেও প্রথমে সিফিলিসের বীজাণুর টীকা দিয়া পরে ঔষধ ঘর্ষণ করায় রোগ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। সিফিলিস রোগের বীজাণু সুস্থ দেহে সংক্রামিত হইবার ২০ ঘণ্টা পরেও ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা হইয়াছে যে, এতটা সময় কাটিয়া গেলে আর ঐ ঔষধে কোন কাজ হয় না। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, অন্য লোকেও এই পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সর্ব্বত্র পরীক্ষার ফল সমান সন্তোষজনক হয় নাই। সে যাহা হউক, মেকনিকফের অয়েণ্টমেণ্ট অচিরে সিফিলিসের প্রতিষেধক ঔষধরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, এবং প্রতিষেধক চিকিৎসা ব্যাপারে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

মার্কিন সেনাদলে এই পীড়ার সম্বন্ধে অতি কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কোন মার্কিন সেনা এই রোগগ্রস্তা কোন স্ত্রীলোকের সংস্রবে আসিবার পর যদি প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন না করার ফলে রোগগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে দণ্ডিত হইয়া থাকে। কেহ যাহাতে এই রোগগ্রস্ত হইয়া তাহা গোপন করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে ঘন ঘন ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা আছে। শোধন কার্য্য খুব শীঘ্র করিয়া ফেলাই ভাল। রোগের সংস্রবে আসিবার পর যদি এক ঘণ্টার মধ্যে শোধনের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে রোগীর সংখ্যা শতকরা ০·০৮এর বেশী হয় না; আর ১০ ঘণ্টার মধ্যে শোধনের ব্যবস্থা হইলে রোগীর সংখ্যা শতকরা ৫ হইতে ৬ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

আমেরিক্যান সেনাদলে শোধনের ব্যবস্থা এইরূপ:—

(১) সাবান জলে উত্তমরূপে ধৌত করা।

(২) ১০০০ ভাগ জলে এক ভাগ পারক্লোরাইড অব মার্কারি মিশাইয়া সেই ঔষধ দ্বারা ধৌত করা।

(৩) মূত্রনালীর মধ্যে শতকরা ২ অংশ প্রোটার্গল অথবা শতকরা ১০ অংশ আর্জাইরলের সলিউসন ইনজেক্ট করিয়া তিন মিনিট কাল ঔষধটি তথায় রক্ষা করা।

(৪) শতকরা ৩০ অংশ ক্যালোমেল মিশ্রিত অয়েণ্টমেণ্ট দ্বারা দুষ্ট স্থান মর্দ্দন করা।

(৫) পুং জননেন্দ্রিয়ের উপর ৪ ঘণ্টা টয়লেট পেপার জড়াইয়া রাখা।

বৃটিশ সেনারা অবৈধ সংসর্গের পর সেনাদলের চিকিৎসক বা তাঁহার আর্দালির নিকটে আবেদন করিলে শোধন করিবার প্রণালী অবগত হইতে পারে এবং ঔষধ পাইতে পারে। শোধনের প্রণালী ও ঔষধ এই—

(১) ১০০০ ভাগ জলে ১ ভাগ পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গা-

নেট মিশ্রিত একটী ক্ষুদ্র বোতল। এই ঔষধ তুলি দিয়া দুষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিতে হয়।

(২) পার্ম্মাঙ্গানেটের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য এক টুক্‌রা কটন উল।

(৩) ক্যালোমেল ক্রীম পূর্ণ একটী টীনের নল।

এই টিউবের টীনের ক্যাপসুলের মাথার ছুঁচ বিঁধিয়া দিলে প্রথমে একটু তরল পদার্থ বাহির হইয়া আসে। এই পদার্থটি মূত্রনালীতে ইনজেক্ট করিতে হয়। ইহার পরবর্ত্তী অংশ অপেক্ষাকৃত কঠিন। সেটা দুষ্টস্থানে ঘর্ষণ করিতে হয়। এই দুইটী ঔষধই ক্যালোমেলের অংশ শতকরা ৩০।

ইদানীং ক্যালোমেল অয়েণ্টমেণ্টের সঙ্গে, অয়েণ্টমেণ্টের প্রতি ৪০ অংশে এক অংশ হিসাবে, থাইমল মিশ্রিত হইয়া থাকে। কারণ, ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, থাইমল সংযোগে অয়েণ্টমেণ্টের বিশোধক গুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যক্তিগত ভাবে জননেন্দ্রিয়ঘটিত পীড়ার প্রতিষেধের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা যথেষ্ট ফলপ্রদ হইলেও, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহা সর্ব্বত্রই অব্যর্থ নহে। কারণ, পুংজননেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য স্থানেও গরমীর ঘা হইতে পারে। এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ "Condom"—সাধারণ্যে যাহা French cap নামে পরিচিত,—তাহাও সর্ব্বত্র অব্যর্থ হয় না। এই যন্ত্র অনেক স্থলে নানা কারণে নিষ্ফল হইয়া থাকে।

মোট কথা, এই পীড়ার দ্বারা সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা যেখানে থাকে, সেখানে না যাওয়াই ভাল। যেখানে প্রলোভন জয় করিবার শক্তি যথেষ্ট নহে, সেখানে সৎ অনুষ্ঠানে, সদালাপে, সৎচিন্তায় সদ্‌গ্রন্থপাঠে দেহ মনকে নিয়োজিত রাখা কর্ত্তব্য। ব্যায়াম, ময়দানে খেলাধূলা, দেহ মনকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবার অতি উত্তম উপায়। সাহিত্য চর্চ্চা করুন, সঙ্গীত চর্চ্চা করুন। যে কোন উপায়ে হউক, মনকে সৎপ্রসঙ্গে নিযুক্ত রাখুন।

ইহার পরেও যদি কখনও কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আপনার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে আলস্যবশতঃ নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না,—অবিলম্বে নিজকে শোধন করিয়া লইবেন। এই উপায়ে আপনি যে কেবল আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবেন তাহা নহে; আপনার পরিবার-বর্গ—স্ত্রীপুত্র কন্যা একটা মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

৮ম বর্ষ | চৈত্র, ১৩২৬ সাল | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

শিশু-মঙ্গল।—

ভারতীয় শিশুগণের অদৃষ্ট বোধ হয় এত দিনে ফিরিতে চলিল। আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের পত্নী শ্রীমতী লেডী চেমসফোর্ডের কৃপাদৃষ্টি ভারতীয় অসহায় শিশুগণের উপর নিপতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে শিশু-মৃত্যুর হার পৃথিবীর অপর সকল দেশকে পরাজিত করিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া দেশ মধ্যে যথেষ্ট আন্দোলনও চলিতেছে। নিরীহ নিষ্পাপ শিশুরা কাহার পাপে অকালে প্রাণ হারাইতেছে, সে বিচার বিতর্ক অনেক হইয়াছে, আর তাহাতে প্রয়োজন নাই। এখন তাহারা আর যাহাতে দলে দলে তাহাদের মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া অকালে চলিয়া না যায়, তৎকল্পে তাহাদের জননীস্থানীয়া লেডী চেমসফোর্ড অবহিত হইয়াছেন। লেডী সাহেবা নিজে সন্তানের জননী, শিশুর মর্য্যাদা তিনি বুঝেন; তাহার উপর, তাঁহার ক্ষমতাও অসীম; এবং তাহারও উপর, তাঁহার পশ্চাতে অপ্রতিহত শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট আছেন;—সুতরাং তিনি যখন শিশুদিগের অকাল মৃত্যু নিবারণের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু সুফল ফলিবে। বস্তুতঃ, তিনি প্রথমেই যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আশা হইতেছে, ভারতের অনেক শিশু এখন হইতে বাঁচিয়া যাইবে, এবং ভগবানের নিকটে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিবে। লেডী চেমসফোর্ড এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন; এ দিকে দিল্লীতে যে মহিলা চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় মহিলা চিকিৎসক এবং ধাত্রী প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল উপায়ে, অশিক্ষিতা মূর্খা ধাত্রীর প্রভাব কমিয়া যাইবে, জননীরা সুস্থ শরীরে থাকিয়া সুস্থ সন্তান প্রসব করিতে, এবং উত্তমরূপে সন্তান পালন করিতে শিক্ষা করিবেন। লেডী সাহেবার জয় হউক।

জাপানের উন্নতির একটা কারণ।—

জাপান এখন পৃথিবীর অন্যতম প্রবল শক্তি। গত রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানের শক্তির প্রথম পরিচয় জগতে প্রকাশ পায়। তার পর চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলে। গত ইয়োরোপীয়ান যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য ইয়োরোপীয়ান শক্তিসমূহ

জাপানকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। জাপানের এই উন্নতির কারণ কি? কারণ একটা নহে, অনেকগুলা আছে। জাপান জীবিত জাতি; জাপান বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। জাপান আরও অনেক বিষয়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। যুদ্ধের সুযোগে জাপানের বাণিজ্য পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়াছে। এ সকল সত্ত্বেও জাপান আমাদেরই ন্যায় অন্নভোজী জাতি,—ইয়োরোপের ন্যায় মাংসাশী জাতি নহে। তথাপি জাপান কিরূপে এত বল-বীর্য্য সঞ্চয় করিল? আমাদের দেশের যাঁহারা আমাদের উন্নতি-প্রয়াসী, তাঁহারা বলেন, আমরা মাংসাশী নহি বলিয়া উন্নতি-বিমুখ। ভারতবর্ষকে যদি পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও মাংস-ভোজী হইতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা এদেশের জল-বায়ুর প্রকৃতি হয় বুঝেন না, না হয়, বুঝিয়াও তাহা মানিতে চান না। তাঁহারা ইয়োরোপের দিকে তাকাইয়া, ইয়োরোপকে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নিতান্ত অদূরদর্শীর মত ভারতবাসীকে মাংসভোজী হইতে পরামর্শ দেন। তাঁহারা যদি একবার জাপানের কথাটা ভাবিয়া দেখিতেন, অন্নভোজী হইয়াও জাপান কিরূপ বলবীর্য্যে অপর সকল জাতির সমান, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর ঐরূপ পরামর্শ দিতে পারিতেন না। জাপানের বীর্য্য-বান জাতি হইবার প্রকৃত কারণ কি, তাহার একটু পরিচয় অধ্যাপক এন, এন, গডবোলে মহাশয়ের বক্তৃতায় পাওয়া যাইতে পারে। অধ্যাপক এন, এন, গডবোলে এম-এ, বি-এস্‌সি সে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার অন্যান্য কথায় এখন আমাদের দরকার হইতেছে না। আমরা কেবল একটী বিষয়ের আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব। অধ্যাপক গডবোলে মহাশয়ের বক্তৃতার এক অংশ হইতে জানা যায়, জাপানী ছাত্রদের পক্ষে ব্যায়ামচর্চ্চা করা বাধ্যতামূলক; অর্থাৎ জাপানের আইন অনুসারে ছাত্র মাত্রেই ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতে বাধ্য; ব্যায়ামচর্চ্চা সেখানে শিক্ষার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইয়োরোপের অনেক দেশে 'কনস্ক্রিপ-শন' আইন প্রচলিত ছিল। ইংলণ্ডে এই আইন পূর্ব্বে ছিল না; যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রকারান্তরে এই আইন ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়; কিন্তু আইরিষরা পাছে অসন্তুষ্ট হয়, সেই জন্য তথায় এই আইন চালানো হয় নাই। এই আইন অনুসারে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে দেশের অধিবাসী মাত্রেই যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধ্য। আর যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলেই আগে ব্যায়ামচর্চ্চা করা চাই। জাপান সেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে দেশে এই আইন চালাইয়া আসিতেছেন। তা'ছাড়া ৬ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ছাত্রদিগকে অধিকাংশ সময় উন্মুক্ত স্থানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ব্যবস্থা। শৈশব কাল হইতে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত থাকায় জাপান আজ জাতির হিসাবে সুস্থ ও সবল জাতি। ইহার সহিত আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন। সম্প্রতি ভারতবর্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে; এই সঙ্গে আমরা প্রার্থনা করিতেছি,—না, দাবী করিতেছি,—ব্যায়াম-চর্চ্চাও ছাত্রদের মধ্যে বাধ্যতামূলক করা হউক। আমরা আশা করিতেছি, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের কোন না কোন সদস্য অচিরে ছাত্রদের মধ্যে বাধ্যতামূলক ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবেন।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ খাদ্য।—

খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মানবের খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে। এই খাদ্যাভাব স্থায়ী হইবে বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধ উপলক্ষে জাহাজে করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে খাদ্য চালান দিবার সময় অনেক খাদ্যের অপচয় ঘটিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে অনেক খাদ্যের অপচয় ঘটিয়া থাকিবে।

এই সকল কারণে স্বভাবতঃ খাদ্যাভাব হইবার কথা। কেবল এই কারণে খাদ্যের অভাব ঘটিলে তাহা অস্থায়ী বলিয়া মনে করা যাইত। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু তাহা নয়। ইয়োরোপের যে সকল স্থানে যুদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল স্থানের ভূমি পরিখা খননের দরুন, বড় বড় শেল গোলা ফাটিবার দরুন, যুদ্ধের মালমসলা, অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ, রাসায়নিক পদার্থ মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবার দরুন, এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, সেই সকল জমিতে বৎসর কতক চাষবাসের কাজ চলিবার সম্ভাবনা নাই। ইহাও খাদ্যাভাব ঘটিবার একটা কারণ হইতে পারে, কিন্তু ইহাও স্থায়ী কারণ নহে। আরও একটা এইরূপ অস্থায়ী কারণে খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে। যুদ্ধে অনেক লোক মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই শ্রমজীবী; অর্থাৎ শিল্পী, কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক। ইহারা জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইহাদের পরিশ্রমের ফলে শিল্পদ্রব্য এবং ফসল উৎপন্ন হয়। গত যুদ্ধে কোটী কোটী পরিমাণ এই শ্রেণীর লোক হতাহত হওয়ায়, ক্ষেত্র মজুত থাকিতেও লোকাভাবে কিছু কাল ফসল উৎপন্ন হইতে পারিবে না। কিন্তু এ সকল কারণ বাদ দিলেও, আরও একটী এমন অবস্থা ঘটিয়াছে। যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ মানব জাতির স্থায়ী ভাবে খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে। অর্থাৎ, পৃথিবীতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযোগী যত জমি আছে, পৃথিবীর লোক সংখ্যা তাহার অনুপাতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং এখনও বৃদ্ধির মুখেই চলিয়াছে। এই কারণে, আমাদের মনে হয়, এখন পর্য্যন্ত যে সকল ফসল মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়া এখন মানুষকে নূতন নূতন খাদ্যের সন্ধান করিতে হইবে। যে সকল স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ এখনও মানুষের খাদ্য শ্রেণীভুক্ত হয় নাই, তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটা মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, তাহা স্থির করিতে হইবে। সম্প্রতি "হেলথ কালচার" নামক একখানি আমেরিকান স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রে মিলো হেষ্টিংস নামক একজন লেখক মানুষের ভাবী খাদ্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন, ককেসিসিয়ান জাতীয় লোকের প্রধান খাদ্য গোধুম। কিন্তু পৃথিবীর লোক সংখ্যা এখন যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে, পৃথিবীতে গোধুম উৎপাদনের উপযোগী যত জমি আছে, সে জমিতে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। "বৃটিশ এসোসিয়েসন ফর দি য়্যাড-ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স" নামক সমিতির সভাপতি সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মানব জাতিকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া-ছিলেন যে, পৃথিবী যে পরিমাণে গম উৎপাদন করিতে পারে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা তদনুপাতে অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে,—তখনকার তুলনায় পৃথিবীর লোক সংখ্যা এখন কত বেশী। অথচ, তখনই পৃথিবীর গোধুম উৎপাদক সমস্ত ভূমিতেই গোধুমের চাষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল; এবং এই সময়ের মধ্যে জমির পরিমাণ বাড়ে নাই, ভবিষ্যতে কখনও বৃদ্ধির সম্ভাবনাও নাই। অতএব, এত দিনে অন্ততঃ ককেসিয়ান জাতীয় লোকদের প্রধান খাদ্য যে গোধুম তাহার অভাব হইয়াছে নিশ্চয়ই। সেই গোধুমের অভাব পূরণের জন্য আমেরিকায় নূতন খাদ্যের সন্ধান হইতেছে। আমেরিকানরা এখন আলু, কদলী (bananas), সাগু, খেজুর প্রভৃতিকে গোধুমের পরিবর্ত্তে প্রধান খাদ্যরূপে পরিণত করিবার কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু, কেবল আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই নূতন খাদ্যের সন্ধান লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বস্ত্র।

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী

পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজ মধ্যেই বস্ত্রের আদর আছে। নির্লজ্জতা দূর, মর্য্যাদা রক্ষা, বেশভূষা ও শারীরিক সৌষ্ঠব সংসাধন প্রভৃতি উদ্দেশ্যের অন্তরালে শরীর রক্ষা হেতু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাহ্য শীতাতপ হইতে সমস্ত শরীরকে রক্ষা করা, সকল সময়ে সকল অবস্থাতে দৈহিক উত্তাপ সমান রাখা, এবং আগন্তুক রোগাদিগের হস্ত হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা করাই বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন ও বস্ত্র ব্যবহার করার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের শরীর ভুবায়ু অপেক্ষা সাধারণতঃ উষ্ণ। শরীরের এই উত্তাপ ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। খাদ্য দ্রব্যের সার পদার্থ রক্ত হইয়া নিয়ত শরীর পালন করিতেছে। পক্ষান্তরে পরিশ্রমাদি দ্বারা প্রতিনিয়ত শরীর কিছু কিছু নষ্ট হইতেছে। শরীর মধ্যে শ্বেতসার, তৈলাক্ত পদার্থ ও চিনি প্রভৃতি খাদ্য (চাউল, তৈল, ঘৃত, চিনি) নিশ্বাসের বায়ুর সহিত দগ্ধ হওয়ায় শরীর মধ্যে তাপ উৎপন্ন হয়, ইহাতেই শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে। মানব দেহে স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮ হইতে ৯৯ ডিগ্রী। এই উত্তাপ সমস্ত দেহে প্রায়ই সকল সময়ে সমান হয়। এই উত্তাপ যেমন সর্ব্বদা শরীরে উৎপন্ন হইতেছে, তেমনি আবার শীতল বায়ু, ঘর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদাই নষ্ট হইতেছে। শরীরের উত্তাপ বাহ্য কারণে যত নষ্ট হয়, তাপ উৎপাদক খাদ্য তত অধিক প্রয়োজন হয়। স্বভাবতঃ মেদ ও চর্ম্মের আবরণ দ্বারা কতকটা উত্তাপ শরীরে রক্ষিত হয়। তথাপি কতকগুলি বাহ্য কারণে দেহের এই স্বাভাবিক তাপের হ্রাস করিয়া থাকে এই হ্রাস নিবারণার্থ বস্ত্র আবশ্যক।

কাপড় নিজে উত্তাপের অপরিচালক নহে। উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্যে যে শুষ্ক বায়ু থাকে তাহা অত্যন্ত অপরিচালক, এজন্য যে কাপড়ে যত অধিক বায়ু থাকে, তাহা তত অধিক অপরিচালক। এই অপরিচালকতা গুণে শরীরের উত্তাপ রক্ষণ, জলীয় পদার্থ শোষণ, শীত নিবারণ, বাহ্যিক বায়ুর উষ্ণতা হইতে শরীর রক্ষা, ও বায়ুর সহিত আগন্তুক বিষাদি শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না দেওয়া প্রভৃতি কারণে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন।

কাপড় গাত্রে অল্প ঢিলা ভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বস্ত্রের মধ্যে যে স্থান থাকে তাহাতে কতকটা শুষ্ক বায়ু আবদ্ধ থাকিতে পারে। তজ্জন্য ঢিলা বস্ত্রে অধিক শীত নিবারণ করে। শুভ্র পদার্থে সূর্য্য কিরণ বা অন্য প্রকার তাপ লাগিবা মাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শুভ্রবস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে কাল রঙ্গের বস্ত্র ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। কারণ তাপ শোষণ দ্বারা বস্ত্র উষ্ণ হইয়া উঠিলে, তাহা দ্বারা শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। ক্লান্তিজনক ব্যায়ামের পর শীঘ্রই পরিহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। সাময়িক শীতের গরম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। সকল অবস্থাতেই গরম ও সুখপ্রদ বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত। বিশেষতঃ—বৃদ্ধ, রুগ্ন, ক্ষীণ এবং আরোগ্যোন্মুখ ব্যক্তিদিগের বস্ত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সচরাচর তিন প্রকার বস্ত্র আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি; প্রথম—সুতার বস্ত্র, দ্বিতীয়—রেশমী বস্ত্র, তৃতীয়—পশম বস্ত্র। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে, সুতার বস্ত্রই আমাদের প্রকৃত ব্যবহার্য্য। রেশমী ও পশমী বস্ত্র স্বভাবতঃই তাপের অপরিচালক গুণ বিশিষ্ট ইহাদের ব্যবহারে শারীরিক তাপ বহির্গত হইতে না পারায় শরীর অত্যধিক গরম হইয়া অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু শীতকালে স্বাস্থ্য রক্ষার্থ, ঐ দুই প্রকার বস্ত্রই

পযোগী। তুরস্ক ও অন্যান্য দেশে শীতকালে চর্ম্ম র্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ার নির্ম্মিত বস্ত্রও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অসভ্য শের লোক গাছের ছাল, পাতা ও জন্তুর চর্ম্ম ব্যবহার রিয়া থাকে। যোগীরা ভস্ম লেপন করে।

সাধারণতঃ এই কয় প্রকার দ্রব্য দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মিত য়া থাকে। যথা—পাট, কার্পাস, পশম, রেশম, ণা, জুট, তসর, গরদ, চামড়া ও রবার। এক্ষণে সকল বস্ত্রের গুণাগুণ বর্ণনা করা যাইতেছে।

পাট—কোমল এবং উত্তম পরিচালক, জল শোষক। দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র গ্রীষ্মকালে ও গ্রীষ্ম প্রধান শে ব্যবহারের উপযোগী। যখন আমরা ঘামিতে তখন ইহা ঘর্ম্ম নিবারণ করিয়া ত্বক শীতল । ঠিক ত্বকের উপরেই এই বস্ত্র ব্যবহার করা য়।

কার্পাস (তূলা)—পাটের কাপড় অপেক্ষা ইহা দ্বারা ত বস্ত্র কম পরিচালক, কিন্তু পশম অপেক্ষা অধিক চালক। পাট অপেক্ষা তূলা কিছু গরম ও আর্দ্রতা ক ও শৈত্য নিবারক। ইহা দৃঢ়, সহজে জল শোষণ না। জল লাগিলে সঙ্কুচিত হয় না, ও অধিক দিন ার করা যায়। পূর্ব্বে ইহা খুবই সুলভ ছিল; ান সময়ে ইহার মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় দিগকে প্রায় বস্ত্রহীন করিয়া তুলিয়াছে। ইহা দ্বারা কালের সুখদ পোষাক প্রস্তুত হয়।

রেশম, তসর, গরদ,—কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা ইহা । লঘু মসৃণ ও কোমল। কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ক্ষা ইহার জল শোষণ গুণ কম। সে জন্য ঘর্ম্মাদি সহজে পচিয়া যায় না। কিন্তু অত্যধিক মূল্য সকলে ব্যবহার করিতে পারে না। যাহাদের করিয়া ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের ইহা ব্যবহার করা উত্তম।

শম—ইহা অপরিচালক ও জল শোষক; এজন্য ইহা কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা উত্তম। ইহার ভিতরে বায়ু আবদ্ধ থাকে; এজন্য বাহিরের শীতল বায়ু উহার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইতে না পারায় শরীরের উত্তাপ নষ্ট করিতে পারে না। অনেকের বিশ্বাস যে পশম অত্যন্ত গরম; কিন্তু ইহার নিজের গরম করা গুণ কিছুই নাই। ইহারা অপরিচালক এজন্য গায়ে থাকিলে শরীরের উত্তাপ অধিক নষ্ট হইতে দেয় না। এই জন্যই প্রকারান্তরে ইহা গরম। ইহা জল শোষক বলিয়া ধৌত করিলে সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হয় এবং কিছু দিন ব্যবহার করিলে, সূত্র সকল কঠিন ও সঙ্কুচিত হয়। তখন ইহা উত্তমরূপ জল শোষণ করিতে পারে না এবং অপরিচালকতা গুণ কম হওয়ায় ভালরূপ শীত নিবারণ হয় না।

ফ্লানেল—পুরাতন পশম দ্বারা যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয় তাহাকে ফ্লানেল বলে। ইহারা পুরাতন পশম নির্ম্মিত বস্ত্র অপেক্ষা অনেক কম জল শোষক ও শীত নিবারক। পুরাতন হইলে পুরাতন পশম নির্ম্মিত বস্ত্রের ন্যায় গুণ প্রাপ্ত হয়।

মেরুণা—কার্পাসের সহিত শতকরা ২০ হইতে ৫০ অংশ পশম মিশাইলে মেরুণা প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ ও ধর্ম্ম কার্পাস ও পশমের মধ্যবর্ত্তী। এই কাপড়ে গেঞ্জি প্রস্তুত হয়। ইহা উত্তম ঘর্ম্ম শোষক।

জুট—ইহা এক প্রকার গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয় এবং পাটে নির্ম্মিত বস্ত্রের ন্যায় গুণযুক্ত। কিন্তু পাট নির্ম্মিত কাপড় অপেক্ষা কিছু মোটা।

তসর ও গরদ—ইহার বস্ত্র অত্যন্ত দৃঢ়, অনেক দিন ব্যবহার করা যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কিন্তু মূল্যাধিক্য জন্য সকলে ব্যবহার করিতে পারে না

চামড়া ও রবার—বৃষ্টির সময় এই প্রকার বস্ত্র অত্যন্ত উপকারী। অত্যধিক শীত নিবারণ জন্য ইহারা শীতকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহাদের মধ্য দিয়া ঘর্ম্ম বহির্গত ও বায়ু চলাচল হইতে পারে না এজন্য অধিক সময় ব্যবহার করা উচিত নহে।

এতদ্ব্যতীত অনেক রকম কাপড় আছে; কিন্তু তাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না এ জন্য তাহার বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে এই সকল বস্ত্র কোন অবস্থায় উপকারী তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে।

শীত নিবারণ—এই কার্য্যে পাট ও কার্পাস অপেক্ষা পশমি বস্ত্র অধিক উপকারী। অত্যধিক শৈত্যে চামড়া ও রবার নির্ম্মিত বস্ত্র অধিক উপকারী।

উত্তাপ নিবারণ—সাক্ষাৎ ভাবে সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বস্ত্রের নির্ম্মাণ অপেক্ষা বর্ণের দিকে লক্ষ্য রাখা অধিক আবশ্যক। শ্বেত বর্ণের বস্ত্র উত্তাপ অধিক বিকিরণ করিয়া থাকে; তৎপরে পাঁশুটে পীত, ঈষৎ গোলাপী, নীল ও পরিশেষে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বর্ণের বস্ত্র অধিক উত্তাপ পরিচালক; এজন্য উষ্ণ প্রধান দেশের জন্য উত্তম। কিন্তু ছায়াতে থাকিলে বস্ত্রের স্থূলতা ও পরিচালকতা গুণ দেখাই কর্ত্তব্য। ছাতা ও টুপি বা পাগড়ি সাদা কাপড়ের হইলে অধিক উপকারী।

ঘর্ম্ম শোষক—এই কার্য্যে পশম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

গন্ধ শোষক—যে সকল বস্ত্রে অধিক আর্দ্রতা শোষণ করে, গন্ধও তাহাতে অধিক শোষণ করে এজন্য পশম অধিক গন্ধ শোষক। এতদ্ব্যতীত এই ধর্ম্ম, বস্ত্রের বর্ণের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। কাল বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গন্ধ শোষক। তৎপর ক্রমে নীল, লাল, হরিত ও পীত। শ্বেত বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা কম গন্ধ শোষণ করে।

ম্যালেরিয়া নিবারক—আফ্রিকায় বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা নির্নীত হইয়াছে যে, খালি গায়ের উপর ফ্লানেল ব্যবহার করিলে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কম হয়।

পরিশ্রমের পর মোটা বস্ত্র গায়ে দিলে ঘর্ম্ম বাষ্পাকারে নির্গত ও বস্ত্রে ঘনীভূত হইয়া জল হয়। বাষ্প জল হইবার সময় তাহা হইতে গুপ্ত ভাবে তাপ বাহির হয়। ঐ তাপ দ্বারা শরীর গরম হয়। পরিশ্রমের পর কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা পাতলা পশমি কাপড় অথবা মেরুণা অধিক উপকারী। যে সকল ব্যক্তির সর্ব্বদা সর্দ্দি হয় অথবা যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল, শীতকালে তাহাদের গাত্রে প্রথমে ফ্লানেল দিয়া তাহার উপর একখণ্ড সেময়িজ (ছাগচর্ম্ম) ব্যবহার করিলে, অধিক উপকার হয়। ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে এক টুকরা ফ্লানেল পেটের উপর বান্ধিয়া রাখিলে ওলাউঠা নিবারণ হয়। ইংরাজিতে ইহাকে "কলেরা বেলট্" বলে। রাত্রিকালেই অধিকাংশ সময় ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয়; সে জন্য অনেকে রাত্রি কালেই ঐ "বেলট্" পেটে বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। বিবিধ প্রকার কাস-সর্দ্দি রোগে ফ্লানেল পিরাণ ও উলের মোজা অত্যন্ত উপকারী। শিরঃপীড়া রোগে উলের মোজা অত্যন্ত উপকারী। ইদানীং অনেকে সকল ঋতুতেই মোজা (ষ্টকিন) ব্যবহার করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা মোজা দ্বারা পদদ্বয় আবৃত থাকিলে অনেক স্থলে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। এই প্রকার অবস্থায় কোন প্রকার শীতল বায়ু বা জল পদদ্বয়ে লাগিবামাত্রই সর্দ্দি ও শিরঃপীড়া হইতে দেখা যায়। জলদ্বারা ধৌত করিয়া উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জনা করিলে পদ উষ্ণ থাকে। আধুনিক সভ্যতার কুফল আমাদের সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। একটী তিন বৎসরের বালকের শিশুকাল হইতেই সর্ব্বদা সর্দ্দি কাসি লাগি থাকিত। সেজন্য তাহার পিতামাতা রাত্রেও নিদ্রার সময় তাহার পদদ্বয়ে মোজা পরাইয়া শয়ন করাইতেন এবং জন্মের পর মোটেই স্নান বা গাত্র বস্ত্র পরিত্যাগ করা নাই। কিন্তু এই দুইটী নিয়মের ব্যতিক্রম করায় এ শিশুটী সর্দ্দী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। রাত্রে নিদ্রার সময় মোজা পায় দিয়া কখনই নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে মস্তিষ্ক অত্যন্ত গরম হইয়া উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইতে পারে।

আমাদের দেশস্থ লোকের মস্তকের চুল ঘন বলিয়া আমাদের দেশে টুপি বা পাগড়ীর প্রচলন নাই। কিন্তু অনেক দেশেই পাগড়ীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে আমাদের দেশে ইহার কতক প্রয়োজন হয়। নতুবা এদেশে সর্ব্বদা মাথায় টুপি পাগড়ীর ব্যবহারে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া টাক রোগ জন্মিয়া থাকে। একবার টাক পড়িলে সহজে তাহা আরাম হয় না। কেঁয়েদের মধ্যে অনেকেরই টাক দেখিতে পাওয়া যায়।

কাপড় সর্ব্বদা পরিষ্কার ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক।

পরিচ্ছন্ন চীরবাস, অপরিষ্কৃত বহুমূল্য সাটিন ও কিংখাব হইতেও বিশেষ গৌরবজনক। শরীরস্থ ক্লেদ প্রভৃতি দ্বারা আমাদের গাত্রবস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বদাই দূষিত হইয়া থাকে। এজন্য সাবান, সোডা, ক্ষার প্রভৃতি দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

কাপড়ের বর্ণ সাদা অথবা ঈষৎ রঞ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। ঘর্ম্ম লাগিয়া ভিজিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত। সংক্রামক রোগীর (হাম, বসন্ত, ওলাউঠা প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি) নিকট যাইতে হইলে, রেশম পশম প্রভৃতি প্রাণীজ ও রং করা বিশেষতঃ কালবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও গামছা কখন ব্যবহার করিবে না। নূতন কাপড় ধৌত না করিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ। বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বদা গাত্র ঢাকিয়া রাখা ভাল। নিদ্রাকালে গাত্রে কাপড় থাকা উচিত। গাত্রে ঢিলা ভাবে ব্যবহার উত্তম। ভিজে কাপড় ব্যবহার করা অপেক্ষা উলঙ্গ থাকাও ভাল।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিষয় লইয়া সমগ্র ভারতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এ বাঙ্গালাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ রহিয়াছে, এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, সরকার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। ১৯১৮ অব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের অস্থায়ী ইনস্পেক্টর মহাশয় বাঙ্গালা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফল একটী রিপোর্টের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী মহাশয় বাঙ্গালাদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ছয় বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিবার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৯১১ অব্দের লোকগণনা অনুসারে এরূপ বালকের সংখ্যা কলিকাতা, দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য প্রদেশ বাদে ২৮১৬৬৮৮ ছিল। ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা দিবার উপযুক্ত বিদ্যালয়সমূহে ১৫৫৫০১৩ জন বালকের স্থান আছে; কিন্তু বর্ত্তমানে ১৩২৫২২৩টী বালক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে এখনও স্কুল সমূহে যথেষ্ট স্থান আছে। তাহা হইলেও সকল স্কুলের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। যে সকল স্কুল গৃহের অবস্থা সন্তোষজনক সেই সকল স্কুলে মোট ৪৭৪০৭৯টি বালকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে।

বাঙ্গালা দেশে এখন যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযোগী অন্য ব্যবস্থা আছে, তাহা ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিস্তৃত নহে। কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় কম, কোথাও বেশী। প্রতি প্রাইমারী স্কুলে ১২০টি বালক স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারে, এই ভাবে হিসাব করিলে বাঙ্গালা দেশে ২৫৫৬৪টি প্রাইমারী স্কুলের দরকার হয়। কিন্তু স্কুলের সংখ্যা এখন ৩১৯১৭। অথচ, সকল স্থলে স্কুল নাই, আবার অনেক স্থলে প্রয়োজনের অনুপাতে স্কুলের সংখ্যা বেশী, কিন্তু ছাত্র সংখ্যা কম। এ দিকে স্কুলের সংখ্যা বেশী হইলেও, শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। আপাততঃ ৪০১৬৯ জন শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষা দানে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৯৩৮৯০ হওয়া আবশ্যক।

এখন প্রত্যেক শিক্ষক গড়ে ২৯ জন বালককে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন।

মোটের উপর, বর্ত্তমানকালে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উপযোগী বালকের মধ্যে শতকরা ১৭টি বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর শতকরা ৪২ জনের উপযোগী শিক্ষক আছেন। কিন্তু শিক্ষার অবস্থা আদৌ ভাল নয়। আলোচ্য রিপোর্ট অনুসারেই, বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াইবার ভাল ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।

রীতিমত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে নূতন আদর্শ স্কুল গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২১৩০৯৪৩৮ টাকা, তাহাদের সরঞ্জামের দরুণ ৯২৯৬০৩৩ টাকা, জমি ক্রয় বাবদ ১২৮২৬০৪ টাকা এবং ছেলেদের শ্লেট কিনিয়া দিবার জন্য ১০৫৬২৫৭ টাকা,—অর্থাৎ থোক ৩২৯৪৪৩৩২ প্রায় ৩৩০ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। আর নিত্য নিয়মিত খরচ হইবে,—শিক্ষকদের বেতন মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে ১৫৩৩০৯২০ টাকা, বাড়ীঘর ও সাজসজ্জা ঠিক অবস্থায় রাখিবার জন্য ২২০৮১৬৬ টাকা, লাইব্রেরী, কনটিনজেন্সী ও রেকর্ড বাবদ ১৪৯৮৩৪৩ টাকা, বালকদের জন্য বই, কাগজ কলম প্রভৃতি ৭৭৭৫২৩ টাকা, শ্লেট ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা আবার কিনিয়া দিবার জন্য ২১১২৫১ টাকা, স্কুল পরিদর্শন বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় ৩৯৯৭৮০ টাকা, ছাত্রদের বৃত্তি বাবদ ২৯৪২২৫৬ টাকা বাড়ী মেরামত বাবদ ১৩৬৬৬৪ টাকা ও আসবাব পত্র মেরামত খরচ ৬৯৮৪০ টাকা; অর্থাৎ মোট ২৩৪৮৪৭৩৩ টাকা ব্যয় হইবে।

বাঙ্গালা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলাফল একরূপ অবগত হইলাম। আইনানুসারে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহারও কতকটা আভাষ পাইলাম। কিন্তু কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে সুফল ফলিবে, শিক্ষাদান সার্থক হইবে, তাহা ত বুঝিলাম না। এদেশে উচ্চ শিক্ষা যে সফল হয় নাই, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত। ডাক্তারী, ওকালতী ইঞ্জিনীয়ারিং— এই তিনটি পেশা ছাড়া বর্ত্তমান কালের উচ্চ শিক্ষা হইতে শিক্ষিত লোকেরা আর বিশেষ কোন উপকার পায় না। ঐ তিনটি পেশাও যাঁহারা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সমান ভাবে ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। ইহাঁদের মধ্যে দুই চারিজন মাত্র নিজেদের কৃতিত্বের ফল ভোগ করিতে পান,—অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশের দশের কাছে মান্যগণ্য হইয়া থাকেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্কুল কলেজে মাষ্টারী অধ্যাপকতা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নহে, উপার্জ্জনও সামান্য,—তাহাতে তাঁহাদের আশা মিটে না, অভাব ঘুচে না, অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কতক লোক সরকারী ও বেসরকারী আপিস ইত্যাদিতে চাকুরী করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ তাহাও সকলে অবগত আছেন। শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের কোনই উপায় নাই। তাঁহারা না পারেন পূর্ব্বের মত তাঁহাদের নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে, না পারেন আধুনিক কালের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিটাইতে। ইংরেজী উচ্চ শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আপামর সাধারণ সকলেই প্রায় মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান ছিল, এবং সকলেরই নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। ফলে সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি ছিল না। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার প্রবর্ত্তনের ফলে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের আশায় লোকে দলে দলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল, এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু দুঃখ কষ্ট ত ঘুচিলই না, অধিকন্তু, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার ফলে যে শান্তি ও তৃপ্তি তাহারা উপভোগ করিতেছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল। উচ্চ শিক্ষার প্রবর্ত্তনের দ্বারা তাহাদের মনে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলা হইল তাহা মিটাইবার কোন উপায় করা হইল না। ফলে তাহাদের একুল ওকূল দুকূল গেল, নূতন কিছু লাভ হইল না। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে এই যে ভুল করা হইয়াছে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারেও কি সেই ভুল করা হইবে?

মানুষের শিক্ষা এমন হওয়া চাই যাহা তাহার জীবনে কাজে লাগে। যে শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে কোন কাজে লাগিবে না, সে শিক্ষা নিষ্ফল শিক্ষা। বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষক। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে এই কৃষকদের মধ্যেই করিতে হইবে। সুতরাং তাহাদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে। অর্থাৎ যাহাতে তাহাদের চাষ আবাদের সুবিধা হয়, জমিতে সার প্রয়োগ, অল্প জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে যাহাতে তাহারা তাহাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে, তাহাই তাহাদের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা। সেই শিক্ষা লাভ করিতে হইলে যে টুকু অক্ষর পরিচয়, যে টুকু লেখা জ্ঞান আবশ্যক তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। যাহাতে তাহারা নিজেদের দেহ সুস্থ রাখিয়া, গ্রামের স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া, তাহাদের অল্প উপার্জ্জন হিসাব করিয়া খরচ করিয়া সুখে না হউক স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিতে পারে, এমন শিক্ষাই তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা। নচেৎ তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, দেশবিদেশের খবর—এসব শিখাইবার কোন দরকার নাই। যে শিক্ষা লাভ করিলে গ্রাম বাসে তাহাদের প্রবৃত্তি থাকিবে না, তাহারা নিজেদের অবস্থায় আর সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না,—এমন শিক্ষা দিয়া, তাহাদের অবস্থার অপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে জাগাইয়া তুলিয়া তাহা পূরণ করিবার সুযোগ না দিলে—সেই শিক্ষা তাহাদের পক্ষে কুশিক্ষা হইবে। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে যে ভুল হইয়া গিয়াছে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারেও যেন সেই ভুল না হইয়া বসে ইহাই আমাদের বক্তব্য।

তাই আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষা এদেশে জনপ্রিয় হয় নাই। কি প্রাইমারী, কি সেকেণ্ডারী, কি উচ্চ শিক্ষা—কোন শিক্ষাই আমাদের কর্ম্ম-জীবনে কোন উপকারে লাগিতেছে না,—কাজেই উহা জনপ্রিয়ও হইতে পারে না। এখন, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর আগাগোড়া সংশোধন করিতে হইবে। এমন ভাবে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাতে এমন শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, যাহাতে লব্ধ শিক্ষা পরিণত বয়সে কাজে লাগে,—লোকে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছি; সেকেণ্ডারী কিম্বা উচ্চ শিক্ষা এখন আমাদিগের আলোচ্য নহে। অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আমাদের মতে কিরূপ আদর্শে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, আমরা এখানে কেবল তাহাই নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা বিবেচনা করি, কৃষি-প্রধান পল্লীতে প্রত্যেক আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত কিছু জমি থাকা উচিত। সেই জমিতে কৃষক-বালকগণকে হাতে কলমে চাষ আবাদের কাজ শিখাইতে হইবে। হাতে কলমে চাষ আবাদের কাজ শিখাইতে হইলে, শিক্ষকদেরও কৃষি কার্য্য কিছু কিছু জানা আবশ্যক। কিন্তু কৃষিকার্য্য জানেন এত শিক্ষক কোথা পাওয়া যাইবে। প্রথমে এই প্রশ্নটি মনে উঠিবে বটে, এবং ইহার সমাধানও কিছু কঠিন বলিয়া বোধ হইবে বটে, কিন্তু ইহার উপায় আছে, এবং সে উপায় খুব কঠিনও নহে। বঙ্গদেশের ৫২টি জেলায় এক্ষণে বহু সংখ্যক গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয় আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতা করিবার জন্য এই সকল বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়গণকে প্রস্তুত করা হয়। এখানে গুরুমহাশয়েরা শিক্ষকতা করিবার জন্য যে শিক্ষা পাইয়া থাকেন, তাহার অতিরিক্ত একটু কৃষি তত্ত্ব তাঁহাদিগকে শিখাইয়া লইলে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কৃষি বিদ্যা শিক্ষা দান কার্য্য তাঁহাদের দ্বারাই চলিতে পারিবে। তবে গুরুমহাশয়দিগকে কৃষি কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেক গুরু ট্রেনিং স্কুলে এক একজন করিয়া পুষা বা সাবুর কৃষি বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

ইহাতে তাঁহাদের শিক্ষা সার্থক হইবে, তাঁহাদের কার্য্য জুটিবে। তাঁহাদের নিকট হইতে অল্প স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরু মহাশয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বচ্ছন্দে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারিবেন। আলোচ্য রিপোর্টে গুরুমহাশয়দিগকে whole time শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা অতি উত্তম এবং সমীচীন প্রস্তাব। বাঙ্গালা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের দুর্ভাগ্য গুরুমহাশয়দিগের বেতন যেরূপ অল্প, যে কোন একজন অশিক্ষিত সামান্য কুলি মজুরও তদপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করে। ঐ সামান্য বেতনে এক জনেরই দুই বেলা উদর পূর্ণ করিয়া আহার জুটে না। তাহার উপর, গুরুমহাশয়গণকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। কাজেই, অন্য উপায়ে তাঁহাদিগকে আরও কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা দেখিতে হয়। হয় ত কেহ গুরু মহাশয় গিরির উপর ডাকঘরের কাজ দেখেন ; কেহ বা জমিদারের সরকারী করেন। সদুপায় না পাইলে অনেকে অভাবের পীড়নে হয় ত অসদুপায় অবলম্বন করিতেও পারেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। শিশুদিগের শিক্ষার ভার লইয়া যেরূপ অখণ্ড মনোযোগের সহিত এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় অবস্থার গতিকে তাহা তাঁহারা পারিয়া উঠেন না। কাজেই শিশু দিগের শিক্ষা ভাল হয় না ; কিম্বা হয় ত কুশিক্ষা লাভ হয়। গুরুমহাশয়দিগকে whole time এর জন্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবটা সুতরাং ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু এই ভাবে wholetime এর জন্য তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইলে তাঁহাদের বেতনের সম্বন্ধেও সুবিবেচনা করিতে হইবে। আর, তাঁহারা সাধারণ শিক্ষার উপর কিছু পরিমাণে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করায় তাঁহাদের কিছু বেশী বেতন পাইবার অধিকারও জন্মিবে। কেন না, তাঁহাদের qualification কিছু বাড়িয়া যাইতেছে। এই সকল প্রস্তাবে অবশ্য ব্যয় বাহুল্য ঘটিবে। সে ব্যয় আসিবে কোথা হইতে? ইহাও একটী গুরুতর সমস্যা। কিন্তু ইহারও যে সমাধান নাই, তাহা নহে। গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ে একজন করিয়া কৃষিবিদের নিয়োগ, গুরু মহাশয়দের বেতন বৃদ্ধি প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত কিছু কিছু কৃষি-ক্ষেত্র রক্ষা এ সকলই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ; অথচ, ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইবে না। সমস্যা কঠিন সন্দেহ নাই। আমাদের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে কিছু অতিরিক্ত অর্থব্যয় হইবে বটে, কিন্তু এই ব্যয় নিরর্থক হইবে না, এবং এই অতিরিক্ত ব্যয় কুলাইয়া যাইতেও পারিবে। কৃষিক্ষেত্রে হাতে হেতেরে যে চাষবাস শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা ত পরীক্ষার স্বরূপ (experimental measure) হইবে না,—রীতিমত চাষ হইবে। এখন আমাদের দেশে সাধারণ কৃষিক্ষেত্রে বৎসরে মাত্র একটা ফসল উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ক্ষেত্রে তাহা হইবে না। এখানে কৃষক-বালকগণকে rotation of crop কৃষি প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে ; এবং ঐ জমিতে বৎসরে দুইবার যে ফসল হইবে, তাহাতে ঐ জমির ব্যয়, কৃষি কার্য্যের ব্যয় এবং কৃষিবিদ্ শিক্ষকের বেতনের কিয়দংশ কুলাইয়া যাইতে পারিবে। এই কৃষি ক্ষেত্রে কিরূপে উৎকৃষ্ট সার প্রয়োগ করিয়া অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহাও হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে অল্প জমিতে বেশী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইতে পারিবে। এই ফসল বিক্রয় লব্ধ অর্থ স্কুলের প্রয়োজনেই ব্যয়িত হইবে।

ক্লাসগুলি বৎসরের অধিকাংশ সময় উন্মুক্ত স্থানে বসাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার উপকারিতা ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে ছাত্রদিগকে নিজেদের শরীর সুস্থ রাখিতে এবং গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এরূপ শিক্ষা ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ জীবনে বৃথা হইবে না। গ্রাম্য কৃষক যখন দেখিবে ছেলেকে স্কুলে পাঠাইলে তাহার চাষের কোন ক্ষতি হইবে না,—লেখাপড়া শিখিয়া বাবু বনিয়া গিয়া ছেলে আর ক্ষেত্রে চাষ করিতে অস্বীকৃত হইবে না, তখন

সে অতি সহজেই এইরূপ বিদ্যালয়ের উপকারিতা বুঝিতে পারিবে, এবং নিজেরা উদ্যোগী হইয়া ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে। তখন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হউক আর নাই হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না। তখন প্রাথমিক শিক্ষা compulsory করিলেও যে ফল হইবে, না করিলেও সেই ফল হইবে।

কৃষি-প্রধান অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সহিত যেমন কৃষিক্ষেত্র থাকিবে, এবং ছাত্রেরা হাতে কলমে কৃষি কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিবে,—শিল্প প্রধান স্থানগুলিতে সে রকম ব্যবস্থা চলিবে না। সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে স্থানে যে শিল্প প্রধান, অধিবাসীদের মধ্যে যে শ্রেণীর শিল্পীর সংখ্যা খুব বেশী, সেই স্থানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত, আধুনিক উন্নত প্রণালীতে সেই শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেখানে বহু সংখ্যক তন্তুবায়ের বাস, তথায় স্কুলের সঙ্গে তাঁতশালা থাকিবে। তন্তুবায় সন্তানগণ সাধারণ লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে Fly-shuttle loom, কিম্বা Hattersley's patent loom প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হইবে। শ্রীরামপুরের বয়ন বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ এই বয়ন-শিল্প শিক্ষা দিতে পারিবেন। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের রেশম শিল্প এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। এখন উৎসাহের অভাবে সেই শিল্প যায় যায় হইয়াছে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই বোধ হয় রেশমের ব্যবসায়ী ছিল ; এখন হয় ত তাহারা অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে। এ দিকে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে তাহাতে এবং যে সকল বিদ্যালয় আছে সে গুলিতেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রেশম কীট পালন, পোলুদের মধ্যে রোগ নিবারণ, রেশম উৎপাদন প্রভৃতি রেশম শিল্প সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে প্রাথমিক শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটিও ক্রমে পুনরুজ্জীবিত হইতে পারিবে।

তদ্রূপ কাঞ্চননগর, দাঁইহাট, খাগড়া প্রভৃতি স্থান ধাতু শিল্পের ও বাসন ইত্যাদির জন্য এক সময়ে বিখ্যাত ছিল ; এখনও তথায় এই সকল শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। এই সকল স্থানে ধাতু শিল্প প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হওয়া চাই।

এই সকল শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য অবশ্য অভিজ্ঞ শিল্পী চাই,—তাহাদিগকে বেতন দিতেও হইবে। এই সমস্ত জায়গাতেই অবশ্য সাধারণ গুরুমহাশয়দিগের দ্বারা এই সমস্ত শিল্প শিক্ষা দিবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষক রাখিতে যে ব্যয় হইবে, স্কুল সংলগ্ন কারখানায় উৎপন্ন শিল্প দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিতে পারা যাইবে। আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিতেছি, শুনিয়াছি, অনেক সাহেবদের স্কুলে, অন্ততঃ মেয়ে স্কুলে এই রকম ব্যবস্থা আছে।

এইরূপে শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করায় একটা মস্ত বড় লাভও আছে। এদেশে পুত্র প্রায় পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আবহমানকাল হইতে এই প্রথা এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে। এবং আমাদের বোধ হয় এই রকম করিয়াই হিন্দু সমাজে ছত্রিশ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি, কেবল জাতি ব্যবসায় নহে,—এদেশে (গুণবাচক) কুলীনের ছেলে কুলীন হয়। আবার, বর্ত্তমান কালে, পাশ্চাত্য শিক্ষার এমন প্রভাবের দিনেও এই প্রথা শিক্ষিতদের মধ্যেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই ; অর্থাৎ, আজ কালও অনেক উকীলের ছেলের ওকালতির, ডাক্তারের ছেলের ডাক্তারির স্কুল মাষ্টারের ছেলেদের স্কুল মাষ্টারি এবং প্রফেসারের ছেলের প্রফেসারীর দিকে ঝোঁক দেখা যায়।

দেশের সমাজের যখন অবস্থা এইরূপ, তখন বাঙ্গলার কৃষক ও শিল্পীগণের মনে, তাহাদের সন্তানেরা যাহাতে তাহাদের ব্যবসার অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এইরূপ ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এত দিন যে ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চলিতেছিল, তাহাতে কৃষক ও শিল্পীগণের সে আশায় ছাই পড়িতেছিল। লোয়ার বা আপার প্রাইমারী বিদ্যালয়ে

কিছু দিন লেখা পড়া শিখিয়াই আমাদের কৃষক ও শিল্পীর সন্তানেরা বিগড়াইয়া যাইতেছিল। প্রাইমারী ইস্কুলে পড়া চাষার ছেলে হাল ধরিতে ঘৃণা বোধ করিত; তাঁতির ছেলে মাকু ঠেলিতে রাজী হইত না; কামারের ছেলে হাতুড়ী দেখিলেই ভয় পাইত। এই জন্য আমাদের কৃষক ও শিল্পীরা সহজে ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে চাহিত না, পাছে ছেলে বিগড়াইয়া যায়। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবানুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে আর এ আশঙ্কা থাকিবে না। কৃষক ও শিল্পী যখন দেখিবে, ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াও তাহার পৈতৃক ব্যবসায় শিক্ষায় বঞ্চিত হইবে না, এবং ব্যবসায় ত্যাগও করিবে না,—বরং কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করায় তাহাদের বুদ্ধি আরও খুলিয়া যাইবে, তাহারা স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারিবে, তখন এই প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপ popular (জনপ্রিয়) হইয়া উঠিবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সমস্ত শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা কিছু ব্যয় সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের অভাব হইবে না বলিয়াই মনে হয়। ঢাকা, রংপুর ও কুমিল্লার টেকনিক্যাল স্কুল, শিবপুরের ইনজিনিয়ারিং কলেজ সংলগ্ন ওয়ার্কসপ, শ্রীরামপুরের চয়ন বিদ্যালয় টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সহজেই এই সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা দিতে পারিবেন।

এইবার আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য তালিকার বিষয়ে একটু আলোচনা করিব। প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার জন্য বিভিন্ন রকমের হওয়া আবশ্যক। পুস্তকগুলি খুব সরল হওয়া উচিত।

কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণে যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় বিরচিত হইলে বর্ণ-পরিচয় আরম্ভ করিয়া তাহাদের সাধারণ শিক্ষা যেরূপ সহজে অগ্রসর হইবে, ঐ সকল পুস্তকের মধ্যেই কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা ও উপদেশ থাকায় সে গুলির শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইবে। তাহার সহিত স্কুলের সংলগ্ন যে ক্ষেত্র, এবং ওয়ার্কসপ বা কর্ম্ম গৃহ থাকিবে, তাহাতে পঠিত বিদ্যার হাতে হেতেরে পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে demonstration এর যাহা ফল তাহাও হইবে; ফলে বোধ হয়, এখন যে শিশু দিগকে কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য দেশের লোকের এবং গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের ঝোঁক পড়িয়াছে, সেই কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর শিক্ষা খুব সহজেই হইয়া যাইবে।

আমর পূর্ব্বে বহুবার বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীর পালন সংক্রান্ত বিষয় গুলির প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমরা ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের "স্বাস্থ্য সমাচারে" আলোচনা মধ্যে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আলোচনা লেখালেখি ও জল্পনা কল্পনা সত্ত্বেও বস্তুতঃ দেশমধ্যে উন্নতি আরম্ভের কোন সূত্রপাতও দেখি না। আমরা "স্বাস্থ্য-সমাচার" সম্পাদনা সত্ত্বেও নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত শরীর পালন ও শরীর রক্ষার সকল নিয়ম প্রতিপালিত করাইতে সক্ষম হইতেছি না। ইহা বড়ই ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়। কথায় বলে, "অভ্যাস যায় না মলে" এইটী এক্ষণে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বুঝিতে পারিতেছি। পরিবারবর্গের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার ইহার প্রধান কারণ। শৈশবে যেরূপ শিক্ষা ও অভ্যাস পাইয়াছে পরজীবনে তাহা পরিবর্ত্তন করা অতি কঠিন ব্যাপার। এই জন্য আমরা করজোড়ে প্রত্যেক পিতামাতা, শিক্ষক ও গুরুজনবর্গকে নিবেদন করিতেছি যেন তাঁহারা শৈশব হইতেই শিশুদিগকে শরীরপালন ও রক্ষা করিবার প্রণালী অভ্যস্ত করাইয়া দেন। শিশুকে যাহা শিখাইবে সে তাহাই শিখিবে এখন হইতে সকলে এক মনে, এক ধ্যানে চেষ্টা করিলে অন্ততঃ ১০।১৫ বৎসর পরে ভাবী বংশধরদের দ্বারা (young hopeful) এদেশের স্বাস্থ্য অনেক উন্নত হইতে পারিবে।

বস্তুতঃ স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন শিক্ষা সাপেক্ষ; এবং সে শিক্ষা অতি শৈশব কাল হইতেই আরম্ভ হওয়া কর্ত্তব্য। এখন যখন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়া যাইতেছে, সকল বালক বালিকাই যখন লেখা পড়া শিখিবার সুযোগ পাইতেছে, তখন স্বাস্থ্যরক্ষা ও চরিত্র গঠন শিক্ষাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরম্ভ করিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর পালন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণে স্বাস্থ্য নীতি সম্বন্ধীয় বচন রচনা করিয়া পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতিও শিক্ষা হইয়া যাইতে পারে এইরূপে তাহারা যে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা করিবে তাহা চিরদিনের জন্য তাহাদের মনে গাঁথা হইয়া যাইবে। শৈশবের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষার ফলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া উঠিবে। সুতরাং শৈশবকাল হইতেই তাহাদের শিক্ষা বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তাহারা যাহাতে কুশিক্ষা না পায়, কদভ্যাস না করে, যাহাতে কুঅভ্যাস দূর করিতে পারে, এমন নীতি কথা তাহাদের পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হওয়া চাই।

স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্র "স্বাস্থ্য-সমাচারে" আমরা প্রাথমিক শিক্ষার কথা লইয়া যে এত বেশী আলোচনা করিতেছি তাহার কারণ;—Child is the father of the man; the nation grows with the child—শিশুকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে, যেরূপ ভাবে তাহাকে গঠন করা হইবে, সেইরূপ ভাবেই, সে মানুষ হইবে। অজ্ঞতাই সকল রোগের মূল—স্বাস্থ্যকথা সকল শৈশবেই শিশুকে শিখাইতে হইবে। যে সকল প্রচলিত কদভ্যাস আছে তাহার দোষ বুঝাইয়া তাহা-দিগকে সেই সকল হইতে বিরত করিতে হইবে। এই জন্য স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনা ও প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইল।

পল্লীস্বাস্থ্য

মফস্বলে বসন্ত এখনও কমে নাই। অনেক স্থলেই ইহা পূর্ব্ববৎ। ময়মনসিংহের একজন সংবাদদাতা "ঢাকা প্রকাশে" লিখিয়াছেন,—

এ সহরে বসন্তের প্রকোপ পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে; অধিকন্তু, কয়েক দিন যাবত নিউমোনিয়া সহ টাইফয়েড জ্বরও দেখা দিয়াছে।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য ঋতু এবং স্থানীয় জলবায়ুর উপর অনেকটা নির্ভর করে। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে আবহাওয়ার খবরটাও লওয়া আবশ্যক। কাটোয়ার বিশেষ উপযোগী "প্রসূন" সংবাদ দিতেছেন,—

কয়েক দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল—মধ্যে মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টিও হইতেছিল। শীতের দাপট খুব, লোকে ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

ঋতুর গোলযোগে স্বাস্থ্যের কিরূপ ইতর বিশেষ ঘটে দেখুন,—

আজ কাল দিনের বেলায় বেশ গরম, কিন্তু রাত্রিতে ঠাণ্ডা আছে। এই নরম গরমে মফঃস্বলে অনেক লোক নিমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বসন্ত ও কলেরাও দেখা দিয়াছে।—'প্রসূন"

কেবল বসন্ত নয়, স্থানে স্থানে বসন্তের সঙ্গে কলেরাও আছে,—

বনগ্রাম টাউনে ও নিকটবর্ত্তী ২।১ টি গ্রামে কলেরা রোগ দেখা দিয়াছে। বসন্ত রোগেরও প্রাবল্য আছে।

ইহার উপর আবার জলকষ্টও আরম্ভ হইয়াছে,—

বনগ্রাম থানার অধীন কামদেবপুর গ্রামে অত্যন্ত জলকষ্ট হইয়াছে। এই গ্রামের লোকে এক্ষণে প্রায় ১ ক্রোশ দূরবর্ত্তী

চামটার বিল হইতে পানীয় জল আহরণ করিয়া থাকে। জেলা-বোর্ডের এদিকে দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

কেবল মানুষ নয়। বনগ্রাম মহকুমায় বসন্ত রোগে গরুও মরিতেছে,—

গাইঘাটা থানার অধীন কয়েকটি গ্রামে বসন্তরোগে গরু মরিতেছে। যশোহরের পশু-চিকিৎসক মহাশয়ের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

আরও আছে,—

বনগ্রাম থানার অধীন দুর্গাপুর গ্রামে বসন্তরোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রামেও বসন্তরোগ দেখা দিয়াছে। টিকার সব ইনিস্পেক্টর সাহেবের চেষ্টায় এই অঞ্চলের বহু লোক টিকা লইয়াছে।

মফস্বলের প্রধান প্রধান স্থানে এক একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বর্দ্ধমানে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন উপলক্ষে "ত্রিপুরা হিতৈষী" দাবী করিতেছেন,—

মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তি স্তাপন উপলক্ষে গভর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন—গভর্ণমেণ্ট সুদীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া বর্দ্ধমান মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছেন। বাঙ্গলায় এখন বহুসংখ্যক শিক্ষিত চিকিৎসক আবশ্যক ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ মনে করেন এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক ভাষায় সুলভে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, কেহ কেহ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার আদর্শ খর্ব্ব না করিয়া কলিকাতায় শিক্ষাদানের আয়োজন বর্দ্ধিত করা সঙ্গত মনে করেন। গভর্ণমেণ্ট এই সকল মতামত বিচার করিয়া বঙ্গদেশের বৃহৎ নগর সমূহে ক্রমশঃ মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের মনস্থ করিয়াছেন।

গভর্ণর বাহাদুরের এই উক্তি মফস্বলবাসী সকলেই সমর্থন করিবে ইহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতায় একটীর স্থানে দশটী স্কুল কলেজ হইলেও মফঃস্বলবাসীদিগের উহাতে পড়ার সুবিধা হয় না। এ নিমিত্ত প্রতি ডিভিসনে অন্ততঃ একটী করিয়া মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়া যুক্তিসঙ্গত। এ সম্বন্ধে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। এখন গভর্ণর বাহাদুরের আশ্বাসবানীতে আমরা আশা করিতে পারি যে পূর্ব্ববঙ্গে আমরা আরও দুই চারিটী মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজের প্রতিষ্ঠা অনতিবিলম্বে দেখিতে পারিব।

বসন্তের খবর আরও একটু লইতে হইতেছে। যে কোন মফস্বলের সংবাদপত্র খুলিতেছি, তাহাতেই প্রথমে বসন্তের কথা নজরে পড়িতেছে। কাজেই পাঠক পাঠিকাগণেরও তাহা না শুনিয়া নিস্তার নাই। নড়াইল লোহাগড়ার সহযোগিনী "কল্যাণী" বলিতেছেন,—

লোহাগড়া বাজারে কয়েকটী লোক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে। বাজারে কর্ত্তৃপক্ষ অনেক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম, কিন্তু স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা ও অপরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত বেশী। এ সময়ে বাজারটীকে বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন রাখিতে অনুরোধ করি।

কুমিল্লা অঞ্চলের স্বাস্থ্য এখন ভাল যাইতেছে না। "ত্রিপুরা হিতৈষী" সংবাদ দিতেছেন,—

রোগের প্রাদুর্ভাব—কয়েক দিন কলেরার বেশ প্রকোপ ছিল। উহা শেষ হইতে না হইতেই আবার জ্বর দেখা দিয়াছে। তারপর হয়ত আসিবে অন্য একটা কিছু। এইরূপে সারা বৎসর ব্যাপী সহরময় একটা রোগ ও মৃত্যুর লীলা চলিতে থাকে। কেবল মূক প্রকৃতির উপর এ দোষ চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বর্ত্তমান সভ্যতার ও উন্নতির যুগে চলে না। এখন দেখা গিয়াছে প্রাকৃতিক শক্তিকেও নিয়মিত করা যায়। মিউনিসিপ্যালটীর সেই উৎসাহ ও উদ্যম আছে কি?

ময়মনসিংহের অনেক স্থানই ঝড়ে ও. দুর্ভিক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য স্থানীয় কয়েকটি ভদ্রলোক "ত্রিপুরা হিতৈষীর" মারফত দেশবাসীকে সকরুণ সাহায্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

অধুনা সেই সকল স্থানের লোকসমূহ বসন্ত, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি পীড়িত। উল্লিখিত বিপন্নাবস্থায় নগদ টাকার সাহায্য ব্যতীত সম্প্রতি উহাদিগকে ঔষধ, পথ্যাদি দ্বারাও সাহায্য করিতে হইতেছে। বহু লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যে সহায়তা করাও তৎসঙ্গে প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রচার ও সংবাদপত্রাদিতে উক্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হয় নাই। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করতঃ বিপন্নের উপকার করিয়া পুণ্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, ইহা আশা করিতে পারি।

"যেচে না দেয় সোদর ভাই, চাহিলে চামারের কাছেও পাই।" অভাব অভিযোগের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলে, প্রতিকারের ব্যবস্থাও অনেক স্থলে হইতে পারে। গত মাসে আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে জানাইয়াছিলাম যে, কাঁথির সহযোগী "নীহার"

বিনামূল্যে বসন্তের টীকা পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে,—

বিনামূল্যে বসন্তের টীকা—এতদঞ্চলের সহর ও মফঃস্বলে নানাস্থানে বসন্ত ব্যাধির সংক্রামক প্রাদুর্ভাবের বিষয় বিগত ৫ই ফাল্গুনের নীহারে আমরা প্রকাশ করিয়া এ সময় যাহাতে গরীব দুঃখী সাধারণকে বিনামূল্যে বসন্তের টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য আমাদের জেলাবোর্ড, লোক্যালবোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটির কর্ত্তৃপক্ষগণকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমরা অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করিলাম যে, কাঁথি ইউনিয়ন কমিটী এখন এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া সকলের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নারায়ণী বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে কাঁথি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সমূহের সর্ব্বসাধারণকে বিনামূল্যে টীকাপ্রদান করিবার জন্য তাঁহারা যোগ্য টীকাদার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই টীকাদার আপাততঃ ১লা মার্চ্চ হইতে ৩মাস কাল সকলকে বিনামূল্যে টীকা প্রদান করিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা সাধারণের অনেক উপকারই হইবে এবং গরীব দুঃখী সকলেই সাদরে নিজ নিজ বালক বালিকাদের টীকা করাইয়া লইবেন। এই সুব্যবস্থার জন্য আমরা ইউনিয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান মহাশয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এখন সমগ্র মেদিনীপুর জেলার সকল ইউনিয়নেই যাহাতে এই প্রকার ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে জেলাবোর্ড কর্ত্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হইতে দেখিলে আমরা অধিকতর সুখী হইব।

টীকার অভাব দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু "নীহারের" অন্য প্রকার অভিযোগের কারণ আছে। মেদিনীপুর জেলা বোর্ড পরিদর্শন করিয়া বিভাগীয় কমিশনার মহাশয় একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে সহযোগী লিখিয়াছেন,—

মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের মন্তব্যে দেখা গেল যে এ জেলায় জেলাবোর্ডের অধীনে ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা খুব কম। যাহাতে জেলাবাসীর চিকিৎসার সুবিধা সুচারুরূপে হইতে পারে, তজ্জন্য কমিশনার বাহাদুর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডকে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়াছেন। যে যে স্থলে. গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের প্রচলন হইবে, সেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ডিস্পেন্সারী থাকিবে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কেবল একটা বিশেষ মঞ্জুরী টাকা ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে প্রদান করিবেন। কমিশনার বাহাদুরের এ মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে যে অচিরে এই ম্যালেরিয়া-ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-ওলাউঠা-বসন্ত-পীড়িত আমাদের জেলার সর্ব্বত্র সুচিকিৎসার বিধান হইবে। তবে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কার্য্যের সত্বর সম্পাদন সম্বন্ধে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ হয়।

অপর এক সংখ্যায় "নীহার" স্থানীয় স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ দিয়াছেন,—

ওলাউঠার প্রকোপ এখন থামিয়াছে বটে, কিন্তু জ্বর ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব সম্পূর্ণ থামে নাই!

সময়ে সময়ে নূতন রোগ আসিয়া লোককে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলে। সহরে হইলে কতকটা পার আছে; কেন না, সহর অঞ্চলে সুচিকিৎসক একেবারে দুর্লভ নহে। কিন্তু মফস্বলে যেখানে সুচিকিৎসক ত দূরের কুচিকিৎসকেরও অসদ্ভাব, সেখানে নূতন অজ্ঞাত-পরিচয় রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে লোককে যথার্থই অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়। আমরা "ঢাকা প্রকাশ" হইতে এইরূপ দুইটী রোগের সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"সংক্রামক শোথ রোগ। মালদহের 'গৌড়দূত' বলেন—মালদহ সহরে এক প্রকার সংক্রামক শোথ-রোগ দেখা গিয়াছে; শুনিতে পাই, এক জেলখানাতেই ৩০ জন কয়েদীর এই রোগ হইয়াছে। প্রকাশ, সরকারী জেলার ডাক্তার সাহেব সপরিবারে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। স্বাস্থ্য বিভাগ শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধান করুন, এবং যাহাতে এই ব্যাধি জিলাব্যাপী না হয় তৎপক্ষে সতর্ক হউন।

আবার,—

নূতন ব্যাধি—সহরের স্থানে স্থানে 'টিটা' রোগ দেখা দিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টিটা রোগ বড়ই সাঙ্ঘাতিক। রোগে আক্রান্ত হইবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর ইহলীলা সাঙ্গ হয়। 'সন্তোষ' লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী, 'কিশোরীলাল জুবিলী' ও পগোজ স্কুলদ্বয়ের ভূতপূর্ব্ব ড্রইং শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ দত্ত মহাশয়ের একটী দৌহিত্র সেদিন এই ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছে। তাঁহার আর একটী দৌহিত্রেরও এই ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, তবে তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতেই শিশুটী রক্ষা পাইয়াছে। সহরবাসী সকলেরই এজন্য সতর্ক হওয়া সঙ্গত।

মফস্বলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিকার কল্পে কর্ত্তৃপক্ষও একেবারে উদাসীন নহেন। সহযোগিনী "কল্যাণী" লিখিয়াছেন,—

স্থানীয় পল্লীগ্রাম সমূহে বসন্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় বেঙ্গল সেনিটারি কমিশনারের আদেশানুসারে স্থানীয় সুচিকিৎসক ডাঃ শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কল্যাণীতে বসন্তরোগ সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া দেশবাসী বিশেষ উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই। অনেক অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত লোকের ধারণা, গো-বীজের টীকা দিলে কোনই ফল হয় না বরং রক্ত বিষাক্ত হইয়া শরীরকে রোগ প্রবণ করিয়া তুলে। বিশেষজ্ঞ ডাঃ শরৎ বাবুর কথায়, আশা করি, তাঁহাদের ভ্রম দূর হইবে।

কিন্তু সাধারণের মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাব বশতঃ ভাল কাজ করিতে যাওয়া অনেক সময়ে বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়,—লোকে শিক্ষার অভাবে সদভিপ্রায়কেও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজেদের ভালমন্দ বুঝিতে না পারিয়া কষ্ট পায়। "কল্যাণী" তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন,—

টিকাদার আসিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে; সাধারণ লোকের টীকা লওয়ার আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। অথচ বসন্ত রোগে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—এসংবাদ আমরা পাইতেছি। টীকা দেওয়ার আবশ্যকতা বুঝাইয়া সকলকেই টীকা লইতে বাধ্য করা উচিত।

অতএব সাধারণের মঙ্গলজনক কোন কাজ করিতে হইলে, প্রথমে তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

বঙ্গদেশ কত দিনে বসন্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, তাহার এখনও কোন স্থিরতা নাই। বসন্ত রোগ বসন্ত ঋতুতেই প্রবল হইয়া থাকে। এবার অনেক আগেই, পূরা শীত থাকিতে থাকিতেই বসন্ত রোগ প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। এখনও সামনে বসন্ত ঋতু। সুতরাং এখনও আরও কিছু দিন বোধ হয় আমাদিগকে এই রোগ ভোগ করিতে হইবে। মফস্বলের এমন কোন সংবাদপত্র দেখিতেছি না যাহাতে একটু আধটু বসন্ত রোগে সংবাদ পত্র হয় নাই। সহযোগী "ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষী" লিখিতেছেন,—

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার বহু গ্রাম হইতে আমরা বসন্তের ভীষণ প্রকোপ সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি; অনেকে মারা যাইতেছে। ডায়মণ্ডহারবার টাউনের পূর্ব্ব পাড়ায় এই রোগের প্রকোপ অত্যধিক। আমরা প্রতি সপ্তাহে সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, ইহার প্রতিষেধক নিয়মগুলি সকলে পালন করিয়া চলুন এবং মায়ের শরণ গ্রহণ করুন। মঙ্গলময়ী অবশ্য সকলের মঙ্গল করিবেন।

দৃষ্টান্ত দ্বারা কিরূপে রোগ চিকিৎসা করা যায়?

রোগের প্রকৃত স্বরূপ ও তাহার চিকিৎসা বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই এই দেশে রোগের প্রাবল্যের প্রধান কারণ। সকলেই বলে এদেশের লোক কুসংস্কারবশতঃ ঔষধ খাইতে চাহে না। উহা আংশিক সত্য বটে; কিন্তু ইহাদিগকে ঔষধের সাফল্যের বিষয় বিশদরূপে বুঝাইতে না পারিলে সহজে এই বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইবে না। পাশ্চাত্যদেশেও কোনও নূতন চিকিৎসা-প্রণালী সহজে লোকের নিকটে আদৃত হয় নাই। নূতন প্রণালীর উপকারিতা জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য অনেক অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে হইয়াছিল ও হইতেছে। পরে এই বিষয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইবে।

লোকের এই কুসংস্কার দূর করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমতঃ লেখা পড়ার সঙ্গে লোকের সংস্কার পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হয়, তাহারা নূতন নূতন তথ্য অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন বিষয় দেখাইলে তাহা উহারা সহজে বুঝিতে পারে।

জ্ঞান লাভের স্পৃহা মানুষের হৃদয়ে স্বভাবতঃই বর্ত্তমান। অনুকরণ করা। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি লেখাপড়া ব্যতিরেকেও উহা সাধিত হইতে পারে। কোনটি ভাল কোনটি মন্দ উহা মানুষ সাধারণ মনের গতি বা common sense হইতে বুঝিতে পারে। সুতরাং কোনও নূতন তথ্য জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে হইলে, উহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া নিরস্ত হইবার কোনও সার্থকতা নাই। উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে পারিলে ঐ তথ্য তাহারা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ও তাহারা অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়। এই সত্য সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে যেমন খাটে স্বাস্থ্য বিষয়েও তদ্রূপ প্রযোজ্য। বিশেষতঃ এই দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম বলিয়া এবং শতকরা ছয় জনের অধিক লোক নাম স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ বই দোহাই দিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ে সংস্কারে নিরস্ত হওয়া কোনও ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত বা Demonstration দ্বারা জনসাধারণকে সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে। তখন উহা সহজে লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিবে। মানুষ বহি পড়িয়া একটি বিষয় যত সহজে উপলব্ধি করিতে পারে স্বচক্ষে তাহার সাফল্য দেখিলে তদ্বিষয়ে আরও সহজে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হইতেছে। সকলেই নূতন বিষয় জানিতে উৎসুক। কিন্তু এই শিক্ষা বাহির হইতে না আসিয়া যদি নিজেদের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয় তবে উহা সহজে লোকের হৃদয় অধিকার করে।

পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, স্বাস্থ্য বিষয়ে কোনও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে উহা প্রথমতঃ জনসাধারণের নিকট হইতে কিরূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। আইন প্রণয়নকারীগণ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলেও দেশের জনসাধারণ প্রথমতঃ শুভচক্ষে তাহাদের কার্য্য বিচার করে নাই। সেই সমস্ত দেশেও প্রথমতঃ সাধারণ লোক স্বয়ং কোনও আইনের জন্য পীড়াপীড়ি করে নাই। অবশ্য ইহা সকলেরই ইচ্ছা যে জনসাধারণ নিজেরা যদি এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য করে তবেই সেই সমস্ত আইন সহজে কার্য্যকারী হয়। কিন্তু বাস্তবিক আজ পর্য্যন্তও পাশ্চাত্যদেশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনও আইন করিতে হইলে Health officerকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। কিন্তু এই ভাব ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এবং আমেরিকা ও ইয়োরোপে স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা হইতেছে।

সাধারণ লোকের মনে কিরূপে স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে ইচ্ছার উদ্রেক হইতে পারে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় দৃষ্টান্ত বা Demonstration দ্বারা লোককে স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সরকার বাহাদুর এই উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ ডলার ব্যয় করিতে স্বীকৃত হন। Hook-worm নামক এক প্রকার ভীষণ কৃমি রোগ তখন ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ দেশে প্রবল ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সহস্র সহস্র লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিত। আবার এই রোগের কারণ ও চিকিৎসা প্রণালী চিকিৎসকগণের নিকট সবিশেষ বিদিত ছিল। Demonstration দ্বারা এই রোগ দূর করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কার্য্য আরম্ভ হইলে চিকিৎসকগণ লোকের সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাকুক বরং ভীষণ ভাবে সকলের নিকট হইতে বাধা পাইতে লাগিলেন। সকলেই বলিল যে তাহাদের এই ব্যারাম নাই; সুতরাং তাহাদের ঔষধের কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি কোনও কোনও স্থানে কয়েকটি হাসপাতাল স্থাপিত হইল। পরীক্ষা করাইবার জন্য ও রোগে আক্রান্ত হইলে ঔষধ লইবার জন্য সকলকে আহ্বান করা হইল। অবশ্য বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া কার্য্যে ফল দেখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। ক্রমশঃ দুই একজন রোগী হাসপাতালে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিল। ফলে শীঘ্রই সাধারণ লোক ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিল।

সহস্র সহস্র লোকে হাসপাতাল ভর্ত্তি হইয়া গেল। অনেক পরিবারে যিনি একমাত্র উপার্জ্জন সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু পীড়িত হইয়া উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও আরোগ্যলাভ করিয়া কার্য্যক্ষম হইলেন। রুগ্ন ব্যাধিক্লিষ্ট শিশুর মুখে পুনরায় হাসির রেখা দেখা দিল। এইরূপে এই ভীষণ ব্যাধি আমেরিকা হইতে দূর হইয়া গেল, বক্তারও প্রয়োজন হইল না অযথা আইন সভায় কোনও তর্ক হইল না।—দেশের মহৎ কার্য্য সাধিত হইল। মানুষ লেখা পড়া না জানিতে পারে; খবরের কাগজ পড়িতে অসমর্থ হইতে পারে; কিন্তু স্বচক্ষে কোনও বিষয়ের সফলতা দেখিলে সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপ বিষয়ে কিরূপে সফলতা লাভ করিতে পারা যায়, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে এই বিষয় উপলব্ধি হইবে। ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে—মিন্‌ডানো দেশে একবার খুব বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সেনা বিভাগের ডাক্তার সাধারণের মধ্যে অনেক চেষ্টা করিয়াও টীকার প্রচলন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া কেবল নিজের সৈন্যগণকে টীকা দিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে বসন্ত রোগ ছাউনির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিল না, কিন্তু অন্য গ্রামে বহুসংখ্যক লোক এই রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল। চারিপার্শ্বস্থ জন সাধারণ ইহাতে অতিশয় চমৎকৃত হইল। একদিন দুই শত গ্রাম্য লোক সেনা-নিবাসে উপস্থিত হইয়া বলিল যে তাহাদিগকে টীকা দিতে হইবে। চিকিৎসক বলিলেন যে এত লোককে টীকা দিবার ঔষধ তাঁহার নাই। কিন্তু অধিবাসীগণ উত্তেজিত হইয়া হাতের লগুড় দেখাইয়া বলিল যে তাহারা এই সমস্ত বাজে কথা শুনিতে আসে নাই। তাহাদের মধ্যে শত শত লোক প্রতিদিন বসন্তে মারা যাইতেছে, অতএব তাহাদিগকে টীকা দিতে হইবে। ক্রমশঃ ব্যাপার গুরুতর হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি চিকিৎসক তখন সকলকে বিশুদ্ধ জল ইন্‌জেক্‌সন (injection) করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে দুই সপ্তাহ বাদে আবার তাহাদিগকে এইরূপে টীকা নিতে হইবে। ইহার মধ্যে ঔষধ আসিয়া পড়িল ও ডাক্তার সকলকে টীকা দিলেন।

এই দেশেও ঐরূপ ঘটনা সর্ব্বদা দেখা যায়। গ্রামের অধিবাসীগণ সহজে কোনরূপ চিকিৎসা করাইতে চাহে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, সরকারী চিকিৎসা প্রণালী তাহাদিগের নিকট নূতন ও অপরিচিত। সুতরাং তাহার সাফল্য বিষয়ে অনেকে সন্দিহান। উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সব বিষয় তাহাদিগকে বুঝাইতে না পারিলে সহজে সুফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সকলেই দেখিতেছেন যে ম্যালেরিয়া দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। এই রোগের উৎপত্তির কারণ ও চিকিৎসা-প্রণালী চিকিৎসকগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। সহরে সভা সমিতিতে এই বিষয় যথেষ্ট বক্তৃতা হইতেছে। আবার ম্যাজিক লেণ্টারন্ প্রভৃতির সাহায্যে কিরূপে মশক প্রভৃতির দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হয় তাহা দেখান যাইতেছে। কিন্তু রোগের ত কোনও উপশম দেখা যাইতেছে না। সরকারের প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীতেও কোনও সুফল দৃষ্ট হইতেছে না। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক চিকিৎসা প্রণালী এখনও গ্রামের অশিক্ষিত অধিবাসীগণ বুঝিতে পারিতেছে না। এই বিষয়ে তাহাদের সম্যক বোধ জন্মাইতে হইলে চারি পাঁচটি গ্রাম লইয়া একটি করে হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। তথায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগের চিকিৎসা করাইতে হইবে। এই ভাবে যদি ঔষধ ও ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা লোককে বুঝান যায় তবে সহজেই এই বিষয়ে সকলের মন আকৃষ্ট হইবে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে শীর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট ও আসন্ন-মৃত্যু রোগী যদি ঔষধ ব্যবস্থার গুণে পুনরায় সুস্থ ও সবল এবং কার্য্যক্ষম হইতে পারে, তবে সকলেই ইহার সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবে। যে অঞ্চলে অনেক গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হয় যেমন যশোহর খুলনা জেলা, তথায় এক একটি গ্রাম লইয়া কর্ত্তৃপক্ষ

demonstration আরম্ভ করা উচিত, আবর্জ্জনা প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলা, ডোবা পুকুর প্রভৃতি পরিষ্কার করা গ্রামে প্রচুর পরিমাণে জল নিকাশের উপায় প্রবর্ত্তিত করা ইত্যাদি উপায়ে যদি একটি গ্রামকে ম্যালেরিয়া-শূন্য করা যায় তবে পার্শ্বস্থ অন্যান্য গ্রামবাসি সমূহ সহজে এই পন্থার অনুসরণ করিতে পারে। একটি ম্যালেরিয়াক্রান্ত জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম যদি পুনরায় এই ব্যাধির কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া শস্যসম্পদপূর্ণ, হয় তবে সহজেই লোকে এই চিকিৎসা-প্রণালীর সফলতা অনুভব করিতে পারিবে। নচেৎ সহস্র বিজ্ঞাপনে "এই পরিবার কুইনাইন সেবন করে না" এইরূপ লিখিয়া দিলেও কোন ফল হইবে না। এইরূপে অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য আরম্ভ হইলে মনে হয় সহজে সুফল পাওয়া যাইবে। অবশ্য প্রথমতঃ সকলে ইহাতে উৎসাহ দিবে না বা সহানুভূতি দেখাইবে না; কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় অদম্য চিত্তে কার্য্য করিলে ফল অবশ্যম্ভাবী। উপরি উক্ত নিয়মে কার্য্য করিলে কলেরা প্রভৃতি মহামারীর সময়েও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আমরা এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ তিনবার পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়াছে; এবং প্রত্যেকবারই বহু সংখ্যক নরবলি গ্রহণ করিয়াছে। কি কারণে যে এই রোগ উৎপন্ন হয় তাহা এ যাবৎ নির্ণীত হয় নাই। বীজাণু তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর দেহের রক্ত অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এক প্রকার বীজাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, এবং তাহার ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাসিলাস নামকরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ নির্দ্ধারণ সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই রোগ পৃথিবীকে প্রথমবার আক্রমণ করে, তখন Pfeiffer নামক একজন বৈজ্ঞানিক সর্ব্ব প্রথমে ঐ বীজাণুর আবিষ্কার করেন; সেই জন্য উহা Pfeiffer's bacillus নামেও পরিচিত। এ পর্য্যন্ত এই bacillusই ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণ বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবারকার ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হইবার পর, আবার উহার বীজাণুর অনুসন্ধান করিতে গিয়া আগে কার সিদ্ধান্ত সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। Pfeiffer-bacillus সত্য সত্যই ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণ কি না, সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে কেবল সন্দেহ নয়, অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। অবশ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর রক্তে, বিশেষতঃ রোগের প্রথম অবস্থায় ঐরূপ এক প্রকার ব্যাসিলাস দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু রোগের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর দেহে এই ব্যাসিলাসের পরিমাণ কমিতেই দেখা গিয়াছিল; বরং তাহাদের স্থলে অন্য বহু প্রকার বীজাণু দৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিউমোনিয়া-উৎপাদক চারি শ্রেণীর Pneumococci বা Pneumonia germsও ছিল। তা' ছাড়া, কিছু কিছু Streptococci এবং Staphylococci নামক ব্যাসিলাসও ছিল।

এই সকল বীজাণু রোগ বৃদ্ধির, এমন কি, মৃত্যুর কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহারা রোগের উৎপত্তির কারণ নয়। এই সকল বীজাণুই, এমন কি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাসিলাস পর্য্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জার বৃদ্ধির গৌণ কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহাদের কোনটাকেই রোগের উৎপত্তির মূল কারণ বলা যায় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, ইনফ্লুয়েঞ্জার বীজাণু স্বতন্ত্র পদার্থ; কিন্তু এখনও তাহা অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে নাই। অনুমান হয়, ঐ অজ্ঞাত-পরিচয় বীজাণু খুব মারাত্মক জিনিষ নহে। কিন্তু ইহার

আক্রমণের ফলে মানব-দেহের,রোগকে বাধা দিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আইসে। তখন পূর্ব্বোক্ত বীজাণু সকল প্রবল হইয়া উঠে। উহাদের মধ্যে অনেকগুলা সুস্থকায় মনুষ্যদেহে কায়েমী ভাবে বাস করিয়া থাকে। মুখ গহ্বর এবং নাসারন্ধ্র অনুসন্ধান করিলে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। মানুষের দেহ যতক্ষণ সুস্থ ও সবল থাকে, যতক্ষণ তাহার রোগের আক্রমণে বাধা দিবার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ ইহারা মানব দেহে বাস করিয়াও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকৃত বীজাণু যখন মানব দেহকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে তখনই কেবল ইহারা প্রবল হইয়া উঠে, এবং অবশেষে রোগীর মৃত্যু ঘটায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে রোগের আক্রমণে বাধা দিবার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ পূর্ব্বোক্ত নিউমোকক্সি এবং তাহার সহচরগুলি মানুষের কিছুই করিতে পারে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা বীজাণুর প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, উহা প্রথমে মনুষ্য দেহ আক্রমণ করিয়া দেহকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, এবং সেই উপায়ে অপর মারাত্মক বীজাণুগুলির আক্রমণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। বর্ত্তমান কালের যুদ্ধও এইরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রথমে গোলন্দাজেরা শত্রুপক্ষের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে মাত্র,—শত্রুকে প্রকৃত পক্ষে পরাজিত করিতে পারে না। পরে পদাতিক সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া শত্রুকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার বীজাণুগুলিও সেইরূপ রোগের হাত হইতে মানুষের আত্মরক্ষার শক্তি খর্ব্ব করিয়া দেয়। আধুনিক গোলন্দাজেরা যেমন নিজেরা গুপ্তভাবে থাকিয়া এবং তাহাদের কামানের বহর ঝোপ জঙ্গলের ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়া দূরস্থিত শত্রুর প্রতি গোলা চালাইতে পারে,—শত্রুপক্ষীয় বিমানবিহারীরা যেমন দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তাহাদের কোন সন্ধান পায় না, সেইরূপ ইনফ্লুয়েঞ্জার অগ্রদূতেরাও এমন গুপ্ত ভাবে থাকিয়া মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে, এবং তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে যে, বৈজ্ঞানিকের অণুবীক্ষণ এখনও তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকৃত ব্যাসিলরই যখন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন উহা যে কিরূপে মানব শরীরকে আশ্রয় করে, তাহাই বা আমরা কেমন করিয়া জানিতে পারিব? বস্তুতঃ, এখনও এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। তবে, সাধারণ নিয়মানুসারে এই মাত্র স্থির হইয়াছে (তাহাও আন্দাজী আন্দাজী) যে, এই রোগ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অপর ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হয়; অর্থাৎ সুস্থ লোক রোগীর সংস্রবে আসিলে, রোগীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিলে, এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী কাসিলে বা হাঁচিলে কিম্বা রোগীর নিঃশ্বাসের সহিত রোগের বীজাণু বাহির হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়; এবং সেই বায়ু স্বস্থ ব্যক্তি নিঃশ্বাস রূপে গ্রহণ করিলে তাহারও রোগ হয়। কিন্তু ইহাতেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

আমেরিকায় যখন এই রোগ খুব প্রবল হইয়াছিল, তখন ইহার প্রকৃতি নির্ণয়ের এবং ইহার সম্পর্কীয় সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহের জন্য নানারূপ পরীক্ষা হইয়াছিল। কিরূপে এই রোগ সংক্রামিত হয় তাহা স্থির করিবার জন্য কতকগুলি লোক লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাদের রোগ-জন্য যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—অর্থাৎ কতকগুলি লোক নির্ব্বাচন করা হইল। তাহাদের এক ব্যক্তির শরীরের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এই সকল লোকের দেহে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষ অতি সহজে সংক্রামিত হইতে পারে। এবং তাহাদের উপর প্রথম যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে অচিরে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা-পীড়িত ব্যক্তির গলার ভিতরটা চাঁচিয়া কল্পিত রোগের বীজাণু বাহির করিয়া লওয়া হইল। তার পর তাহা সুস্থ ব্যক্তির গলার ভিতর চালাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রোগ কিরূপে রোগীর দেহ হইতে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয় তাহা যে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, সে তাহাতে কোন ফল ফলিল না,—একজনেরও ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয়বারে পরীক্ষায়, তাহাদিগকে রোগীর শয্যায় বসাইয়া

হইল। এই লোকগুলি কেবল শয্যার উপর বসিয়া ক্ষান্ত হইল না,—তাহারা রোগীর দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রোগীর মুখের কাছে নিজেদের মুখ লইয়া গিয়া, রোগীর পরিত্যক্ত নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি কিছুই হইল না,—ইনফ্লুয়েঞ্জা তাহাদের কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারিল না। ইহাতেও পরীক্ষকেরা নিরস্ত বা নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহারা পিচকারীর সাহায্যে কল্পিত রোগ-বীজাণু সুস্থ ব্যক্তিদিগের নাসারন্ধ্রে ও গলনালীর মধ্যে প্রয়োগ করিলেন, তাহাদের চক্ষুপল্লবে বর্দ্দন করিয়া দিলেন; এমন কি, কাহাকেও কাহাকেও খাওয়াইয়া দিলেন। এবং অপর একটা পরীক্ষায় কতকগুলি লোকের দেহে ছুঁচের সাহায্যে রোগবীজ ইনজেক্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সকল পরীক্ষার ফলে সেই সমান দাঁড়াইল—কেহই আক্রান্ত হইল না। তখন সকল পরীক্ষক একবাক্যে রোগ বীজাণুর রহস্য আবিষ্কারে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করিলেন। পরীক্ষার ফলে তাঁহারা এই জ্ঞানটুকু লাভ করিলেন যে, ইনফ্লুয়েঞ্জার সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই জানেন না—তাঁহাদের পূর্ব্ব ধারণা সমস্তই ভুল। তবে ইহাও সম্ভব যে, যে সকল লোকের দেহে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষ অতি সহজে সংক্রামিত হইতে পারে। এবং তাহাদের উপর প্রথম যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে অচিরে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা-পীড়িত ব্যক্তির গলার ভিতরটা চাঁচিয়া কল্পিত রোগের বীজাণু বাহির করিয়া লওয়া হইল। তার পর তাহা সুস্থ ব্যক্তির গলার ভিতর চালাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রোগ কিরূপে রোগীর দেহ হইতে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয় তাহা যে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, সে পরীক্ষায় ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয়বারে পরীক্ষা সফল না হইলেও আর একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার—ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ এই ব্যর্থ পরীক্ষার ফল দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রকৃত বীজ কি,—কিরূপে তাহা সংক্রামিত হয়, বিজ্ঞান যখন তাহা নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করিতে পারিল না, তখন সংক্রামক রোগের সময় লোকে আত্মরক্ষার্থ কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে, তাহা বাহির হইয়া পড়া নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই আবিষ্কার অবশ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নহে, সুতরাং ইহার আবিষ্কারের গৌরব বিজ্ঞানের প্রাপ্য নয়। তথাপি, বিজ্ঞান নিশ্চিত হইয়া বসিয়া ছিল না,—অন্য উপায়ের আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল। সকলেই জানেন, সার আমরথ রাইট (Sir Almroth Wright) টায়ফয়েড জ্বরের প্রতিষেধক টীকার আবিষ্কার করিয়াছেন। টাইফয়েড জ্বরের টীকার সাফল্য দর্শনে, ইনফ্লুয়েঞ্জারও টীকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এবং অনেকগুলি টীকা তৈয়ারও হইয়া উঠিল। এখন, কোন রোগের প্রতিষেধক টীকা প্রস্তুত করিতে হইলে সেই রোগের বীজ আবশ্যক। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বীজ যে কি তাহাই স্থির হয় নাই। কাজেই বলিতে হয়, ইনফ্লুয়েঞ্জার যে কয়েক প্রকার টীকা প্রস্তুত হইল, সে সবগুলাই আন্দাজে আন্দাজে তৈয়ার করা হয়। প্রথমে যে বীজাণুকে ইনফ্লুয়েঞ্জার বীজাণু বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল,-সেই বীজাণু হইতে এক প্রকার টীকা প্রস্তুত হয়। তার পর তাহাদের সহচর বীজাণু সম্প্রদায় (মায় নিউমোনিয়ার চারি শ্রেণীর বীজাণু) লইয়া টীকা প্রস্তুত করা হইল।

এই সকল টীকা লইয়া পরীক্ষাও করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে সন্তোষজনক হয় নাই। একটা পরীক্ষার ব্যাপার এইরূপ:—কতকগুলি লোককে তিন বার টীকা দেওয়া হয় এবং কতকগুলি লোক নির্ব্বাচন করা হয়, কিন্তু তাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই। এই দুই দল লোককে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর সংস্রবে রাখা হয়। যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের

মধ্যে যতগুলি লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে,—যাহাদের টীকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রোগীর সংখ্যা গড়ে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ছিল। আর এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা—অরক্ষিত ব্যক্তিদের অনুপাতে টীকা-গৃহীতদের মধ্যে এক-পঞ্চাংশ মাত্র হইয়াছিল। অতএব ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকৃত বীজ নির্দ্ধারিত হউক আর নাই হউক, টীকা দেওয়ায় ক্ষতি হয় নাই, বরং লাভই হইয়াছিল,—মৃত্যু সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছিল। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকৃত বীজ যাহাই হউক, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা যখন মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ নয়, উহা কেবল রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়া নিউমোনিয়ার বীজাণুর কার্য্যে সহায়তা করে, এবং টীকা গ্রহণে যখন মৃত্যু সংখ্যা স্পষ্টই কমিতে দেখা গিয়াছে, তখন টীকা গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত।

মোট কথা, যখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকৃত কারণ জানা না থাকিলেও, প্রতিষেধক টীকা গ্রহণের ফলে মৃত্যু সংখ্যা কমিতেছে, তখন টীকার উপর কিছু বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যায় হইবে না। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, টাইফয়েডের টীকা গ্রহণ করিলে যতটা নিরাপদ হওয়া যায়, ইনফ্লুয়েঞ্জায় টীকা গ্রহণে ততটা নিরাপদ হইবার আশা করা যায় না। টাইফয়েডের টীকার রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি, সাধারণ লোকে সাধ করিয়া টাইফয়েডের টীকা গ্রহণ করে না। সেইরূপ,—ইহাও আশা করা যায় না যে, বর্ত্তমান অবস্থায়, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামকরূপে বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলেও, লোকে স্বেচ্ছায় দলে দলে ইনফ্লুয়েঞ্জার টীকা লইতে আরম্ভ করিবে। সেটা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয় না। তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময়ে টীকা গ্রহণ করা আবশ্যক কি না, সে সম্বন্ধে পারিবারিক চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করা উচিত, এবং তাঁহার মতানুসারে চলা কর্ত্তব্য। তিনি মকেলের শারীরিক অবস্থা, স্বাভাবিক রোগ-প্রতিষেধক শক্তি, সংক্রামকতার ব্যাপকতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া সুপরামর্শই দিবেন। ইনফ্লুয়েঞ্জার সামান্য লক্ষণ দেখা দিবা মাত্র অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা কখনও যেন নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা না করেন। এ যাবৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন কোন ঔষধ বাহির হয় নাই, যদ্দ্বারা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ আরাম হইতে পারে। সুতরাং রোগের চিকিৎসার্থ প্রকৃতিকে সাহায্য করিবার জন্য স্বাস্থ্যনীতির অনুমোদিত কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে,—ইনফ্লুয়েঞ্জা যাহাতে নিউমোনিয়ায় পরিণত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে না পারে, সে পক্ষেই বা কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা কেবল মাত্র চিকিৎসকই স্থির করিয়া দিতে পারিবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর দেহ হইতে রোগের বিষ লইয়া সুস্থকায় কতকগুলি লোকের দেহে সংক্রামিত করিয়া কিরূপে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ এক ব্যক্তির দেহ হইতে অপর ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হয়—তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাতে কোন ফল ফলে নাই—ঐ সুস্থ লোকদের মধ্যে একজনও ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয় নাই। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, অবস্থা বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের দেহে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষ কোন কাজই করিতে পারে না। এই সকল লোককে বাছিয়া লওয়া হয় নাই,—যে যে লোককেই লওয়া হইয়াছিল। সেই জন্য ইহাও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ঐরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে খুব বেশী। ইনফ্লুয়েঞ্জার খুব প্রবল আক্রমণের সময়েও যখন ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষ চারিদিকে খুব বেশী পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, সেই সময়েও সমুদায় লোক সংখ্যার সিকি ভাগও আক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ সমাজের বারো আনা ভাগ প্রতিনিয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষের সংস্রবে আসিয়াও রোগাক্রান্ত হয় না। ইহার অর্থ এই যে, এই সকল লোকের শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থাই ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক। সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক সংখ্যক লোকের দেহকে যদি চেষ্টা করিয়া এইরূপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলেই সাধারণ ভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা হয়। চেষ্টা করিলে এরূপ করাও অসম্ভবও নহে। সেই অবস্থাটি হচ্চে প্রবল জীবনী শক্তি। পক্ষান্তরে এই শক্তি কমিয়া গেলেই ইনফ্লুয়েঞ্জা আসিয়া আক্রমণ করিবে। অতএব মানুষ মাত্রেরই শরীরকে এইরূপ সতেজ অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহাদের শরীরে এই তেজ কম, তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া যেন তাহা বাড়াইয়া লয়। আর যাহাদের দেহে এই তেজ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাহা যেন কমিয়া না যায়, সে জন্য নিয়মিত ভাবে ব্যায়ামের অনুষ্ঠান, আহার বিষয়ে সতর্কতা, এবং সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণ করিতে পারিবে না।

চয়ন।

একদা জীবন শক্তির সতেজতার জোরে যে সকল রোগের আক্রমণ আমরা নিরস্ত করিতে পারিতাম, এখন তাহা পারি না। পুষ্টির অভাবে সমস্ত শরীর নির্জ্জীব হইয়া আছে বলিয়াই নানা প্রকার রোগের হাতে আমরা হার মানিতেছি এবং মরিতেছি। সমস্ত দেশের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আহার সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বালকদের সম্মান করো। সব সময় পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের বোধে আচ্ছন্ন হইয়া তাহাদিগকে চালাইতে বা ও দিতে চেষ্টা করিও না

এমার্সন।

বৃদ্ধের ক্রোড়ে শিশুই ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ দান; শিশু বৃদ্ধের জীবনে আনন্দ লইয়া আসে, ভবিষ্যতের আশা লইয়া আসে।

টেনিসন।

আমাদের সমস্ত সমস্যা এমনই অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিজড়িত হইয়া আছে যে একসঙ্গে সবগুলির মীমাংসা করিয়া উঠিতে না পারিলে বিচ্ছিন্নভাবে কোনটার সমাধান মিলিবে না। স্বাস্থ্য, অর্থ, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক আচার এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতির মধ্যে একটী বিচ্ছেদহীন যোগ রহিয়াছে। জাতীয় জীবনকে সার্থক করিতে হইলে ব্যক্তির জীবনকে সুস্থ, সবল এবং নিশ্চিন্ত করিয়া তুলিতে হইবে—ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই।

ভারতবর্ষ।

প্রত্যেক শিশু ধনীর ঘরে জন্মাইতে পারে না; কিন্তু স্বাস্থ্যবান হইয়া জন্মিবার অধিকার প্রতি শিশুর আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিশুরা তাহাদের মাতাপিতাদের বাছিয়া লইতে পারে না, তাহাদের জন্মের পূর্ব্বেই তাহাদের

সৃষ্টি হইয়া যায়। মাতাপিতারা স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও ব্যাধিমুক্ত হইবেন, এই হচ্ছে শিশুদের দাবী।

Good Health.

জগৎ জুড়িয়া শক্তিমান স্বাস্থ্যবান মানুষের জন্য আহ্বান আসিয়াছে; দেশে দেশে স্বাস্থ্যবান পুরুষ ও নারীরাই জগৎকে নূতন করিয়া গড়িতে সক্ষম হইবেন।

Health Culture.

আপনার স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; আপনি রোগী হইতে পারেন, নির্জ্জীব নিস্তেজ হইতে পারেন, অথবা দেহ মনে প্রাণের প্রবাহে ভরা হইতে পারেন। আপনি মনে করিলেই আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারেন। স্বাস্থ্য লাভের জন্য সাধনা চাই।

Physical Culture.

জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পাঠ বড় অপ্রিয়, নীরস; কিন্তু এই তালিকা নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলে।

দেশ	বৎসর	প্রতি ১০০০ হাজার নব-জাত শিশুর মধ্যে প্রথম বৎসরে মৃত্যু-সংখ্যা।
নিউজিলাণ্ড	১৯১২	৫১
নরওয়ে	১৯১২	৬৮
সুইডেন	১৯১১	৭২
অষ্ট্রেলিয়া	১৯১৩	৭২
ফ্রান্স	১৯১২	৭৮
নেদারল্যাণ্ড	১৯১৩	৯১
সুইজারল্যাণ্ড	১৯১২	৯৪
ডেনমার্ক	১৯১৩	৯৪
আয়রল্যাণ্ড	১৯১৩	৯৭
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্	১৯১৬	৯৮
স্কটল্যাণ্ড	১৯১৩	১১০
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি	(১৯০২-১১)	১৯৯
বাঙ্গালা		২৭০
বেহার ও উড়িষ্যা		৩০৪
পাঞ্জাব		৩০৬
বোম্বাই		৩২০
বর্ম্মা		৩৩২
যুক্ত-প্রদেশ		৩৫২

Modern Review

DOUBLE COLOUR PAGE

স্বাস্থ্য-সমাচার

স্বাস্থ্য-বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম্-বি।

নবম বর্ষ

১৩২৭

কার্য্যালয়

৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য এক টাকা।